অর্থ-তত্ত্ব

বি. এ. এবং বি. কম্. ছাত্রছাত্রীদের জন্য
বাংলা ভাষায় 'জেনারেল ইকনমিক্স'

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, এম. এ., বি. এল.
সহঃ অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর কলেজ, বাণিজ্য-বিভাগ

ও

শ্রীপ্রশান্তকুমার রায়
এম. এ., ডিপ্. এস-সি. (এডিন), সি. এ. আই. আই. বি.
অর্থনীতির অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ, বাণিজ্য-বিভাগ

প্রাপ্তিস্থান
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার * কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

২৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা, এশিয়ান পাব্লিকেশনের পক্ষে অপরাজিতা রায়
কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউরেশিয়া প্রেস হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

এই বইখানিতে "অর্থতত্ত্বের" (Economics) মূল কথাগুলি যথাসম্ভব সহজ বাংলায় বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। বি-কম্ ও বি-এ ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই বইখানি লেখা হয়েছে। লেখার মধ্যে লেখকদের নিজস্ব দান সামান্যই আছে। তথ্য ও যুক্তি যা সব দেওয়া হয়েছে, তার প্রায় সবটুকুই ইংরাজীতে লেখা কলেজ পাঠ্য পুস্তকগুলি থেকে, এবং বিশেষ করে 'Cambridge Economic Hand-books' গুলি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

আজকাল লেখা-পড়া-জানা লোকেদের মধ্যে অনেকেই অর্থতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন অনুভব করেন। আশা করি, এই বইখানি তাঁদেরও কাজে লাগবে।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিদেশের সঙ্গে দেনা-পাওনায় গরমিল হ'লে, এই গরমিল শোধরাবার উপায়—দেনা বেশী হ'লে, বিদেশী অর্থের দর বাড়ে এবং তার ফলে রপ্তানী বাড়ে—পাওনা বেশী হ'লে বিদেশী অর্থের দর কমে, এবং তার ফলে আমদানী বাড়ে—এতে পুরো প্রতিকার না হ'লে সোণা রপ্তানী বা আমদানী হ'তে থাকে—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, দেশে টাকার যোগান কমিয়ে, বাড়িয়ে এর প্রতিকারের চেষ্টা করে—ব্যাঙ্ক-রেট (Bank rate) বাড়ান' কমান'র নীতি—খোলা হাতে সরকারী ঋণপত্র কেনা-বেচার নীতি (Open market operations)—'ডিভ্যালুয়েশন (Devaluation), অর্থাৎ সোণার হিসাবে দেশের টাকার দাম কমান'—'মুদ্রাসঙ্কোচ' ও 'ডিভ্যালুয়েশন' এই দুই ব্যবস্থার কোনটিই যদি না নেওয়া হয়, তা হ'লে স্বর্ণমান পরিত্যাগ ক'রতে হয়—তখন বিদেশী অর্থের কোন দরকেই স্থির দর বলা চলে না—তবে, বিভিন্ন দেশের অর্থ যে হারে বেচা-কেনা হ'লে তাদের ক্রয়শক্তি সমান হয়, এক হিসাবে সেই দরকে স্থির-দর বলা চলে (Purchasing power parity)—কারণ, এই দর চালু থাকলে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনার সমতা বজায় থাকার সম্ভাবনা আছে। পৃঃ ২১৮—২৩২

চতুর্থ খণ্ড

দেশের সমগ্র আয়ের শ্রেণীগত বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জমিদারীর আয়, শ্রমিকের মজুরী ও মাহিনা, মূলধনের সুদ এবং ব্যবসায়ীর লাভ, এই চার রকমের আয় কি ভাবে স্থির হয়, সেই প্রশ্ন এই খণ্ডে আলোচনা করা হবে—বিত্ত সৃষ্টির কাজে যাদের যতটুকু দান, তাদের সেই অনুপাতে আয় হয়, এ উত্তর দেওয়া চলে না—চাহিদা ও যোগানের সূত্র অনুসারে এই ভাগ-বাটোয়ারা হয়, এ উত্তরও খাটে না, কারণ যদিও পণ্য-মূল্য নির্দ্ধারণের প্রশ্ন ও আয়-নির্দ্ধারণের প্রশ্নের মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য আছে, এবং চাহিদার দিক্‌টায় এ দুটি প্রশ্নের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে, তবুও যোগানের দিক্‌টায় ততটা মিল না থাকায়, প্রত্যেকটির পৃথক্ আলোচনা দরকার। পৃঃ ২৩৫—২৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জমিদারীর আয়—খাজনা ও ভাড়া—চাষের জমি থেকে ব্যয়াতিরিক্ত আয়—তিনটি কারণ—প্রান্তিক জমির তুলনায় স্বাভাবিক উর্ব্বরতাগত শ্রেষ্ঠত্ব, প্রান্তিক জমির তুলনায় অবস্থানগত শ্রেষ্ঠত্ব ও জমির দুর্ল্লভতা—রিকার্ডোর সিদ্ধান্ত—এই ব্যয়াতিরিক্ত আয়

খাজনা হিসাবে আদায় করা হয়—জমির খাজনার সঙ্গে ফসলের দামের সম্পর্ক—খাজনা দিতে হয় ব'লে ফসলের দাম চড়া নয়, ফসলের দাম চড়া বলেই খাজনা দিতে হয়—অতএব জমিদারদের খাজনা আদায় করবার অধিকার লুপ্ত ক'রে দিলে ফসলের দাম ক'মবে না—এই সিদ্ধান্তের দুটি বিরুদ্ধ সমালোচনা—প্রথম, দেশের সমগ্র ফসলটি তৈরী ক'রতে গড়পড়তা যে খরচ পড়ে, সেই দামে সমস্তটি বিক্রয় হ'তে পারে, যদি গভর্ণমেণ্ট সমস্ত খাজনা আদায় করে, এবং সেই টাকা দিয়ে যে সব চাষীর পড়তা বেশী, তাদের ক্ষতিপূরণ করে—দ্বিতীয়, কোন বিশেষ ফসলের কথা বিবেচনা ক'রলে এ কথা বলা চলে না যে, খাজনা তৈরী-খরচের অঙ্গ নয়—এই দুটি ক্ষেত্রেই যুক্তিতে ত্রুটি আছে।

বাড়ী ভাড়া, খনির খাজনা ও জলকর—বাড়ীভাড়ার একটি অংশ মূলধনের সুদ এবং বাকিটুকু আসল খাজনা—খনির খাজনার একটি অংশ খনিজ পদার্থের দাম এবং বাকিটুকু খাজনা—জলকরের কোথাও সবটুকু আসল খাজনা, এবং কোথাও কতক অংশ মাছের দাম এবং বাকিটুকু আসল খাজনা। পৃঃ ২৩৮—২৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রিকার্ডোর সিদ্ধান্ত অনুসারে খাজনার পরিমাণ যতটুকু হবার কথা, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার চেয়ে কম-বেশী হয়—তার কারণ।

জমির খাজনার হ্রাসবৃদ্ধি কৃষির উন্নতির ফল—শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির ফল—জন-সংখ্যার বৃদ্ধির ফল—চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির ফল জমির দাম।

জমির খাজনা, রাজস্ব হিসাবে আদায় ক'রে নেওয়ার সপক্ষে যুক্তি—জমির উদ্বৃত্ত আয় জমিদারের চেষ্টার ফল নয়, এবং তা' বাজেয়াপ্ত ক'রে নিলে দেশের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না—কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ নীতি অবলম্বন ক'রলে অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পৃঃ ২৫০—২৫৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরিশ্রমের উপার্জ্জন—মজুরী ও মাহিনা—মজুরীর হিসাব, সময়ের মাপ ও কাজের মাপ—শ্রমিকেরা সময়ের হিসাব পছন্দ করে এবং মালিকেরা কাজের হিসাব পছন্দ করে—তার কারণ—অনেক ক্ষেত্রে কাজের মাপে মজুরী দেওয়া সম্ভব হয় না—যে সব ক্ষেত্রে কাজের মাপে মজুরী দেওয়া সম্ভব, যে সব ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা চালু থাকলে দেশের মঙ্গল হয়। পৃঃ ২৫৫—২৫৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তি—কে কি চায়—শ্রমিক চায় সর্ব্বাধিক নীট সুবিধা—আর্থিক আয় ও আসল আয়—মালিক চায় সস্তায় কাজ—শুধু মজুরীর হার কমিয়ে তার কোন স্বার্থসিদ্ধি হয় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মজুরীর পরিমাণ কি ভাবে স্থির হয়—প্রান্তিক সার্থকতার সিদ্ধান্ত—এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি—মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাক্‌লেই, তবে এই সূত্র অনুসারে মজুরী স্থির হ'তে পারে—মালিকদের একজোটে মজুরী দাবিয়ে রাখার চেষ্টা—তৎসত্ত্বেও যদি শ্রমিকদের জোর থাকে তা' হ'লে এই সূত্র অনুসারে মজুরী স্থির হবার কথা—কিন্তু শ্রমিকদের জোর কম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রমিকদের দুর্ব্বলতার কারণ—শ্রম-শক্তি মজুত করে রাখা যায় না—শ্রমিকের যোগ্যতা অনেকাংশে তার আয়ত্তের বাহিরে—সাধারণ পণ্যের মত শ্রম-শক্তি পাঠিয়ে দেওয়া যায় না—শ্রমিকের দৈন্য।

শ্রমিক-সঙ্ঘ দ্বারা এই অসুবিধাগুলির অনেকাংশে প্রতিকার হয়েছে—শ্রমিক-সঙ্ঘের গঠন ও কর্ম্ম-পদ্ধতি—শ্রমিক-সঙ্ঘের সার্থকতা—ধর্ম্মঘটের দ্বারা শ্রমিকের প্রান্তিক দানের চেয়ে বেশী মজুরী আদায় করা যায় না—ধীরবুদ্ধি ও দূরদর্শী লোকদের হাতে শ্রমিক-সঙ্ঘের নেতৃত্ব থাক্‌লে শ্রমিকদেরও মঙ্গল হয়, দেশেরও মঙ্গল হয়।

যেখানে শ্রমিক-সঙ্ঘ গড়া হয় নি, সেখানেও শ্রমিকেরা একেবারে অসহায় নয়—শ্রমিকেরা যে ধরণের খাওয়া-পরায় অভ্যস্ত, সেটুকু বজায় রাখ্‌তে যে পারিশ্রমিক দরকার, মালিকেরা যদি তার চেয়েও কমাতে চায় তা হ'লে সে চেষ্টা বাধা পায়—কেউ কেউ মনে করেন যে জীবনযাত্রার মান উঁচু ক'রলে মজুরীও বেশী পাওয়া যায়—এ কথা বিচারসহ নয়—পারিশ্রমিকের হার শ্রমিকের প্রান্তিক দান ছাড়িয়ে যেতে পারে না—তবে, যদি বেশী মজুরী দেওয়ার ফলে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মদক্ষতার উন্নতি হয় তা হ'লে তার প্রান্তিক দান বৃদ্ধি পায় এবং তখন তাকে স্থায়ীভাবে বেশী মজুরী দেওয়া পোষায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পারিশ্রমিক সম্বন্ধে আগেকার দুটি মত—১। Subsistence Theory of Wages বা মাত্র জীবনধারণের উপযোগী আয়ের সিদ্ধান্ত—এই মতের উৎপত্তি হয়, প্রজা-বৃদ্ধি সমস্যা

সম্বন্ধে ম্যালথাসের অভিমত থেকে—অতএব ম্যালথাসের সিদ্ধান্তে যে ত্রুটি আছে, এ সিদ্ধান্তেও সে ত্রুটি আছে।

২। Wages Fund Theory বা মজুরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট সঞ্চিত ধনের সিদ্ধান্ত—এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি —মাল তৈরীর কাজে সময় লাগে ; অতএব মাল বিক্রীর টাকা থেকে মজুরী দেওয়া যায় না, জমা টাকা থেকে দিতে হয়—এ যুক্তি ঠিক নয়—মজুরী দেবার জন্য বেশী টাকা নানাভাবে সংগ্রহ করা যায় অন্য কাজ থেকে টেনে নেওয়া যায়, বিদেশ থেকে ধার করা যায়, এবং ব্যাঙ্কগুলি নোট ও ডিপজিট আকারে বাড়তি টাকা সরবরাহ ক'রতে পারে—এ মন্তব্যের এই জবাব দেওয়া চলে যে, টাকার অঙ্কে মজুরীর পরিমাণ বাড়ান' সম্ভব হ'লেও ভোগ্য বস্তুর হিসাবে সম্ভব নয়, কারণ এগুলি অতীতের কর্ম্মচেষ্টার ফল - কিন্তু এ মন্তব্যও যুক্তিযুক্ত নয় দেশের ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদির যোগানকে একটি বদ্ধ জলাশয়ের মত কল্পনা না ক'রে, একটি স্রোতস্বতী নদীর মত কল্পনা করাই সমীচীন —এবং এই স্রোতের বেগ চেষ্টা ক'রলে বাড়ান যায়। পৃঃ ২৬৮—২৭১

নবম পরিচ্ছেদ

দেশভেদে পারিশ্রমিকের তারতম্য—নানা রকম সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়ে বসবাস ক'রতে পারে না, বা চায় না—সেইজন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে মজুরীর হার সমান হ'তে পারে না।

কাজভেদে পারিশ্রমিকের তারতম্য—এর কারণ, যে কেউ নীচু দরের কাজ ছেড়ে উঁচু-দরের কাজে ঢুকতে পায় না - সে পথে নানা রকম আর্থিক ও সামাজিক বাধা আছে—সমাজ এমন ভাবেই গড়া যে, তার মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট কতকগুলি স্তর আছে, এবং এক স্তরের লোকের পক্ষে অন্য স্তরে উঠতে গেলে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। পৃঃ ২৭১—২৭৩

দশম পরিচ্ছেদ

কারবারের লাভ—কারও কারও মতে ব্যবসায়ীরা যে লাভ করে, তাতে তাদের কোন ন্যায্য দাবী নেই—এই অভিমত কতদূর সঙ্গত স্থির ক'রতে হ'লে, লাভ বলতে কি বোঝায়, তার আলোচনা করা দরকার—খুঁটিয়া বিচার ক'রলে দেখা যায় যে ছয় প্রকার বিভিন্ন আয় লাভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়—যথা, মূলধনের সুদ, পরিচালকের পারিশ্রমিক, লোকসানের ঝুঁকি নেওয়ার প্রতিদান, অসাধারণ দক্ষতার ফলস্বরূপ উদ্বৃত্ত আয়, আকস্মিক কারণে অপ্রত্যাশিত লাভ ও একচেটিয়া অধিকারের লাভ—প্রথম চারিটি সম্বন্ধে কোন সঙ্গত আপত্তি করা চলে না, কিন্তু শেষের দুইটি সমর্থনযোগ্য নয়। পৃঃ ২৭৪—২৭৮

একাদশ পরিচ্ছেদ

টাকার সুদ—সুদ সম্বন্ধে দুটি বিষয় জানবার আছে ; যথা, কেন উত্তমর্ণ সুদ চায় ও অধমর্ণ সুদ দিতে রাজী হয়, এবং কি ভাবে সুদের হার স্থির হয় - প্রথম প্রশ্নটির আবার দুটি দিক আছে, ঋণের যোগান ও ঋণের চাহিদা।

ঋণের যোগান - এই যোগান ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে—কি কি অবস্থা সঞ্চয়ের পক্ষে অনুকূল - সঞ্চয় ক'রতে হ'লে সম্ভোগের ইচ্ছা কতকটা দমন ক'রতে হয়—সুদ পেলে এই আত্মনিগ্রহ করা পোষায়—এই হিসাবে সুদকে সঞ্চয়ের মূল্য বলা চলে—অতএব সুদের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের পরিমাণেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে—এ কথা কতকাংশে সত্য হ'লেও সঞ্চয়ের বেশীর ভাগ পরিমাণের সঙ্গে সুদ পাওয়া না পাওয়ার কোন সম্পর্ক নাই—Liquidity Preference বা টাকা আলগা রাখার পছন্দ- সঞ্চয়ের টাকা লোকে হাতছাড়া ক'রতে চায় না, বা ক'রলেও যথাসম্ভব কম সময়ে এবং যথাসম্ভব কম খরচে ও কম বেগ পেয়ে যাতে ঐ টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়, সে দিকে নজর রাখে—সুদের প্রয়োজন আসলে এই টাকা হাতছাড়া করার অনিচ্ছাকে অতিক্রম করবার জন্য—ঋণের মেয়াদ, লোকসানের ভয় ও টাকা আদায়ের অসুবিধা যে ক্ষেত্রে যত বেশী, সুদও সেক্ষেত্রে তত বেশী হারে দাবী করা হয়—সুদের তারতম্যের অন্যান্য কারণ।

ঋণের চাহিদা—আজকাল ঋণ নেওয়া হয় প্রধানতঃ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতির কাজে মূলধন হিসাবে খাটাবার জন্য—ঋণ নেওয়ায় যে উপকার হয় সেটি আসলে সময় পাওয়ার উপকার—ঋণের পরিমাণ যত বাড়ে, তার প্রান্তিক সার্থকতা তত কমে—অতএব সুদের হারের উপর ঋণের চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করে—এই হার যত বেশী হয় চাহিদার পরিমাণও তত কমে, এবং এই হার যত কম হয় চাহিদার পরিমাণও তত বাড়ে।

দীর্ঘকালের হিসাব নিলে, যে সুদে ঋণের যোগানের পরিমাণ ও চাহিদার পরিমাণ সমান হয়, সেই সুদ বাজারে বলবৎ থাকে।

মূলধন নিয়োগের সুযোগ সুবিধা বরাবর সমান থাকে না—যখন বদল হয় তখন ঋণের চাহিদার ধারাও বদল হয়—নানা কারণে এই বদল ঘটে—ঋণের যোগানের ধারাও নানা কারণে বদলায়।

সুদ দেওয়া নেওয়ার প্রথা থাকার কি কোন প্রয়োজন আছে?—ঋণের জন্য যদি সুদ দিতে না হ'ত, তা হ'লে দেশের মূলধনের অপচয় নিবারণ করা সম্ভব হ'ত না—সুদ যারা নেয় তাদের যদি এই টাকা নেওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, তা হ'লে সঞ্চয় বিশেষ কিছু কমে না—কিন্তু লোকে সহজে টাকা হাতছাড়া ক'রতে চায় না—এই অনিচ্ছা অতিক্রম করবার জন্য সুদের প্রয়োজন আছে।

পৃঃ ২৭৯—২৮৮

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাণিজ্যচক্র—ব্যবসা বাণিজ্য বরাবর সমান যায় না—বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে মোটামুটি একই সময়ে উন্নতি হয় এবং একই সময়ে মন্দা পড়ে—কেন এরকম হয় সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন।

অত্যধিক যোগান—আজকাল ভাবী ভারী যন্ত্রের সাহায্যে এবং অত্যন্ত ঘুরপথে পণ্যাদি তৈরী হয়,—সেইজন্য চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে যোগান বাড়ান যায় না—যখন বাড়ে তখন অনেক সময়ে অত্যধিক বাড়ে—পরে, চাহিদা কম্‌লে সহজে যোগান কমান' যায় না—ফলে মন্দার অবস্থা অনেক দিন চলে।

বিভিন্ন কারবারে এবং বিভিন্ন দেশে কেন একই সময়ে বাজার ভাল বা মন্দ হয় তার কারণ দুটি—প্রথম, বিভিন্ন শিল্প ও বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল—দ্বিতীয়, আশা বা আশঙ্কার মনোভাব সংক্রামক (পিগু সাহেবের মত)

অত্যল্প চাহিদা—(হব্‌সন্‌ সাহেবের মত) দেশের আয়ের বড় বেশী অংশ মুষ্টিমেয় ধনী লোকেদের হাতে আসে—সেইজন্য যত মাল তৈরী হয় তার সবটুকু বিক্রী হ'তে পায় না।

অত্যধিক বা অত্যল্প ঋণের যোগান (হট্রি সাহেবের মত)—বাণিজ্য-চক্রের সমস্যা আসলে, ব্যাঙ্কগুলি থেকে কখন কত পরিমাণে ঋণ দেওয়া হবে, সেইটি ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যা—সুদের একটা হার আছে, যে হার বলবৎ থাক্‌লে, দেশে যতটুকু সঞ্চয় হয় ঠিক্‌ ততটুকু ঋণের চাহিদা হয়; এবং তাতে বাজারের সহজ অবস্থা বজায় থাকে—ব্যাঙ্ক গুলি লোভের বশে, সুদের হার কমিয়ে অত্যধিক ঋণ দেয়; এবং তার ফলে যখন মজুত টাকার পরিমাণ অত্যন্ত ক'মে যায় তখন অতিমাত্রায় সাবধানী হয় এবং ঋণের যোগান অত্যধিক কমিয়ে দেয়—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত, ব্যাঙ্ক-রেট (Bank rate) বাড়িয়ে- কমিয়ে, এবং খোলা হাতে সরকারী ঋণপত্র কেনা-বেচা ক'রে এই অস্বাভাবিক অবস্থা ঘট্‌তে না দেওয়া।

অত্যধিক বা অত্যল্প পরিমাণে নূতন মূলধন নিয়োগ (কীন্‌স্‌ সাহেবের মত)— দেশে মূলধন নিয়োগ, বরাবর সমান পরিমাণে হয় না; কখন বেশী, কখন কম—অন্যদিকে, সঞ্চয় বরাবর সমান হারে হ'তে থাকে, কারণ লোকে অভ্যাস মত, উপার্জ্জনের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ সঞ্চয় করে—কিন্তু মূলধন নিয়োগের পরিমাণ আর সঞ্চয়ের পরিমাণ সমান না হ'য়ে পারে না: কারণ এই দুটি আসলে একই জিনিষ—মূলধন নিয়োগ অনুচিত বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হ'লে, দেশের উপার্জ্জনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হয়—তার ফলে সঞ্চয় বাড়ে বা কমে; এবং এই ভাবে মূলধন নিয়োগের পরিমাণ ও সঞ্চয়ের পরিমাণের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়—multiplier

বা গুণক-সংখ্যা—বেশী মূলধন নিয়োগের ফলে, বাণিজ্য-চক্রের উর্দ্ধগতির সময়, কিছু দূর পর্য্যন্ত জিনিষপত্রের যোগান বাড়ে, কিন্তু বাজার দর বাড়ে না—পরে, আরও অগ্রসর হ'লে, মুদ্রাস্ফীতির কুফলগুলি ফলতে আরম্ভ করে এবং লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে—forced saving বা জবরদস্তি সঞ্চয়—যদি ব্যাঙ্কগুলি সময় থাকতে সুদের হার চড়িয়ে মূলধন নিয়োগ নিয়ন্ত্রিত করে, তা হ'লে আর এ অবস্থা হ'তে পারে না—মূলধন নিয়োগের পরিমাণ অনুচিত হ্রাসপ্রাপ্ত হ'লে নানা কারবারে মন্দা পড়ে এবং লোকের উপার্জ্জন কমে এই ভাবে মূলধন নিয়োগের পরিমাণ ও সঞ্চয়ের পরিমাণের মধ্যে সাম্য বজায় থাকে—এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য কম সুদে ঋণ দিয়ে বেশী মূলধন নিয়োগের উৎসাহ দেওয়া দরকার —এবং তাতেও যদি সুফল না হয় তা হ'লে সরকারের পক্ষ থেকে নানা রকম জনহিতকর কাজে হাত দিয়ে লোকের উপার্জ্জন যাতে বৃদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার।

পৃঃ ২৯১ ২৯৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রের আয় ব্যয়—রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যয়সাপেক্ষ—সরকারী আয়—কি কি সূত্রে গভর্ণমেণ্টের হাতে টাকা আসে—টেক্স শব্দে কি বোঝায়—Impact ও incidence—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ টেক্স।

টেক্স কি রকম হওয়া উচিত—সুনির্ব্বাচিত টেক্সর চারিটি লক্ষণ—ন্যায্যতা, স্থিরতা, সুবিধা ও কম খরচ—আনুপাতিক হার ও ক্রমবর্দ্ধমান হার (Proportional ও Progressive taxation)—প্রত্যক্ষ টেক্স ও পরোক্ষ টেক্সর গুণাগুণ। পৃঃ ৩০০—৩০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেশের বৈষয়িক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য—ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ রাখার নীতি—এ নীতির সপক্ষে যুক্তি এতে ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হয়, এবং তার ফলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ মূলধন ও শ্রমশক্তির সবচেয়ে কার্য্যকর ব্যবহার হয়, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থোপার্জনের সুযোগ পায়।

ক্ষেত্রবিশেষে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন—কল কারখানা চালান সম্বন্ধে নানা রকম বিধি নিষেধের ব্যবস্থা না করলে শ্রমিকদের দুর্গতি নিবারণ করা যায় না—খরিদ্দারদের স্বার্থরক্ষার জন্যও সরকারী বিধি নিয়ন্ত্রণ দরকার হয়—দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্প-সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা দরকার—একচেটিয়া কারবারীদের অনাচার দমন করবার জন্যও সরকারী হস্তক্ষেপ দরকার হয়।

সোস্যালিজম্ (Socialism)—সোস্যালিষ্টরা জমি, খনি, কল কারখানা প্রভৃতিতে ব্যক্তিগত মালিকানী স্বত্ব রাখার বিরোধী এবং দেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আনার পক্ষপাতী—তাঁরা বলেন যে তা না হ'লে দেশের সঙ্গতির অপচয় নিবারণ করা যায় না, এবং সাধারণ লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও করা যায় না—ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার নীতির ব্যর্থতা—বেকার সমস্যা—দারিদ্র্য ও ধন-বৈষম্যের সমস্যা—এই ব্যর্থতার কারণ—ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বজায় রাখা যায় না—সাধারণ লোক নিজের ইষ্ট বোঝে না, বা বুঝেও সেইমত কাজ করবার সুযোগ পায় না।

স্বাধীন চেষ্টার নীতি যে সর্ব্বাংশে সার্থক হয় নি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু তা থেকে এ কথা প্রমাণ হয় না যে পুরোপুরি সোস্যালিষ্ট নীতি অবলম্বন ক'রলে দেশের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভাল হবে—বিলাতে ও ফ্রান্সে অনেকগুলি ব্যবসায় রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আছে—কোনটিতেই সুফল হয় নি, এবং প্রায় সমস্তগুলিতেই বিপুল পরিমাণে লোকসান হয়েছে।

কি ধরণের ব্যবস্থা ক'রলে সরকারী পরিচালনা কার্য্যকরী হ'তে পারে, তার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি—এ বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত।

সরকারী ব্যবস্থা কার্য্যকরী হওয়ার পথে দুটি অন্তরায়—যথেষ্ট সংখ্যায় সুদক্ষ পরিচালক তৈরী করা বা নির্ব্বাচন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়; এবং যদিও বা কোন ক্ষেত্রে সুযোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তার কাছ থেকে পুরো কাজ পাওয়া সম্ভব নয়—বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজারদের নিয়োগ, পদবৃদ্ধি, বিশেষ পুরস্কার ও পদচ্যুতির যে সব ব্যবস্থা আছে, সে রকম ব্যবস্থা সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে অবলম্বন করা যায় না।

এ বিষয়ে এ-ডি-গোরওয়ালার প্রস্তাব—ভারত গভর্ণমেণ্ট থেকে, সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির কোনটিই ভাল চলছে না কেন, সে বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়—তাঁর প্রস্তাবগুলি যতদিন না বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে ততদিন ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়—তবে, এই প্রস্তাবগুলির একটি বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য যে, বহুসংখ্যক বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান বজায় না থাকলে এই প্রস্তাবগুলি কাজে লাগান যায় না—অর্থাৎ, পুরোপুরি সোস্যালিষ্ট নীতি চালু করলে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করবার কি ব্যবস্থা করে যেতে পারে, তার কোন উত্তর শ্রী গোরওয়ালা দেন নি বা দিতে পারেন নি।

দেশের কৃষি-শিল্প বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনলে অন্য যে সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হবে, সে সমস্যা সমাধান করা আরও কঠিন—দেশের সঙ্গতি থেকে সবচেয়ে উপকার পেতে হলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ মূলধন ও শ্রমশক্তি, বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে

এমন ভাবে ভাগ করে দিতে হবে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐগুলি থেকে সমপরিমাণ প্রান্তিক উপকার পাওয়া যায়—খোলা বাজারে দর ওঠা নামার ভেতর দিয়ে ঐ কাজ আপনা আপনি হয়—সরকারী কর্ম্মচারীদের বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর যদি এই কাজ ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে দেশের সম্পত্তির অপচয় অবশ্যম্ভাবী।

অতএব চালু ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে, তার বদলে পুরোপুরি সোস্যালিষ্ট ব্যবস্থা আমদানী করবার চেষ্টা করলে অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কাজ করা হবে—যে সব ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, শুধু সেই সব ক্ষেত্রে যতটুকু দরকার ততটুকু বিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা উচিত—আর সেই সঙ্গে যে কারণে স্বাধীন চেষ্টার নীতি থেকে যথোচিত সুফল পাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটছে সেগুলি দূর করা উচিত—অর্থাৎ অত্যধিক ধন-বৈষম্য দূর করা উচিত এবং একচেটিয়া কারবারীদের কঠোর হস্তে শাসন করা উচিত।

পৃঃ ৩০৮—৩২০

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থতত্ত্বের বিষয় বস্তু

অর্থতত্ত্বের কাজ হচ্ছে মানব সমাজের বৈষয়িক জীবনের পর্য্যালোচনা। আমরা নিত্য নানা রকমের ভোগ্যবস্তু ব্যবহারে অভ্যস্ত। জীবন ধারণের জন্য অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসগৃহ চাই। এই অভাব মেটাবার জন্য রয়েছে নানারকমের খাদ্যসামগ্রী; নানা রংএর, নানা ছাঁচের, এবং নানা উপাদান দিয়ে তৈরী পোষাক পরিচ্ছদ; ছোট বড় গ্রাম ও নগর পত্তন ক'রে নানা ধরণের ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা। এ সব ছাড়াও আরও অনেক জিনিষের নিত্য ব্যবহার চল্‌ছে, যেগুলি মনের ও দেহের আরাম বিধান করে, কিংবা শুধু খেয়াল বা বিলাস বাসনা চরিতার্থ করার কাজে লাগে। এই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে যে কত, তা' কলিকাতার মত একটি বড় শহরের বাজারগুলিতে ঘুরে' বেড়ালে উপলব্ধি করা যায়। এই বিপুল পণ্য-সম্ভারের যোগানের পেছনে রয়েছে, একদিকে মানুষের ভোগের আকাঙ্খা, এবং অন্যদিকে এই আকাঙ্খা চরিতার্থ করবার জন্য তার সহস্রমুখী কর্ম্ম-প্রচেষ্টা। সমাজ-জীবনের এই যে দিক্, এইটিই হচ্ছে অর্থতত্ত্বের আলোচনার বিষয়-বস্তু। সংক্ষেপে, বিত্ত-সংগ্রহ, বিত্তের ভাগ ও বিত্তের ব্যবহার, এই নিয়ে মনুষ্য-সমাজের যে কর্ম্ম-জীবন সেইটিই হচ্ছে অর্থতত্ত্বের আলোচনার বিষয়।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, তার সমাজের গঠন ও রাষ্ট্র-জীবনের রূপ, প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবিস্তারের গতি, আদর্শের অনুপ্রেরণা বা ধর্ম্মের উন্মাদনা, এ সব কিছুরই মানব সমাজের বৈষয়িক জীবনের উপর প্রভাব আছে; এবং অর্থতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে এ সবগুলিরই যথোপযুক্ত স্থান আছে। অতএব এরকম মনে ক'রলে ভুল হবে যে, অর্থতত্ত্বে একটি কল্পনায় গড়া মানুষকে নিয়েই বিচার বিবেচনা করা হয়—যার সমস্ত কাজ ও ব্যবহারের পেছনে স্বার্থসিদ্ধির তাগিদ্ ছাড়া আর কোন রকম উদ্দেশ্য বা অনুপ্রেরণা নাই। আবার, এ রকম মনে ক'রলেও ভুল হবে যে অর্থতত্ত্বের আসল কাজ হচ্ছে একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থার কল্পনা করা, এবং যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করা, কেন এইটি অন্য সব রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থার চেয়ে ভাল। যেমন পদার্থ বিদ্যায় বা রসায়নশাস্ত্রে দেখ্‌তে পাই, কি ঘট্‌ছে এবং কেন ঘট্‌ছে এই নিয়েই অনুসন্ধান করা হয়, অর্থতত্ত্বেরও কাজ মুখ্যতঃ তাই। অবশ্য দেশের শ্রী-সম্পদ্ ও লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ান'র কাজে সহায়তা করে ব'লেই এ বিদ্যার সার্থকতা। এবং সেই জন্য অর্থতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও গবেষণা আছে, এবং বিশেষ

উদ্দেশ্য সাধন সম্বন্ধে কার্য্যকর উপায়েরও নির্দ্দেশ আছে। সেই হিসাবে অথতত্ত্ব মুখ্যতঃ একটি তথ্য-সন্ধানী বিজ্ঞান (positive science) হ'লেও, এর আরও দুটি দিক্ আছে—একটি আদর্শ-সন্ধানী বিজ্ঞান (normative science), এবং অন্যটি ফলিতবিদ্যা (practical art)। তবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য ঠিক্‌মত উপায় উদ্ভাবন ক'রতে হ'লে, আগে দরকার জ্ঞান আহরণ। যেমন দেহতত্ত্ব ও ঔষধিতত্ত্ব .সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাক্‌লে কার্য্যকরী চিকিৎসা-বিদ্যা গ'ড়ে তোলা যায় না, তেমনি আমাদের এখনকার কর্ম্ম-জীবনের পেছনে যে কারণগুলি বর্ত্তমান রয়েছে, সেগুলিকে উপেক্ষা ক'বে সমাজের বৈষয়িক জীবনকে নূতন রূপ বা গতি দেবাব চেষ্টা ক'রলে, সে চেষ্টা ফলবতী হ'তে পারে না। তা' ক'রতে গেলে হাতুড়ে বৈদ্যের চিকিৎসাঁর মত শুধু অনর্থেবই সৃষ্টি হবে, মানুষের কল্যাণ সাধন হবে না। এই জন্য তথ্যসন্ধানী বিজ্ঞান হিসাবে অর্থতত্ত্বেব আলোচনাব বিশেষ প্রযোজন আছে।

অর্থতত্ত্বের সূত্রগুলির বৈশিষ্ট্য

অর্থতত্ত্বকে পদার্থ-বিদ্যা বা বসায়ণ-শাস্ত্রের মত তথ্যসন্ধানী বিজ্ঞানেব পর্য্যায়ভুক্ত করা কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মনঃপূত নয়। ঐ দুই শাস্ত্রে গবেষণার কাজে কোন একটি কারণকে অন্যান্য কারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষাগারেপরীক্ষা করা যায়, এবং তার ফলাফল নির্ণয় করা যায়। সেইজন্য ঐ দুই শাস্ত্রেব বিষয়ীভূত পদার্থগুলি সম্বন্ধে নির্ভুল কার্য্য-কারণ-সূচক সূত্র আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু আমাদের বৈষয়িক জীবনের ব্যাপারে সে ব্যবস্থা সম্ভব নয়। আপনা আপনি যা-ঘট্‌ছে সেইগুলি মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করা ছাড়া আমাদের কোন গতি নাই। তারই উপর ভিত্তি ক'রে এবং বিচার বিবেচনার উপব নির্ভর ক'বে আমাদেব বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে কার্য্য-কারণ-সূচক সূত্র আবিষ্কার ক'বতে হয়। এ আপত্তিব এই উত্তব দেওয়া চলে যে, পরীক্ষাগারে পরীক্ষা ক'রতে না পাবিলেই যে নির্ভুল সূত্র আবিষ্কার কবা যায় না তা নয়। সৌবজগতেব গ্রহ উপগ্রহগুলি নিয়ে পবীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয় না। কিন্তু সেইগুলিব সংস্থান ও গতি সম্বন্ধে এমনই নির্ভুল সব সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে যে, কবে চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ হবে তা বহুকাল আগে থেকেই নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়।

তবে অর্থতত্ত্বের সূত্রগুলির একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন। জড়জগৎ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে যে সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে কারণের যে ফল সূচিত হয়, সেই কারণ কোথাও প্রকাশ পেলেই তার নির্দ্দিষ্ট ফলও যথাসময়ে প্রকাশ পায়—কোথাও তার ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু অর্থতত্ত্বের সূত্রগুলি এরূপ নিশ্চিতধর্ম্মী হ'তে পারে না।

মানুষ ত' জড় পদার্থ নয়। তার চিন্তাশক্তি আছে, ও স্বাধীন ইচ্ছা আছে। তারপর, আমাদের বৈষয়িক জীবনের উপর কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে যে কারণের ক্রিয়া চল্‌ছে, তার সবগুলি সব সময়ে নজরে পড়ে না; এবং প'ড়্‌লেও সেগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব সব সময়ে বোঝা যায় না। উপরন্তু, যখন কতকগুলি কারণের কাজ চল্‌ছে, সেগুলির পূর্ণ ফল উদ্ভূত হবার আগেই অন্য কারণ এসে হাজির হয়, এবং পূর্ব্বগামী কারণগুলির কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মায়। সেইজন্য, অর্থতত্ত্বের কার্য্য-কারণ-সূচক সূত্রগুলি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ কর্‌বার সময় দেখা যায় যে, যে পরিবেশের ফল- স্বরূপ যে ঘটনা ঘট্‌বার প্রত্যাশা করা যায়, আসলে তা' থেকে অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম হয়। অর্থতত্ত্বের সূত্রগুলিতে কোন কারণের বা কারণসমবায়ের নিশ্চিত ফল সূচিত করে না, শুধু কি ফল উৎপন্ন হওয়ার সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা সেই ঝোঁকটির সন্ধান দেয়। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হবে। দাম কম্‌লে বিক্রী বাড়ে—একটি অর্থতত্ত্বের সূত্র। অতএব যদি চিনির দাম কমে, আমরা আশা ক'রতে পারি যে. চাহিদার পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু এমন যদি হয় যে, চিনির দর কমার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের দর অত্যধিক বেড়ে গেল, তা' হ'লে চা খাওয়া ক'মে যাবে, এবং চিনির ব্যবহারও অনেক ক'মে যাবে। ফলে এরকম হওয়া অসম্ভব নয় যে চিনির দর কম্‌বার পর দেখা গেল যে, বিক্রী বেশী হওয়া ত' দূরের কথা, উল্টে বিক্রী ক'মে গেল। কিন্তু এতে ক'রে সূত্রটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল না। শুধু এইটুকু প্রতিপন্ন হ'ল যে সূত্রটি প্রয়োগ করবার সময় দেখ্‌তে হবে যে আর কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে কি না, যার প্রতিক্রিয়া এই সূত্রটির কাজের ওপর হ'তে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈষয়িক জীবনের-ক্রম বিকাশ—আদিম অবস্থা

মানবসমাজের বৈষয়িক জীবনের যে রূপটির সঙ্গে এখন আমরা পরিচিত, এমনটি চিরকাল ছিল না। বহুযুগ ধ'রে ধীরে ধীরে এটি গ'ড়ে উঠেছে। একেবারে গোড়ায় ঠিক্ কিরকমটি ছিল, তার অবশ্য কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়। তবে, এখনও পৃথিবীর যে দু' এক জায়গায় মানুষকে আদিম অবস্থায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাদের পর্য্যবেক্ষণ ক'রে, এবং প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার ফলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, সে যুগে মানুষের অবস্থা প্রায় বন্য পশুর সামিল ছিল। বাস ছিল বনে জঙ্গলে; খাওয়া ছিল বনের ফল, মূল ও শিকার করা পশুপক্ষীর মাংস; গায়ের আবরণ প্রথমে কিছুই ছিল না, এবং পরে পশুচর্ম্মের ব্যবহার হ'তে লাগল; ঘর বল্‌তে ছিল পর্ব্বতের গুহা এবং গাছের লতা পাতা দিয়ে তৈরী অতি সামান্য রকমের আশ্রয়। বস্তুতঃ, একদিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে, মানুষের অবস্থা পশুপক্ষীর চেয়েও অসহায় ছিল। কারণ, বাঘ ভালুকের নখ আছে, দাঁত আছে; ঘোড়া বা হরিণ দৌড়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে; পাখী আপনা থেকেই অতি চমৎকার বাসা তৈরী ক'রতে পারে। কিন্তু এ সব কোন যোগ্যতাই মানুষের নাই। তবে মানুষকে প্রকৃতিদেবী এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী ক'রেছেন। তার বুদ্ধি আছে, স্মরণশক্তি আছে, বিচার বিবেচনা করবার ক্ষমতা আছে। তার উদ্ভাবণী শক্তি আছে; এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রবার সহজ প্রবৃত্তি আছে। এই সমস্ত বৃত্তিগুলির অনুশীলন ও প্রয়োগ দ্বারাই মানুষ আপনার অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি ক'রেছে; এবং প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারের অসংখ্য সম্পদ্ নানা ভাবে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের কাজে লাগিয়েছে। সে চেষ্টা তার এখনও চল্‌ছে।

যে সব সময়ের অল্পবিস্তর বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় তার প্রথম দিক্‌টায় আমরা মানুষকে দেখ্‌তে পাই পশুচারণরত যাযাবর দল হিসাবে। খাদ্যের অন্বেষণে আর মানুষকে বনে জঙ্গলে শীকার ক'রে বেড়াতে হচ্ছে না। গরু, ভেড়া, উট প্রভৃতি জন্তুর দুধেরও ব্যবহার চল্‌ছে। পশুর চর্ম্ম, এবং পরে তার লোম দিয়ে তৈরী কাপড়ের পরিচ্ছদ ও তাঁবুর ব্যবহার চল্‌ছে। ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে, তার পিঠে চ'ড়ে দূর দূরান্তরে ক্ষিপ্র-বেগে যাতায়াত করার সমস্যার সমাধান হয়েছে। এক জায়গার ঘাস ইত্যাদি পশুখাদ্য ক'মে গেলে, পশুর পাল নিয়ে মানুষের দলগুলি অন্য জায়গায় সরে যাচ্ছে। এই ভাবে ধীরে ধীরে মানুষ ভূপৃষ্ঠের অনেকখানি অংশে ছড়িয়ে প'ড়ছে।

এ যুগে ধনসম্পদ্ ব'লতে পশুর পালই বোঝাত। এগুলি দলের সাধারণ সম্পত্তি ব'লেই গণ্য হ'ত। তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা মানুষের মনে পরিস্ফুট হয় নি।

কৃষির যুগ

এর পরে আস্তে আস্তে কৃষির যুগ এল। আগুন জ্বাল্‌বার কৌশল আয়ত্ত হবার পর, লোহার তৈরী ছুরি, কাটারি, কোদাল, কুড়ুল জাতীয় হাতিয়ারের সাহায্যে বন জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে চাষের জমি তৈরী করা সহজ হ'ল। গরু ও ঘোড়াকে চাষের কাজে লাগান হ'ল। খাদ্য-আহরণ আগের চেয়ে অনেক সহজ হ'ল। তারপরে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা ভাবে বহু শতাব্দী ধ'রে কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। কি ক'রে জমির পাট ক'রতে হয়, কোন্ ঋতুতে কোন্ ফসল ক'রতে হয়, কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল ভাল হয়, কোন্ সারে কাজ বেশী হয়, জল সেচের ও জল নিকাশের কোন্ ব্যবস্থা বেশী কার্যকরী, এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা ক'রে মানুষ ক্রমে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হ'য়েছে, এবং এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সমাজের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি ক'রেছে। কৃষিবিদ্যার গবেষণার কাজ এখনও শেষ হয় নি, এবং প্রতি বৎসরেই নূতন নূতন মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে।

কৃষি-প্রধান সমাজে সম্পত্তি ব'লতে আসলে চাষের জমিই বোঝায়। যে, কোন জমি বন জঙ্গল কেটে পরিষ্কার ক'রে চাষের উপযোগী করেছে, এবং সেখানে নিয়মিত চাষ ক'রছে, স্বভাবতঃ সে জমি তারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে গণ্য হ'ত। বেশীর ভাগ জায়গায় এই কাজ একজনের দ্বারা না হ'য়ে, কয়েক জনের সমবেত চেষ্টায় হ'ত। সেখানে সেই জমি তাদের সকলের সাধারণ সম্পত্তি ব'লে গণ্য হ'ত। জমিতে চাষীর মালিকানা স্বত্ব স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই লোকে মেনে নিত। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে বরাবর জমিতে প্রজার মালিকানী স্বত্ব স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে। ফসলের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজাকে রাজস্ব হিসাবে দিতে হ'ত। কিন্তু রাজার তরফ থেকে কখনও জমির মালিকানী স্বত্ব দাবী করা হয় নি। জমিদারেরা ছিলেন আসলে রাজ-কর্ম্মচারী। তাঁদের কাজ ছিল রাজস্ব আদায় করা; এবং এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে রাজস্বের একটি অংশ তাঁদের প্রাপ্য ছিল। অবশ্য, অনেক জায়গায় জমিদারেরা বলপ্রয়োগ দ্বারা নানা অজুহাতে বেশী বেশী আদায় ক'রতেন। কিন্তু সে সব ছিল অত্যাচার, দেশের নিয়ম নয়। কেবল ইংরাজের আমলে বাংলায় এবং অন্য যে সব জায়গায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল, সেই সব জায়গায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। জমিদারদিগকে জমির মালিক ব'লে সাব্যস্ত করা হয়। পরে প্রজা-স্বত্ব আইনের দ্বারা এ ভুলের প্রতিকার করা হয়, এবং জমিতে প্রজার মালিকানী স্বত্ব অনেকাংশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জমিদারী প্রথা

উচ্ছেদের স্বপক্ষে জনমত প্রবল হ'যে উঠেছে, এবং খুব সম্ভব অদূর ভবিষ্যতে, চাষীর কাছ থেকে খাজনা আদায় ক'রবার অধিকার, সরকার ছাড়া, আর কারও থাকা হবে না।

ইউরোপে চাষীর অবস্থা কালক্রমে অত্যন্ত হীন হ'য়ে পড়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের অবসানের পর বহু শতাব্দি ধ'রে ইউরোপে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলেছিল। তারপর যখন ধীরে ধীরে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন সমাজগঠনের যে ব্যবস্থা কায়েমী হ'ল, সেটির নাম 'ফিউড্যাল' ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা আধুনিক যন্ত্রযুগের আগে বহু শতাব্দি ধ'রে চালু ছিল। এই ব্যবস্থায় রাজ্যের সমস্ত জমির মালিকানী স্বত্ব ছিল রাজার। তাঁর অধীনে বিভিন্ন এলাকার কর্ত্তা হিসাবে অনেকগুলি সামন্ত ছিলেন। এই সামন্তেরাই আসলে জমির উপস্বত্ব ভোগ ক'রতেন। চাষীদের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব এতই ব্যাপক ছিল যে তাদের অবস্থা প্রায় ক্রীতদাসের মত ছিল। তাদের ভরণ-পোষণের জন্য সামান্যকিছু জমি তাদের চাষ ক'রতে দেওয়া হ'ত। সামন্তেরা নিজেদের খাস জমিতে চাষীদের বেগার খাটিয়ে নিতে পারতেন। উপরন্তু অন্য অনেক প্রকারে তাদের সেবা আদায় করবার অধিকার তাঁদের ছিল। চাষীদের জমি ছেড়ে-যাবার অধিকার ছিল না, এবং যখন কোন জমি এক সামন্তের হাত থেকে অন্য সামন্তের হাতে গিয়ে প'ড়ত তখন সেখানকার চাষীদের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারও নূতন সামন্ত পেতেন। ফ্রান্সের চাষীরা মুক্ত হয় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের সময়। রুষের চাষীরা মুক্ত হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের রুষ বিপ্লবের সময়।

গ্রাম-জীবন—স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম বা-গ্রাম সমষ্টি

চাষ আবাদের সাহায্যে খাদ্য আহরণের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের এক যায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজন উপস্থিত হ'ল। ক্ষেতের কাছে সুবিধামত কোন উঁচু জমি বেছে নিয়ে কতকগুলি পরিবার নিজের নিজের ঘর তৈরী করে এক সঙ্গে বসবাস সুরু ক'রল। এইভাবে গ্রাম-জীবন আরম্ভ হ'ল। আধুনিক যন্ত্রযুগের পূর্ব্বেকার বহু শতাব্দির ইতিহাস হচ্ছে, এই গ্রাম-জীবনের প্রসার ও পরিপুষ্টির ইতিহাস। অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নজর প'ড়ল কিসে দৈনন্দিন জীবন আরও স্বচ্ছন্দ ও সুখকর করা যায়। এই চেষ্টার ফলেই ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠ্‌তে লাগল নানা রকমের গ্রাম-শিল্প। প্রথম প্রথম প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা পরণের কাপড়, মাটির তৈজসপত্র, কাঠের আস্‌বাব প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নিজেরাই তৈরী ক'রে নিত। ক্রমশঃ লোকে বুঝতে শিখলে যে প্রত্যেকেই পাঁচ রকমের কাজ না ক'রে, যদি এক এক জন এক এক রকমের কাজে তার সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করে, তা' হ'লে কাজও ভাল হয়,

এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও বেশী হয়। ফলে, সেই ভাবেই সমাজ গ'ড়ে উঠ্‌তে লাগল, এবং কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কারু-শিল্পকে আশ্রয় ক'রে ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হ'ল। একদিকে চাষী এবং অন্যদিকে কামার, কুমোর, তাঁতী, কলু, ছুতোর, গয়লা, জেলে, ময়রা প্রভৃতি নিয়ে গ্রাম-জীবন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হ'ল। প্রথম প্রথম একজনের তৈরী জিনিষ আর একজন পেত, তার নিজের তৈরী জিনিষের সঙ্গে অদল-বদল ক'রে। পরে পয়সা কড়ির প্রচলন হ'ল। তখন এই বিনিময়ের কাজ আরও সহজ হ'ল, এবং বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে আদান প্রদান সম্ভব হ'ল। ক্রমশঃ রাস্তা ঘাট তৈরী হ'তে লাগ্‌ল। কালক্রমে, নানা কারণে কোন কোন গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধ ও জনবহুল হ'য়ে নগরে পরিণত হ'ল। বেশী দামের জিনিষপত্র তৈরীর শিল্পগুলি প্রধানতঃ এইসব নগরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল—যেমন পিতল বা কাঁসার বাসন, সোনা, রূপা বা হীরা জহরতের কাজ, হাতীর দাঁতের জিনিষ, সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি, অস্ত্র শস্ত্র এবং অন্যান্য যুদ্ধসজ্জা ইত্যাদি। আশে পাশের গ্রামগুলির উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যাদি এইসব নগরেই বিক্রীর জন্য আসৃত, এবং গ্রামে দুষ্প্রাপ্য জিনিষ গুলির যোগান এইসব নগর থেকেই হ'ত। আধুনিক যন্ত্রযুগের আগেকার বৈষয়িক জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র দিতে গেলে ব'লতে হয় যে, একটি গ্রাম, বা একটি নগর এবং তার চারিপার্শ্বস্থ কতকগুলি গ্রাম নিয়ে, এক একটি স্বয়ং পূর্ণ এলাকা ছিল; অর্থাৎ প্রত্যেক এলাকার বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সেই এলাকার মধ্যেই তৈরী হ'ত; এবং প্রত্যেক এলাকার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সেই এলাকার মধ্যেই ব্যবহার হ'ত। দূরদেশের সঙ্গে যে ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না তা নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্থলপথে, নদীপথে এবং সমুদ্রপথে বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। মিশর, রোম, সিংহল, বর্ম্মা, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, শ্যামদেশ, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি পশ্চিম ও পূর্ব্বের বহু বিদেশের সঙ্গেও, অতি প্রাচীনকাল থেকেই, স্থলপথে ও সমুদ্রপথে আমাদের বণিকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তার অনেক প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরের কবর থেকে পাওয়া 'মমীর' গায়ে ভারতের তৈরী মস্‌লিন পাওয়া গেছে। প্রাচীন রোম থেকে ভারতের পণ্যের বদলে এত অধিক সোনা ভারতে রপ্তানি হ'ত যে, সে সময়ে রোমের সরকারের এ একটা বিশেষ চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠেছিল। ডামাস্কাসে তৈরী তরবারির সারা ইউরোপে বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। সেই তরবারি তৈরী হ'ত পূর্ব্ব ভারত থেকে ইস্পাৎ আমদানী ক'রে। বস্তুতঃ, প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ ক'রে এদেশে ইংরেজ আসার সময় পর্য্যন্ত, এত রকমের এবং এত উৎকৃষ্ট ধরণের সব পণ্যদ্রব্য এখানে পাওয়া যেত, যে বরাবরই দেশ বিদেশের লোকেরা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য বিশেষ লালায়িত ছিল। মধ্যযুগে ভারতের পণ্য ইউরোপে পৌঁছে দেওয়ার কাজ ভারতের পশ্চিমের মুসলমান দেশগুলির বণিকদের

একচেটিয়া ছিল। এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকৃতে না পেরে পঞ্চদশ শতাব্দিতে, ইউরোপ থেকে ভারতে পৌঁছিবার অন্য পথ আবিষ্কার করবার জন্য ইউরোপীয়গণ চেষ্টা ক'রতে লাগল, এবং এই অন্বেষণের ফলেই কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করেন, এবং ভাস্কো ডি গামা আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে, আফ্রিকা ঘুরে, ভারত মহাসাগর দিয়ে ভারতে এসে পৌঁছতে সমর্থ হন। তারপরে স্পেন, পর্টুগ্যাল, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বণিকগণ এই পথেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ক'রতে থাকেন। যেমন ভারতে, তেমনি সভ্য জগতের অন্যান্য জায়গাতেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে অনেক কাল থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য চ'লে আসৃছে। বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের উভয় তীরবর্ত্তী দেশগুলির মধ্যে অতি ঘনিষ্ট যোগাযোগ অতি প্রাচীনকাল থেকেই চ'লে এসেছে।

আগেকার কালে দেশবিদেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য যথেষ্ট ছিল বটে; কিন্তু একটি কথা এই সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে, এই ব্যবসার সঙ্গে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ কোন যোগ ছিল না। কারণ আমদানী রপ্তানীর জিনিষগুলি ছিল, হয় মূল্যবান বিলাসের সামগ্রী যা অতিশয় বিত্তবান্ লোকেদের ভোগেই লাগত, না হয় লোহা, লবণ, সোরা, গন্ধক, কর্পূর, চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি যে সব জিনিষ বিশেষ বিশেষ দেশেই পাওয়া যেত, এবং যা লোকের কদাচিৎ কখনও ব্যবহার করবার প্রয়োজন হ'ত। নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের মধ্যে বোধ হয় লোহা এবং লবণ ছাড়া আর কোনও জিনিষের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবসা চলৃত না।

আগেকার দিনের শিল্প-জীবনের বিশেষত্ব।

তখনকার দিনের শিল্প জীবনের গুটিকতক বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। এখন যেমন জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য যে কেউ যে কোন বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে পারে, তাতে কোন বাধা নিষেধ নাই, আগে সে রকম ছিল না। আমাদের দেশে ত' ব্যবসা ছিল সম্পূর্ণ জাতিগত। ইউরোপে যদিও আমাদের দেশের মত বাঁধাধরা জাতিভেদ কখনও ছিল না, তবু সেখানেও প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যবসা বংশগত হ'য়ে প'ড়েছিল। তার একটা কারণ ছিল এই যে, তখন কোন ব্যবসা শিখ্‌তে হ'লে ভাল কারিগরের কাছে পাঁচ সাত বৎসর ধ'রে শিক্ষানবিশ থেকে হাতে কলমে শিখ্‌তে হ'ত। আর স্বভাবতঃই, নিজের ছেলে বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় ছাড়া আর কাহাকেও কেউ বড় এরকম শিক্ষা নেবার সুযোগ দিত না। সাহেবদের নামের পেছনে যে Carpenter (ছুতোর), Smith (কামার), Baker (রুটিওয়ালা), Saddler (ঘোঁড়ার সাজওয়ালা), Wheeler (চাকা নির্ম্মাতা), Turner, Gardener (মালী), Butler (রাঁধুনি), Waterman (ভিস্তি), Tailor (দর্জ্জি), Hunter (ব্যাধ) প্রভৃতি বংশগত উপাধি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা থেকে বেশ

বোঝা যায় যে, অতীতে এদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কোন এক সময়ে পুরুষানুক্রমে ঐ সব কাজ ক'রত। সেকালে ইউরোপে প্রত্যেক ব্যবসার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ছিল। নগরেব ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে মাতব্বরদের নিয়ে একটি Guild বা শিল্পী-সংঘ তৈরী হ'ত। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিভিন্ন 'গিল্ড' থাকৃতো। ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ভার এই 'গিল্ড'গুলিব হাতে থাকৃত। কি ধরণের এবং কত মাল তৈরী হবে, কি রকমের কাঁচা মাল ব্যবহার হবে, কি দামে এবং কোথায় বিক্রী হবে, কাকে ব্যবসা করতে দেওয়া হবে, শিক্ষার্থীদেব শিক্ষাব ব্যবস্থা কি হবে, এই সবকিছুই এই 'গিল্ড'-গুলি স্থির ক'রত। ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিদেশীদের কেউ বড় আমল দিতে চাইত না প্রত্যেক দেশের, এমন কি প্রত্যেক নগরের চেষ্টা ছিল কিসে নিজেদের জিনিষ বিক্রী করে বাইরে থেকে বেশী বেশী সোনা নিযে আস্‌তে পারা যায়। দেশে কত সোণা আছে, এবং কত সোণা আমদানী হচ্ছে, তাই দিয়ে দেশের সম্পদের হিসাব করা হ'ত। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা ক'রতে হ'লে বাজার অনুমতি দবকার হ'ত, এবং নানা রকম বিধিনিষেধ মেনে চল্‌তে হ'ত। উদাহবণ স্বরূপ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব উল্লেখ করা যেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দির প্রথম ভাগে যখন কতিপয় ইংবাজ বণিক্ ভারতেব সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য ক'বতে উদ্যোগী হ'ল, তখন তাদেব বাজাব 'charter' বা অনুমতিপত্র নিয়ে কোম্পানী গঠন ক'রতে হয়েছিল। এইরূপ অনুমতি-পত্রেব মধ্যে নানা রূপ বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করাব প্রথা ছিল। এই সকল বিধি নিষেধের সূত্র ধ'রেই উত্তরকালে ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানির কার্য্যকলাপেব উপব নিযন্ত্রণ ব্যবস্থা উত্তবোত্তব বলবত্তব করা হয়েছিল; এবং পবিশেষে সিপাহী বিদ্রোহেব পর ভাবতসাম্রাজ্যেব শাসনেব ভার প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজ সবকাবেব হাতে নিযে নেওয়া হযেছিল।

আধুনিক যুগ—শিল্প-জগতে যুগ পরিবর্ত্তন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত সভ্যজগতে মানবসমাজের বৈষয়িক জীবনের ধারা কি রকম ছিল, তার একটা মোটামুটি আভাস উপরে দেওয়া হ'ল। তারপর আরম্ভ হ'ল আধুনিক যুগের প্রথম পর্ব্ব। এই পরিবর্ত্তন এত ব্যাপক, এবং এত দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ ক'রেছিল যে ইহাকে 'Industrial Revolution' বা "শিল্প-জগতে যুগ-পরিবর্ত্তন" এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এ নূতন যুগের সূত্রপাত হয়, বিলাতে।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে স্কচ্ মনীষী 'অ্যাডাম স্মিথ' তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'ওয়েল্‌থ অব্ নেশন্‌স্' (Wealth of Nations) প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকে তিনি নানা যুক্তি

ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে দেশের ধন সম্পদ্ বৃদ্ধির পথে নানা রকম আইনগত ও আচারগত বিধিনিষেধ গুলিই ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, এবং ঐগুলি সরিয়ে নিলে অতি সত্বর দেশের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর এই মত সুধীসমাজে ও সরকারী মহলে আদর পেয়েছিল, এবং ক্রমশঃ বাধানিষেধ গুলির অবসান ঘট্‌ল, এবং 'Laissez Faire' বা 'হাত সরিয়ে নাও' এই নীতি, তার মানে শিল্প-বাণিজ্যে স্বাধীন চেষ্টার নীতি, প্রবর্ত্তিত হ'ল।

এই নূতন পরিবেশে পর পর অনেকগুলি শ্রমসঞ্চয়ী যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলেই উপরি-উক্ত যুগ পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়। যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয় প্রথমে কার্পাস-শিল্পে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হারগ্রীভ্‌স্ সাহেব তাঁর সুতা কাটার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে আর্করাইট সাহেব অন্য এক রকমের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ক্রম্পটন সাহেব আরও উন্নত রকমের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ক্রমে সুতা বুনিবারও যন্ত্র আবিষ্কার হয়, এবং কার্পাস-শিল্প সম্পূর্ণভাবে যন্ত্র-শিল্পে পরিণত হয়।

প্রথম প্রথম যন্ত্র চালান' হ'ত খরস্রোতা নদীর গতিবেগের দ্বারা। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়াট্ সাহেব ষ্টীম-এঞ্জিন কার্য্যকর ক'রে তোলেন। ফলে শীঘ্রই যন্ত্র চালান'র কাজে ষ্টীম এঞ্জিনের ব্যবহার হ'তে আরম্ভ হ'ল। যত দিন যেতে লাগ্‌ল, একটির পর একটি ক'রে প্রত্যেক শিল্পের উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'তে লাগ্‌ল, এবং অল্প দিনের মধ্যেই শিল্প জগতে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে যন্ত্রের দ্বারা শিল্পজাত জিনিষ পত্র তৈরী হ'তে লাগ্‌ল। যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী হওয়াব দরুণ, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও স্বভাবতঃই আগের চেয়ে অনেক বেশী হ'তে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য দূর দূরান্তরে পৌঁছে দেবার কাজও সহজ হ'তে লাগ্‌ল। তা না হ'লে যন্ত্রের ব্যবহার এত তাড়াতাড়ি প্রসার লাভ ক'রতে পারত না। এই সময় বরাবরই, বাঁধান পাকা রাস্তা তৈরী করবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়, এবং অনেক রাস্তা তৈরী হ'তে থাকে। লম্বা লম্বা খাল কেটেও জলপথে জিনিষপত্র আনা নেওয়ার কাজ সহজ করা হয়। তারপর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ষ্টিভেন্‌সন্ সাহেব রেলের ইঞ্জিন তৈরী ক'রলেন, এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিভিন্ন দেশে রেলপথ তৈরী হ'তে লাগ্‌ল। সমুদ্রপথেও বড় বড় জাহাজ ষ্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে চালান' সম্ভব হওয়ায় দূরদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানির কাজ ঢের কম সময়ে এবং কম খরচে করা সম্ভব হ'ল। ফলে, পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা সহজ হওয়াতে পণ্যদ্রব্য তৈরীর কাজে যন্ত্রের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়ে চল্‌ল। শুধু যে শিল্পজগতেই যন্ত্রের ব্যবহার প্রাধান্য লাভ ক'রেছে তা নয়। চাষের কাজেও এর ব্যবহার বিশেষ কম নয়। বিশেষতঃ আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশে চাষের কাজে এমন সব যন্ত্র ব্যবহার হয়, যে চার পাঁচ জন লোক ১০০০ বিঘা জমি স্বচ্ছন্দে চাষ ক'রে থাকে।

যন্ত্র-ব্যবহারের ফলে বৈষয়িক জীবনের রূপ পরিবর্ত্তন

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে যন্ত্রের ব্যবহার হওয়াতে আমাদের বৈষয়িক জীবন, আগেকার তুলনায় অনেক দিক্ দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের হ'য়ে গেছে। এই বদ্‌লে যাওয়া অবস্থার দুটি একটি বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। আগে, প্রত্যেকটি গ্রাম, বা প্রত্যেকটি সহর তার চারিদিকের গুটিকতক গ্রাম নিয়ে এক একটি স্বয়ংপূর্ণ এলাকা ছিল। এখন, দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর-নির্ভরতা অনেক বেড়ে গেছে। বিলাতের লোকের রোজকার খাওয়ার জন্য যে রুটি মাংসের প্রয়োজন, তাব বেশীব ভাগ আসে সাগরপারের উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। জাপানে কাপড়েব কলে যে তুলা ব্যবহার হয়, তার কতক আসে মিশর থেকে, কতক ভারত, এবং কতক আমেরিকা থেকে। পূর্ব্ববঙ্গে যে পাট জন্মায়, তার থেকে থ'লে তৈরী হচ্ছে কল্‌কাতায় কিংবা ডাণ্ডীতে (বিলাতে), আর সে থ'লে ব্যবহার হচ্ছে দূর দূরান্তরের সব দেশে, যেমন আর্জেনটাইনে খাদ্য-শস্য রপ্তানির কাজে। এই পরস্পব-নির্ভরতার ফলে, যেমন এক দিকে, পৃথিবীর যে কোন অংশে যদি সস্তায় ভাল জিনিষ তৈরী হয়, পৃথিবীর অন্যান্য অংশ তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না; তেমনি পৃথিবীর কোন অংশে যদি অশান্তি বা বিপর্য্যয় ঘটে, তা'হলে পৃথিবীব অন্যান্য অংশ তার দুর্ভোগ থেকেও পরিত্রাণ পাচ্ছে না।

২। আগে আপামর জনসাধাবণের পক্ষে নানা রকমের ভোগ্যবস্তু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব, এবং সকলের পক্ষেই পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা সম্ভব, এ রকম কেউ কল্পনাও ক'রতে পারত না। তার কারণও সুস্পষ্ট। বিত্ত-সৃষ্টির কাজে, তা' সে চাষের কাজই হউক, আর কারু-শিল্পের কাজই হউক, বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পণ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়ার কাজই হউক, এ সব রকম কাজেই খানিকটা ক'রে শক্তির খরচ হয়। অতএব কোন দেশে কত পরিমাণ জিনিষপত্র তৈরী হওয়া সম্ভব তার সর্ব্বোচ্চ সীমা স্থির করে দেয়, সে দেশে বিত্ত-সৃষ্টির উপযোগী শক্তির যোগান কত পরিমাণে আছে সেইটি। আগেকার কালে এই শক্তি ছিল প্রধানতঃ মানুষের পেশীর শক্তি। অবশ্য ঘোড়া, গরু, উট, হাতী প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারকে অল্পবিস্তর কাজে লাগান হ'ত। পাল তোলা নৌকা বা জাহাজ চালান'র কাজে, এবং কোথাও কোথাও অন্য কাজেও বহমান্ বায়ুর ব্যবহারও ছিল। কিন্তু প্রধানতঃ সেকালে বিত্ত-সৃষ্টির কাজ চলত মানুষের পেশী-শক্তির প্রয়োগ দ্বারা। এই শক্তির যোগানের পরিমাণ নিতান্তই কম। নিখুঁত প্রয়োগ ব্যবস্থা হ'লে এই শক্তির সাহায্যে জনসাধারণের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তার বেশী বিশেষ কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে সেকালে

সকলে বেশ আরামে থাকবে এরকম অবস্থা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা ছিল না। এখন কিন্তু আর সে দিন নাই। এখন জিনিষপত্র তৈরী হয় নানা রকম যন্ত্রের ভিতর দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা। এই শক্তির আধার হচ্ছে কয়লা, খনিজ তেল ও জল-বিদ্যুৎ। এইগুলির যোগানের পরিমাণ অফুরন্ত না হ'লেও এত বেশী, যে দুশ' পাঁচশ' বছরের মধ্যে কম প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অতএব এখন আপামর জনসাধারণের পক্ষে নানা রকমের ভোগ্যবস্তু ব্যবহারের দ্বারা আরামের জীবন যাপন করার সম্ভাবনা র'য়েছে। অবশ্য এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত ক'রতে হ'লে মানবসমাজের চিন্তাধারার ও জীবনধারার আরও অনেক দিক্ দিয়ে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন দরকার। কি রকম পরিবর্ত্তন দরকার, এবং সে রকম পরিবর্ত্তন সম্ভব কি না, সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা, অর্থতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক হবে।

৩। শিল্পজগতে যন্ত্রের ব্যবহারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ক্রমশঃ প্রবল হ'য়ে উঠেছে। আগেকার দিনে জিনিষপত্র যা তৈরী হ'ত তার পরিমাণ ও ঔৎকর্ষ নির্ভর ক'রত কারিগরদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য ও কর্ম্ম-তৎপরতার ওপর। যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার হ'ত সেগুলি সামান্য রকমের এবং কমদামী, এবং প্রায় ক্ষেত্রেই কারিগরের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। সেই কারণে সে যুগে কারিগরের একটা মর্য্যাদা ছিল; এবং সে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন ক'রতে পাবত। আজ আব সে দিন নেই। এখন জিনিষপত্র তৈরী করে, আসলে যন্ত্র। কারখানায় যে সব লোক কাজ করে, তাদের কাজ দাঁড়িয়েছে আসলে যন্ত্রের পরিচর্য্যা করা। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটাই উল্টে গেছে। আগে ছিল মানুষ প্রধান; যন্ত্র তার সহায়। এখন হ'য়েছে যন্ত্রই প্রধান; শ্রমিকের কাজ সেগুলি দেখাশোনা করা।. এ অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যন্ত্রের মালিকের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বেড়েছে। আর শ্রমিক হয়েছে দুর্ব্বল ও পরাধীন। কারখানায় কাজ করার সর্ত্তাবলি নিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হবার সময় দুই পক্ষের আইনগত সমান স্বাধীনতা থাকলেও এই সর্ত্তাবলী শ্রমিকের স্বার্থের প্রতিকূল না হ'য়ে পারে না। এই কারণেই ট্রেড ইউনিয়ন' বা শ্রমিক-সংঘ গড়া দরকার হয়েছে, এবং আইন করে নানা রকমের বিশেষ দায়িত্ব মালিকের উপর চাপান, দরকার হ'য়েছে।

৪। সমাজের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে, নীতি হিসাবে, রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার যে আদর উনবিংশ শতাব্দিতে ছিল এখন আর তা নাই। তার একটি কারণ আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। আইন কানুনের সাহায্য ব্যতিরেকে শ্রমিক তার নিজের শক্তিতে মালিকের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। আরও অনেকক্ষেত্রে নানা কারণে আমাদের বৈষয়িক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য্য হ'য়ে পড়েছে। যেমন, বড় বড় ধনী একচেটিয়া ব্যবসাদারদের নানা রকমের অনাচার দমন করবার জন্য; মাঝে মাঝে যে

ব্যাপক বেকার সমস্যা দেখা দেয় তার প্রতিকারের জন্য ; রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য, ইত্যাদি। তারপর, বর্ত্তমান শতাব্দির প্রথম ভাগে যে বিশ্ব যুদ্ধ ঘটেছিল, এবং সম্প্রতি যে বিশ্বযুদ্ধের অবসান হ'য়েছে, এই দুই বারেই যুদ্ধ জেতবার জন্য বৈষয়িক জীবনেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়ন্ত্রণ দরকার হয়েছিল। যুদ্ধের সময় দেশের সঙ্গতির এত অপচয় হয়েছিল এবং বৈষয়িক জীবনের গতানুগতিক ধারার এত পরিবর্ত্তন ক'রতে হয়েছিল যে, যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবার পরও, সমাজকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ-কালীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনেকাংশে চালু রাখতে হ'য়েছে। কখনও যে আবার আগেকার দিনের ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব বা সমীচীন হ'তে পারে, এবকম মত আজকাল আর বড় কেউ পোষণ করেন না। এখন পৃথিবীর অনেকখানি অংশে 'কমিউনিষ্ট'দের হাতে রাজদণ্ড এসে প'ড়ছে। তারা, সমাজের বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ রাখার সম্পূর্ণ বিরোধী। তারা চায়, দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্যের কাজ রাজ্য-শাসনের অঙ্গ হিসাবে সরকারী দপ্তর মারফৎ চালানো হবে। তারা সেই ভাবেই শাসনকার্য্য চালাচ্ছে। তাদের কাজের ধারা থেকে বোঝা যায় যে তারা দেশের জমিতে ও কলকারখানায় ব্যক্তিগত মালিকানী স্বত্ব স্বীকার করে না, এবং বিনা খেসারতে এইগুলি বাজেয়াপ্ত করাতে কোন অবিচার আছে তাও মনে করে না। কোনও রকমেব বিরুদ্ধ মত প্রচাব বা পোষণও তারা বরদাস্ত করে না। এবং সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে, এ কথাও তারা বিশ্বাস করে না। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনাদর এতটা গড়ায়নি। বরঞ্চ এই সব জায়গার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বেশীরভাগ ব্যক্তি কম্যুনিষ্ট-দের কার্য্যকলাপ বিভীষিকার চক্ষেই দেখেন ; এবং আজকের দিনের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা যতটুকু খর্ব্ব করা অবশ্য প্রয়োজনীয় তার চেয়ে বেশী যেন করা না হয়, সে বিষয়ে নিরলস সতর্কতা অবলম্বনের পক্ষপাতী। আজ সারা পৃথিবীতে এই দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শের দ্বন্দ্ব চ'লেছে। এই বিষয়ে-বিতর্কের সময় দুইপক্ষ যে সকল তথ্য ও যুক্তির অবতারণা করেন সেগুলি ঠিক্ ভাবে বুঝে স্বাধীন বিচার দ্বারা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হ'লে, আমাদের সমাজের বৈষয়িক জীবনের স্বরূপ কি, এবং কেন এ রকম হ'য়েছে, সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার।

পরবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে সেই বিষয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা হ'য়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

চাহিদার কারণ

জীবধর্ম্মের তাড়নায় আমরা চাই আহার, আচ্ছাদন ও আশ্রয়। এইগুলি না হলে জীবন রক্ষা হয় না। কিন্তু শুধু এইটুকুর ব্যবস্থা করেই মানুষ ক্ষান্ত হয়নি। মানুষের স্বভাব, সে চায় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। তাই খাবার জিনষের এত রকম; পোষাক পরিচ্ছদে এত রং ও এত 'পারিপাট্য। তাই বসনেব সঙ্গে ভূষণের যোগ। তাই বড় মানুষের অট্টালিকায় এত ঘর, এবং ঘরে এত আস্‌বাব। তাই তার বাড়ীর সঙ্গে বাগান, এবং বাগানে বিদেশী গাছ, নকল ফোয়ারা এবং মর্ম্মর-মূর্ত্তির সারি। তাই পাঁচ খানা গাড়ী থাক্‌তেও নূতন মডেলের গাড়ী কেনার প্রয়োজন।

অল্পবিত্ত লোকেরাও সাধ্যমত নানা জিনিষ কিনে রাখে, যা তাদের না থাক্‌লেও বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না। তার কারণ আমাদের সম্পত্তি বোধ। আমাব এত সব জিনিষ আছে এই ভেবেই মানুষ মনে একটা তৃপ্তি অনুভব করে।

জ্ঞান পিপাসু পুস্তকের আদর করে। সঙ্গীতানুরাগী গান বাজনা শোনে এবং গান বাজনা করবার সরঞ্জাম কেনে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে চাহিদাব পেছনে রয়েছে মানুষের মনোবৃত্তি অনুশীলনের আকাঙ্খা। জ্ঞান চর্চ্চা বা সুকুমাব কলাব সাধনা যতই করা যায় ততই সে বিষয়ে আসক্তি বাড়ে। এই কারণে এই সব সংক্রান্ত দ্রব্যাদিব যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার প্রসার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এখন দেখ্‌তে পাই প্রায় সব দেশেই বিজলী আলো ও পাখা, গ্রামোফোন, রেডিও, মোটরগাড়ী প্রভৃতির ব্যবহার খুব বেশী লোকেই করে থাকে। কিন্তু এগুলির উৎপত্তির ইতিহাস খোঁজ ক'রলে দেখ্‌তে পাই, প্রতিভাবান মনস্বী ব্যক্তিরা জ্ঞান-পিপাসার তাগিদে প্রকৃতির নিগূঢ় তথ্য আবিষ্কার করেছেন, এবং কৌতূহল পরবশ হয়ে সেই সব তথ্য কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। এই রকম চেষ্টার ফলে নূতন নূতন ভোগ্য দ্রব্য আবিষ্কার হয়েছে, এবং আস্তে আস্তে ব্যবহারের সঙ্গে চাহিদা গ'ড়ে উঠেছে। এ সব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আগে অভাববোধ এবং পরে সেই অভাব মোচনের চেষ্টা না হ'য়ে, আগে কোন অভিনব ভোগ্য বস্তু তৈরী হয়েছে, এবং পরে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার প্রসার হয়েছে। আমরা আজকাল যে সব জিনিষ ব্যবহারে অভ্যস্ত, তার মধ্যে এমন অনেক জিনিষই আছে যার জন্যে অভাববোধ

এই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুতঃ আগেকার যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের তুলনা ক'রলে যে জিনিষটি বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে আজকালকার ভোগ্য বস্তুর আয়োজন—তার অসংখ্য রকম ও বিপুল পরিমাণ। যে দেশে এই আয়োজন যত বেশী, সেই দেশ তত অগ্রসর ব'লে গণ্য হয়।

(২)

চাহিদার ধর্ম্ম— ক্ষীয়মান উপকারের সূত্র

মানব সমাজে নানা দ্রব্যের চাহিদার পেছনে যে কারণগুলি বিদ্যমান রয়েছে তার একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া গেল। এই কারণগুলি চিন্তা ক'রলে সহজেই বোঝা যায়, কেন অভাবের শেষ নেই।

সমগ্রভাবে অভাবের শেষ না থাক্‌লেও, বিভিন্ন দ্রব্যাদি যখন আলাদা আলাদা ভাবে বিবেচনা করা যায় তখন দেখ্‌তে পাই, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভোগের পরিতৃপ্তি আছে। আমরা সকলেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে প্রত্যেক জিনিষই **"পাওয়ার পরিমাণ যত বাড়্‌তে থাকে, আরও পাবার আকিঞ্চণ তত কম্‌তে থাকে।"** কোন একটি লোকের একটিও জামা নেই। শীতাতপে বড় কষ্ট। ভদ্র- সমাজে বেরোনো যায় না, এও একটা অসুবিধা। এই রকম অবস্থায় তার একটি শার্ট সংগ্রহ হ'ল। বলা বাহুল্য, এতে তার যথেষ্ট উপকার হ'ল। তা ব'লে যে তার শার্টের অভাব একেবারে ঘুচে গেল, তা নয়। আর একটি পেলে স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বাড়ে। ময়লা হ'য়ে গেলে, একটি কেচে আর একটি পরা যায়। তবে এ কথাও ঠিক্ যে, যখন মোটে জামা ছিলনা, তখন একটি শার্টের জন্য অভাববোধ যত তীব্র ছিল, একটি শার্ট পাওয়ার পর দ্বিতীয়টির জন্য আর ততটা নেই। যখন দ্বিতীয়টি সংগ্রহ হ'ল, তখন খানিকটা বাড়্‌তি উপকার সে পেলে বটে; কিন্তু প্রথমটি পাওয়ায় সে যতটা উপকার বোধ করেছিল, এখন দ্বিতীয়টি পাওয়ায় যে বাড়্‌তি উপকার হ'ল, প্রথম শার্ট থেকে পাওয়া উপকারের চেয়ে সেটা কম। যদি উপকারের কোন মাত্রা নির্দ্ধারণ করা যায়, তা হ'লে বলা চলে যে, প্রথম শার্টটি থেকে যদি ১০ মাত্রা উপকার পাওয়া গিয়েছে হয়, তা' হ'লে দ্বিতীয়টি থেকে তার চেয়ে কিছু কম অর্থাৎ ৯ মাত্রা কিংবা ৮ মাত্রা উপকার পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়টি পাওয়ার পরেও অভাব একেবারে ঘোচে নি। সব সময়ে ফর্সা ইস্তিরি করা শার্ট পরতে হ'লে অন্ততঃ তিনটি থাকা দরকার। তিনটি সংগ্রহ হবার পর মনে হবে আর একটি অন্য রকমের ছিটের করালে হয় সেটি পাবার পর হয়ত নূতন ফ্যাসানের গলা কাটা আর একটি শার্টের প্রয়োজন বোধ হবে, এই রকম। যেমন শার্টের সংখ্যা দফায় দফায় বেড়ে চলেছে, শার্ট থেকে পাওয়া মোট উপকারও তেমনি বাড়্‌ছে; তবে প্রত্যেক

ধাপে নূতন শার্টটি থেকে যে বাড়্তি উপকার পাওয়া যাচ্ছে, সেটি তার আগের ধাপের নূতন শার্টটি থেকে পাওয়া উপকারের চেয়ে পরিমাণে কম। বক্তব্য বিষয়টি অঙ্কের ছক্ দিয়ে এইভাবে সুবোধ্য করা যেতে পারে। এখানে অন্তে বা শেষে যে শার্টটি যোগ হয়েছে, তাই থেকে যে বাড়্তি উপকার পাওয়া গেছে সেটিকে **"প্রান্তিক উপকার"** এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মোট যোগানের পরিমাণ	প্রান্তিক উপকার	মোট উপকার
১টি শার্ট	১০ মাত্রা	১০ মাত্রা
২টি "	৯ "	১৯ "
৩টি "	৭ "	২৬ "
৪টি "	৬ "	৩২ "

এই সকলের জানা তথ্যটি সূত্র আকারে এই ভাবে লেখা হয় সূত্রটির নাম **'ক্ষীয়মান উপকারের সূত্র"** (Law of Diminishing Utility).

"যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক উপকার কম্‌তে থাকে" বা **"যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট উপকার বাড়্তে থাকে ; কিন্তু এই বৃদ্ধি পাওয়ার হার ক্রমশঃ কম্‌তে থাকে।**

যে দুই এক ক্ষেত্রে মনে হয় যেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে, একটু চিন্তা ক'রলেই বোঝা যায় যে এগুলি ব্যতিক্রম নয়। যেমন,

১। পয়সা কড়ি রোজগারের ব্যাপারে এ রকম বড় দেখা যায় না, যে রোজগার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও রোজগারের আকিঞ্চন কমে যাচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এক কৃপণের কাছে ছাড়া পয়সা জিনিষটা নিজে একটা ভোগ্য বস্তু নয়। পয়সার বিনিময়ে অন্য সব রকম জিনিষ সংগ্রহ করা যায় বলেই পয়সার আদর। কিন্তু যেহেতু অসংখ্য ভোগ্য বস্তুর অভাব একসঙ্গে মিটে যাওয়ায় পথে এগোতে পারে না, সেইহেতু পয়সা কড়ির ক্ষেত্রে ক্ষীয়মান উপকারের সূত্র খাটে না।

২। মাতালের মদ খাওয়ার ঝোঁক অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে বই কমে না। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে ঐ ব্যক্তির কোন সময়ের মদ খাওয়ার আকিঞ্চনের সঙ্গে, পরবর্তী কালের কোন সময়ের আকিঞ্চনের যখন তুলনা করি, তখন এ ব্যক্তি আর সে ব্যক্তি নাই। মদ খেতে খেতে সে ক্রমশ পাঁড় মাতাল হয়ে উঠ্‌ছে। অতএব এখানে উপরোক্ত সূত্রটি প্রয়োগ করা চলে না।

৩। একটি লোকের বাড়ীর পাশে এক খণ্ড জমি আছে। লোকটির একটি টেনিস্ কোর্ট করবার সখ ; এবং জমিটি পেলে তার সখটি মেটে। জমির মালিক কিন্তু দুজন। এক খণ্ড

এক জনেব ; এবং অপব খণ্ড অন্য এক জনেব। প্রথম খণ্ডটি সংগ্রহ কবতে কোন অসুবিধা হ'ল না, ন্যায্য দামেই পাওযা গেল। কিন্তু দ্বিতীয খণ্ডটিব মালিক অনেক বেশী দর চাইলে, এবং ক্রেতা তাই দিতেই বাজী হ'ল। এব কাবণ কি? 'ক্ষীযমান উপকাবের সূত্র' হিসাবে দ্বিতীয খণ্ডটিব জন্য ক্রেতাব আকিঞ্চন কম হওযা উচিত ছিল। এখানে দুটি খণ্ড জমিকে পৃথক্ ক'বে দেখাতেই বিচাবেব ভুল হচ্ছে। ক্রেতাব আসলে দবকাব সমগ্র জমিটি। একটু কম হ'লে আব তাতে তাব প্রযোজন কিছুই মেটে না।

"ক্ষীযমান উপকাবেব সূত্র" থেকে আমবা **'চাহিদার ধর্ম্মের'** সন্ধান পাই। 'চাহিদা' ব'লতে বুঝি ক্রেতাব কেন্‌বাব আকিঞ্চন। শুধু 'পেলে উপকার হয' এই বোধ থাক্‌লেই হবে না। পাবাব আকিঞ্চনেব সঙ্গে যোগ হওযা চাই উপযুক্ত মূল্য দেবাব সঙ্গতি ও ইচ্ছা। এই দু'যেব যোগে চাহিদাব সৃষ্টি হয। চাহিদা সম্বন্ধে একটা সাধাবণ নিযম দেখ্‌তে পাই, সব জাযগাতেই খাটে সেটি হচ্ছে, **"দাম যত কমে, কেনার পরিমাণ তত বাড়ে; এবং দাম যত বাড়ে, কেনার পরিমাণ তত কমে।"** কোন লোকেব কোন জিনিষেব চাহিদা কত জান্‌তে হ'লে, কেবল একটি অঙ্ক দিযে জানানো চলে না। পব পর কতকগুলি সম্ভাব্য দর, এবং সেই সেই দবে সে কি কি পবিমাণ কিন্‌বে এইরকম একটি তফ্‌শীল ছাড়া তাব চাহিদাব পূর্ণ পবিচয দেওযা যায না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগেকাব লোকটিব শার্টেব চাহিদা এই ভাবে দেখান যায—

যদি প্রতিটিব দর হয	তা' হলে তাব কেনাব পবিমাণ হবে
১০৲ টাকা	১টি
৯৲ "	২টি
৭৲ "	৩টি
৬৲ "	৪টি
৫৲ "	৫টি

কেন দরের ওপর কেনাব পবিমাণ নির্ভব কবে তাব উত্তব পাওয়া যায 'ক্ষীয়মান উপকারের সূত্রটির' মধ্যে। কেনা কাজটার মধ্যে একটা লাভের দিক্ আছে, আব একটা ক্ষতির দিক্ আছে। কেনা জিনিষটি পাওযায যে উপকার হ'ল, সেইটি লাভ। মূল্য হিসাবে যে টাকাটা দিতে হ'ল, সেইটি ক্ষতি। ক্রেতাব বিবেচনায় যদি লাভেব ওজন ক্ষতির চেয়ে বেশী হয; অন্ততঃ ক্ষতিব সমান হয়, তবেই সে কিন্‌বে। এখন ধবা যাক্, এক টাকা খরচ ক'রলে যে ক্ষতি হয, তাব ওজন এক মাত্রা উপকারেব ওজনেব সমান। প্রথম শার্টটির

উপকার ১০ মাত্রা। অতএব সেটি ১০৲ টাকা দামেও কেনা চলে। কিন্তু ১০৲ টাকা দাম থাকতে আর দ্বিতীয় শার্ট কেনা চলে না। কারণ, দ্বিতীয় শার্টটির উপকার মোটে ৯ মাত্রা; কিন্তু তার জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে হবে ১০ মাত্রা। অতএব দর ৯৲ টাকায় না নামলে লোকটি ২টি শার্ট কিনবে না। তেমনি দর ৬৲ টাকায় নামলে, তবে ৪টি শার্ট কেনা পোষায়। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে।

১। যদি কেনার পরিমাণ খুব ছোট ছোট মাত্রায় বেশী কম করা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে যে তার প্রান্তিক উপকারের মাপ হবে প্রতি মাত্রার মূল্য। কারণ, কেনার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, প্রান্তিক উপকার কমতে কমতে যতক্ষণ না মূল্যের সমান হয় বা মূল্যের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছায়, ততক্ষণ আরও বেশী কিনলে, বাড়তি উপকার বাড়তি ক্ষতির চেয়ে বেশী থেকে যাবে। অতএব কেনার পরিমাণ বেড়ে চলবে। চাল, ডাল, চিনি প্রভৃতি জিনিষ, এই রকম ছোট ছোট মাত্রায় বেশী কম কেনা যায়। কিন্তু মোটর গাড়ীর মত জিনিষের বেলায় এ রকম বলা চলে না যে, বাজার দর দিয়ে প্রান্তিক উপকারের সঠিক্ মাপ পাওয়া যায়।

২। যখন প্রতিটি শার্টের দাম ছ'টাকা, তখন লোকটি ৪টি শার্ট কিনেছে। কিন্তু ১০৲ টাকা দাম হ'লেও সে স্বেচ্ছায় ১টি শার্ট কিনত। প্রথম শার্টটি থেকে সে উপকার পাচ্ছে ১০৲ টাকা মাপের; কিন্তু তার জন্যে খরচ করেছে মোটে ৬৲ টাকা। অতএব প্রথম শার্টটি থেকে সে **"ব্যয়াতিরিক্ত উপকার"** (consumers surplus) লাভ করেছে ৪৲ টাকার। তেমনি দ্বিতীয়টি থেকে পাওনা 'ব্যয়াতিরিক্ত' উপকারের পরিমাণ ৩৲ টাকা, এবং তৃতীয়টির থেকে ১৲ টাকা। ৪টি শার্ট কেনায় সব সমেত তার ব্যয়াতিরিক্ত উপকারের পরিমাণ হ'ল ৮৲ টাকা। ব্যয়াতিরিক্ত উপকারের দৃষ্টান্ত আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। যেমন রোজকার খবরের কাগজ দুই আনায় পাওয়া যায়; কিন্তু এ রকম লোক বিরল নয় যারা আট আনা দাম হ'লেও রোজই কাগজ কিনত। এই সমস্ত লোক রোজ ছয় আনা পরিমাণের ব্যয়াতিরিক্ত উপকার লাভ ক'রছে।

এই ব্যয়াতিরিক্ত উপকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। অনেক সময়ে নানা রকম বিধি, নিষেধ, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সরকারী অবিবেচনার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয়াতিরিক্ত উপকার নষ্ট হয়। কাগজে কলমের হিসাব থেকে এই অনিষ্টের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা শক্ত। কিন্তু দেশের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য যে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ব্যক্তিগত চাহিদার মত, একটি বাজারের চাহিদা দেখাতে হ'লেও একটি অঙ্কের ছকের সাহায্যে দেখান দরকার। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন বিশেষ বাজারে চিনির চাহিদা কত তা এই রকম একটি 'চাহিদা তফ্শীলের' সাহায্যে দেখান চলে—

যদি প্রতি মণের দাম হয়	তা হ'লে বিক্রীর পরিমাণ হবে
৪২৲ টাকা	৩০০ মণ
৪১৲ "	৩২০ "
৪০৲ "	৩৫০ "
৩৯৲ "	৩৭৫ "
৩৮৲ "	৪১০ "
৩৭৲ "	৪৫০ "

এখানে, ডান দিকের অঙ্কগুলি হচ্ছে সেই বাজারে যত লোক জিনিষপত্র কেনে, তাদের চিনি কেনার পরিমাণের সমষ্টি।

রেখা-চিত্র দিয়েও চাহিদা দেখান হয়; এবং অনেক ক্ষেত্রে রেখা-চিত্রের সাহায্য পেলে আলোচনার কাজ সহজ হয়।
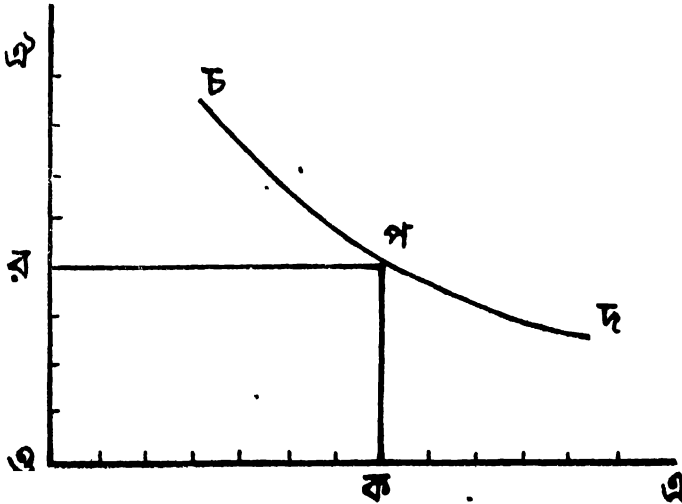
'চ দ', উপরের চিনির চাহিদার রেখা-চিত্র। এখানে 'ওঐ' বরাবর প্রতি মণের দর মাপা হচ্ছে। প্রতিটি ঘর = ১০৲ টাকা। সেইরকম 'ওএ' বরাবর কেনার পরিমাণ মাপা হচ্ছে। প্রতিটি ঘর = ৫০ মণ। 'চদ' চাহিদা-রেখার ওপর একটি বিন্দু 'প' থেকে 'পক' ও 'পর' দুটি খাড়া রেখা যথাক্রমে 'ওএ' ও 'ওঐ' এর ওপর ফেল্‌লে এই বোঝায় যে যদি প্রতি মণের দাম 'পক' বা 'ওর' হয়, তা হ'লে বিক্রীর পরিমাণ হবে 'ওক'।

সকল চাহিদা-রেখার মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম্ম দেখতে পাওয়া যাবে যে, রেখাটি ডান দিকে এগোবে, এবং যত এগোবে তত 'ওএ'র কাছে এসে পড়বে। 'চদ' বরাবর 'প' এর সংস্থান সরান'র দরুণ 'পক' যখন বাড়বে, 'ওক' তখন কমবে, এবং 'পক' যখন কমবে, 'ওক' তখন বাড়বে।

দরের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিষেরই বিক্রির পরিমাণ বাড়ে এবং কমে। তবে দেখতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিক্রির পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে ও কমে; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বাড়ে এবং কমে। চিনির দর যদি টাকায় ৴৹ আনা বাড়ে কিংবা কমে, তা হ'লে হয়ত বিক্রির পরিমাণ শতকরা পঁচিশ কি ত্রিশ ভাগ তফাৎ হ'য়ে যাবে। অন্যপক্ষে নূণের দর যদি টাকায় ৴৹ আনা বাড়ে কিংবা কমে, তবে হয়ত বিক্রির পরিমাণ বড় জোর শতকরা পাঁচ ভাগ বদল হয়। চিনির মত জিনিষের চাহিদা হ'ল **'ক্ষিপ্র-গতি' চাহিদা**। নূণের মত জিনিষের চাহিদা হ'ল **'মন্থর-গতি' চাহিদা**। সাধারণতঃ চাল, ডাল, নূণ, মোটা কাপড় প্রভৃতি যে সব জিনিষ জীবনধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়, সেই সব জিনিষের চাহিদা মন্থর-গতি। অন্যপক্ষে ঘি, দুধ, চিনি, মাছ, মাংস, ডিম, ভাল ফল ও তরকারী প্রভৃতি যে সব জিনিষ লোকে খাওয়ার আরামের জন্য ও বেশী পুষ্টির জন্য খোঁজে, সেগুলির চাহিদা ক্ষিপ্রগতি। যে সব জিনিষের পাঁচ রকম ব্যবহার আছে, বা যে সব জিনিষ বৈচিত্র বা বৈশিষ্ট্যের জন্য লোকে আদর করে, সে সব জিনিষেরও চাহিদা ক্ষিপ্র-গতি। রকমারী পোষাক পরিচ্ছদ, ভাড়া বাড়ী, আসবাবপত্র প্রভৃতি এই পর্য্যায়ে পড়ে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

বিত্ত বা ধনসম্পদ্ শব্দের অর্থ

বিত্ত বা ধনসম্পদ্ বল্‌তে আমরা সেই সমস্ত দ্রব্যাদি বুঝি, যা মানুষের কাজে লাগে, বা মানুষের অভাব মেটায়। তার মধ্যে কতকগুলি সম্ভোগ্য জিনিষ; আর কতকগুলি সম্ভোগ্য জিনিষ তৈরী করবার কাজে লাগে, কিংবা কোন না কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জনে সাহায্য করে। জমি, বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী; খনি ও খনিজ সম্পদ্; জমির ফসল, গাছের ফল, শিল্পজাত নানা রকমের সামগ্রী, কল কারখানা ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সব কিছুই এই পর্য্যায়ে পড়ে। আবার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় নানা রকমের আইন-সঙ্গত অধিকার, যেমন কোম্পানীর শেয়ার, হাতচিঠির দাবী, বন্ধকী স্বত্ব, 'পেটেণ্ট' 'কপি-রাইট' প্রভৃতি নানা রকমের একচেটিয়া অধিকার, এ সবও সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়। ব্যবসার 'গুড-উইল' বা সুনামও এই পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু, মানুষের ব্যক্তিগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা বিচক্ষণতা অর্থোপার্জ্জনের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করলেও, এই সমস্ত গুণাবলী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয় না, তার কারণ এগুলি বেচা-কেনা বা অন্য কোনও প্রকারে হস্তান্তর করা যায় না। সেই রকম, সূর্য্যের কিরণ বা স্বাস্থ্যকর জলবায়ু আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হ'লেও, যেহেতু এ সব জিনিষ একান্ত নিজস্ব করা যায় না, সেই হেতু এইগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তির পর্য্যায়ে পড়ে না। আবার নদীতীরবাসীর পক্ষে নদীর জল, কিংবা মরুবাসীর পক্ষে বালি, সম্পত্তি নয়; তার কারণ, এর যোগান অফুরন্ত এবং এর সংগ্রহে বিশেষ কোন পরিশ্রম ক'রতে হয় না।

(২)

বিত্ত-সৃষ্টি—বিত্ত-সৃষ্টির কারণ—সার্থক শ্রম।

যে দেশে ধনসম্পদের আয়োজন যত বেশী, সে দেশে জনসাধারণের শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনাও তত বেশী। এই ধনসম্পদের যোগানের কারণ অনুসন্ধান ক'রলে দেখতে পাই, দুরকম কারণের সমাবেশে এর উৎপত্তি। একটি প্রকৃতির দেওয়া সম্পদ্—এটি হ'ল উপাদান-কারণ। আর একটি হ'ল মানুষের কর্ম্মচেষ্টা—এটি নিমিত্ত-কারণ। নানা রকম প্রাকৃতিক সম্পদ্‌কে মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, যত্ন ও পরিশ্রম প্রয়োগ দ্বারা মানুষের

ব্যবহারযোগ্য ক'রে তোলার কাজকেই আমরা বিত্তসৃষ্টির কাজ বলি। কোথাও এই ব্যবহার-যোগ্যতা সৃষ্টি করা হয় প্রাকৃতিক সম্পদের গঠন বা আকৃতি বদ্‌লে—যেমন, বনের গাছ কেটে, তাই থেকে নানা আকারের কাঠ বা'র ক'রে, চেঁচে, ছুলে, জোড় দিয়ে, পালিস ক'রে চেয়ার, বেঞ্চি, আলমারী প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের আস্‌বাব তৈরী হয়। কোথাও বা এই ব্যবহার-যোগ্যতা সৃষ্টি করা হয়, প্রকৃতির দেওয়া সম্পদ্‌কে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে—ইলিস্ মাছ যতক্ষণ পদ্মাগর্ভে রয়েছে ততক্ষণ থাকা না থাকা আমাদের কাছে সমান; যখন সেই মাছ নিয়ে এসে বাজারে পৌঁছে দেওয়া হ'ল, তখনই সেটি মানুষের সম্পদে পরিণত হ'ল। কোথাও আবার ব্যবহার-যোগ্যতা সৃষ্টি হয় কেবল সঞ্চয় ক'রে রাখার ফলে—ধান কাটার সময় যোগানের পরিমাণ বেশী থাকার দরুণ ধানের কদর যথেষ্ট কম থাকে; কতক ধান যদি সঞ্চয় ক'রে রাখা হয়, পাঁচ ছয় মাস বাদে যখন যোগানে টান ধরে, তখন তার কদর অনেক বাড়ে; তার মানে সঞ্চয় ক'রে রাখার দরুণ খানিকটা বাড়্‌তি ব্যবহার-যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। মানুষ যে সব জিনিষের কদর করে তার মূল উপাদান সে সৃষ্টি করে না। সে সৃষ্টি করে শুধু ব্যবহার-যোগ্যতা।

দেশের নানা লোক নানা ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করে। কেউ চাষী, কেউ মাছ ধরে, কেউ খনিতে কাজ করে। কেউ তাঁতি, ছুতোর, কামার, কুমোর বা অন্য রকমের কারু-শিল্পী। কেউ কল কারখানার মজুর বা মিস্ত্রি। কেউ দোকানদার, কেউ সওদাগর, কেউ তেজারতীর ব্যবসা করে। কেউ শিক্ষক, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ রাজকর্ম্মচারী। এই রকম আরও কত কি। সব রকম কাজেই খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, আর খানিকটা বুদ্ধি খাটাতে হয়। প্রথম দিকটায় যে সব কাজের উল্লেখ করা হল, তাতে শারীরিক পরিশ্রম প্রধান, বুদ্ধির প্রয়োগ অপ্রধান। এদের শ্রমজীবী বলা চলে। অন্য গুলিতে বুদ্ধি প্রধান, শারীরিক পরিশ্রম অপ্রধান। এরা বুদ্ধিজীবী। কারও কারও মতে শ্রমজীবীদের কাজের একটা বিশেষ মর্য্যাদা আছে। তারাই আসলে ধন উৎপন্ন করে। আর অন্যেরা তাদের তৈরী সম্পদে ভাগ বসায়। কিন্তু এ রকম মতের পেছনে কোন সুযুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। যে শারীরিক পরিশ্রম করে তাকে যেমন সমাজের প্রয়োজন, তার অসুখ করলে তাকে যে ডাক্তার আবার কর্ম্মক্ষম করে তোলে, তাকেও তেমনি সমাজের কম প্রয়োজন নয়। এখনকার দিনের একটি সূতাকলে গেলে দেখা যাবে, আগে চরকার সাহায্যে একজন লোক যতখানি সূতো তৈরী করত, একজন যন্ত্রের সাহায্যে তার হয়ত পাঁচশ' গুণের চেয়েও বেশী সূতো তৈরী করছে। এই কৃতিত্বের সবটা কিছু তার একলার পাওনা নয়। যে তাকে যন্ত্রের কলকব্জার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, যে সেই যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে, যাদের সঞ্চিত ধনের সাহায্যে এই যন্ত্র আগে থাকতে তৈরী হতে পেরেছে, যে দূরদৃষ্টি

সম্পন্ন কর্ম্ম-তৎপর লোক উদ্যোগী হয়ে নানা রকমের যন্ত্রপাতি ও নানা রকমের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক একত্র ক'রে কারখানা গড়ে তুলেছে, যারা কারখানার কাজে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে, যারা সাগরপার থেকে এনে, ভাল তুলা সরবরাহ ক'রে, ভাল সুতো তৈরী করা সম্ভব করেছে; এদের সকলেরই এবং আরও অনেকের এই কৃতিত্বে ভাগ আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে ধনসম্পদের মূল উপাদান প্রকৃতির দেওয়া, মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষ শুধু ব্যবহার—যোগ্যতা সৃষ্টি করে। এ কাজে শ্রম-জীবীর যেমন দান আছে, বুদ্ধি জীবীরও তেমনি দান আছে। শুধু কৃষক, মজুর ও মিস্ত্রীর শ্রমই সার্থক শ্রম, আর অন্য সকলে সমাজের পরগাছা, এ রকম মত কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি পোষণ ক'রতে পারে না। যেখানে চেষ্টার ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় না, অর্থাৎ মানুষের কোন উপকার হয় না, যেমন একখানা বাড়ী তৈরীর পর ভিতের দোষে যদি বাড়ীখানি পড়ে যায়, শুধু সেই ক্ষেত্রেই সে চেষ্টাকে পণ্ডশ্রম বলা চলে।

(৩)

বিত্ত সৃষ্টির কাজে মানুষের চেষ্টা চার রকম ভাবে প্রকাশ পায়

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বিত্তসৃষ্টির দুইটি কারণ। একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, অন্যটি মানুষের চেষ্টা। এই মানুষের চেষ্টার আবার চার রকম ভাবে প্রকাশ হয়।

১। সাক্ষাৎ ভাবে শারীরিক শক্তির প্রয়োগ।

২। মূলধন।

কারখানার বাড়ী, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, দোকানদারের মজুত মাল, এই সব মূলধনের রূপ। মূলধনের পরিচায়ক বিশেষত্ব হ'ল এই যে এগুলির উৎপত্তি মানুষের চেষ্টার ফলে; আর এগুলির কাজ হচ্ছে, অন্য সামগ্রী তৈরী করার কাজে মানুষের পরিশ্রমকে বেশী কার্য্যকর করে তোলা, বা অন্য কোন রকমে অর্থোপার্জ্জনে সাহায্য করা।

৩। নিয়োগব্যবস্থা।

এখনকার দিনের কোন কারখানায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়, নানা লোক ও নানা যন্ত্রপাতির সমাবেশ। কারবারের সাফল্য নির্ভর করে, এইগুলির যথাযথ নিয়োগ ব্যবস্থার উপর—অর্থাৎ প্রয়োজনের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রপাতি ও ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ও কর্ম্মদক্ষতা-সম্পন্ন লোকজন সংগ্রহের উপর, এদের মধ্যে ঠিক্ ঠিক্ যোগাযোগ স্থাপনের উপর, এবং কাজের সময় নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর। নিয়োগ ব্যবস্থা যত সুচারু হবে, উৎপন্ন দ্রব্যের ঔৎকর্ষ্য ও পরিমাণও তত বেশী হবে, এবং তৈরী খরচাও তত কম হবে।

৪। লাভ লোকসানের ঝুঁকি নেওয়া।

এখনকার দিনে জিনিষপত্র তৈরী হয়, প্রধানতঃ বাজারে বিক্রী ক'রবার জন্য ; যে তৈরী করে তার, বা তার পরিজনবর্গের ব্যবহারের জন্য নয়। কিন্তু যে সময়ে বিক্রী হবে, তার অনেক আগে থেকেই তৈরী করার ব্যবস্থা সুরু ক'রতে হয়, এবং সেই সম্পর্কে খরচপত্রাদি ক'রতে হয়। মাঠের ফসল, চাষের সুরু থেকে ফসল কাটা অবধি, পাঁচ সাত মাস কি তার চেয়েও বেশী সময় নেয়। একটা চা-বাগান তৈরী করতে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর লাগে। কফি, রবার, সুপারী বা নারিকেলের বাগানে তার চেয়েও বেশী সময় লাগে। একটা আধুনিক ধরণের বড় কারখানা গ'ড়ে তুলে চালু ক'রতে দু চার বৎসর লাগে, এবং রেলপথ কি বড় লোহার কারখানা গ'ড়ে তুলতে আরও অনেক বেশী সময় লাগে। অতএব, ভবিষ্যতে বাজার দর কি হবে, কি ধরণের মালের চাহিদা থাকবে, এবং কত পরিমাণেই বা কাট্‌তি হবে, সে বিষয়ে একটা আন্দাজ ক'রে, তবে তৈরী করার ব্যবস্থা সুরু ক'রতে হয়। আন্দাজ যদি শেষ পর্য্যন্ত মোটামুটি ঠিক দাঁড়ায়, তবেই লাভ হবে। নতুবা লোকসান। এই লোকসানের ঝুঁকি যদি কেউ না নেয়, তা হ'লে মাঠের ফসল কিংবা কারখানার মাল কিছুই তৈরী হ'তে পারে না। যারা আমদানী রপ্তানীর কাজ করে, কিংবা বিক্রী করবার জন্যে মাল মজুত করে, তাদেরও লোকসানের ঝুঁকি নিতে হয়, কারণ ভবিষ্যতে কি দর পাওয়া যাবে সেইটে আন্দাজ ক'রে, তবে তাদের মাল কিনতে হবে। আন্দাজ ভুল হ'লে লোকসান এড়ান যাবে না। এখনকার দিনে দেশের বৈষয়িক জীবনের গঠনে লোকসানের ঝুঁকি নেওয়া একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)

চাষের উন্নতির দুটি ধারা—শ্রম-সঞ্চয়ী কৌশল

কৃষি-কার্য্যের উন্নতির চেষ্টায় মানুষ দুটি পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। একটি, কিসে সবচেয়ে কম লোকের সাহায্যে সবচেয়ে বেশী ফসল ফলান যায়। অন্যটি, কিসে সবচেয়ে কম জমি থেকে সবচেয়ে বেশী ফসল তোলা যায়।

যে সব দেশে লোকসংখ্যা কম, কিন্তু চাষের উপযোগী জমির কোন অভাব নেই, সে সব দেশে জমি বিষয়ে কাপণ্য ক'রবার কোন দরকার নেই; সেখানে দরকার কিসে মাথাপিছু সবচেয়ে বেশী ফসল ফলান যায়। ধরা যাক্, ২ জন লোক উপযুক্ত সরঞ্জাম নিয়ে যদি ৫ বিঘা জমি চাষ করে, তা' হ'লে মোট ফসলের পরিমাণ হয় ৫০ মণ। আবার, সেই ২ জন লোক ও সেই সরঞ্জাম যদি ১০ বিঘা জমির চাষে লাগান যায়, তা' হ'লে মোট ফসল হয় ৮০ মণ। এখানে বিঘা প্রতি ফলন ১০ মণের জায়গায় ৮ মণে দাঁড়াল। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? মাথাপিছু ফলন বাড়্‌ল, ২৫ মণের জায়গায় ৪০ মণ। এইটেই দরকার; কারণ এখানে জমির কোন অভাব নেই। চাষের এই কৌশলকে বলে 'শ্রম সঞ্চয়ী কৌশল (Extensive cultivation)। অবশ্য, যতই জমির পরিমাণ বাড়ান যাবে ততই যে সুবিধা হবে, তা নয়। যদি ঐ লোক আর সরঞ্জাম নিয়ে ১০০ বিঘা জমি চাষ করবা'র চেষ্টা করা হয়, তা' হ'লে সে নাম মাত্র চাষ হবে, এবং ফসলের পরিমাণ ৮০ মণের চেয়ে অনেক কমও হ'তে পারে। জমির পরিমাণ এমন নিতে হবে যে যতগুলি লোক লাগান' হবে, তাদের মাথাপিছু সবচেয়ে বেশী ফসল যেন পাওয়া যায়।

অল্পসংখ্যক লোকের সাহায্যে অনেক বেশী জমি চাষ করবার চেষ্টায়, সাহেবদের দেশে নানা রকমের যন্ত্রপাতির প্রচলন হয়েছে। একটি ৫০ ঘোঁড়া শক্তির 'ট্রাক্টর' যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক এক দিনে ৬০।৭০ বিঘা জমিতে লাঙ্গল দিতে পারে। ঐ যন্ত্রের সঙ্গে একটি বীজ বোনার যন্ত্র যোগ ক'রে এক দিনে ২০০।২৫০ বিঘা জমিতে বীজ বপন করা যায়। "কম্বাইন্‌ড্ হার্‌ভেষ্টর (Combined harvester) নামক যন্ত্রের সাহায্যে ২ জন লোক এক দিনে ১৫০ বিঘা গমের ক্ষেতের ফসল কেটে তুল্‌তে পারে। ঐ যন্ত্রই গমের শীষ কাটে, গমের দানাগুলি খড় থেকে আলাদা করে, থলেতে ভরে, থলে শুদ্ধ ওজন করে, এবং সেগুলি সাজিয়ে রাখে। যে সব দেশে লোকসংখ্যা কম, অথচ চাষের উপযোগী জমি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সব দেশেই যন্ত্রের ব্যবহারে সুবিধা সব চেয়ে বেশী। তাই দেখ্‌তে পাওয়া

যায়, কানাডায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও মধ্য ভাগে, আর্জেন্টাইনে, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং রাশিয়ার জনবিরল জায়গাগুলিতেই যন্ত্রের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। ইংলণ্ডেও যন্ত্রের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে হয়। তার কারণ, যদিও সেখানে লোকসংখ্যা কম নয়, তবু সেখানে যন্ত্রশিল্পের প্রসার এত বেশী যে চাষের কাজের জন্য লোক পাওয়া যায় কম, এবং তাদের মজুরীও বেশী। আমাদের দেশে যন্ত্রের ব্যবহারে বিশেষ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা কম। এখানে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এক লপ্তে ২।৩ হাজার বিঘা জমি খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। গরম দেশ বলে, যন্ত্র গরম হ'য়ে তাড়াতাড়ি খারাপ হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশী। তার ওপর এ সব যন্ত্রের দামও খুব বেশী, এবং বিদেশ থেকে কিন্‌তে হয়। যন্ত্র চালাবার পেট্রোলও দেশে খুব কম তৈরী হয়; বিদেশ থেকেই বেশীর ভাগটা কিন্‌তে হবে। দেশে যন্ত্র চালাবার এবং যন্ত্র সারাবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি-অলা লোকেরও একান্ত অভাব। তা ছাড়া, দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসার বেশী না হওয়ার দরুণ, যদি চাষের কাজে লোক কমান যায়, তা হ'লে একটা বড় রকমের বেকার সমস্যা দেখা দেবে। আমাদের দেশে চাষের উন্নতির জন্য আসলে দরকার ভূমি-সঞ্চয়ী কৌশল (Intensive cultivation)--যাতে করে কম জমিতে সবচেয়ে বেশী ফসল ফলান' যায়।

(২)

ভূমি-সঞ্চয়ী কৌশল—ক্ষীয়মান্ ফলনের সূত্র

চাষের কাজে যেমন কৃষাণ লাগাতে হয়, তেম্‌নি মূলধনও প্রয়োগ করতে হয়। যন্ত্রপাতি, চাষের বলদ, জমির সার, বীজ, জল সেচের ও জল নিকাশের ব্যবস্থা, এই সব মূলধনের-রূপ। একই জমি থেকে বেশী পরিমাণে ফসল তুল্‌তে হ'লে, কৃষাণের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ বাড়ালে সে কাজ করা যায়। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধা আছে। যে অনুপাতে শ্রমশক্তি ও মূলধনের পরিমাণ বাড়ান যায়, সে অনুপাতে ফসলের পরিমাণ বাড়ে না, তার চেয়ে কম অনুপাতে বাড়ে। অবশ্য জমির তুলনায় কৃষাণের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ প্রথমটায় যদি নিতান্ত কম হ'য়ে থাকে, তা হ'লে শ্রমশক্তি ও মূলধন যে অনুপাতে বাড়ান যাবে, ফসলের পরিমাণ তার চেয়ে বেশী অনুপাতে বাড়্‌বে। কিন্তু, বার কতক এই রকমে বাড়্‌বার পর, শীঘ্রই এমন একটা অবস্থা আস্‌বে যখন ফসলের পরিমাণ, শ্রমশক্তি ও মূলধনের পরিমাণের চেয়ে কম অনুপাতে বাড়্‌তে থাক্‌বে। ব্যাপারটা একটি অঙ্কের ছক্ দিয়ে এই ভাবে দেখান যায়। এখানে, একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কৃষাণ ও তদুপযোগী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের মূলধন নিয়ে, একটি শ্রমশক্তি ও মূলধনের মাত্রা কল্পনা করা হয়েছে। আর মনে করা হচ্ছে যে, একখানি নির্দ্দিষ্ট জমিতে বৎসরের পর বৎসর, ক্রমান্বয়ে শ্রমশক্তি ও মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়া

হচ্ছে এবং তার ফলে ফসলের পরিমাণ কি ভাবে বাড়্ছে তার হিসাব লেখা হচ্ছে। যেমন দফায় দফায় শ্রমশক্তি ও মূলধনের মাত্রা বাড়ান হচ্ছে, তেম্নি প্রত্যেক দফায় খানিকটা করে বাড়্তি ফসল পাওয়া যাচ্ছে। এই বাড়্তি পরিমাণটিকে সেই দফার 'প্রান্তিক ফসল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শ্রমশক্তি ও মূলধনের পরিমাণ	মোট ফসলের পরিমাণ	প্রান্তিক ফসল
১ মাত্রা	১০ মণ	১০ মণ
২ ,,	২২ ,,	১২ ,,
৩ ,,	৩৫ ,,	১৩ ,,
৪ ,,	৪৬ ,,	১১ ,,
৫ ,,	৫৬ ,,	১০ ,,
৬ ,,	৬৪ ,,	৮ ,,
৭ ,,	৭১ ,,	৭ ,,
৮ ..	৭৬ ..	৫ ..

এখানে দেখা যাচ্ছে যে জমিটির তুলনায় ১ মাত্রা কি ২ মাত্রা পরিমাণ শ্রমশক্তি ও মূলধন নিতান্ত অপ্রচুর ; সেইজন্য ৩ মাত্রা অবধি, প্রান্তিক ফসল বেড়ে চলেছে। কিন্তু তার পর থেকে কম্তে আরম্ভ করেছে। এবং যেমন, মাত্রাব পর মাত্রা শ্রম-শক্তি ও মূলধন বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, মোট ফসলের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে বাড়্ছে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির হার ক্রমশঃই কমে চলেছে ; তার মানে, প্রান্তিক ফসল ক্রমশঃই কমে চলেছে।

এই ব্যাপারটি রেখা চিত্র দিয়ে এই ভাবে দেখান যায়—
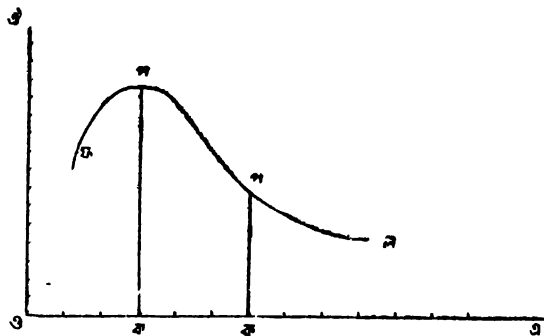
ওএ' বরাবর শ্রমশক্তি ও মূলধনের পরিমাণ মাপা হয়েছে। এক এক ঘর, এক এক

মাত্রা। 'ওঐ' বরাবর প্রান্তিক ফলনের পরিমাণ মাপা হয়েছে। এক এক ঘর, এক এক মণ। যেমন যেমন শ্রমশক্তি ও মূলধনের মাত্রা বাড়্‌ছে, প্রান্তিক ফলনের পরিমাণ কি ভাবে বদ্‌লাচ্ছে, সেইটি দেখান হচ্ছে 'ফল' এই রেখাটি দিয়ে। এই রেখার ওপর যে কোন একটি বিন্দু 'প' থেকে যদি খাড়া রেখা 'পক' 'ওঐ'র ওপর ফেলা যায়, তা হ'লে এই বোঝায় যে যখন 'ওক' মাত্রা শ্রমশক্তি ও মূলধন প্রয়োগ করা হচ্ছে, তখন প্রান্তিক ফলনের পরিমাণ হচ্ছে 'পক'। প্রথম তিন মাত্রা 'ওক'র সঙ্গে সঙ্গে 'পক'ও বেড়েছে। কিন্তু তারপর 'ওক' যত বেড়েছে, 'পক' ততই কমেছে।

এতক্ষণ যে প্রাকৃতিক বাধার আলোচনা হ'ল সেটির নাম **"ক্ষীয়মান ফলনের সূত্র"** (Law of Diminishing Returns)। সূত্রটি এই :—

"একখানি জমিতে যদি শ্রমশক্তি ও মূলধন প্রয়োগের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়ান যায়, তা হ'লে প্রান্তিক ফলন ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে"।

আমরা আগে যে ভূমি সঞ্চয়ী কৌশলের কথা উল্লেখ করেছি, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একই জমিতে শ্রমশক্তি ও মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়ে ক্রমান্বয়ে বেশী বেশী ফসল তোলা, ও ক্ষীয়মান ফলনের সূত্রে যে প্রাকৃতিক বাধার সন্ধান পাওয়া গেল তাকে নানা উপায়ে ঠেকিয়ে রাখা। এই শেষোক্ত কাজে, গত ২শত বৎসর ধরে রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞান, জীবাণু-তত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানের সাহায্যে এমন আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়েছে, যে কেউ কেউ মনে করেন যে ভবিষ্যতেও এই উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ক্ষীয়মান ফলনের সূত্রের ক্রিয়াকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে। তা কিন্তু সম্ভব নয়। তার কারণ একই জমি থেকে ক্রমান্বয়ে বেশী ফসল তোলার যে সব অন্তরায় আছে, তার কতকগুলি দূর করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হলেও, বাকিগুলি দূর করা মানুষের সাধ্যাতীত।

যদি জমির স্থূল গঠনের দোষই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ যদি জমিতে বালির ভাগ বেশী কিংবা শক্ত কাদার ভাগ বেশী হয়, তা হলে সজ্জীসার প্রয়োগ এবং অন্যান্য উপায়ে তাব প্রতিকার করা সম্ভব।

যদি জলের অভাবই কারণ হয়, তা হ'লে তারও প্রতিকার আছে। এ বিষয়ে "এঞ্জিনিয়ার"রা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। বড় বড় নদীতে আড়া-আড়ি বাঁধ নির্ম্মান ক'রে, জল উঁচু করে, সেই জল শত শত মাইল খাল কেটে, তার ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে লক্ষ লক্ষ বিঘা শুষ্ক জমিকে সরস করা হয়েছে। বড় বড় পুষ্করিণী কেটে, কূয়ো খুঁড়ে, নলকূপ বসিয়ে এবং বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তার থেকে জল তুলে, হাজার হাজার বিঘা জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রয়োজন মত খাদ্যের যোগান রাখা আর একটি সমস্যা। জমিতে যে নাইট্রোজেন,

ফস্ফরাস্, ক্যাল্সিয়াম প্রভৃতি পদার্থ থাকে, তাই থেকেই গাছপালা পুষ্টি আহরণ করে। অতএব বেশী পরিমাণে শস্য ফলাতে হ'লে, এই খাদ্যের পরিমাণও বাড়ান দরকার। সে কাজ সার দিয়ে করা যায়। সবচেয়ে বেশী দরকার হয় নাইট্রোজেনের। এর জন্য আগে খনিজ নাইট্রেটের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর ক'রতে হ'ত। এখন বিজ্ঞানের সাহায্যে হাওয়া থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা যায়। সেই জন্য সুলভ মূল্যে এবং যে কোন পরিমাণে এখন নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে পারে। আরও নানা রকমের সার এখন বিজ্ঞানের সাহায্যে কম খরচায় তৈরী হয়, যাতে ক'রে উদ্ভিদ্ খাদ্যের সব রকম উপাদানই যথেষ্ট পরিমাণে জমিতে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে।

এ ছাড়াও উদ্ভিদের রোগের প্রতিকার করে, পালা ক'রে বিভিন্ন শস্য ফলিয়ে, উন্নত রকমের বীজ ব্যবহার ক'রে এবং অন্য আরও অনেক প্রকারে মানুষ একই জমি থেকে উত্তরোত্তর বেশী ফসল তুল্‌তে সমর্থ হয়েছে।

আমরা দেখলাম "ক্ষীয়মান ফলনের সূত্রের" ক্রিয়াকে ঠেকিয়ে রাখার কাজে, মানুষ নানা কৌশল অবলম্বন ক'রে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করেছে। এ কথাও স্বীকার্য্য যে ভবিষ্যতে এ পথে আরও অনেক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু একটি বাধা এমন আছে, যা দূর করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

প্রত্যেক গাছের দাঁড়াবার এবং বাড়বার জন্য খানিকটা ক'রে জায়গা দরকার। অতএব বেশী ফসল ফলাতে হ'লে জায়গাও বেশী দরকার। কিন্তু এক বিঘা জমিতে এক বিঘাই জায়গা থাকবে; তার চেয়ে ত বাড়ান যায় না। তারপর, গাছপালা জন্মাবার জন্য এবং বাড়বার জন্য রোদ, বৃষ্টি, আলো এবং বাতাস দরকার। এ সব জিনিষের এক বিঘা জমিতে প্রকৃতির যেটুকু বরাদ্দ, মানুষের চেষ্টায় তা আর বাড়ান' যায় না। অতএব জমিতে ক্রমান্বয়ে বেশী বেশী ফসল ফলাবার চেষ্টা ক'রলে, একটা অবস্থা এমন আসবেই, যখন এই সব জিনিষের ঘাটতি পড়বে। যেহেতু এ ঘাটতি মানুষের চেষ্টায় পূর্ণ করা যায় না, সেইহেতু ক্ষীয়মান ফলনের সূত্রের ক্রিয়াকে শেষ পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)

জন সংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যা—ম্যালথাস সাহেবের সিদ্ধান্ত।

মানুষের খাদ্য প্রধানতঃ জমি থেকে আসে। আমরা দেখেছি যে জমি থেকে যত খুসী ফসল তোলা যায় না। অতএব যদি কোন দেশে ক্রমাগত লোক বাড়তে থাকে তা' হ'লে একটা দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে ইংরাজ মনীষী ম্যালথাস সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি নানা দেশের ইতিহাসের নজির তুলে দেখান যে, যখনই কোন দেশে খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্য্য ঘটেছে, তখনই জন সংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বেড়েছে। পরে ধীরে ধীরে এই প্রাচুর্য্যের অবস্থার অবসান হয়েছে; এবং কালক্রমে অভাব দেখা দিয়েছে। লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বেশী বেশী খাদ্য উৎপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু যে হারে জনসংখ্যা' বৃদ্ধি পেয়েছে সে হারে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ান' সম্ভব হয় নি। এই দুই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হারের তারতম্য কতখানি, তা বোঝাবার জন্য তিনি অঙ্কশাস্ত্রের ভাষার আশ্রয় নিয়ে লিখেছেন যে, খাদ্যের যোগান বড় জোর সমান্তর সংখ্যায় (Arithmetical progression) বাড়ান যায়, যেমন ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, এইরকম। কিন্তু জন-সংখ্যার ঝোঁক রয়েছে সমগুণ সংখ্যায় (Geometric progression) বাড়বার, যেমন ১০, ২০, ৪০, ৮০, ১৬০ এইরকম। ফলে, খাদ্যের প্রয়োজনের পরিমাণ আর যোগানের পরিমাণের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে চলে, এবং যত দিন যায়, ততই খাদ্যের অভাব তীব্রতর হ'য়ে ওঠে। এর প্রতিকার কি? ম্যালথাস দেখিয়েছেন, বরাবর এর প্রতিকার এসেছে অসীম দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে। অর্দ্ধাহারে লোকে জীর্ণকায় হয়েছে; সামান্য সামান্য রোগে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে; বংশবৃদ্ধি রোধ করবার জন্য লোকে শিশুহত্যার আশ্রয় নিয়েছে; আর এসেছে যুদ্ধ, এবং ব্যাপক আকারে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। অতীতে যা ঘটেছে, ভবিষ্যতেও তাই ঘটবে। এই ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে বাঁচতে হলে মনুষ্যকে নিষ্ক্রিয় থাক্‌লে চলবে না। কারণ তা' হ'লে প্রজা-বাহুল্য ঘটবেই, এবং সে সমস্যার সমাধান হবে উপরিউক্ত লোকক্ষয়কর প্রতিকারের (Positive checks) দ্বারা। অতএব মানুষকে অনাগত-বিধানের (Preventive checks) আশ্রয় নিতে হবে। ম্যালথাস তার উপায় নির্দ্দেশ করেছেন, সকলকে সংযম অভ্যাস ক'রতে হবে, এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা বজায় রেখে একটু বেশী বয়সে বিবাহ ক'রতে হবে।

ম্যালথাস উপায়ের সন্ধান দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বেশী লোক যে তাঁর উপদেশ মত চল্‌তে পারবে এ ভরসা তিনি ক'রতে পারেন নি। তাই উপসংহারে তিনি এই মতই প্রকাশ করেছিলেন যে মানুষের ভাগ্যে দুঃখ ও দুর্দ্দশা অনিবার্য্য।

(২)
ম্যালথাসের সিদ্ধান্তের সমালোচনা ও আধুনিক মত

ম্যালথাসের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রজা-বাহুল্য সমস্যা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে; এবং ম্যালথাসের মতের বহুবিধ বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে।

অনুকূল অবস্থা পেলে যে জন সংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বাড়্‌তে পারে, এ কথা অবশ্য কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু, জন সংখ্যা বাড়্‌লে যে দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী, কিংবা ম্যালথাসের নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন ছাড়া অন্য কোন কারণে যে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির গতি মন্থর হ'য়ে যায় না, এ কথা এখন অনেকেই অস্বীকার করেন।

উনবিংশ শতাব্দিতে বিলাতে এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্য অনেক দেশে যথেষ্ট পরিমাণে জন-সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু তাতে দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়ে নি। বরঞ্চ ঐ সময়ে ঐ সব দেশ এত সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠেছিল, এবং সাধারণ লোকের স্বচ্ছলতা এত বেড়েছিল যে অতীতে কখনও এরকম হয় নি। এর কারণ, ঐ সময়ে ঐ সব দেশে যন্ত্র শিল্পের প্রসার দ্রুতগতিতে ঘটেছিল, এবং নানা রকম উৎকৃষ্ট শিল্প জাত সামগ্রীর বিনিময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে বিপুল পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য এবং কৃষিজাত ও খনিজ নানা রকমের কাঁচা মাল আনা সম্ভব হয়েছিল। অতএব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে দেশে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই দেশেই সমান অনুপাতে কৃষিসম্পদ বাড়ান' সম্ভব হচ্ছে না বলেই যে দুঃখ অনিবার্য্য, তা নয়; শিল্প সম্পদ বাড়িয়েও এ সমস্যার সমাধান করা যায়। এ সম্বন্ধে কিন্তু একটি কথা ভাববার আছে। এখন সকল দেশই শিল্প-জাত দ্রব্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা ক'রছে। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র বহুদিন আগেই শিল্প-সম্পদে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। রাশিয়া আর এখন পশ্চিম ইউরোপের মুখাপেক্ষী নেই। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলি রাশিয়ার আওতায় গিয়ে পড়েছে, এবং প্রত্যেকেই কল কারখানা গড়ে যতদুর সম্ভব স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা ক'রছে। ভারতে বহু-দিন আগে থেকেই শিল্পোন্নতির চেষ্টা চলছে, এবং অনেক ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এমন কি কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মত জন-বিরল দেশগুলিও শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে অন্য দেশের উপর নির্ভর করে থাকতে চায় না। এই কারণে দেশে শিল্প-সম্পদ বাড়িয়ে প্রজা-বাহুল্য সমস্যার সমাধান করবার সুযোগ আর যে বেশী দিন থাকবে তা ব'লে মনে হয় না। ভারত বা চীনের মত দেশের এ সুযোগ কোন দিনই হবে না।

উনবিংশ শতাব্দিতে পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্য আর এক দিক্ দিয়ে সুপ্রসন্ন ছিল। লক্ষ লক্ষ লোক, দেশের ভার লাঘব করে আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ-জীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা নূতন দেশে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেছিল। আধুনিক কালে এ সুযোগও আর বিশেষ নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এখন আর লোকের অভাব নাই, এবং সেখানে জনাগম সম্বন্ধে নানা রকমের বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর, যে সব দেশের উল্লেখ করা হ'ল সে সব দেশে ইউরোপ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের লোককে বসবাস ক'রতে দেওয়া হয় না। অষ্ট্রেলিয়া আবার বিলাতের লোক ছাড়া আর কাহাকেও আসতে দিতে চায় না। এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করার আরও একটি অন্তরায় আছে। সম্প্রতি একটি পুস্তকে * একটি হিসাব দিয়ে দেখান হয়েছে যে বিলাত থেকে লোক নিয়ে গিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করাতে মাথাপিছু ১০০০ পাউণ্ড মূলধন খরচ করা দরকার। এত বিপুল পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা সহজ কাজ নয়। ভারতের লোকের অন্য কোন দেশে গিয়ে স্বস্তি পাবার সম্ভাবনা নেই। সিংহল, বর্ম্মা প্রভৃতি ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিও, সেখানে পুরুষানুক্রমে যে সব ভারতীয়েরা বাস ক'রছে তাদের তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

ম্যাল্‌থাসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরও একটি যুক্তি আছে। বিভিন্ন দেশের জন-সংখ্যার হিসাব মিলিয়ে দেখ্‌লে দেখা যায় যে, যে দেশ যত গরীব সে দেশে জন্মের হার তত বেশী; এবং যে দেশ যত সমৃদ্ধ ও শিল্প-প্রচেষ্টায় অগ্রসর সে দেশে জন্মের হার তত কম। সুইডেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে ও উত্তর আমেরিকায় জন্মের হার সবচেয়ে কম। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিতে তার চেয়ে বেশী। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে আরও বেশী। আবার একই দেশের মধ্যে যে শ্রেণী যত গরীব, সে শ্রেণীতে বংশ-বৃদ্ধি হয় তত তাড়াতাড়ি। যারা যত সঙ্গতিপন্ন তাদের জন্মের হার হয় তত কম। খুব ধনী পরিবারগুলিতে চালু সংখ্যাই বজায় থাকছে না। কেন এরকম হয়, তার উত্তরে পণ্ডিতেরা যা বলেন তাতে দুরকম মতের আভাস পাওয়া যায়। একটি যে, অবস্থা সচ্ছল হ'লে মানুষ সাধারণতঃ যে ধরণের জীবন যাপন করে, তাতে ক'রে আপনা আপনি সন্তান সন্ততি কম হয়। অন্যটি হচ্ছে যে, যারা উঁচু দরের জীবন যাপনের স্বাদ পেয়েছে তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্যও সেই রকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে, এবং বেশী ছেলেমেয়ে হ'লে পাছে সকলকে প্রয়োজন মত সুযোগ সুবিধা দিতে অসমর্থ হয়, সেই কারণে, যাতে সন্তান সন্ততি কম হয় সেই চেষ্টা করে। প্রথম কথাটির মধ্যে বিশেষ কোন সত্য আছে বলে মনে হয় না। শেষের কারণটিই আসল। তবে, লোকে যে ছেলে মেয়ে কম

* "Twentieth Century Empire" by H. V. Hodson.

হওয়া পছন্দ করে, সেটা কতটা ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে, আর কতটা নিজেদের ভোগের সুযোগ অব্যাহত রাখবার জন্য, তা বলা শক্ত। কি ভাবে জন্মের হার কম রাখা হচ্ছে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন কার সণ্ডার্স্ (Carr Saunders) তাঁর পৃথিবীর জন-সংখ্যা (World Population) নামক গ্রন্থে। সেটি হচ্ছে কৃত্রিম জন্ম-নিরোধ। তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে এবং ইউরোপের বাইরের অন্যান্য জায়গায় শ্বেতকায় জাতিদের মধ্যে কৃত্রিম জন্ম-নিরোধের অভ্যাস এত ব্যাপকতা লাভ করেছে যে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, দ্রুতগতিতে জন-সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রজা-বাহুল্যের আর কোন এখন সম্ভাবনা নাই। এখন সমস্যা দাঁড়িয়েছে কি করে বংশলোপ নিবারণ করা যায়। ম্যালথাস লিখেছিলেন যে প্রজাবাহুল্যের ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচতে হ'লে, মানুষকে নিজের চেষ্টায় জন্মের হার কমাতে হবে। হচ্ছেও তাই। তবে ম্যালথাস্ আত্মসংযম ও নির্ম্মল জীবনের উপর জোর দিয়েছিলেন। মানুষ সে পথে না গিয়ে আরও সহজ পথের আশ্রয় নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় চিন্তা কর'বার আছে। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত (Annie Besant) প্রথম বয়সে কৃত্রিম জন্ম-নিরোধের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং বিলাতের সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর ক'রবার একমাত্র কার্য্যকর উপায় হিসাবে, তাঁর স্বভাব-সুলভ বাগ্মিতা ও কর্ম্ম-তৎপরতার সহিত এই উপায়ের বহুল প্রচার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ও তাঁর সহকর্ম্মীদের উৎসাহের ফলেই, বিলাতের সাধারণ লোকের এই উপায়ের প্রতি নজর পড়ে। কিন্তু, তার লেখা প'ড়ে আমরা জানতে পারি যে, পরিণত বয়সে, যখন তিনি আধ্যাত্ম জীবনে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন তখন, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এ কাজটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছিল। তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে কৃত্রিম জন্ম-নিরোধের অভ্যাসের ফলে নৈতিক জীবনের এরকম শোচনীয় অবনতি ঘটে যে, রোগের চেয়ে প্রতিকার বেশী ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে। ডাক্তারেরা বলেন যে ইহাতে স্বাস্থ্যহানিও যথেষ্ট ঘটে।

ভারত ও চীন সম্বন্ধে 'কার সণ্ডার্স' লিখেছেন যে এই দুই দেশের প্রজাবাহুল্য সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান সম্ভবপর নয়।

এখন পৃথিবীতে জন-সংখ্যা যে হারে বাড়ছে ও খাদ্য উৎপাদনের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বিচার করে দেখলে মনে হয় যে প্রজা-বাহুল্য সমস্যা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনও আসেনি। International Federation of Agricultural Producers এর মাসিক বিবরণীতে (জুলাই ১৯৪৮) প্রকাশ যে স্যর জন বয়েড অর্ (Sir John Boyd Orr) এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন যে,- দুই চারি বার

ভাল ফসল হ'লেই পৃথিবীর খাদ্যের ঘাটতি মিটবে না। United Nations Department of Economic Affairs এর বিবরণীতেও অনুরূপ মত প্রকাশ করা হয়েছে। পৃথিবীর জন-সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তার তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বিলাতের 'Scope' পত্রিকায় (Jan-1949) একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে এই মন্তব্য করা হয়েছে যে, আগে কৃষি-প্রধান দেশ ও শিল্প-প্রধান দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের ব্যাপারে শিল্প-প্রধান দেশের জোর ছিল বেশী। এখন কৃষিপ্রধান দেশের জোর বেশী হয়েছে, এবং এই অবস্থাই চিরস্থায়ী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তার কারণ, আর এখন পৃথিবীতে কোথাও চাষের উপযোগী বিস্তৃত নূতন জমি পড়ে নেই। বরঞ্চ লক্ষ লক্ষ একর জমি উপরের মাটি ধুয়ে যাওয়ার দরুণ, এবং চাষের দোষে উর্বরতা নষ্ট হওয়ার দরুণ, এখন অকেজো হ'য়ে পড়েছে। এদিকে, ১৯৩২ সালের পর পৃথিবীর জন-সংখ্যা ৩৫ কোটি বেড়েছে, এবং দৈনিক ৫৫,০০০ করে বাড়ছে।*

	World Population	World Industrial Production	World Food Production
1938	100	100	100
1947	110	128	93

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১)

ব্যবসায়ে শ্রম-শক্তি নিয়োগের কৌশল :

কর্ম্ম-বিভাগ ও যন্ত্রের ব্যবহার।

দেশে যত কর্ম্মক্ষম লোক আছে, তারা মাথাপিছু যত বেশী পরিমাণে কাজ দিতে পারবে, দেশ তত সমৃদ্ধ হবে, এবং সাধারণ লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌বার সম্ভাবনাও তত বেশী হবে। শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াবার কৌশল হচ্ছে কর্ম্ম-বিভাগ ; তার মানে, সমগ্র কাজটি, বিভিন্ন অংশে ভাগ ক'রে, প্রত্যেক অংশ আলাদা আলাদা লোক বা লোকসমষ্টিকে ক'রতে দেওয়া। এতে ক'রে বেশী কাজ পাওয়া যায়, দুটি কারণে। সমগ্র কাজটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ ক'রে দেওয়ার দরুণ, প্রত্যেক অংশটি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয় ; আর বারংবার একই কাজ করার দরুণ সেই কাজে দক্ষতা জন্মায়। কাজ যত ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা যাবে, সুবিধার সম্ভাবনাও তত বেশী হবে। সেইজন্য শিল্প-জীবনের ইতিহাস আলোচনা ক'রলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, বরাবর সেই চেষ্টাই হ'য়ে এসেছে।

প্রথম আরম্ভ হয় স্থূল কর্ম্ম-বিভাগ দিয়ে। এক একটি গোটা ব্যবসা, আলাদা এক এক দল লোকের হেপাজতে দেওয়া হয়। এক দল লোক শুধু কাঠের কাজ ক'রবে। আর এক দল শুধু লোহার কাজ ক'রবে। আর এক দল, কাপড় তৈরীর কাজ। আর এক দল, সোণা রূপার কাজ। এই রকম। আমাদের দেশে এই রকম সব আলাদা আলাদা বৃত্তি আশ্রয় ক'রে আলাদা আলাদা জাতির উদ্ভব হয়।

তারপর সুরু হয়, এই রকম এক একটি আস্ত ব্যবসাকে ভেঙে তিন চার্‌টে আলাদা আলাদা ব্যবসার পত্তন্ করা। প্রায় প্রত্যেক ব্যবসাতেই, কাঁচা মাল থেকে ব্যবহারের জিনিষ তৈরী করার পথে অনেকগুলি ধাপ আছে। এই রকম একটি, বা পর পর দুটি তিনটি ধাপ নিয়ে এক একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা গ'ড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যেমন পোষাক পরিচ্ছদ সরবরাহ করার কাজে, প্রথম ধাপ হচ্ছে তুলোর বীজ বাদ দিয়ে, আঁশ থেকে পাঁজ তৈরী ক'রে, চরখার সাহায্যে সুতো তৈরী করা। এইটি একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা হ'য়ে উঠ্‌ল। এ ব্যবসার কাঁচা মাল হচ্ছে তুলো, আর তৈরী মাল সুতো। এর পরের ধাপ হচ্ছে, এই সুতো বুনে নানা রকমের কাপড়ের থান তৈরী করা। এ ব্যবসার কাঁচা মাল হচ্ছে সুতো, এবং তৈরী মাল হচ্ছে, কাপড়ের থান। এর পরের ধাপ হ'ল দর্জ্জির ব্যবসা। তারা কাপড়ের থান কিনে, মাপ্ ক'রে কেটে, সেলাই ক'রে, ব্যবহারের যোগ্য নানা রকমের পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী

করে। এই ভাবে আরও অনেক ব্যবসা ভেঙ্গে, তার বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে, পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসা গ'ড়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার, প্রত্যেক ব্যবসার মধ্যে সূক্ষ্ম কর্ম্ম-বিভাগের ব্যবস্থা হয়েছে। একটি কর্ম্মশালা বা কারখানায় যে কাজ হচ্ছে সেটিকে অনেকগুলি প্রক্রিয়ায় ভাগ করে, প্রত্যেকটি ভাগ আলাদা আলাদা লোককে ক'রতে দেওয়া হয়। তাঁতীর ঘরে একজন সুতোয় মাড় দিচ্ছে, আর একজন রং কর্‌ছে, আর একজন বুন্‌চে। কাঠের আস্‌বাবের কারখানায়, কেউ কাঠ চির্‌চে, কেউ মাপ ক'রে কাট্‌ছে, কেউ রঁ্যাদা ক'রছে, কেউ জোড় দিচ্ছে, কেউ শিরীষ ঘস্‌ছে, কেউ পালিস ক'রছে। প্রত্যেকেই এক একটি ছোট অংশ নিয়ে ব্যস্ত, এবং সকলের সহযোগিতার ফলে সমগ্র কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে। কাজের সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে এমন অবস্থা এসে দাঁড়ায় যখন প্রত্যেকের ভাগে যে অংশটুকু পড়ে, তাতে তাকে ঠিক্ একই ধরণের অঙ্গ-চালনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক'রে যেতে হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের ঠেলা দেওয়া, কিংবা টানা, কিংবা হাতুড়ি ঠোকা, কিংবা ঘুরিয়ে দেওয়া, এই ধরণের একটা সামান্য কাজ বারংবার করে যেতে হয়। কাজের মধ্যে তখন আর বুদ্ধি বা বিচারশক্তি প্রয়োগের কোনও প্রয়োজন থাকে না। মানুষ তখন যন্ত্রে পরিণত হয়। যখন এ রকম হয়, তখন উপযুক্ত যন্ত্র আবিষ্কার হ'তে দেরী হয় না। মানুষের জায়গায় যন্ত্র বস্‌তে থাকে।

ব্যক্তি-বিশেষের দিক্ থেকে দেখলে মনে হয় যে, কর্ম্ম-বিভাগের ফলে মানুষে মানুষে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমগ্র সমাজের দিক্ থেকে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এতে ক'রে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সূচিত হয়। যে সুতো কাটে তার কাজ সার্থক হয় তখনই, যখন তাঁতি এবং দর্জি তাদের নিজের নিজের কাজ ঠিক্‌মত করে। প্রত্যেকেই একটি সঙ্কীর্ণ পরিধির বিশেষ কাজে তার সমস্ত সময় ও কর্ম্মদক্ষতা নিয়োগ ক'রছে। তার কারণ, এই ভাবেই তার কৃতিত্ব সবচেয়ে বাড়ান যায় *। কিন্তু এ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে, সে সমাজে বাস করে ব'লেই। সে তার নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা জিনিষের জন্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে সমাজের অন্যান্য লোকের ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন কাজে লিপ্ত নানা শ্রেণীর লোকগুলি এক প্রাণবন্ত সমাজদেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মত। প্রত্যেকে নিজের নিজের কর্ত্তব্য ঠিক্ মত ক'রলে সমস্ত সমাজদেহে শ্রী ও সম্পদ্ ফুটে ওঠে; কোন একটি অঙ্গ বিকল হ'লেই সমস্ত সমাজদেহে অবসাদ ও অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে।

* হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্য্যন্ত মাথাপিছু উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ গড়ে বৎসরে শতকরা ২ অংশ হিসাবে চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে এসেছে। প্রধানতঃ যন্ত্র ব্যবহারের ফলেই এই রকম হয়েছে।

(২)
কর্ম্ম-বিভাগ ও যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা।

কর্ম্ম-বিভাগের ফলে কি ধরণের সব সুবিধা হয়, বিচার ক'রলে দেখতে পাওয়া যায় যে—

১। যার যে কাজের জন্য বিশেষ যোগ্যতা আছে, তাকে সেই কাজে সমস্তক্ষণ নিযুক্ত রাখা যায়। যে ঢাকাই শাড়ী বুন্‌তে পারে, তাকে যদি গামছাও বুনতে হয়, কিংবা যে ইঞ্জিন চালাতে পারে তাকে যদি বয়লারে কয়লাও দিতে হয়, তা হ'লে শ্রম-শক্তির অপচয় ঘটে। কেউ কেউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নিয়ে জন্মায়। যে সব কাজে এই ধরণের যোগ্যতা বিশেষ দরকার, তাদের সেই সব কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। বড় কারবারে সাফল্যের সঙ্গে কর্ত্তৃত্ব ক'রতে যে দূরদৃষ্টি, উপস্থিত-বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তা দরকার, সে খুব কম লোকেরই থাকে। অতএব দেশের বৈষয়িক ব্যবস্থা যদি এমন হয় যাতে, এই ধরণের গুণসম্পন্ন লোকেদের হাতেই কর্ত্তৃত্বের ভার এসে পড়ে, তা হ'লে দেশের শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সুযোগের সবচেয়ে কার্য্যকর ব্যবহার হয়।

২। একই কাজ বারংবার ক'রতে ক'রতে কাজ সোজা হ'য়ে আসে। প্রত্যেক কাজই কি ক'রে নিখুঁত ভাবে অথচ কম সময়ে ও পরিশ্রমে করা যায়, তার একটা কৌশল আছে। অভ্যাসে সেই কৌশল আয়ত্ত হয়। কাজ কোন্ ভাবে সাজালে সবচেয়ে সুবিধা হয়; হাতের যন্ত্র কোন্ ভাবে ধরলে এবং চালালে পরিশ্রম কম লাগে, অথচ কাজ ভাল হয়; কোন্ কাজটুকুতে ঠিক্ কতখানি সময় লাগা উচিৎ; কখন, কোথায়, ঠিক্ কতখানি জোর দেওয়া দরকার; এই সব বিষয়ে আন্দাজ এমন ঠিক হ'য়ে যায় যে, হাত তখন কলের মতন চল্‌তে থাকে। চোখের সঙ্গে হাতের তখন একটা সরাসরি যোগ গ'ড়ে ওঠে; মনের মধ্যস্থতার আর প্রয়োজন থাকে না। এ অবস্থায় কাজ নিখুঁত হয়, অথচ সময় ও পরিশ্রমের ঢের সাশ্রয় ঘটে।

৩। একই লোককে যদি দিনের মধ্যে তিন চার রকম আলাদা আলাদা কাজ ক'রতে হয়, তাহলে অনেক খানি সময়ের অপচয় ঘটে। একটি কাজ শেষ ক'রে গুছিয়ে তুলতে খানিকটা সময় লাগে। অন্য একটি সাজিয়ে আরম্ভ ক'রতে, এবং তাতে হাত বসতে খানিকটা সময় লাগে। প্রত্যেক লোক একই কাজে বরাবর নিযুক্ত থাকলে এই সময়টুকু অনাবশ্যক নষ্ট হয় না।

আরও একটি দিক দিয়ে অপচয় নিবারণ হয়। প্রত্যেক কাজের জন্য আলাদা আলাদা ধরণের যন্ত্র দরকার। একই লোক দু তিন রকমের কাজ ক'রলে, যখন সে একটি কাজ ক'রছে, তখন অন্য কাজের যন্ত্রগুলো খালি পড়ে থাকে, কোন ব্যবহার হয় না। এতে মূলধনের অপচয় ঘটে। দেশে যন্ত্রের ব্যবহার যত বাড়ে, প্রত্যেক যন্ত্র যাতে যতক্ষণ সম্ভব কাজে লাগান হয়, সে দিকে নজর রাখা তত দরকার হ'য়ে পড়ে।

৪। কাজ ছোট ছোট ভাগে ভাগ করার দরুণ, প্রত্যেক ভাগের কাজটুকুর জন্য উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবন করা সহজ হয়। অনেক ক্ষেত্রে একই সঙ্কীর্ণ পরিধির কাজ বার বার ক'রতে ক'রতে কারিগরের নিজের মাথাতেই মতলব এসে পড়ে, কি ভাবে এই কাজ করবার উপযোগী যন্ত্র তৈরী করা যায়, কিংবা চালু যন্ত্রের কি ধরণের উন্নতি করা যায়। এইভাবে অনেক নূতন নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে।

আজকাল যন্ত্র চালাবার শক্তি নেওয়া হয়, কয়লা খনিজ তেল ও জল-বিদ্যুৎ থেকে। আর যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্র তৈরী হওয়ার দরুণ যন্ত্রগুলিও নিখুঁত হয়। এই কারণে যন্ত্র দিয়ে নানা রকমের জিনিষ তৈরী করার সুবিধা এত বেশী, যে যন্ত্র-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, পুরাতন ধরণের কারু-শিল্পের টিকে থাকার সম্ভাবনা বড় আর নেই। যে সব জায়গায় বিক্রী কম, কিংবা খুব কম মজুরীতে লোক পাওয়া যায়, সে সব জায়গায়, যন্ত্রের প্রাধান্য কিছু কালের জন্য ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু বেশী দিন তা পারা যাবে না। যন্ত্র ব্যবহারের বিশেষ সুবিধাগুলি চিন্তা ক'রলেই বোঝা যায় কেন যন্ত্রের জয় সুনিশ্চিত।

যন্ত্রের ক্লান্তি নেই। যন্ত্র কখনও ভুলও করে না। অতি সূক্ষ্ম কাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা হ'য়ে চলেছে; অথচ কোথাও সামান্য একটু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে না। তারপর, যন্ত্রের দ্বারা এমন ধরণের সব কাজ করা সম্ভব হয়েছে, যা বহু লোককে একত্র ক'রলেও তাদের সমবেত শক্তি দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। ইঞ্জিন দিয়ে চালান' 'পাম্প' (pump) লেদ (lathe), ড্রিল (drill), ক্রেন (crane) প্রভৃতি যন্ত্র দিয়ে যে সব ধরণের কাজ পাওয়া যায় তা আগে কল্পনাও করা যেত না। রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, বা মোটরগাড়ী, বৈদ্যুতিক পাখা এবং আলো, এ সব যন্ত্রযুগেই সম্ভব হয়েছে।

(৩)

বৈষয়িক জীবনের রূপ পরিবর্তন।

শ্রম-বিভাগ ও যন্ত্র-ব্যবহারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বৈষয়িক জীবন অনেক দিক্ দিয়ে নূতন রূপ নিয়েছে।

যন্ত্র তৈরীর উপাদান ইস্পাৎ। ইস্পাৎ তৈরীর জন্য কয়লা দরকার। যন্ত্র চালাবার শক্তিও নেওয়া হয় কয়লা থেকে। ফলে, কয়লা তোলার ও ইস্পাৎ তৈরীর ব্যবসায় দুটি সকলের চেয়ে দরকারী ব্যবসায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ দেশের শিল্প-সমৃদ্ধি কত জানতে হ'লে, সে দেশের লৌহ-শিল্প ও কয়লা-শিল্পের খবর নিলেই মোটামুটি একটা সঠিক আন্দাজ পাওয়া যায়।

যন্ত্র ব্যবহারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, যন্ত্র তৈরী করা, যন্ত্র বসান, যন্ত্র মেরামত করা, যন্ত্র উদ্ভাবন করা, যন্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া প্রভৃতি নানা রকমের নূতন পেশার উদ্ভব হয়েছে। দেশের শিল্পোন্নতি ক'রতে হ'লে এই সব কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক লোক থাকা দরকার। তার মানে, দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা খুব ভাল ভাবে গড়ে তোলা দরকার। কারখানায় যে সমস্ত কারিগর কাজ করে, তাদেরও এখন নূতন ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। আগেকার কালের কারু-শিল্পীদের অনেক দিন ধরে শিক্ষানবিশী ক'রে হাতের দক্ষতা অর্জন ক'রতে হ'ত। এখন এ ধরণের যোগ্যতার বিশেষ কোন দাম নেই *। তার কারণ শুধু যে মোটা ও ভারী কাজগুলিই এখন যন্ত্রে হয় তা নয়; সূক্ষ্ম কাজ যা দরকার, তার বেশীর ভাগও এখন যন্ত্রে হয়। অতএব কারিগরের এখন দরকার যন্ত্রজ্ঞান। কি ক'রে যন্ত্র চালু ক'রতে হয়, কি ভাবে যোগান দিতে হয়, যন্ত্রের কোন্ কোন্ অংশ কি ভাবে নড়িয়ে চড়িয়ে রকমারী কাজ নিতে হয়, এই সব শেখা দরকার। দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিৎ যাতে করে ছেলেরা কম বয়স থেকেই কল কব্জার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারে। আমেরিকায় শিশুদের খেলনা থেকে এই পরিচয় আরম্ভ হয়। কারখানার শ্রমিকদের আরও একটি যোগ্যতার এখন বিশেষ দরকার হয়েছে। কারখানায় অনেক লোক কাজ করে; নানা যন্ত্রের সাহায্যে নানা রকমের কাজ চলে; প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজটুকু নিয়ে ব্যস্ত; কিন্তু, প্রত্যেকের কাজই সমগ্র কাজটির এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। একজনের কাজ খারাপ হ'লে, অন্যদেরও কাজে গলদ্ হবে। একজন কাজে দেরী ক'রলে, অন্যদের কাজ আট্‌কে যাবে। কে কতটুকু সময়ে কোন্ কাজটুকু ক'রবে, আগে থাক্‌তে তার একটি কার্য্য-তালিকা তৈরী হয়। সকলকে সেই মত কাজ ক'রতে হয়, এবং উপরওলার নির্দ্দেশ মেনে চল্‌তে হয়। এ না হ'লে, কাজ অচল হ'য়ে যায়। যন্ত্র-যুগে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সময়-নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। অতএব দেশে, চরিত্রের এই দিক্‌টার অনুশীলন বিশেষ দরকার।

আজকাল জিনিষপত্র তৈরী হয় অনেক ঘুর-পথে। এক কারখানায় যে কাজ হচ্ছে, তাতে অন্যান্য কারখানায় তৈরী নানা রকমের মাল, উপাদান হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। আবার, এ কারখানায় যে মাল তৈরী হবে, সেগুলি অন্য অনেক কারখানায় উপাদান হিসাবে ব্যবহার হবে। কোন একটি ব্যবহারের জিনিষ কি ভাবে তৈরী হয়েছে, তার ইতিবৃত্ত নিলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তার পেছনে নানা শিল্পের দান রয়েছে। একটির পর একটি কারখানার ভেতর

---

* হেনরী ফোর্ড তাঁর "My life & Work" নামক বইতে লিখেছেন যে তাঁর কারখানায় যত রকমের কাজ আছে তার মধ্যে শতকরা ৪৩ ভাগ কাজের জন্য নূতন লোক নিয়ে তাদের কাজ শেখাতে মোটে ১ দিন লাগে; ৩৬ ভাগ কাজে, ১ দিন থেকে ১ সপ্তাহের শিক্ষাই যথেষ্ট; ২০ ভাগ কাজে, ১ সপ্তাহ থেকে ১ বৎসর শিক্ষা দরকার; এবং মাত্র ১ ভাগ কাজের জন্য ১ বৎসরের বেশী সময় শিক্ষার জন্য দিতে হয়।

দিয়ে, নানা প্রক্রিয়া হ'তে হ'তে, কাঁচা মাল ব্যবহার-যোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হচ্ছে। প্রত্যেক বার এক ব্যবসায়ের আওতা থেকে আর এক ব্যবসায়ের আওতায় যাবার সময় একবার করে বেচাকেনা হচ্ছে। তা ছাড়া, প্রত্যেক কারখানাকেই যন্ত্র পাতি কিনতে হয়। যন্ত্র চালাবার জন্য বয়লার, ষ্টীম-এঞ্জিন, মোটর বা ইলেক্ট্রো-মোটর কিনতে হয়; এবং কয়লা, পেট্রোল বা বিদ্যুৎ-শক্তি কিনতে হয়। পদে পদে বেচা-কেনা এখনকার শিল্প-কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার ফলে, একদিকে টাকা কড়ির ব্যবহার অত্যন্ত বেড়েছে; এবং অন্যদিকে যারা এই বেচা-কেনার সহায়তা করে, অর্থাৎ ব্যাপারী, সওদাগর, আড়ৎদার, মহাজন এই শ্রেণীর লোকদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বেড়েছে। অনেক সময়ে কারখানার মালিকেরা, সঙ্গতির অভাবে সব মাল নগদ কিনতে পারে না। বণিকদেরও মাল মজুত রাখবার জন্য ঋণের প্রয়োজন হয়। বড় বড় মহাজনেরা ধারে মাল বিক্রয় করে এই ঋণের চাহিদা কতকটা মেটায়। কিন্তু বেশীর ভাগটা পাওয়া যায় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় থেকে। ব্যাঙ্কগুলির কাজ হচ্ছে, দেশের সঞ্চিত ধন সংগ্রহ ক'রে একত্র করা, এবং যাদের ঋণ দরকার তাদের ঋণ দেওয়া। আজকালকার বৈষয়িক জীবনে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এক জায়গায় বহু কারখানার সমাবেশ ও তাহাতে সুবিধা।

দেশের কল-কারখানাগুলির হিসাব নিলে দেখা যায়, যে সেগুলি দেশময় সমান ভাবে ছড়িয়ে নেই। এক এক জায়গায়, কাছাকাছি অনেকগুলি ক'রে কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এর কারণ এতে ক'রে কাজ ভাল হয়, এবং তৈরী-খরচ কম পড়ে। এক একটি জায়গার এক একটি বিশেষ শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে আগেও প্রসিদ্ধি ছিল। ঢাকার মসলিন, শান্তিপুরের ধুতি, কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্প, মুর্শিদাবাদের সিল্ক, বেনারসের জরির কাজ, কাশ্মীরি শাল, শেফিল্ডের ছুরি কাঁচি, জেনেভার ঘড়ি, এ সব জিনিষের খ্যাতি অনেক দিনের।

এক জায়গায় অনেকগুলি কারখানা থাকলে, কাজ জানা লোক পাওয়া সহজ হয়, কারণ অনেকে সেখানে কাজ খুঁজতে আসে। স্থানীয় ছেলেরা একটি বিশেষ শিল্পের আব-হাওয়ায় মানুষ হওয়াতে সেই শিল্প সংক্রান্ত অনেক খবর আপনা আপনি জানতে পারে, এবং সহজে ভাল কাজ শিখতে পারে। পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ ও ভাব বিনিময়ের ফলে নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হয়, এবং অন্য নানা ভাবে ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। বহু সংখ্যক ব্যাপারী সেখানে মাল কিনতে আসে, ফলে, ভাল কাজের আদর হয়, এবং ন্যায্য দাম পাওয়া যায়। সকলের চেয়ে বেশী সুবিধা এই হয় যে, কর্ম্ম-বিভাগ ক'রবার সুযোগ অনেক বাড়ে। কলিকাতার কাছে মেটিয়াবুরুজে অনেক ঘর দর্জ্জির বাস। কল্‌কাতায় কাজের অভাব নেই। এক দল লোক শুধু কাজ সংগ্রহ ক'রতে আসে, এবং কাজ হ'য়ে গেলে সেগুলি দিয়ে যায়। কাজ এলে, কাজ ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। সকলে সমান কাজ জানে না। যে যে কাজ সবচেয়ে ভাল ক'রতে পারে, তাকে সেই কাজ দেওয়া হয়। খুব ভাল দর্জ্জি ছাড়া, কোট কিম্বা প্যাণ্ট কিম্বা চোগা চাপকান কাটতে পারে না। তাদের সেই কাজই সর্ব্বক্ষণ ক'রতে দেওয়া হয়। যে মিহি হাতের সেলাই ক'রতে পারে, তাকে সেই কাজ দেওয়া হয়। যে কেবল মোটা কাজ জানে, তাকে সেই রকম কাজ দেওয়া হয়। ছোট, বড়, মেয়ে, পুরুষ প্রত্যেককেই নিজের নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হয়। সেলাইএর কল বা অন্য রকম যন্ত্রপাতি খালি পড়ে থাকে না। একজনের কাজ হ'য়ে গেলে, অন্য লোকে ব্যবহার করে। ফলে, অতি সুশৃঙ্খলায় কম খরচে ভাল কাজ হয়।

আধুনিক কালের যন্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায় যে, এক একটি জায়গা এক একটি বিশেষ শিল্পের কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছে। কারণ খোঁজ ক'রলে, প্রায় ক্ষেত্রেই কোন না কোন বিশেষ সুবিধার সন্ধান পাওয়া যায়। কল্‌কাতার কাছে ভাগিরথীর দু'ধারে যত সব পাটকল। তার কারণ, পাট প্রধানতঃ বাংলা দেশেই হয়, এবং জলপথে কল্‌-কাতায় পাট নিয়ে আসা সোজা। কল্‌কাতা পূর্ব্ব ভারতের প্রধান বন্দর। অতএব এখান

থেকে পাট, এবং পাটের তৈরী জিনিষ রপ্তানি ক'রবার সুবিধা রয়েছে। কল্‌কাতার অনতি দূরে বড় বড় কয়লার খনি। অতএব এদিক দিয়েও কল্‌কাতার একটা বড় সুবিধা। বর্ম্মার চালের কলগুলি প্রধানতঃ রেঙ্গুন সহরে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কারণ, বর্ম্মা থেকে বিপুল পরিমাণ চাল রেঙ্গুন বন্দর দিয়ে রপ্তানি ক'রতে হয়। কোচিন এবং কলম্বোয় বহুসংখ্যক নারিকেল তেলের কল থাকার কারণও অনুরূপ। বাংলা দেশের চালের কলগুলি বেশীর ভাগ বড় বড় গঞ্জগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ এ সব জায়গায়, বিক্রীর জন্য আশেপাশের অঞ্চল থেকে উদ্বৃত্ত ধান এসে জমা হয়। বিলাতে ময়দার কলগুলি প্রধানতঃ বন্দরগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়, কারণ বিদেশ থেকে জাহাজ জাহাজ গম ঐ বন্দরগুলিতেই এসে হাজির হয়। লৌহশিল্পে কয়লার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যে সব জায়গায় লোহার খনি ও কয়লার খনি কাছাকাছি পাওয়া গেছে, ঐ সব জায়গায় লৌহপিণ্ড ও ইস্পাৎ তৈরী ক'রবার বড় বড় কারখানাগুলি গড়ে উঠেছে। অন্যান্য ভারী শিল্পগুলিতেও কয়লার দরকার যথেষ্ট, কারণ বড় বড় যন্ত্র চালাবার শক্তি প্রধানতঃ কয়লা থেকে নেওয়া হয়। তাই যে সব অঞ্চলে বহুল পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়, সেই সব অঞ্চলে নানা রকম শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। জগতের বড় বড় শিল্প কেন্দ্রগুলি বিস্তৃত কয়লার অঞ্চলগুলিতেই গড়ে উঠেছে; যেমন জার্ম্মানীর রূর (Ruhr) অঞ্চল, বিলাতের দক্ষিণ ওয়েল্‌স্ ও "মিডল্যাণ্ডস্", আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্ব্ব ভাগ ইত্যাদি। লৌহপিণ্ড বা ইস্পাৎ তৈরীর কারখানা, কিংবা জাহাজ তৈরীর কারখানায় যে ধরণের ভারী কাজ হয়, তার জন্য কেবল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকদের নেওয়া চলে। অতএব তাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বেকার থাকৃতে হয়। এই কারণে ঐ ধরণের ভারী শিল্পের কেন্দ্রগুলিতে কম মজুরীতে স্ত্রী ও বালক শ্রমিক পাওয়া যায় বলে, আশে-পাশে নানা রকমের হাল্কা কাজের শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হ'য়ে থাকে।

যে জায়গায় আগে থাক্‌তেই অনেকগুলি কারখানা রয়েছে, নূতন কারখানা খোলবার সময় সেই রকম জায়গা বেছে নিলে, নানা রকম আনুষঙ্গিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য তৈরী ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন, মাল আনা নেওয়ার জন্য গরুর গাড়ী বা মোটর লরীর ব্যবস্থা, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ 'ভোল্টেজের' (Voltage) বিদ্যুৎ-শক্তি এবং টেলিফোন; যন্ত্রপাতি মেরামৎ ক'রতে পারে এবং দরকার হ'লে ছোট ছোট অংশ বদ্‌লে দিতে পারে এরকমের কারখানা; যন্ত্র সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারে, এমন যোগ্যতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ; ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, মাল 'বুক' ক'রবার ও খালাস ক'রবার এজেন্ট; বড় বড় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, বিশেষ বাজার, যেমন কল্‌কাতার পাটের বাজার বা বোম্বাইয়ের তুলার বাজার, ইত্যাদি। এই কারণে কোন জায়গা একবার শিল্পাঞ্চলে পরিণত হ'লে, এর স্থায়িত্ব বজায় থাকে, এবং এর পরিধি ক্রমশঃ বাড়্‌তে থাকে।

নবম পরিচ্ছেদ

অতিকায় কারবার—বর্ত্তমান কালে অতিকায় কারবারের প্রাধান্য ও তার কারণ।

আজকালকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই বড় আয়তনের হ'য়ে থাকে, এবং সেগুলি আরও বড় ক'রবার চেষ্টা চলেছে, তাও দেখতে পাওয়া যায়। অনেকখানি ঘেরা জায়গা; তার মধ্যে যন্ত্রপাতি ভরা প্রকাণ্ড বড় বড় ঘর; দুশো, পাঁচশ, হাজার, কি তার চেয়েও বেশী লোক সেখানে কাজ ক'রছে; দেশ বিদেশ থেকে রেলে ও জাহাজে ক'রে গাড়ী গাড়ী কাঁচা মাল সেখানে আনা হচ্ছে; আবার সেই রকম ভাবেই গাড়ী গাড়ী তৈরী মাল সেখান থেকে দূর দূরান্তরে পাঠান হচ্ছে; এই হ'ল আজকালকার কারখানার সাধারণ রূপ। বোম্বাই অঞ্চলের একটা মাঝারী কাপড়ের কলেও অল্পাধিক ৫০,০০০ টাকু ও ১,৫০০ তাঁত থাকে; একটা মাঝারী পাটকলে সাত আটশ' তাঁত থাকে, এক একটা কাগজ তৈরীর কারখানায় ২০।৩০ লক্ষ টাকার মূলধন খাটান হয়; একটা মাঝারী ধরণের ময়দার কলের মূলধন অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা; একটা সিমেণ্টের কারখানায় ৫০ লক্ষ টাকা কি তার চেয়েও বেশী মূলধন খাটে।

আমরা দেখেছি যে কর্ম্ম বিভাগ ও যন্ত্রের ব্যবহারের সাহায্যে শিল্প-জাত দ্রব্যের তৈরী খরচা কমান' যায়। অতিকায় প্রতিষ্ঠানে এই কৌশল প্রয়োগ ক'রবার সুযোগ বেশী পাওয়া যায় বলেই, আজকাল অতিকায় প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য এত বেশী হয়েছে। প্রত্যেক প্রক্রিয়াটির জন্য আলাদা আলাদা বিশেষ যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা পেতে হ'লে, ঐ যন্ত্রটি সমস্ত দিন নিযুক্ত রাখতে পারা চাই। সেইরকম, বেশী মাহিনা দিয়ে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত রাখা সার্থক হয় তখনই, যখন তাকে তার বিশেষ কাজে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখতে পারা যায়। বড় কারবারেই এ রকম করা সম্ভব হয়। কারণ কাজের পরিমাণ খুব বেশী না হ'লে তার প্রত্যেকটি ছোট ছোট প্রক্রিয়া সমস্ত দিন ধরে ক'রবার দরকার হয় না। আবার অনেক সময়ে, যেখানে একই যন্ত্র বিভিন্ন মাপের পাওয়া যায় সেখানে, বড় যন্ত্র ছোট যন্ত্রের চেয়ে, কাজের অনুপাতে, দরে সস্তা পড়ে। একটা ২৪ ঘোঁড়া ইঞ্জিনের দাম, একটা ৮ ঘোঁড়া ইঞ্জিনের দামের তিন গুণের চেয়ে অনেক কম। একটা ৫০০০ টনের জাহাজ তৈরী ক'রতে যে খরচা পড়ে, একটা ১০,০০০ টনের জাহাজ তৈরী ক'রতে, তার দ্বিগুণের চেয়ে কম পড়ে। চল্‌তি খরচার বিষয়েও বড় যন্ত্রের সুবিধা বেশী। একটা ছোট বিদ্যুৎ ঘর (Power House) চালু রাখ্‌তে যে কজন এবং যে রকম যোগ্যতা-সম্পন্ন লোক দরকার

একটি বড় বিদ্যুৎ-ঘর চালু রাখ্‌তেও তাই দরকার, তার চেয়ে বেশী নয়। অতএব এদিক্ দিয়েও বড় কারবারে খরচের সাশ্রয় ঘটে। উপরন্তু, বড় কারবারে এমন কতকগুলি সুবিধার ব্যবস্থা করা যায়, যা ছোট কারবারে পোষায় না। যেমন, কারখানার ভেতরে রেলের লাইন টেনে এনে নিজস্ব আলাদা সাইডিং এর (railway siding) ব্যবস্থা; ইলেক্‌ট্রিক্ ক্রেনের (electric crane) সাহায্যে মাল নাড়াচাড়ার ব্যবস্থা, ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও অনেক দিক্ দিয়ে বড় কারবারে খরচা বাঁচান যায়। মালের পরিমাণ বেশী হওয়ার দরুণ, কাঁচা মাল কেন্‌বার সময় দরে সুবিধা হয়; মাল বেচবার সময়, নানা মাপের এবং নানা ধরণের জিনিষ দিতে পারায়, ভাল খরিদ্দার জোটে; গাড়ী ভাড়া, এজেণ্ট রাখার খরচ, বিজ্ঞাপনের খরচ প্রভৃতি সব দিক্ দিয়েই সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি সুবিধার কথা উল্লেখ করবার আছে। অনেক ব্যবসায়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, কোন একটি পণ্য তৈরী ক'রবার কাজে যে কাঁচা মাল ব্যবহার করা হয়, তার সবটুকু কাজে লাগান যায় না। কিছু অংশ পড়ে থাকে। ছোট কারবারে এই অংশটুকু ফেলে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বড় কারবারে এই ফেল্‌না পদার্থের মোট পরিমাণ যথেষ্ট হওয়াতে, বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা এটিকে কোনও আনুষঙ্গিক পণ্যে (by product) পরিণত করা পোষায়। যেমন, চিনির কলে মাৎ গুড় এবং আকের ডগা ও আকের ছিব্‌ড়ে থেকে 'এ্যালকোহল' (alcohol) এবং অ্যাসেটিক এসিড (acetic acid) তৈরী করা হয়। এ্যালকোহল পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে মোটর চালাবার কাজে ব্যবহার হয়; এ্যাসেটিক এসিড নকল রেশম শিল্পে দরকার হয়। তেমনি বড় সাবানের কারখানায় সাবানের জলীয় তলানিটি ফুটিয়ে শোধন ক'রে, গ্লিসারীন (glycerine) সংগ্রহ করা হয়। গ্লিসারীন নানা ব্যবসায়ে ব্যবহার হয়। এই ধরণের আনুষঙ্গিক পণ্য বিক্রী ক'রে কিছু অর্থাগম হওয়াতে, মুখ্য পণ্যের তৈরী খরচা সেই পরিমাণে কম পড়ে। ফলে, বড় কারবার, ছোট কারবারের চেয়ে কম দরে মাল সরবরাহ ক'রতে সমর্থ হয়।

আমরা দেখেছি, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তৈরী-খরচা কমাবার উপায় হচ্ছে, সমগ্র কাজটিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভাগ করা, এবং প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা, এবং বিশেষ যোগ্যতা-সম্পন্ন লোক নিযুক্ত করা। বড় কারবারে এই কাজ বেশী দূর পর্য্যন্ত করা যায় ব'লেই বড় কারবারে তৈরী-খরচা কম পড়ে। কিন্তু এই ভাবে ব্যয়-সঙ্কোচের একটা সীমা আছে। কাজ ভাগ ক'রতে ক'রতে এমন অবস্থা এসে দাঁড়ায় যখন আর কাজ ভাগ করবার সুযোগ থাকে না। অতএব যে আয়তনে পৌঁছিলে এই অবস্থা হয়, তার চেয়ে আয়তন বাড়িয়ে আর কোন ব্যয়-সঙ্কোচের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়, কারবারের আয়তন তার চেয়েও অনেক বেশী বাড়ান হ'য়ে থাকে। তার কারণ, নির্ম্মাণ-কৌশলের দিক থেকে

ব্যয় সঙ্কোচের সুযোগ ফুরিয়ে গেলেও, তখনও পরিচালনার কাজে কর্ম্ম-বিভাগের দ্বারা ব্যয়-সঙ্কোচের সুযোগ থেকে যায়। ছোট কারবারের মালিককে যেমন কারখানার ভেতরের কাজের তত্ত্বাবধান ক'রতে হয়, তেমনি কাঁচা মাল কেনা, তৈরী মাল বেচা, মূলধন সংগ্রহ করা ও নিয়োগের ব্যবস্থা করা, হিসাব রাখা প্রভৃতি সব কাজই দেখা-শোনা ক'রতে হয়। অংশীদারী কারবারে এই সব কাজ বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া যায়। জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীতে এক এক জন ডিরেক্টর এক একটি কাজের ভার নিতে পারে। এই কাজগুলি পরিপূর্ণ সার্থকতার সঙ্গে ক'রতে হ'লে, প্রত্যেকটির জন্য ঐ কাজে বিশেষ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোক নিযুক্ত করা দরকার। অতিকায় কারবারেই এ ব্যবস্থা সম্ভব। কাজের পরিমাণ খুব বেশী না হ'লে, প্রত্যেকটি কাজের জন্য আলাদা এক এক জন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করে, তাকে এবং তার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সেই বিশেষ কাজে সমস্ত দিন লিপ্ত রাখা যায় না। এবং তা না হ'লে এই রকমের বুদ্ধির কাজে কর্ম্ম-বিভাগের ব্যবস্থা থেকে পূরো উপকার আদায় করা যায় না।

অতিকায় প্রতিষ্ঠানের আর একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, নূতন নূতন পণ্য আবিষ্কার করবার জন্য গবেষণা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রসায়ণ-শিল্পে এই গবেষণার কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এই কাজ সার্থকতার সঙ্গে ক'রতে হ'লে যে বিস্তৃত ও ব্যয়সাধ্য আয়োজনের দরকার তা অতি বড় প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কারও সাধ্যে কুলায় না। প্রকাশ যে 'ইম্পিরিয়ল কেমিক্যাল ইনডাসট্রিস লিমিটেড' এই কাজের জন্য প্রতি বৎসর প্রায় ৭০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করে। *

অতিকায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পেছনে, কোন কোন ক্ষেত্রে, অন্য কারণেরও সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি যে আজকাল, প্রায় প্রত্যেক শিল্পকেই, কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য এবং তৈরী মাল বিক্রয়ের জন্য, অন্য শিল্পের উপর নির্ভর করতে হয়। বাজার যখন মন্দা পড়ে, তখন এই পরনির্ভরতার দরুণ অনেক সময়ে লোকসান বাঁচান দুরূহ হ'য়ে ওঠে। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য, কোন কোন ক্ষেত্রে, বড় বড় প্রতিষ্ঠান আগের এবং পেছনের বিভিন্ন ধাপের এক বা একাধিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আত্মসাৎ ক'রে নিজের কলেবর বৃদ্ধি করে। এই ভাবে কোন একটি পণ্যদ্রব্য তৈরীর বিভিন্ন ধাপের অনেকগুলি বিভিন্ন কারখানা এক কর্তৃত্বাধীনে আসায় প্রতিযোগিতার ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, এবং বাজার মন্দার সময়, লাভ বজায় রাখা ও লোকসান

* In a recent speech at the annual dinner of the Association of British Chemical Manufacturers, Sir Henry Jephcott said.

"At the end of 1948 the chemical Industry was spending upon research and development no less than £ 8,500,000 annually—and let me emphasise, not capital costs, but current out of pocket annual expenditure on research.

বাঁচান সহজসাধ্য হয়। এইভাবে অগ্র-পশ্চাৎ অন্তর্ভুক্তির (Vertical integration) দ্বারা আয়তন বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত লৌহশিল্পে যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। কয়লা তোলা, লৌহ-পিণ্ড তৈরী, ইস্পাত তৈরী, তাই থেকে নানা মাপের চাদর, পাটি প্রভৃতি তৈরী, এমন কি জাহাজ তৈরী, জাহাজ চালান'র ব্যবসা প্রভৃতি নানা রকমের সংশ্লিষ্ট ব্যবসা একই অতিকায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ হিসাবে পরিচালনা করা হয়।

২

আয়তন বড় করার অন্তরায়—ছোট কারবারের সুবিধা।

এতক্ষণ আমরা বড় কারবারের সুবিধাগুলিরই খবর নিচ্ছিলাম। সবই যদি সুবিধা হ'ত, তা হ'লে ছোট কারবারের অস্তিত্ব থাকত না। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে পাই যে বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছোট খাট প্রতিষ্ঠান বেশ জোরের সঙ্গেই টিকে আছে। শুধু তাই নয়; এমন অনেক ব্যবসা আছে যেখানে বড় প্রতিষ্ঠানের মোটেই প্রাধান্য হয় নি। এর কারণ --

১। প্রথমতঃ, কারবারের আয়তন বাড়ান'র সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনার কাজ ক্রমশঃ কঠিন হ'য়ে পড়ে। খুব বড় কারবার সামলাতে পারে এরকম লোক অত্যন্ত বিরল। কার্ণেগী, রক্‌ফেলার, ফোর্ড, লড নাফিল্ড ও জামসেদজী টাটার মত লোক এক আধ জনের বেশী পাওয়া যায় না। এই কারণে বড় কারবারে অনেক সময়ে সুদক্ষ পরিচালনার অভাবে নানা রকমের অব্যবস্থা ও অপচয় ঘটে থাকে। ছোট কারবারের এইখানেই জোর। মালিকের নিরলস সতর্কতার ফলে কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি বা জিনিষের অপচয় ঘটতে পারে না।

২। আয়তন বৃদ্ধির দ্বারা ব্যয়-সঙ্ক্ষেপের সম্ভাবনা থাকলেও, যদি জিনিষটির চাহিদা বিশেষ না থাকে, কিংবা উপযুক্ত রাস্তা বা রেলপথ প্রভৃতির অভাবে দূর দূরান্তরের বাজারে মাল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা না থাকে, তা হ'লে কারখানা বাড়িয়ে কোন লাভ হয় না।

৩। অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়, একত্র সমাবিষ্ট কতকগুলি মাঝারী আকারের প্রতিষ্ঠান, পরস্পরের সহযোগিতার ফলে, অনেকাংশে অতিকায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-সঙ্ক্ষেপের উপায়গুলি কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মাল আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করা, বীমা এবং ঋণের ব্যবস্থা করা, ফেলনা জিনিষ কাজে লাগান, সকলে মিলে কোনও বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪। চাষের কাজে অতিকায় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। অবশ্য যে দেশে জমির অভাব নেই, সে দেশে একলপ্তে অনেকখানি জমি নিয়ে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে গম বা ভুট্টাজাতীয় ফসল খুব কম খরচে ফলান যায়। কিন্তু জমি থেকে সর্ব্বাধিক ফসল তুলতে গেলে, প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের নিজস্ব গুণাগুণ বিচার ক'রে, কি ধরণের চাষ ক'রতে হবে এবং কি ফসল ফলাতে হবে, তা ঠিক ক'রতে হয়। সে জায়গায় বাঁধা ধরা কাজের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া, এবং বহুবিস্তৃত ভূমিতে কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা কোনটাই সম্ভব নয়।

৫। অন্যান্য ক্ষেত্রেও, যেখানে গঠন ও প্রকৃতির দিক্ দিয়ে, কাঁচামাল সব সময়ে ঠিক এক ধরণের পাওয়া যায় না, সেখানে কারখানার কাজের ধারার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচি তৈরী করা চলে না, এবং সেই কারণে অতিকায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয়সঙ্কোচের উপায়গুলি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা চলে না।

৬। চারু-শিল্পের কাজে অতিকায় প্রতিষ্ঠানের স্থান নগণ্য। কারণ, এখানে জিনিষের কদর নির্ভর করে প্রধানতঃ শিল্পীর প্রতিভা, শিক্ষা ও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপর।

৭। অতিকায় প্রতিষ্ঠানে হুবহু এক ছাঁচের জিনিষ বিপুল পরিমাণে তৈরী হ'তে পারে। অতএব যেখানে ব্যক্তিগত রুচি বা প্রয়োজন মেটাবার দরকার, সেখানে ছোট কারবারেরই সুবিধা বেশী ; যেমন, পায়ের মাপে জুতা, কিংবা গায়ের মাপে পোষাক পরিচ্ছদ।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রম-বিভাগের কুফল

আমরা দেখেছি, আজকের দিনে যে নানা বিচিত্র রকমের ভোগ্য বস্তু এত বিপুল পরিমাণে তৈরী হচ্ছে, তার পেছনে রয়েছে কল কারখানায় কাজ ভাগ ক'রে দেওয়ার নীতির প্রয়োগ। যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের একত্র সমাবেশ, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা, প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে এই শ্রমবিভাগ নীতিকেই উত্তরোত্তর বেশী কার্য্যকরী করা হয়েছে। এতে ক'রে যে কতখানি উপকার হয়েছে তা শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এসব জায়গায় নানা রকমের ভোগ্য বস্তু বিপুল পরিমাণে তৈরী হচ্ছে; লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে, এবং সাধারণ লোকের জীবন যাত্রার মান আগেকার তুলনায় বহুগুণ উন্নত হয়েছে। কিন্তু সবটাই সুফল হয়নি। কতকগুলি কুফলও দেখা দিয়েছে। তবে আশ্বাসের কথা এই যে, আইন কানুন ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তনের দ্বারা এগুলি দূর করা অসম্ভব নয়। সে চেষ্টা অনেক দেশেই অল্প-বিস্তর চলছে, এবং অনেকাংশে ফলবতীও হয়েছে।

১। যন্ত্রযুগের প্রথম দিকটায় বিলাতে এবং অন্যান্য জায়গায় কারখানার শ্রমিকদের দুর্গতির সীমা ছিল না। বহুক্ষণ ধ'রে অত্যধিক পরিশ্রম, যৎসামান্য মজুরী, অল্পপরিসর এবং অস্বাস্থ্যকর ঘরে কাজ, ৬।৭ বৎসরের ছেলেদেরও কারখানায় খাটান, এবং তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার, বিনা দোষে বা সামান্য দোষে কর্ম্মচ্যুতি, যন্ত্রের আঘাতে শ্রমিকের প্রাণহানি বা অঙ্গহানি, এসব দুর্ভোগ তখন কারখানার কাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। কার্ল মার্কস্ তাঁর লেখায়, এই ধরণের নানা রকমের অনাচারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। শ্রমিককে দেখা হ'ত শুধু বিত্ত-সৃষ্টির উপায় হিসাবে। বিত্তসৃষ্টির প্রকৃত সার্থকতা যে সাধারণ মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা, এ সহজ কথাটা যেমন মালিক, তেমনি সরকার ও জনসাধারণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রত। *

---

* কার্ল মার্কস্ যে সময়ে 'ক্যাপিট্যাল' (Capital) নামে তাঁর বিখ্যাত বইখানি লিখেছিলেন, তখনও আইন কানুনের সাহায্যে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি; এবং শ্রমিকরাও ট্রেড ইউনিয়নের সাহায্যে সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষা ক'রতে শেখেনি। তিনি চারিদিকে শ্রমিকদের দৈন্য ও দুর্দ্দশা দেখে মর্ম্মাহত হয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, শিল্প-বাণিজ্যে ব্যক্তিগত অধিকার বজায় থাকলে যন্ত্র-শিল্পের পরিবেশে শ্রমিকদের দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। তিনি লিখেছিলেন—

'Within the capitalist system... ....all means for the development of production transform themselves into means for domination over and exploita-

এখন আর এ অবস্থা নেই। এখন, প্রায় সব দেশেই, আইন কানুনের দ্বারা কারখানা চালানর কাজে মালিককে নানা রকমের বিধি নিষেধ পালন ক'রতে বাধ্য করা হয়েছে। শ্রমিকেরা শ্রমিকসঙ্ঘ (Trade Union) গ'ড়ে একজোটে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি আদায় ক'রতে শিখেছে। তা ছাড়া, বেকার-বীমার (Unemployment Insurance) দ্বারা শ্রমিকেরা সাময়িক ভাবে বেকার হ'য়ে প'ড়লে তাদের যাতে না বিশেষ দুর্ভোগ ভুগিতে হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুড়ো বয়সে, কাজে অক্ষম হ'লে তাদের পেন্সনের ব্যবস্থা হয়েছে। তারপর, সরকারী খরচায় ও সরকারী তত্ত্বাবধানে ছেলে-মেয়েদেয় শিক্ষা, রোগীর চিকিৎসা প্রভৃতি নানা ভাবে শ্রমিকদের সুবিধা করবার চেষ্টা চল্‌ছে।

শ্রম-বিভাগের অন্যান্য কুফলগুলির প্রতিকার আরও শক্ত।

২। আগেকার কালে কারুশিল্পীরা ধীরে সুস্থে কাজ ক'রত। তাদের কাজে একটা আনন্দও ছিল। একটা গোটা জিনিষ, গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত, নিজের হাতে গ'ড়ে তোলায় একটা আত্মপ্রসাদ আছে। এখনকার কলের কারিগরদের সর্ব্বদা তটস্থ হ'য়ে থাক্‌তে হয়। অতি দ্রুতগতিতে কাজ চলেছে; চারিদিকে ভারী ভারী যন্ত্রের আওয়াজ; পাছে দুর্ঘটনা ঘটে, তার জন্য নিরলস সতর্কতা; এতে ক'রে শরীর ও মন অত্যন্ত বেশী, এবং অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। কাজও একঘেয়ে। সমগ্র কাজটির একটি ক্ষুদ্র অংশ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ক'রে যেতে হয়। এতে মনের কোন খোরাক জোটে না। তাই কাজ আজকাল আগেকার চেয়ে অনেক ক্লেশকর। এতে শরীর ও মনের অবসাদ হয় ঢের বেশী। তাই দেখতে পাওয়া যায়, কলের মজুররা উত্তেজনা খুঁজে বেড়ায়, এবং নেশা করা, জুয়া খেলা প্রভৃতি কদভ্যাসের দাস হ'য়ে পড়ে। এর উচিতমত প্রতিকার ক'রতে হ'লে, প্রথমে দরকার কাজের সময় কমিয়ে বেশী অবসরের ব্যবস্থা করা। আর

---

tion of the producers; they mutilate the labourer into a fragment of a man, degrade him to the level of an appendage of a machine, destroy every remnant, of charm in his work, and turn it into a hated toil: they estrange from him the intellectual potentialities of the labour process in the same proportion as science is incorporated in it as an independent power; they distort the conditions under which he works, subject him during the labour process to a despotism the more hateful for its meanness.

They transform his life-time into working time, and drag his wife and child beneath the wheels of the juggernath of capital...............

Accumulation of wealth at one pole is therefore at the same time, accumulation of misery, agony of toil, slavery, ignorance, brutality, mental degradation, at the opposite pole, i. e. on the side of the class that produces its own product in the form of capital.

দরকার, এই অবসর সময়ে নির্দ্দোষ ক্রীড়া কৌতুকের দ্বারা অঙ্গ-সঞ্চালন ও চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করা, এবং সহজ ও মনোগ্রাহী উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩। আগেকার দিনের কারুশিল্পী স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন ক'রত। তাতে তার আত্মমর্য্যাদাবোধ বজায় থাকত। নিজেই ব্যবসায়ের মালিক হওয়াতে, কাঁচা মাল কেনা, কি ভাবে ও কি ধরণের মাল তৈরী হবে তা স্থির করা, মাল বিক্রী করা, হিসাব রাখা প্রভৃতি যাবতীয় পরিচালনার কাজ তাকেই ক'রতে হ'ত। ফলে রোজকার কাজের মধ্য দিয়েই তার বুদ্ধি বৃত্তি ও বিচার-শক্তির অল্পবিস্তর অনুশীলন হ'ত। এতে চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। আজকালকার কারখানার কারিগরদের অবস্থা অন্য রকম। পরের চাকুরী ক'রলে, মনের দৈন্য অবশ্যম্ভাবী। তারপর, রোজ সে যে কাজ করে, তার প্রত্যেক খুঁটিনাটিটি পর্য্যন্ত উপর-অলার নির্দ্দেশ মত বাঁধাধরা নিয়ম অনুযায়ী ক'রতে হয়। নিজের দায়িত্বে এতটুকু কাজ ক'রবার সুযোগ তার হয় না। যাকে সর্ব্বক্ষণ যন্ত্রের মত ব্যবহার করা হয়, তার যন্ত্রের মত জড়-প্রকৃতি হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থা, স্বাধীনচেতা, আত্মপ্রত্যয়শীল জাতি গ'ড়ে তোলার কাজের অনুকূল নয়। ভরসা এই যে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ ক'রতে হয় বলে, এখনকার কারিগরদের আগেকার চেয়ে বেশী বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। আর, কারখানাগুলি অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় সহরে বা তার আশে-পাশে স্থাপন করা হয় বলে, শ্রমিকেরা কর্ম্মব্যস্ত বহুবিচিত্র নগরজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়। এতে মানুষকে চালাক চতুর করে।

৪। কারিগরদের আরও একটি অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। প্রত্যেককেই কোন না কোন শিল্পের সমগ্র কাজের একটি সঙ্কীর্ণ অংশ সম্বন্ধে বিশেষ যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রতে হয়। ফলে কোন কারণে বেকার হ'য়ে পড়লে, ঠিক তার উপযুক্ত কাজ আবার যোগাড় করা শক্ত হয়। এবং অন্য কাজ ক'রতে গেলে, তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অনুপাতে অনেক কম মাহিনাতে সন্তুষ্ট হ'তে হয়।

কারিগরদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে, দেশের শিল্পোন্নতির পথেও একটি বাধার সৃষ্টি হয়েছে। বিলাতের মত শিল্পোন্নত দেশের শিল্প-পতিরাও অভিযোগ করেন যে অনেক সময়ে নূতন আবিস্কৃত সুক্ষ্ম যন্ত্র চালাবার উপযুক্ত লোকের অভাবে নূতন নূতন যন্ত্র এবং বেশী কার্য্যকর নির্ম্মান-কৌশল কাজে লাগাতে অসুবিধা হয়। এর প্রতিকার হচ্ছে, কারিগরদের সমগ্রভাবে যন্ত্র-বিদ্যা শেখাবার সুবন্দোবস্ত করা। হয় সরকারী চেষ্টায়, না হয় শিল্প-পতিদের সমবেত চেষ্টায় ভাল ভাল "টেক্‌নিক্যাল স্কুলের" (Technical School) ব্যবস্থা করা, দেশের শিল্পোন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিত্ত-সৃষ্টির ব্যবস্থা—বণিক্ ও শিল্পপতি

(১)

বণিকের কাজ

বণিকের কাজ হচ্ছে, বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা। প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যে মাল মশলা, যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার হয়, সেগুলি অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কারখানার মালিক বা কোন নিযুক্ত ব্যক্তি, খোঁজ খবর ক'রে, যেখানে যেটি পাওয়া যায় সেখান থেকে সেটি সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করে। এবং যে সব মাল তৈরী হ'ল সেগুলি, বিজ্ঞাপন মারফৎ ও দালাল পাঠিয়ে খরিদ্দার ঠিক্ ক'রে, বিক্রয় করার ব্যবস্থা করে। কিন্তু, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে; এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে বণিক্-সম্প্রদায়। তারাই, কোথায় কোন্ জিনিষ কি পরিমাণে এবং কত দামে পাওয়া যায়, এবং কোথায় কোন্ জিনিষ কি পরিমাণে এবং কত দামে দরকার, প্রতিনিয়ত তার খবর রাখে; যোগানদারের এজেন্সী নিয়ে তার মাল কাটাবার দায়িত্ব নেয়; খরিদ্দারের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে তাকে মাল সররাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করে; এবং নিজেরাই নানা রকমের মাল কিনে মজুত ক'রে, দোকান সাজিয়ে ব'সে, জনসাধারণকে প্রয়োজন ও অভিরুচি মত জিনিষ কেন্‌বার সুযোগ দেয়।

এখানেও দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে আধুনিক কালের কৌশল প্রয়োগ দ্বারা জিনিষপত্র তৈরীর ব্যবস্থা চালু রাখ্‌তে হ'লে, বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে যোগাযোগ রাখা অবশ্যপ্রয়োজনীয়, সেই কাজের ভার কর্ম্ম-বিভাগ-নীতির অনুসরণেই, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হাতে এসে পড়েছে। এই ব্যবস্থাতেই এই কাজ সবচেয়ে সুশৃঙ্খলায় ও কম খরচে হয়ে থাকে।

বণিকেরা এই কাজের দ্বারা তাদের জীবিকা উপার্জ্জন করে। দোকানদার, খরিদ্দারের কাছ থেকে কেনা দামের চেয়ে বেশী দাম আদায় করে ব'লে, কেউ কেউ তাদের দোষ ধরেন। এতে কিন্তু তাদের ওপর অবিচার করা হয়। তারা যে কাজ করে তার প্রয়োজন রয়েছে। কেউ যদি এ কাজ না কর্‌ত তা' হ'লে, আমরা যে সব জিনিষ ব্যবহার করায় অভ্যস্ত, তার বেশীর ভাগ জিনিষই পেতে পার্‌তাম না। একটি ছাতার দরকার হ'লে, দোকানে গেলেই নানা রকমের ছাতা সাজান রয়েছে, দেখ্‌তে পাই। তার মধ্যে থেকে

পছন্দ ও সামর্থ্য মত বেছে একটি কিন্‌তে পারি। যেটি কিন্‌লাম সেটির বাঁট এসেছে হয়ত সিঙ্গাপুর থেকে ; শিক্‌গুলো তৈরী হয়েছে, জাপানে ; কাপড়টা তৈরী হয়েছে, ইটালীতে ; এবং অন্য কল কব্জা বিলাতে। এইগুলি সংগ্রহ ক'রে, একত্র ক'রে, কলকাতার এক কারখানায় ছাতাটি প্রস্তুত হয়েছে। প্রত্যেক পদে পদে বণিকেরা, এই আনা নেওয়া সংগ্রহ করা ও মজুত রাখার কাজ করেছে বলেই, আমার ছাতা পাওয়াটা সম্ভব হয়েছে, এবং যারা এর বিভিন্ন অংশগুলি তৈরী করেছে, তাদেরও খরিদ্দার পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই কাজে, বণিকেরা পরিশ্রম করেছে, টাকা খাটিয়েছে, এবং লোকসানের ঝুঁকি নিয়েছে। এই উপকারের মুল্য স্বরূপ, কেনা দামের চেয়ে বেশী দামে বিক্রী ক'বে তারা একটি লাভ আদায় করে। এতে অন্যায় কিছু নেই।

অবশ্য, যদি বণিকেরা এক জোট হ'য়ে একচেটিয়া কারবাব ক'রে অত্যধিক লাভ করে, তা' হ'লে সেটা দূষণীয়। বণিক্‌দের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা না থাক্‌লে জনসাধারণের স্বার্থ বজায় থাকে না। অতএব এমন আইন কানুন ও সমাজ ব্যবস্থা দরকার যে, বণিকেরা যেন একচেটিয়া কারবার না কর্‌তে পারে।

বণিক্‌দের কাজের দ্বারা আরও একটি উপকার সাধিত হয়। তারা, যেখানে যে জিনিষ সবচেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে সস্তায় তৈরী হয়, সেইখান থেকে সেই জিনিষ কিনে, যেখানে সবচেয়ে বেশী দাম পাওয়া যায়, অর্থাৎ যেখানে অভাব সবচেয়ে বেশী, সেইখানে বিক্রী করে। কারণ, এতেই তাদের সবচেয়ে বেশী লাভ হ'বার সম্ভাবনা। ফলে, যেখানে যে জিনিষ তৈরী করবার সুযোগ সবচেয়ে বেশী সেখানে সে জিনিষের কাট্‌তি বাড়ে, এবং বেশী বেশী তৈরী হ'তে থাকে। অন্যপক্ষে যেখানে সুযোগ কম, সেখানে তৈরী খরচা বেশী পড়ে, এবং বেশী দামে বিক্রী না ক'রলে পোষায় না। তাতে কাটতি কমে, এবং সেই জিনিষ সেখানে তৈরী করা ক্রমশঃ বন্ধ হ'তে থাকে। এই ভাবে বণিক্‌দের কাজের ফ.ল, দেশের প্রাকৃতিক সুযোগ ও শ্রমশক্তির সবচেয়ে কার্য্যকর প্রয়োগ হ'য়ে থাকে। অবশ্য, দেশের উপকার ক'রব মনে ক'রে বণিকেরা ব্যবসা করে না। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের লোভেতেই বেচা কেনা করে। তাদের কাজের যে এ রকম সুদূরপ্রসারী ফল হয়, সে বিষয়ে তারা সচেতনও নয়। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত লাভ ক'রবার সুযোগ থাকার দরুণই দেশের এই মঙ্গলটি সাধিত হয়।

(২)

শিল্প-পতির কাজ।

দেশের বৈষয়িক জীবনে, বণিক্‌দের মত, শিল্পপতিদেরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তারাই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি পত্তন করে, এবং পরিচালনা করে। এ কাজ যে সে পারে

না। বিশেষতঃ, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার কাজে যে যোগ্যতার দরকার, তা' কম লোকেরই থাকে। কোন একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান কি ভাবে পত্তন হয়েছিল খোঁজ নিলেই দেখা যাবে যে, একজন বিচক্ষণ দুরদর্শী লোক, উদ্যোগী হ'য়ে এবং লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে, এই কাজে হাত দিয়েছিল; এবং তারই উদ্যমে ও কর্ম্ম-তৎপরতায় প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে উঠেছে। পত্তনকারীদের (Entrepreneur) কি ধরণের কাজ ক'রতে হয়, চিন্তা ক'রলেই তাদের কাজের গুরুত্ব বোঝা যায়। একটি নূতন কারখানা পত্তন করবার আগে দেখা দরকার, যে জিনিষ তৈরী হবে তার বাজার কি রকম, এবং যে দামে বিক্রী হ'বার সম্ভাবনা, তাতে খরচা পুষিয়ে উচিৎ পরিমাণে লাভ থাকবে কি না। নানা রকম খুঁটিনাটি হিসাব ক'রে লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর, প্রয়োজন মত মূলধন সংগ্রহ ক'রতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের সুবিধা অসুবিধা বিচার ক'রে, কারখানার স্থান নির্ব্বাচন ক'রতে হয়, এবং বাড়ী তৈরীর ব্যবস্থা ক'রতে হয়। তারপর, বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি কেনা, এবং ঠিকমত সাজিয়ে বসানর ব্যবস্থা করা, সুযোগ্য লোকজন নিযুক্ত করা, মালপত্র আনানেওয়ার ব্যবস্থা করা, আফিস খোলা, বিক্রীর ব্যবস্থা করা প্রভৃতি, কারবারটিকে সফল করবার জন্য যা কিছু আবশ্যক, সবই তাদের ক'রতে হয়। চালু কারবারের দৈনন্দিন পরিচালনার কাজও কম গুরুত্ব-পূর্ণ নয়। বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতির সাহায্যে, নানা রকমের বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের দ্বারা সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চালান, কাঁচা মালের বাজার এবং তৈরী মালের বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, চাহিদার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাল তৈরীর ও মাল সরবরাহের আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন সাধন করা, নির্ম্মাণকৌশলের উন্নতির জন্য নানা রকমের পরীক্ষা চালান, হিসাব রাখা, টাকা আদায় করা, চল্‌তি খরচার মূলধন সংগ্রহ করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ঠিক্ মত ক'রতে হ'লে যথেষ্ট যোগ্যতার প্রয়োজন।

দেশের শিল্প-বাণিজ্য যদি সুযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে থাকে, তবেই সর্ব্বাধিক পরিমাণে ধনসম্পদ তৈরী সম্ভব হয়। আর যদি এই কাজ অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে এসে পড়ে, তা হ'লে দেশের মূলধন ও শ্রমশক্তির অপচয় অবশ্যম্ভাবী।

এই সম্পর্কে সরকারের পক্ষে কি নীতি অবলম্বন ক'রলে দেশের সবচেয়ে কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার উপর নির্ভর ক'রলেই সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। সোস্থালিষ্টরা বলেন যে দেশের বৈষয়িক জীবন, সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী ও সরকারী পরিচালনার অধীনে, গ'ড়ে তোলা দরকার। অন্য অনেকে, দেশ কাল ও বিষয় ভেদে কোথাও প্রথমোক্ত ও কোথাও শেষোক্ত নীতির পক্ষপাতী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈষয়িক জীবনে স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ থাকার ফলাফল।

(১)

ঊনবিংশ শতাব্দিতে এই নীতির অসামান্য সাফল্য

স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ থাকার অর্থ, প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে কোন ন্যায-সঙ্গত উপায় ও কৌশল অবলম্বন ক'রবার অধিকার থাকা, এবং এই সম্পর্কে কাহারও কার্য্যকলাপের উপর আইনগত বা সরকারী হস্তক্ষেপ দ্বারা কোন রকম বাধা নিষেধ আরোপ না করা। ঊনবিংশ শতাব্দিতে এবং বিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে, বিলাতে এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য স্থানে এবং উত্তর আমেরিকায মোটামুটি এই নীতি প্রচলিত ছিল। এই, মাত্র কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসরের মধ্যে, ঐ সব দেশে মানুষেরা যে পরিমাণ উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ও কর্ম্মতৎপরতা প্রকাশ ক'রেছে, তা মনে ক'রলে ঐ নীতির সার্থকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। রেলগাড়ী, ষ্টীমার, মোটরগাড়ী, গ্রামোফোন, ফটোগ্রাফ, সিনেমা; টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, ইলেকট্রিক্ বাতি ও পাখা এবং বিদ্যুচ্চালিত নানা রকমের যন্ত্র, 'সাবমেরিন,' 'এযারোপ্লেন' প্রভৃতি মানুষের সব অদ্ভুত কীর্ত্তি এই সময়টিতেই হযেছে। অসংখ্য রকমের ভোগ্য বস্তু বিপুল পরিমাণে তৈরী হযেছে, নিত্য নব নব যন্ত্র ও নির্ম্মাণকৌশল আবিষ্কার ক'রে কাজে লাগান হযেছে, সাগরপারের লোকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা চলছে, এখন আবার টেলিভিসান যন্ত্রের সাহায্যে পরস্পরকে দেখাও যাচ্ছে; ঘণ্টায ৮০ মাইল দৌড়ের রেলগাড়ী চলছে ও ৫০০ মাইল দৌড়ের এযারোপ্লেন চলেছে, মাটির তলার তল থেকে নানা রকমের সুগন্ধ ও নানা রকমের রঙ্ঝকে পাকা রং তৈরী হচ্ছে; নানা রকমের ফেলনা জিনিষ কাজে লাগিযে প্লাষ্টিক (plastics) শিল্প গ'ড়ে উঠেছে; কৃত্রিম রেশম ও রবার তৈরী হচ্ছে, এই রকম আরও কত কি! সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাযগার সঙ্গে প্রত্যেক জাযগার ব্যবসা বানিজ্যের যোগাযোগ স্থাপিত হযেছে; এবং বিপুল পরিমাণে পণ্যদ্রব্য আদান প্রদান চলেছে। বস্তুতঃ এই সমযের মানুষের সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবলে বিস্মযে অভিভূত হ'তে হয। এ সবই স্বাধীন চেষ্টার নীতির আওতায ঘটেছে।

(২)

এই নীতির সপক্ষে যুক্তি

এই নীতির সপক্ষে প্রধান যুক্তি হ'ল এই যে, এতে ক'রে দেশের ধনসম্পদ্ সবচেয়ে

বেশী বাড়্বার সম্ভাবনা। প্রত্যেক লোককে স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ দিলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হয়। প্রত্যেকেই স্বভাব-ধর্ম্মের প্রেরণায় সর্ব্বাধিক পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন ক'রবার চেষ্টা ক'রবে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বেশী লাভ ক'রবার একটি মাত্র উপায় আছে—কম দামে ভাল জিনিস বা বেশী কাজ দেওয়া। প্রত্যেকেই যথাসাধ্য পরিশ্রম ক'রবে, বুদ্ধি খাটাবে, এবং প্রাকৃতিক সুযোগ কাজে লাগাবার চেষ্টা ক'রবে। হাজার হাজার লোকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টার ফলে নূতন নূতন শ্রম-সঞ্চয়ী যন্ত্র উদ্ভাবিত হবে; কাঁচা মালের নূতন নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হবে; এবং পণ্য নির্ম্মাণের উপায় ও কৌশলের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হবে। ফলে, দেশের শ্রী ও সম্পদ্, বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে ক্রমশঃই বাড়তে থাকবে। যে, কোন কারবার গ'ড়ে তুল্বে, বা চালাবে, তাকে তার লোকসানের ঝুঁকি নিতে হবে। ব্যবসায়ে লাভ হ'লে, যেমন সমস্ত লাভটি তার প্রাপ্য হবে, তেমনি লোকসান হ'লে সে লোকসান তাকেই বহন ক'র্তে হবে। লোকসানের ভিতর দিয়ে অযোগ্য শিল্প-পতিরা আপনা আপনি বাতিল হ'য়ে যাবে, এবং দেশের বৈষয়িক জীবনের কর্ত্তৃত্বের ভার প্রধানতঃ সুযোগ্য ব্যক্তিদের হাতেই এসে পড়বে। ফলে, দেশের প্রাকৃতিক সুযোগ, শ্রমশক্তি ও মূলধনের সবচেয়ে কার্য্যকর ব্যবহার হবে।

(৩)

বর্ত্তমান কালে এই নীতির আংশিক বিফলতা ও তার কারণ।

শতাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে, স্বাধীন চেষ্টার নীতির এখন কতকগুলি গুরুতর গলদ্ চোখে পড়েছে।

১। একটি নূতন ব্যবসায় গ'ড়ে তুল্তে অবশ্য উঁচু দরের যোগ্যতা দরকার হয়। কিন্তু একটি চালু কারবার কোন রকমে বজায় রাখতে বিশেষ যোগ্যতার আবশ্যক হয় না। যারা উত্তরাধিকার-স্বত্বে ব্যবসায় পরিচালনা ক'রবার ক্ষমতা পায়, তারা অনেক সময়ে অত্যন্ত সাধারণ যোগ্যতার লোক। এই সব ব্যবসায় যদি সত্যকারের যোগ্যতা-সম্পন্ন লোকের হাতে থাকৃত, তা হ'লে এই ব্যবসায়গুলির আরও অনেক উন্নতি হ'তে পারত; এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও ঢের বেশী উপকার হ'ত।

২। কোন কারবারের পরিচালনার ভার যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে এসে পড়ে, তখন সেই কারবারে লোকসান হ'তে থাকে; এবং ফলে সেই কারবার দেউলে হ'য়ে উঠে যায়। কিন্তু একটি কারবার উঠে গেলে শুধু যে মালিকের ক্ষতি হয়, তা নয়; অন্য অনেক লোক, যারা এই কারবারের সম্পর্কে থেকে জীবিকা উপার্জ্জন ক'রত, তাদেরও সর্ব্বনাশ হয়। অযোগ্য পরিচালককে কর্ত্তৃত্বের আসন থেকে সরাবার আরও কম ক্ষতিকর ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৩। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগ থেকে একচেটিয়া কারবারের প্রাধান্য ক্রমশঃ অতিমাত্রায় বেড়ে উঠেছে। কতকগুলি ধনী ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে, এক একটি ব্যবসায়ে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা মালের যোগান কমিয়ে এবং দর বাড়িয়ে অতিরিক্ত লাভ আদায় করে। কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী উঠ্‌লে, দর অসম্ভব কমিয়ে দিয়ে তার বাজার নষ্ট ক'রে দেয়, এবং সে বিদায় হ'লে, আবার দর চড়িয়ে লোকসান পুষিয়ে নেয়। খরিদ্দারদের নিরুপায় হয়ে বেশী দাম দিতে হয়। অনেক সময়ে কোন নূতন যন্ত্র বা কৌশল উদ্ভাবিত হ'লে, তার পেটেন্ট কিনে নেয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা সেগুলি নিজেরাও কাজে লাগায় না, অপরকেও কাজে লাগাতে দেয় না। এই ভাবে তারা শিল্পের উন্নতির পথেও বাধা সৃষ্টি করে। একচেটিয়া কারবারীদের দৌরাত্ম্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত বা বিলুপ্ত হওয়ায়, স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ দেবার নীতি আজ কাল অনেকাংশে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। এ নীতি সার্থক ক'রতে হ'লে, এক-চেটিয়া কারবারের মূলোচ্ছেদ করা দরকার। সে কাজ সহজ নয়। আমেরিকাতে আইন ক'রে বড় বড় 'ট্রাষ্ট' (Trust) গুলি ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা বিফল হয়েছে। বোধ হয় এ পাপ নিবারণ কর্‌বার একমাত্র উপায় হচ্ছে, কাউকে খুব ধনী হতে না দেওয়া। অতিলাভের উপর খুব বেশী হারে কর ধার্য্য ক'রে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বড় বড় সম্পত্তির বেশীর ভাগ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে, এ কাজ করা যায়।

৪। স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ দেওয়ার নীতির সুফল আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এতে ক'রে দেশের শ্রমশক্তি ও মূলধনের সবচেয়ে কার্য্যকর ব্যবহার হয়। এ মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি হ'ল এই যে, দেশে যে জিনিষের অভাব যত বেশী হবে, তৈরী-খরচার অনুপাতে সে জিনিষের বাজার দর তত বেশী হবে, অর্থাৎ সে ব্যবসায়ে লাভ তত বেশী হবে। বেশী লাভের লোভে শিল্প-পতিরা সেই ব্যবসায়ে তত বেশী শ্রম-

President Truman (U. S A.) in his annual State of Union Message stated in 1950—

"Compared with 50 years ago the population of U. S. A. had doubled, and our national production has risen from about $ 50 billion in terms of to-days' prices to the staggering figure of $ 255 billion a year."

"As our national production increases...the number of independent and competing enterprise should also increase."

"If the number does not increase, our constantly growing economy, will fall under the control a few dominant economic groups whose powers will be so great that they will be a challenge to democratic institutions.'

"To avoid this danger we must curb monopoly and provide aids to independent business so that it may have the credit and capital to compete in a system of free enterprise."

শক্তি ও মূলধন নিয়োগ ক'রবে। ফলে সবচেয়ে বেশী অভাব যে জিনিষের, সেই জিনিষ বেশী পরিমাণে তৈরী ক'রবার চেষ্টা আগে হবে। এইভাবে, নিয়োগযোগ্য মূলধন ও শ্রমশক্তির সাহায্যে দেশের সবচেয়ে মঙ্গল সাধিত হবে। এ যুক্তি মোটামুটি ঠিক্ হ'লেও এর মধ্যে একটু গলদ্ আছে। টাকার মাপে, ধনী ও দরিদ্রের অভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব তুলনা করা চলে না। এক জন গরীব লোক যে পরিমাণ উপকারের প্রত্যাশায় এক টাকা খরচ ক'রতে রাজী হবে, একজন বড়মানুষ তার চেয়ে ঢের কম উপকার পাবার জন্য এক টাকার বেশী খরচ ক'রবে। ধনীর বিলাসের সামগ্রীর যোগান বাড়ানর আগে যদি গরীবের অত্যাবশ্যক জিনিসের যোগান বাড়ান' যায়, তবেই দেশের কল্যাণ বেশী হয়। কিন্তু এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে, একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন ও শ্রমশক্তি যদি ধনীর বিলাসের সামগ্রী তৈরী ক'রবার কাজে লাগান যায়, তাতে শিল্পপতিদের যে লাভ হবে, গরীবের অত্যাবশ্যক জিনিসের যোগান বাড়াবার কাজে লাগালে সে লাভ হবে না। শিল্প-পতিরা টাকার অঙ্কেই লাভের হিসাব ক'রবে। সে টাকা গরীবের রক্ত জল করা টাকা, কি ধনকুবেরের কানাকড়ি পাওয়া টাকা, সে খোঁজ তারা ক'রবে না। অতএব দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে, শিল্পপতিদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে দেশের সমগ্র স্বার্থের বিরোধ থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। দেশে বেশী রকম ধন বৈষম্য থাক্‌লে, স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ দেওয়ার নীতি থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(১)

'মূলধন' শব্দের অর্থ।

এখনকার দিনের শিল্প-কৌশল ও ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা চিন্তা ক'রলেই দেশে মূলধন থাকা যে কত দরকার তা' সহজেই বোঝা যায়। যে দেশের মূলধনের পরিমাণ যত বেশী সে দেশে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশী। মূলধন ব'লতে, দেশের ধন-সম্পদের একটি অংশকে বোঝায়। দেশের ধনসম্পদের মধ্যে কতকগুলি হ'ল সদ্যভোগ্য সামগ্রী। আর কতকগুলি নূতন ধনসম্পদ তৈরীর কাজে লাগে, কিংবা অন্যভাবে মানুষের অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টার সহায় হিসাবে ব্যবহার হয়। এই শেষোক্ত অংশটি দেশের মূলধন। আপাতদৃষ্টিতে সদ্যভোগ্য সামগ্রী ও মূলধনী সামগ্রীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট বোধ হ'লেও, সূক্ষ্ম বিচার ক'রতে গেলে অনেক সময়ে এই প্রভেদ ধরা শক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে দেশের মূলধন (Social Capital) বলতে ঠিক কি বোঝা উচিৎ এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

যদি মূলধনের অর্থ-নির্দ্দেশ এইভাবে করা যায় যে, দেশের ধনসম্পদের যে অংশ সদ্যভোগ্য নয়, সেই অংশ মূলধন, তা' হ'লে নেতিবাচক হ'লেও একটি সুস্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। ধন-সম্পদের অন্তর্গত করায় বুঝতে হবে যে, এই সব সামগ্রী মানুষের চেষ্টার ফল, এবং এগুলি মানুষের কাজে লাগে। সদ্যভোগ্য নয় বলাতে এই বুঝতে হবে যে, এগুলির ব্যবহারে তখনি তখনি কোন তৃপ্তি পাওয়া যায় না; তবে এগুলি ব্যবহার করার ফলে, পরে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, এগুলি ব্যবহার না ক'রলে সেই রকমের বা ততটা তৃপ্তি পাওয়া যায় না। অতএব মূলধনের ধারণার মধ্যে দুটি ভাবের সমাবেশ রয়েছে। একটি, উৎপাদন-ক্ষমতা; অন্যটি ভবিষ্য-সূচনা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে মূলধনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—কারখানার বাড়ী ও যন্ত্রপাতি, মাল আনা নেওয়ার জন্য গরুর গাড়ী, মোটর লরী ও পাকা রাস্তা; রেলগাড়ী ও রেলপথ, মালবাহী জাহাজ ও জাহাজ লাগাবার ডক্; চাষের জমিতে জল-সেচের জন্য কাটা খাল, কয়লার খনির ভেতর থেকে কয়লা তোলবার জন্য গর্ত্ত ও খনির ভেতরের সুড়ঙ্গ কাটা পথ ইত্যাদি। এগুলি যে স্পষ্টই দেশের মূলধনের সামিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হবার কথা নয়। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার ক'রলে দেখা যায় যে এর মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি, নিতান্তই যে গৌণভোগ্য, এবং কোন সময়েই সদ্যভোগ্য নয়,

তা বলা চলে না। যে রাস্তা দিয়ে মোটর-লরী যোগে মাল চলাচল হয়, সেই রাস্তাতে মোটরগাড়ী চ'ড়ে লোকে বিলাস ভ্রমণেও বেরোয়, পার্সেল্ এক্সপ্রেসের বেশীর ভাগ গাড়ীতে পার্সেল বহা হ'লেও খানকতক যাত্রীবাহী গাড়ীও থাকে, এবং সে গাড়ী চ'ড়ে লোকে হাওয়া খেতে বিদেশেও যায়। মালবাহী জাহাজে লোকে সমুদ্র ভ্রমণেও যায়, জলসেচের খালে লোকে নৌকা বিহারও করে, এবং ছিপ দিয়ে মাছ ধরার সখও মেটায়। অতএব এই সব জিনিষ কোন সময়ে সম্ভোগ্য নয় ত বলা চলে না। এই কারণে কোন কোন অর্থতত্ত্ববিদ বলেন যে, কোন সামগ্রী মূলধনের অন্তর্গত করা উচিৎ কি না তা' নির্ভর করে, যে ব্যবহার ক'রছে তার উদ্দেশ্যের উপর। অর্থাৎ মূলধনী সামগ্রী ও সম্ভোগ্য সামগ্রীর মধ্যে পার্থক্য, আসলে মনোগত, বস্তুগত নয়। এমন কি খাবার জিনিষ সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে না যে, কোন ক্ষেত্রেই একে মূলধনের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। বয়লার জ্বালানর কয়লা, কি ইঞ্জিন চালাবার তেল যে মূলধন বলে গণ্য হওয় উচিৎ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা হ'লে, যদি কারখানার মালিক তার কারখানায় নিযুক্ত লোকজনকে বেশী কর্ম্মক্ষম ক'রবার উদ্দেশ্যে বিনা পয়সায় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করে, তা হ'লে এই খাদ্য সামগ্রীকে কি মূলধন ব'লে গণ্য করা উচিৎ নয়? তা যদি মেনে নেওয়া যায়, তা হ'লে যে লোকের চৈতন্য আছে যে, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাওয়া না হলে কাজ করবার ক্ষমতা বজায় থাকে না, সে যে খাদ্য সামগ্রী নিজের পয়সায় কিনে খায়, সেটাকেও ত অন্ততঃ কতকাংশে মূলধন ব'লে গণ্য করা উচিত। এই ধরণের সূক্ষ্ম বিচারের পথে আরও কিছু দূর অগ্রসর হ'লে বলতে হয় যে, কোন সময়ে দেশে যা কিছু ধন সম্পদ আছে, সবই দেশের মূলধনের সামিল। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এই মতই পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, কোন সময়ে দেশে যে ধন সম্পদ্ রয়েছে, সেগুলির প্রয়োজন ছিল ব'লেই তৈরী হয়েছে। অতএব সেগুলির কোন অংশ যদি না থাকৃত, তা হ'লে দেশে যে নূতন ধন সম্পদ্ তৈরী ক'রবার ব্যবস্থা ও সরঞ্জাম রয়েছে সেগুলি ঐ অভাব মেটাবার কাজে আগে লাগান হ'ত। অতএব ঐ সব ধন সম্পদ্ আছে ব'লেই নূতন ধন সম্পদ্ তৈরী হওয়া সম্ভব হয়েছে। তা বলাও যা, আর ঐগুলি নূতন ধন সম্পদ্ তৈরীর কাজে সহায়তা করেছে বলা একই কথা। অতএব সব রকম ধন-সম্পদ্ই দেশের মূলধনের অন্তর্গত। এ যুক্তির ভেতর কোন ফাঁক আছে ব'লে মনে হয় না। অতএব দেশের সমস্ত ধন সম্পদ্, দেশের মূলধনের অন্তর্গত ব'লে মেনে নেওয়া উচিত, এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর আছে ব'লে মনে হয় না। তবে কথা হ'ল এই যে, তা হ'লে "মূলধন" ব'লে একটা আলাদা কথারও আর কোন প্রয়োজন থাকে না। অথচ মোটা বিচারে, মূলধনী সামগ্রী ও সম্ভোগ্য সামগ্রীর মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। আমরা আমাদের দৈনন্দিন চিন্তার

মধ্যে, ও পরস্পরের সঙ্গে আলোচনার সময় এ পার্থক্য ক'রে থাকি ; দেশের নানাবিধ বৈষয়িক সমস্যার আলোচনার সময় এ পার্থক্য করার প্রয়োজন আছে। সেই কারণে এই পার্থক্য বোঝাবার জন্য একটি আলাদা শব্দ না থাকলে চলে না। অতএব, যে সব সামগ্রীর কদর করা হয়, প্রধানতঃ সেগুলি নূতন ধন-সম্পদ্ তৈরীর কাজে লাগে ব'লেই, সেই সব সামগ্রী বোঝাবার জন্য "মূলধন" শব্দটি চালু রাখাই সঙ্গত।

(২)

ব্যবসায়ের মূলধন

ব্যবসায়ের মূলধনের হিসাব দেওয়া এত শক্ত নয়। কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন কত, খোঁজ নিলে সাধারণতঃ টাকার অঙ্কে উত্তর পাওয়া যায়, যে অমুক কোম্পানীর মূলধন ২০,০০০৲, কি ৫০,০০০৲, কি ১ লক্ষ টাকা, এই রকম। এই টাকাটা কিছু টাকা হিসাবে মজুত করা থাকে না। অতএব, ব্যবসা চালান'র জন্য এই টাকা দিয়ে যে যে জিনিষ কেনা হয়েছে, সেইগুলিই আসলে ঐ ব্যবসায়ের মূলধন। ব্যবসার চলতি খরচ মেটাবার জন্য কতকটা নগদ্ টাকা হাতে রাখ্‌তে হয়। অতএব এই নগদ্ টাকাটাও সেই ব্যবসায়ের মূলধনের সামিল। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মূলধনের মধ্যে থাকে—

১। কারখানার বাড়ী, যন্ত্রপাতি ও অনুরূপ সরঞ্জাম। এগুলিকে বলা হয় স্থায়ী মূলধন ; কেন না এগুলি থেকে বারংবার কাজ পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে, কাঁচা বা আধা-তৈরী মাল, ইঞ্জিন চালাবার জন্য কয়লা বা তেল ইত্যাদিকে অস্থায়ী মূলধন বলে, কারণ এগুলি একবার ব্যবহার ক'রলেই ফুরিয়ে যায়।

২। লোকজনের মাহিনা দেওয়া, বাড়ী ভাড়া দেওয়া, যখন লোকসান হয় তখন লোকসানের দেনা মেটান, প্রভৃতি কাজের জন্য সব সময় কিছু নগদ টাকা হাতে রাখতে হয়। ব্যবসা চালান'র জন্য এটি দরকার। অতএব এই নগদ টাকাও মূলধনের পর্য্যায়ে পড়ে।

৩। ব্যবসার উন্নতি করবার জন্য অনেক সময়ে নূতন কাঁচা মাল, নূতন যন্ত্র, নূতন নির্ম্মান কৌশল প্রভৃতি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা চালান' হ'য়ে থাকে। অতএব, এই সব কাজের জন্য যে সরঞ্জাম ব্যবহার হয়, এবং যে সমস্ত খরচ করতে হয়, এ সবই মূলধনের সামিল।

৪। এ ছাড়া, পেটেণ্ট, রেজিষ্ট্রীকৃত ট্রেড মার্ক, ব্যবসায়ের সুনাম প্রভৃতি যা কিছু ব্যবসায়ে লাভ করায় সহায়তা করে, সে সবই মূলধন বলে গণ্য হয়।

দোকানদারের মূলধন বলতে আসলে তার দোকানের এবং গুদামের মজুত মালকে বোঝায়। তার কাজ হচ্ছে, খরিদ্দার হাজির হলেই তার প্রয়োজনমত মাল সরবরাহ করা। আজকাল খুব বড় বড় পাইকারী বিক্রেতারা অনেক সময়ে খুব কম মজুত মালের ওপরই ব্যবসা চালিয়ে থাকে। আজকাল খবরাখবর করার এবং মাল চলাচলের ব্যবস্থা এত ভাল হয়েছে যে এইসব পাইকারেরা আগে অর্ডার সংগ্রহ ক'রে, এবং পরে সেইমত মাল কিনে সরবরাহ ক'রতে কোন অসুবিধা ভোগ করে না। তারা সব সময়ে খরিদ্দারদের ও যোগানদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে, এবং অর্ডার পেলে তবে মাল কেনে। তাদের ক্ষেত্রে মূলধনের দরকার আসলে হয়, খরিদ্দারদের ধারে মাল বিক্রয় ক'রবার জন্য, এবং কখন সখন যদি নিতান্ত সস্তায় কোন মাল পাওয়া যায়, তা হ'লে বেশী লাভের আশায় সেই মাল কিনে রাখবার জন্য। তেমনি, যখন অর্ডার নেবার পর বেশী দামে মাল কিনে সরবরাহ ক'রতে হয়, তখন সেই লোকসানের দেনা মেটাবার জন্যও মূলধনের প্রয়োজন হয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মূলধন সঞ্চয়- সঞ্চয়ের অনুকূল পরিবেশ

মূলধনের প্রয়োজন কতখানি, এবং মূলধন থেকে কি ধরণের কাজ পাওয়া যায়, তা আমরা দেখলাম। দেশের শ্রীবৃদ্ধি ক'রতে হ'লে, যথেষ্ট পরিমাণে মূলধনের যোগান থাকা দরকার। এই যোগান আসে জনসাধারণের সঞ্চয় থেকে। লোকে আয়ের চেয়ে ব্যয় কম ক'রলেই, তবে ধনসঞ্চয় হয়। এই সঞ্চিত ধন থেকে মূলধন জোগাড় করা হয়। কি ভাবে জনসাধারণের সঞ্চিত ধন সংগ্রহ ক'রে কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতিতে লাগান হয়, তা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। মূলধনের যোগান সরকারী প্রচেষ্টাতেও হ'তে পারে। বেশী বেশী টেক্স আদায় ক'রে, তার একটি অংশ, দেশের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধির কাজে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিংবা অতিরিক্ত নোট ছাপিয়েও সে কাজ করা যেতে পারে। এই শেষোক্ত উপায়, আসলে সাধারণ লোককে জোর ক'রে ধনসঞ্চয় ক'রতে বাধ্য করার সামিল। কারণ, অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া। তার মানে, যে লোকের আয় ১০০৲ টাকা, সে আগে হয়ত ৮০৲ টাকা খরচ ক'রে যে মাল পেত, এখন সেইটুকুই মাল ১০০৲ টাকা খরচ ক'রে পাবে। তার পক্ষে এখন তার পূরো আয়, অর্থাৎ ১০০৲ টাকা খরচ করার মানে, আগের হিসাবে ৮০৲ টাকা খরচ করা ও ২০৲ টাকা সঞ্চয় করা। তবে এই সঞ্চয়ের সুবিধা সে কিছু পেল না; পেল সরকার। বড় বড় যুদ্ধের খরচ, এই রকম মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে মেটান হয়েছে। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের মূলধন সংগ্রহের জন্য এ উপায় বড় একটা হয় না। * তার জন্য ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ওপরেই নির্ভর ক'রতে হয়।

---

* 'ইনডাষ্ট্রিয়্যাল ফাইনান্স কর্পোরেসন্' এর (Industrial Finance Corporation) ৫ কোটি টাকা মূলধনের ওপর গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে শতকরা ২॥০ টাকা সুদের গ্যারাণ্টি (প্রতিশ্রুতি) দেওয়া হয়েছিল এবং প্রথম দুই বৎসর সরকারী তহবিল থেকে এই বাবদ ১৭॥০ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে। এ দেশে যখন প্রথম রেলপথ নির্ম্মাণ হয়, তখনও সরকারী গ্যারাণ্টির সাহায্যে মূলধনের টাকা তোলা হয়েছিল; এবং অনেক বৎসর ধরে সরকারী তহবিল থেকে লাভের ঘাটতি মেটান হয়েছিল। সম্প্রতিকার, Sindri Fertiliser factory, Hindustan Air-craft factory, Penicilin factory প্রভৃতি সরকারী শিল্প প্রচেষ্টার মূলধনের সবটুকু বাজার থেকে তোলা যায়নি; অনেকখানি রিসার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিতে হয়েছে। তার মানেই মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে করা হয়েছে।

এই সঞ্চয় নির্ভর করে, লোকের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের উপর। ইচ্ছা থাকলেও যদি সামর্থ্য না থাকে, তা হলে সঞ্চয় হ'তে পাবে না। আবার সামর্থ্য আছে, অথচ ইচ্ছা নেই, তা' হ'লেও সঞ্চয় হ'তে পারে না।

দেশে শান্তি শৃঙ্খলা না থাকলে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ'তে পারে না। লোকের যদি ভয় থাকে যে, সঞ্চিত ধন চুরি ডাকাতি হ'তে পাবে, বা সরকারী অত্যাচারে বাজেয়াপ্ত হ'তে পারে, তা হলে কেউ সঞ্চয় ক'রবে না। টাকার ক্রয়শক্তি যদি মোটামুটি বজায় থাকার সম্ভাবনা না থাকে, তা' হ'লেও সঞ্চয়ের ইচ্ছা ক'মে যায়। অতএব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে দেশের ধনসঞ্চয়ের ব্যাপারে সরকারের একটি বড় রকমের দায়িত্ব রয়েছে। এমন ব্যবস্থা তাদের ক'রতে হবে যে, লোকে যেন সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

যদি জমান' টাকা রাখবার সুবিধামত ব্যবস্থা না থাকে, তা হ'লে সঞ্চয়ে উৎসাহ হয় না। এই বিষয়ে ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট উপকারে আসে। তা'রা, লোকের টাকা শুধু যে গচ্ছিত রাখে তা নয়, সেই গচ্ছিত টাকার জন্য কিছু সুদও দেয়। তাতে ক'রে লোকের সঞ্চয় করার আকিঞ্চন আরও বাড়ে। ব্যাঙ্কগুলি সুদ দিতে পারে এই কারণে যে, তারা ব্যবসায়ীদের ঐ টাকা ধার দেয়, এবং উচ্চ হারে সুদ নেয়। ব্যবসায়ীরা সুদ দিতে পারে এই কারণে যে তারা ঐ ধার করা টাকা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে, এবং সেই মূলধনের সাহায্যে বেশী বেশী লাভ ক'রতে পারে। অতএব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, দেশে কৃষি, শিল্প, বানিজ্য প্রভৃতিতে মূলধনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সঞ্চয় করবার উৎসাহও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

সঞ্চয় করার সামর্থ্য নির্ভর করে আসলে, আয়ের পরিমাণের উপর। যার আয় এত সামান্য যে, কোন রকমে জীবন-ধারণ ক'রতেই সে আয় নিঃশেষ হ'য়ে যায়, সে কিছু সঞ্চয় ক'রতে পারে না। সচ্ছল অবস্থার লোকেই সঞ্চয় ক'রতে পারে। ধনী লোকের পক্ষে সঞ্চয় করা সবচেয়ে সহজ; কারণ তাদের সঞ্চয় ক'রতে কোন ক্লেশ স্বীকার ক'রতে হয় না। সাধারণ লোকের পক্ষে সঞ্চয় ক'রতে হ'লে, বর্ত্তমানে কতকটা ভোগ-প্রবৃত্তি দমন ক'রতে হয়। বড়মানুষের ভোগের ইচ্ছা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তি ক'রেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে; অতএব বিনা আয়াসেই সঞ্চয় হয়। এইজন্য বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি ধনকুবেরদের দেশে খুব বেশী পরিমাণে ধনসঞ্চয় হ'য়ে থাকে।

শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলিতে আজকাল ধনসঞ্চয়ের আরও একটি সুবিধা হয়েছে। বড় বড় কারবারের বেশীর ভাগই আজকাল "জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানী" গ'ড়ে করা হয়। তারা বাৎসরিক লাভের একটি মোটা অংশ শেয়ারের মালিকদের মধ্যে ভাগ ক'রে না দিয়ে ঐ

ব্যবসাতেই মূলধন হিসাবে খাটায় । ফলে, যে ব্যবসায়ে লাভ বেশী, অর্থাৎ যে ব্যবসা প্রসার করা বেশী দরকার, সেই ব্যবসাতেই নূতন মূলধনের যোগান বেশ সহজ উপায়েই হ'য়ে থাকে ।

› The Department of Commerce reviewing capital formation in U. S A in the four years 1946 49, found that $ 60,000 million had been sunk in new plant and equipment, $ 23,000 million in accumulated stocks and over $ 12,000 million in credit extended to clients, a total of about $ 94 000 million Of this huge sum, only $5,100 million was found by the sale of shares and $ 12, 700 million by fixed interest borrowing. Even the latter—debenture issues and the like—was for the most part from large financial institutions. Bank credit played a minor part—about $ 6,000 million and mortgage, even less $ 2, 600 millions. American enterprise in this period found its principal source of funds in its own income. undistributed profits, $ 39,400 million, and depreciation reserves $ 20,800 million

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মূলধন সংগ্রহ ও নিয়োগের ব্যবস্থা

(১)

এক মালিকের কারবার

বেশীর ভাগ ছোট খাট কারবার, লোকে নিজের টাকায় ক'রে থাকে। অনেক বড় বড় কারবারও, প্রথমটায় এই ধরণের এক মালিকের কারবার হিসাবে আরম্ভ হয়। তখন অবশ্য তার আয়তন ছোট থাকে। তারপর যখন কারবারে বেশ লাভ হ'তে থাকে, এবং কারবারের বেশ সুনাম হয়, তখন মালিক সেটিকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত ক'রে, আয়তন বাড়াবার পথ সুগম ক'রে নেয়। এক মালিকের কারবারের প্রধান সুবিধা হ'ল এই যে, যার টাকা তার হাতেই পরিচালনার ভার ও ক্ষমতা। লাভ হ'লেও তার, লোকসান হ'লেও তার। সেই জন্য পরিচালনার কাজে চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও সতর্কতার কোনও ত্রুটি হয় না। আর একটি বড় সুবিধা এই যে, যখন কোন বড় রকমের ঝুঁকি নেবার দরকার হয়, তখন আর কারও সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য, কিংবা আর কারও মত নেবার জন্যে, দেরী ক'রতে হয় না। সেইজন্য, দেশে কোন নূতন ধরণের শিল্প গ'ড়ে তোলার কাজে, একলার কারবারে সাফল্য বেশী হয়। তেমনি যে শিল্পে যন্ত্রপাতি ও নির্ম্মাণ-কৌশলের উন্নতি দ্রুতগতিতে হচ্ছে সেখানেও, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে, একলার কারবারে সুবিধা বেশী হয়।

একজনের কারবারে প্রধান অসুবিধা এই যে, কারবারের আয়তন বিশেষ বাড়ান' যায় না। একজনের সঞ্চয়, এবং সে যেটুকু ধার পেতে পারে শুধু সেইটুকু অর্থের দ্বারা বড় কারবারের মূলধনের প্রয়োজন মেটান যায় না। কারবার বড় হ'য়ে গেলে, একজনের পক্ষে পরিচালনার কাজ চালানও শক্ত হ'য়ে পড়ে।

(২)

পার্টনারশিপ বা অংশীদারী কারবার

দু পাঁচ জনে মিলে একসঙ্গে কারবার ক'রলে এই দুটি অসুবিধা অনেকাংশে দূর করা যায়। এ রকম কারবারকে 'পার্টনারশিপ (Partnership) বা অংশীদারী কারবার বলে। এ সম্বন্ধে যে আইন আছে, তাতে ক'রে, ২০ জন পর্য্যন্ত লোককে এক সঙ্গে যে কোন কারবার

ক'রবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কেবল, ব্যাঙ্কিং ব্যবসা ১০ জনের বেশী লোক এক সঙ্গে ক'রতে পায় না। একজনের জায়গায় যদি কয়েকজন মিলে মূলধনের টাকা যোগায়, তা হ'লে অনেক বেশী মূলধন সংগ্রহ হ'তে পারে। পরিচালনার ব্যাপারেও যদি অংশীদারদের মধ্যে এক এক জন, নিজের নিজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে, এক এক দিকের ভার নেয়, তা হ'লে সমস্ত কাজটাই সুশৃঙ্খলায় ও সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে। এমন অনেক সময় হয় যে, যার ব্যবসা-বুদ্ধি আছে, তার টাকা নেই ; আবার যার টাকা আছে, তার ব্যবসা-বুদ্ধি নেই। এ রকম ক্ষেত্রে দুজনে মিলে এক সঙ্গে অংশীদারী কারবার ক'রলে দুজনেরই লাভ হয়। কোন কোন সময়ে, কারবারের মালিক নিজের মাইনে-করা লোকেদের মধ্যে থেকে বিশেষ বিশ্বাসী, বিচক্ষণ ও যোগ্যতা-সম্পন্ন লোক বেছে কারবারের অংশীদার ক'রে নেয়। তাতে কারবার বজায় রাখা ও বাড়ান'র কাজে অনেক সুবিধা হয়।

অংশীদারদের মধ্যে লাভের কে কত অংশ পাবে, কে কত মূলধন সরবরাহ ক'রবে, কে কি কাজ ক'রবে এবং তার জন্য কি মাসহারা পাবে, এই সব বিষয় তারা আগে থেকেই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে স্থির করে নেয়।

একজনের কারবারে দেনা হ'লে, মালিককে তার সমস্ত সম্পত্তি বেচেও সে দেনা শোধ ক'রতে হয় ; এবং যতদিন না শোধ হয়, ততদিন তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে যায়। অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রেও আইন সেই রকম। কারবারের দেনা শোধ ক'রবার জন্য অংশীদারেরা আলাদা আলাদা ভাবে এবং মিলিত ভাবে দায়ী থাকে। তার মানে পাওনাদার ইচ্ছা ক'রলে যে কোন অংশীদারের কাছ থেকে তার সমস্ত পাওনা আদায় ক'রতে পারে। পরে অবশ্য এই অংশীদার অন্যান্য অংশীদারদের কাছ থেকে সমান হারে ক্ষতি-পূরণ আদায় ক'রতে পারে। দেনা শোধ করার বিষয়ে এই ধরণের দায়িত্ব থাকার দরুণ অংশীদারী ব্যবস্থাতেও লোকে বড় কারবার ক'রতে ভরসা পায় না।

তা ছাড়াও, এমন অনেক ব্যবসা আছে, যাতে এত বেশী টাকার মূলধন দরকার হয় যে, অংশীদারী ব্যবস্থাতে তত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

(৩)
লিমিটেড কোম্পানী

লিমিটেড কোম্পানী ব্যবস্থায় এই দুটি অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয় না। তার কারণ, বহুসংখ্যক অংশীদার থাকায় খুব বেশী পরিমাণে টাকা তোলা যায়। আর, প্রত্যেক অংশীদারের দায় নির্দ্দিষ্ট করা থাকে ব'লে, কারবারের দেনার জন্য বিপদে পড়্‌তে হবে, এ ভয় কারও থাকে না। 'লিমিটেড কোম্পানী' (Limited Company) ইংরাজী কথা।

কোন কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি লোক মিলিত হ'লে তাকে 'কোম্পানী' বলে। 'লিমিটেড' শব্দে বোঝায় যে, দায়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা আছে। "কোম্পানী আইন" (Indian Companies Act) অনুসারে, প্রত্যেক অংশীদার যে টাকা কারবারে ফেলেছে, বা যে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কারবারের দেনা শোধ ক'রবার জন্য, তার চেয়ে বেশী, তার কাছ থেকে আদায় করা যায় না।

ছোট খাট কারবার ছাড়া, বেশীর ভাগ কারবারই আজকাল লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দু চার জন উদ্যোগী হ'যে প্রাথমিক কাজগুলি করে। তাদের বলা হয় 'promoter' বা পত্তনকারী। তারা কোন ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা দেখলে নূতন কারবার পত্তন ক'রতে উদ্যোগী হয। কি মাল তৈরী হবে, কি ধরণের যন্ত্রপাতি কিন্‌তে হবে, কোথায় কারখানা বসাতে হ'বে, কারবারের আয়তন কত বড় হবে, কি রকম আন্দাজ তৈরী-খরচ পড়্‌বে এবং কি রকম আন্দাজ লাভ হবে, এই সব বিষয়ে খোঁজ খবর ক'রে এবং হিসাব ক'রে তারা যদি দেখে যে লাভের বেশ সম্ভাবনা আছে, তা' হ'লে কারবার পত্তন ক'রতে মনস্থ করে। সঙ্গে সঙ্গে কত টাকার মূলধন তুল্‌তে হবে তাও স্থির করে। লিমিটেড কোম্পানী গড়্‌বার সময় যে সব প্রাথমিক খরচ পত্রাদি ক'রতে হয় সেগুলি তারা প্রথমটা নিজেদের পকেট থেকেই করে। তার পর টাকা তোলার কাজ আরম্ভ হয়। যত টাকা তোলা স্থির হয, তাকে অনেকগুলি স্বল্পমূল্যের 'শেয়ারে' (Share) ভাগ করা হয়। যদি ৫০,০০০৲ টাকা তোলা স্থির হয়, এবং ঐ টাকাকে ৫,০০০ শেয়ারে ভাগ করা হয়, তা' হ'লে প্রত্যেক শেয়ারের দাম হয় ১০৲ টাকা। 'শেয়ার' মানে অংশ। একখানি 'শেয়ার' কেনা মানে ঐ কারবারের ৫০০০ ভাগের এক ভাগের মালিক হওয়া। একটি প্রস্‌পেক্‌টাস্‌ (Prospectus) প্রচার ক'রে জনসাধারণকে শেয়ার কেন্‌বার জন্য আহ্বান করা হয়। 'প্রস্‌পেক্‌টাস্‌' একটি বিবরণী। এতে প্রস্তাবিত কারবার সম্বন্ধে তথ্যাদি থাকে, এবং মোটামুটি সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা হয় যে এই কারবারে বেশ লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। শেয়ার বিক্রী করবার জন্য দালালও নিযুক্ত করা হয়। তারা লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে শেয়ার বিক্রী ক'রে আসে। এই শেয়ার বিক্রীর ব্যাপারে ব্যাঙ্কেরা অনেক সময়ে 'আণ্ডাররাইটার' (Underwriter) হ'য়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। ব্যাঙ্কের মালিক বা কর্ম্মাধ্যক্ষকে যদি বোঝান' যায় যে, এ কারবারে লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে; তা' হ'লে তারা অনেক সময়ে আণ্ডাররাইটার হ'তে রাজী হয়। আণ্ডাররাইটার হওয়া মানে, একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সব শেয়ার বিক্রী না হয়, তা' হ'লে বাকি শেয়ারগুলি কিনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। তার জন্য অবশ্য ব্যাঙ্ক কিছু কমিশন নিয়ে থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ককে শেষ পর্য্যন্ত একটিও শেয়ার কিন্‌তে হয় না। একটি নামজাদা ব্যাঙ্ক কোন নূতন কোম্পানীর আণ্ডাররাইটার হয়েছে জান্‌তে পার্‌লে,

লোকে সেই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আগ্রহের সহিত তার শেয়ারগুলি কিনে ফেলে।

শেয়ারের মালিকেরা সম্মিলিতভাবে কারবারের মালিক। কারবার চালান'র জন্য তারা একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে নিজেদের মধ্যে থেকে কয়েকজন ডিরেক্টর (Director) বা পরিচালক মনোনীত করে। এই ডিরেক্টরদের নিয়ে যে 'বোর্ড অফ্ ডিরক্টারস্' (Board of Directors) বা পরিচালক-সভা তৈরী হয়, সেই বোর্ডের হাতে পরিচালনার ভার থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন কি দু জনকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর্ (Managing Director) করা হয়, কিংবা কোনও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে ম্যানেজিং এজেন্ট্স্ (Managing Agents) করা হয়। সে ক্ষেত্রে ঐ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেন্টস্ পরিচালনার কাজ করে। প্রত্যেক বৎসরের শেষে শেয়ার-মালিকদের একটি সভায় বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ ক'রে পাস করিয়ে নেওয়া হয়, এবং শেয়ার পিছু কত "ডিভিডেণ্ড" বা লাভ বিলি করা হবে তাও ঠিক করা হয়। কারবার কি ভাবে চালান হচ্ছে, কোন অসুবিধা ভোগ ক'রতে হচ্ছে কি না, এবং হ'লে কি প্রতিকার করা যেতে পারে, পর বৎসরে কারবারের উন্নতির জন্য কি কি ক'রবার সঙ্কল্প আছে, এই সব এবং এই ধরণের অন্যান্য বিষয়ও এই সভায় আলোচনা হ'য়ে থাকে। ব্যবস্থাটা অনেকটা রাজ্য-শাসনের ব্যাপারে গণতন্ত্রের ব্যবস্থার মত। এই বাৎসরিক মিটিংএ ডিরেক্টরদেরও নির্ব্বাচন হয়। সাধারণতঃ ডিরেক্টররা পালা ক'রে তিন বৎসর অন্তর পদত্যাগ করে। ফলে প্রত্যেক বৎসর বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ এর তিন ভাগের এক ভাগ লোকের পুনর্নির্ব্বাচন হয়। যার মেয়াদ শেষ হ'ল, সে আবার নির্ব্বাচিত হ'তে পারে।

শেয়ারের শ্রেণীভেদ আছে। কারবারের বেশীর ভাগ টাকা তোলা হয় 'অর্ডিনারী' (Ordinary = সাধারণ) শেয়ার বিক্রী ক'রে। এ ছাড়া আছে—ডিবেঞ্চার (Debenture), প্রেফারেন্স (Preference = অগ্রগণ্য) শেয়ার এবং কিউমিউলেটিভ (Cumulative = জেরটানা) প্রেফারেন্স শেয়ার। কখন কখন আর এক রকমের শেয়ারও বা'র করা হয়। তার নাম ডেফারড্ (Deferred = পশ্চাদ্-গণ্য) শেয়ার।

ডিবেঞ্চার বিক্রী ক'রে যে টাকা তোলা হয় সেটা আসলে কারবারের ধার করা টাকা, নিজস্ব টাকা নয়। যারা ডিবেঞ্চার কিনেছে, তাদের কারবারের মালিকদের মধ্যে গণ্য করা যায় না। ডিবেঞ্চার পত্রে সুদের হার, এবং কতদিন বাদে ও কি ভাবে টাকা শোধ দেওয়া হবে, সে সকল উল্লেখ করা থাকে। কারবারের সম্পত্তি, এই ঋণের জামিন হিসাবে ধরা হয়। ডিবেঞ্চারের টাকা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তেমনি, কারবারে যদি খুব লাভ হ'তে থাকে, তা হ'লে ডিবেঞ্চার-ক্রেতারা সে লাভের সুবিধা পায় না; তারা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ ছাড়া আর কিছু পায় না। প্রেফারেন্স শেয়ারে

নির্দ্দিষ্ট হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়ার কথা থাকে। অবশ্য যদি লাভ কিছু না হয়, তা হ'লে দিতে হয় না। কিন্তু লাভ হ'লে, প্রথম প্রেফারেন্স শেয়ারের ওপর নির্দ্দিষ্ট হারে ডিভিডেণ্ড দিতে হয়, এবং তা দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তাই থেকে অর্ডিনারী শেয়ারের ডিভিডেণ্ড দিতে হয়। কারবারে লাভ খুব বেশী হ'লেও প্রেফারেন্স শেয়ার নির্দ্দিষ্ট হারের চেয়ে বেশী ডিভিডেণ্ড পায় না। অর্ডিনারী শেয়ার তখন খুব উঁচু হারে ডিভিডেণ্ড পায়। কিউমিউলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ারে আগের আগের বৎসরের দাবীর জের টানবার অধিকার থাকে। আগের বৎসরে হয়ত কোন লাভ হয় নি ব'লে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হয় নি। এ বৎসর কিন্তু এত লাভ হয়েছে যে, নির্দ্দিষ্ট হারে ডিভিডেণ্ড দিয়েও উদ্বৃত্ত থাকছে। এ অবস্থায়, আগের বছরে যে ডিভিডেণ্ড দিতে পারা যায় নি সেটা আগে পুষিয়ে দিয়ে, তারপর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তখন অর্ডিনারী শেয়ারের ডিভিডেণ্ড দিতে পারা যাবে। প্রেফারেন্স শেয়ার বিনুলে, কারবারের ওপর কোন স্বত্বাধিকার জন্মায় কি না, সে বিষয়ে আগে মতভেদ ছিল। সম্প্রতি বিলাতে দুইটি মামলায় 'হাউস্ অফ্ লর্ডস্' এ রায় দেওয়া হয়েছে যে, প্রেফারেন্স শেয়ারগুলি ঋণপত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং কোম্পানী যখন ইচ্ছা এই সব টাকা পরিশোধ ক'রে, যারা প্রেফারেন্স শেয়ার কিনেছিল তাদের সঙ্গে কোম্পানীর সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দিতে পারে। মনে হয়, এই সিদ্ধান্তের পরে প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় ক'রে কারবারের জন্য টাকা তোলা আগের মত সহজ থাকবে না। প্রেফারেন্স শেয়ারে সাধারণতঃ একটু উঁচু হারে ডিভিডেণ্ড নির্দ্দিষ্ট থাকে। অবশ্য, কারবারে লাভ কিছু না হ'লে প্রেফারেন্স শেয়ার কোন ডিভিডেণ্ড পায় না, এবং যে প্রেফারেন্স শেয়ার কেনে, সে একথা জেনেই কেনে। কিন্তু যদি কারবার দাঁড়িয়ে যায়, তা হ'লে বরাবর বেশ উঁচু হারে ডিভিডেণ্ড পাওয়া যাবে, এ ভরসা তার ছিল; এবং সেই জন্য কিছু না পাওয়ার সম্ভাবনাটা সে তত আমল দিত না। এখন এই দাঁড়াল যে, কারবারে লাভ না হ'লে সে টাকা ফেরৎ পাবার দাবী ক'রতে পারে না; অথচ যদি কারবার বেশ দাঁড়িয়ে যায়, তা হ'লে তার টাকা ফেরৎ দিয়ে তাকে কারবার থেকে বিদায় ক'রে দেওয়া যাবে।

লিমিটেড কোম্পানীর পক্ষে কারবারের জন্য টাকা তোলার চারটি বিশেষ সুবিধা আছে—

১। অতি সামান্য পুঁজির লোকেদের কাছ থেকেও টাকা সংগ্রহ করা যায়।

২। যারা বেশী ঝুঁকি নিতে ইতস্ততঃ করে, তাদের জন্য ডিবেঞ্চার ও প্রেফারেন্স শেয়ারের ব্যবস্থা আছে।

৩। যারা শেয়ার কেনে তারা, যখন খুসী, শেয়ার-বাজারে শেয়ার বিক্রী ক'রে নিজেদের টাকা উঠিয়ে নিতে পারে। অংশীদারী কারবারে যদি কোন অংশীদার টাকা তুলে নিতে চায়, এবং সেই জন্য নিজের অংশ আর কাউকে বিক্রী ক'রতে চায়,

তা' হ'লে অন্য সব অংশীদার রাজী না হ'লে, ব্যবসা ভেঙে দিতে হয়। লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার যতই হাত বদল হউক না কেন, কারবারের তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। এই রকম শেয়ার বেচাকেনা চালু থাকার দরুণ, কারবারের জন্য টাকা সংগ্রহে একটি সুবিধা এই হয় যে, যারা বেশী দিনের জন্য নিজেদের টাকা আটকে রাখতে চায় না, তাদের টাকাও কারবারের জন্য পাওয়া যায়।

৪। প্রত্যেক অংশীদারের দায় নির্দ্দিষ্ট করা থাকে।

এই সব কারণে লিমিটেড কোম্পানী খুব বড় বড় কারবারের উপযোগী মূলধন সংগ্রহ ক'রতে সমর্থ হয়।

দেশে লিমিটেড কোম্পানীর প্রসার হ'লে জন-সাধারণেরও সুবিধা কম হয় না। যারই কিছু পুঁজি আছে, সে নিজে সেই টাকা ব্যবসায়ে খাটাতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হ'লে, কোন লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার কিনে, লাভের অংশ পেতে পারে। যাদের অনেক টাকা আছে তারা, একটা কারবারে সব টাকা না ফেলে, অনেকগুলি কারবারে সেই টাকা ভাগ করে খাটাতে পারে। তাতে লাভের নিশ্চয়তা বাড়ে, এবং লোকসানের ঝুঁকি কমে। যাদের তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি আছে, অথচ নিজস্ব বিশেষ পুঁজি নেই, তারা লিমিটেড কোম্পানী গ'ড়ে নিজেদের উন্নতি ক'রতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও উপকার ক'রতে পারে।

লিমিটেড কোম্পানী ব্যবস্থার একটি অসুবিধা এই যে, কারবারের যারা মালিক, পরিচালনার কাজের সঙ্গে তাদের কোন রকম সাক্ষাৎ যোগাযোগ থাকে না। এইজন্য, ব্যক্তিগত কারবারে, লাভের আশায় এবং লোকসানের ভয়ে, পরিচালনার কাজে যে কর্ম্ম-তৎপরতা, মিতব্যয়িতা ও সতর্কতা দেখা যায়, লিমিটেড কোম্পানীতে ততটা দেখা যায় না। অবশ্য শেয়ার-মালিকেরা কারবার পরিচালনার ব্যাপারে ডিরেক্টরদের যে কোন রকমের নির্দ্দেশ দিতে পারে, এবং অকর্ম্মণ্য ডিরেক্টরকে সরিয়েও দিতে পারে। কিন্তু অত লোকের পক্ষে একযোগে কাজ করা শক্ত। অল্পসংখ্যক লোক চেষ্টা ক'রলেও কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারে না। কারণ, শুধু যে গরীব শেয়ার-মালিকদেরই ভোটের জোর কম, তা নয়। বড়মানুষ শেয়ার-মালিকেরাও বেশী টাকা একটা কারবারে ফেলে না; পাঁচটা কারবারে ভাগ ক'রে খাটায়। সেইজন্য, কোন একটি বিশেষ কারবারে তাদেরও ভোটের জোর বেশী থাকে না। তার ওপর, সাধারণ লোক এ সব বিষয়ে কতকটা উদাসীনও থাকে। ফলে, ডিরেক্টরদের হাতে, এবং বিশেষতঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেণ্টসদের হাতে অত্যন্ত বেশী ক্ষমতা এসে পড়ে। তারা ইচ্ছা ক'রলে, কারবারকে বঞ্চিত ক'রে, নিজেদের ব্যক্তিগত লাভ বাড়াবার জন্য নানা রকম অসাধু উপায় অবলম্বন ক'রতে পারে। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে মোটা মোটা মাহিনার চাকুরী দেওয়া; কারবারের কাঁচা মাল কেনা ও তৈরী মাল বিক্রীর

বরাৎ দিয়ে মোটা মোটা কমিশন পাইয়ে দেওয়া, কারবারের টাকা নিয়ে ফাট্‌কা খেলা এবং অন্ত নিজস্ব কারবারে খাটান, ব্যাঙ্কের টাকা অন্ত লোকের বেনামীতে ধার নেওয়া এবং অন্ত লোককে ধার দেবার সময় তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে কমিশন নেওয়া প্রভৃতি নানা রকমের অনাচার সম্ভব, এবং হ'য়েও থাকে। এবং হ'লে, এর প্রতিকার বড় শক্ত। কোম্পানী আইনে, ডিরেক্টরদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে খুব কড়া সব নিয়ম আছে, এবং নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রলে সমুচিত শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এই ধরণের অনাচার কোথায় কি ভাবে হচ্ছে, খোঁজ পাওয়া ভারী শক্ত; এবং যেখানে খোঁজ পাওয়া যায় সেখানেও, অনেক সময়ে প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়। আসলে, ডিরেক্টররা মোটামুটি সৎ প্রকৃতির না হ'লে ব্যবসা ভাল ভাবে চল্‌তে পারে না। বিলাতে লিমিটেড কোম্পানী ব্যবস্থা যে এত কার্য্যকরী হয়েছে তার কারণ সাহেবদের ব্যবসায়ী-সাধুতা। আমাদের দেশে যে এত কোম্পানী ফেল্ হয়, তার আসল কারণ এই ব্যবসায়ী-সাধুতার অভাব। যারা পরকে ফাঁকি দিয়ে বড়মানুষ হয়, সমাজ তাদের যতদিন না নিন্দা ও ঘৃণা ক'রতে শেখে, ততদিন এ পাপের প্রতিকার হওয়া শক্ত।

(৪)
কো-অপারেটিভ্ বা সমবায় প্রতিষ্ঠান

মূলধন সংগ্রহ ও নিয়োগের ব্যবস্থা হিসাবে, এক মালিকের কারবার, অংশীদারী কারবার ও লিমিটেড কোম্পানী এই তিন রকম প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে। এইগুলিই প্রধান। এ ছাড়া আরও দুরকম ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে কো-অপারেটিভ বা সমবায় প্রতিষ্ঠান। আর একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান।

যখন অনেকগুলি লোক একসাথে মিলে, নিজেদের বৈষয়িক জীবনের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলে, এবং তার জন্য যা মূলধন দরকার হয় তা নিজেরাই যোগান দেয়, যে পরিশ্রম করার দরকার হয় তা নিজেরাই প্রধানতঃ করে, এবং পরিচালনার ভার নিজেদেরই হাতেই রাখে, তখন সেই রকম প্রতিষ্ঠানকে সমবায় প্রতিষ্ঠান বলে।

বিলাতে ক্রেতা-সমবায়-সমিতির যথেষ্ট সাফল্য দেখা যায়। এদের কাজ হচ্ছে, নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের খুচ্‌রো বিক্রীর দোকান চালান'। সাধারণতঃ, কারখানা থেকে যে দরে মাল বেরোয়, শেষ-ক্রেতাকে তার চেয়ে অনেক বেশী দরে সে মাল কিন্‌তে হয়। কারণ সে মাল, আড়ৎদার, মহাজন, পাইকার, খুচরো দোকানদার প্রভৃতি তিন চার হাত ফের্‌তা হ'বার পর তবে এসে শেষ-ক্রেতার হাতে পৌঁছয়। মাঝের এই সমস্ত লোক প্রত্যেকেই

কিছু না কিছু মুনাফা রাখে। ফলে খুচরো দাম অনেক বেশী হয়। ক্রেতা-সমবায়-সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য এই খরচটিকে বাঁচান'। যারা সমিতির মেম্বর, তারাই কেবল সমিতির দোকান থেকে জিনিষপত্র কিন্‌তে পায়। স্বল্প-মূল্যের একখানি শেয়ার কিন্‌লেই সমিতির মেম্বর হওয়া যায়। সমিতি কি কি ধরণের কাজ কি ভাবে ক'রবে, তা সমিতির মেম্বররা সভা ক'রে স্থির করে, এবং নিজেদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে নির্ব্বাচন ক'রে একটি কার্য্য-সভা তৈরী করে। এই কার্য্য-সভার অধীনে ও তত্ত্বাবধানে একজন মাইনে-করা লোক সমিতির কাজ কর্ম্ম চালায়। শেয়ার বিক্রী ক'রে যে টাকা ওঠে, সেইটিই সমিতির মূলধন। এই টাকার ওপর অল্প হারে কিছু সুদ দেওয়া হয়। জিনিষপত্র যা বিক্রী হয়, তার দর মোটামুটি বাজার দরের সমান রাখা হয়। পাইকারী দরে মাল কিনে খুচরো দরে বিক্রী করায় লাভ যথেষ্টই হয়। বৎসরের শেষে হিসাব নিকাশ হ'য়ে যাবার পর লাভের কতক অংশ সমিতির ব্যবসা বাড়ান'র কাজে লাগান হয়। আর কতক অংশ, মেম্বরদের সকলের সুবিধার জন্য স্কুল চালান', চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজে লাগান' হয়। তার কারণ, সমবায় সমিতি গড়বার উদ্দেশ্য শুধু আর্থিক সুবিধা নয়। এই প্রচেষ্টার পেছনে আছে আরও ব্যাপক একটি আদর্শ। সেটি হচ্ছে, পরস্পরের সহযোগিতায় সকলের নানা দিক্ দিয়ে উন্নতি বিধান করা। লাভের বাকি অংশ মেম্বরদের মধ্যে, যে যত মূল্যের মাল কিনেছে, সেই অনুপাতে 'ডিভিডেণ্ড' হিসাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। এ টাকাও অনেকে সমিতির হাতেই গচ্ছিত রাখে, যাতে ক'রে এই টাকার সাহায্যে সমিতির কাজের আরও প্রসার হ'তে পারে। তবে এ টাকা মেম্বররা ইচ্ছামত তুলে নিতে পারে। যতদিন সমিতির হাতে এ টাকা থাকে ততদিন এ টাকার জন্য কিছু সুদও দেওয়া হয়।

এই ধরণের দোকানগুলির সাফল্যের প্রধান কারণ এই যে, যারা দোকানের খরিদ্দার তারাই আবার দোকানের মালিক। নিজেদের গড়া প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সকলেই কামনা করে। সেইজন্য, যার যখন যা প্রয়োজন হয়, সমিতির দোকানে পেলে অন্য দোকানে যায় না। তাতে যদি কিছু স্বার্থত্যাগও করতে হয়, কিংবা ঠিক্ পছন্দসই জিনিষ নাও মেলে, তাতে আপত্তি করে না। এর কারণ যে শুধু ডিভিডেণ্ডের লোভ, তা নয়। সমবায় সমিতি গড়ার পেছনে যে পরস্পরের সহযোগিতায় সকলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করার উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটিকে সার্থক করবার আকিঞ্চণ প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর থাকে। খরিদ্দার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারায়, দোকান চালানর খরচ নানা দিক দিয়ে কমান' যায়। মাল বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হয় না, রুচিবাগীশদের খুসী করবার জন্য একই জিনিষের হরেক প্যাটার্ণ রাখতে হয় না, মাল মজুত ক'রে, বিক্রী হবে কি না তার ভাবনাও ক'রতে হয় না। তা ছাড়া, দোকান চালানর জন্য প্রয়োজনীয় নানা রকম আনুষঙ্গিক কাজ করবার জন্য, বিনা খরচে কিংবা অল্প পারিশ্রমিকে মেম্বরদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। কোথাও

কোথাও এই ধরণের খরচ কমাবার চেষ্টা বড় অতিরিক্ত রকমের করা হয়। তাতে ফল ভাল হয় না। যেসব কাজে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য দরকার, সেসব কাজ নিজেরা ক'রতে গেলে খরচে সাশ্রয় হয় না। বিভিন্ন রুচির চাহিদা মেটাবার দিকে যদি বড্ড কম নজর দেওয় হয় তা হ'লে খরিদ্দার রাখা যায় না। সেই জন্য দেখতে পাওয়া যায় যে, যদিও বিলাতে সাধারণ লোকেদের মধ্যে ক্রেতা সমবায় সমিতির প্রসার যথেষ্ট হয়েছে, তবু এ কথা সত্য নয় যে তারা খুচরো বিক্রীর বাজার পুরোপুরি দখল করতে পেরেছে। পয়সাঅলা লোকেদের মধ্যে এই ধরণের সমিতি মোটেই আমল পায় নি।

কতকগুলি স্থানীয় সমিতির সম্মিলিত চেষ্টায় এক একটি Wholesale Society বা পাইকারী সমিতি গ'ড়ে উঠেছে। স্থানীয় সমিতিগুলি এর মেম্বর, এবং এখান থেকে তাদের মাল যোগান দেওয়া হয়। কতকগুলি মাল, পাইকারী সমিতি বাইরে থেকে সংগ্রহ না ক'রে নিজেরাই কারখানা স্থাপন ক'রে তৈরীর ব্যবস্থা করে। পাইকারী সমিতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য হয়নি। তার কারণ সাধারণ লোকের হাতে বড় কারবার চালানর ভার, বিশেষতঃ বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালানর ভার থাকলে সে কাজ ভাল ভাবে হওয়া শক্ত। তার জন্য বড় বড় শিল্পপতিদের মধ্যে যে ধরণের যোগ্যতা দেখা যায়, সেই ধরণের যোগ্যতা-অলা লোক দরকার।

ডেনমার্কে আর এক ধরণের সমবায় সমিতির বিশেষ প্রসিদ্ধি হয়েছে। এখান থেকে খুব বেশী পরিমাণে মাখন রপ্তানী হয়। ছোট ছোট চাষীদের ঘরের দুধ থেকে এই মাখন তৈরী হয়। কম খরচে মাখন তৈরী করবার যে সব বহুমূল্য যন্ত্রপাতি আছে, তা এদের কারও একলার কেনবার সঙ্গতি নেই। সেজন্য তার সমবায় সমিতি গ'ড়ে সকলে মিলে এই সব যন্ত্রপাতি কেনে এবং চালায়। এক জায়গায় যন্ত্রগুলি বসান' হয়, এবং চাষীরা নিজের নিজের দুধ সেই খানে নিয়ে আসে। সমস্ত দুধ থেকে যে মাখন তৈরী হয়, যে যত দুধ দিয়েছে তার নামে সেই অনুপাতে জমা হয়। লাভও সেই অনুপাতে বিলি করা হয়। এই সব সমিতি, মেম্বরদের সকলের সুবিধার জন্য, অন্যান্য কাজও ক'রে থাকে, যেমন রপ্তানীর ব্যবসা করা, বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি কেনা ইত্যাদি। অন্যান্য দেশেও অনুরূপ সমিতি গ'ড়ে বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও রপ্তানীর কাজ করা হয়ে থাকে, যেমন পশ্চিম কানাডায় গম, ডেনমার্কে ডিম, বেলজিয়ামে আলু, নিউজীল্যাণ্ডে মাংস ইত্যাদি।

জার্ম্মানী, আর এক রকমের সমবায় সমিতির আদর্শ স্থাপন করেছে। এগুলি কৃষি-ঋণ-সমিতি। এ গুলির কাজ হচ্ছে, চাষীর ঋণের চাহিদা মেটান'। চাষের কাজে ঋণ নেওয়া এক রকম অপরিহার্য্য বল্লেও চলে। চাষের সময়, এবং ফসল তোলবার সময়, এতগুলি টাকা একসঙ্গে খরচ করতে হয় যে, এমন চাষী খুব কমই আছে, যে নিজের সঞ্চয় থেকে এই খরচ করতে পারে। ফলে তাকে গ্রামের মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়। এই

মহাজনেরা এত উঁচু হারে সুদ আদায় করে যে, একবার ঋণ নিলে ঋণের বোঝা বেড়েই চলে; ঋণ শোধ আর কখনও হয় না। শেষে জমি বিক্রী ক'রে, চাষী দিন-মজুরে পরিণত হয়। এত বেশী হারে সুদ নেওয়ার একটি কারণ অবশ্য মহাজনদের অতিলোভ। তারা চাষীর দারিদ্র্য ও অদূরদর্শিতার পুরো সুযোগ নিতে ছাড়ে না। কিন্তু আরও একটি কারণ হচ্ছে, চাষীদের নিজেদেরই মিতব্যয়িতার অভাব। ফসল তোলার পর তাদের হাতে যখন টাকা আসে, তখন যদি তারা নিজেদের অবস্থা বুঝে হিসাব ক'রে চলে, তা হ'লে অনেক চাষীই নিয়মিতভাবে প্রত্যেক বৎসর ধার শোধ ক'রতে পারে। তা না ক'রে তারা বিবাহাদি নানা রকমের সামাজিক অনুষ্ঠানে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করে, এবং নানা রকমের অনাবশ্যক চটকদার জিনিস কেনবারও লোভ সামলাতে পারে না। অনেক সময়, বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে বেহিসাবী খরচ করবার জন্য টাকা ধার ক'রতেও পশ্চাৎপদ হয় না। চাষীদের আয় এত অল্প যে খুব হিসাব ক'রে চ'ললে কোন রকমে দিন গুজরান হ'তে পারে। অর্থের অপব্যয় ক'রলে দুর্গতি অনিবার্য। চাষীদের দরকার কম সুদে টাকা ধার পাওয়া। এবং তার চেয়েও বেশী দরকার মিতব্যয়িতার অভ্যাস করা। এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষি-ঋণ সমিতির সৃষ্টি। একই গ্রামের বা পাশাপাশি গ্রামের কতকগুলি চাষী মিলে এইরকম সমিতি গড়ে, এবং শেয়ার কিনে তার মেম্বর হয়। এই ভাবে শেয়ার বিক্রী ক'রে যে টাকা ওঠে, সেইটি সমিতির মূলধন। মেম্বরদের এবং অন্য লোকের কাছ থেকে তাদের সঞ্চয়ের টাকাও গচ্ছিত হিসাবে নেওয়া হয়, এবং তার জন্য সুদ দেওয়া হয়। এই ভাবে মেম্বররা টাকা সঞ্চয় ক'রবার সুযোগ ও উৎসাহ পায়। এ ছাড়া, সমিতি বাইরে থেকেও টাকা ধার করে। এইসব টাকা শোধ দেবার জন্য সমস্ত মেম্বর সমষ্টিগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে। সেই জন্য ঋণদাতার টাকা মারা যাবার সম্ভাবনা বড় থাকে না। ফলে, সমিতি কম সুদে টাকা ধার ক'রতে সমর্থ হয়। সমিতির কাজ, এই সমস্ত টাকা মেম্বরদের যথাসম্ভব অল্প সুদে ধার দেওয়া। সমিতির কাজ চালাবার জন্য মেম্বররা নিজেদের মধ্যে থেকে একটি কার্য্য সভা নির্ব্বাচিত করে। কোথাও কোথাও এই কার্য্য-সভার অধীনে একজন মাইনে করা ম্যানেজারও থাকে। এ ছাড়া, প্রায়ই সমিতির মেম্বররা সভায় মিলিত হ'যে সমিতির কাজ কর্ম্ম আলোচনা করে, এবং কার্য্য সভাকে নানা রকম নির্দ্দেশ দিয়ে থাকে। সমিতির ঋণ শোধ ক'রবার জন্য প্রত্যেকের অনির্দ্দিষ্ট দায় থাকার দরুণ একটি সুফল এই হয়েছে যে, অসৎ-প্রকৃতি বা অমিতব্যয়ী লোকেদের মেম্বর হ'তে দেওয়া হয় না। আর মেম্বররা ধার করা টাকার সদ্ব্যবহার ক'রছে কি না সে দিকেও অন্য মেম্বররা দৃষ্টি রাখে। মেম্বরদের আস্থা-ভাজন হ'বার জন্য, অনেক মাতাল, জুয়াড়ী, উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী ব্যক্তি, চেষ্টা ক'রে নিজেদের স্বভাব শুধরে মেম্বর হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। এই ভাবে কৃষি-ঋণ-সমিতিগুলি গ্রামের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের কাজে যথেষ্ট সহায়তা

করেছে। সমিতির যে লাভ হয়, সেটি মেম্বরদের মধ্যে বিলি করা হয় না; একটি বিসার্ভ ফণ্ডে (Reserve Fund = সঞ্চয়-তহবিল) জমা করা হয়। এই ফণ্ডে যতই টাকা জমে, ততই কম সুদে মেম্বরদের টাকা ধার দেওয়া সম্ভব হয়। এ ছাড়া, এই ফণ্ডের টাকা থেকে লাইব্রেরী, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, প্রসুতি সদন প্রভৃতি নানা জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানও চালান' হ'য়ে থাকে। কৃষি ঋণ-সমিতির সাফল্য নির্ভর করে আসলে মেম্বরদের আদর্শ নিষ্ঠার ওপর। পরস্পরের সহযোগিতায়, সকলের যাতে ভাল হয় সেই রকম কাজ ক'রবার মনোভাব যেখানে প্রবল, সেইখানেই কৃষি ঋণ সমিতির দ্বারা আর্থিক ও নৈতিক দুই দিক্ দিয়েই গ্রামের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

(৫)
সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

অনেক সহরে জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ, যানবাহনের ব্যবস্থা, বাজার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা প্রভৃতি নানা রকম ব্যবসা মিউনিসিপ্যালিটি (পৌর শাসন প্রতিষ্ঠান) দ্বারা হ'য়ে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যেরা, নিজেদের মধ্যে থেকে জনকয়েককে নির্ব্বাচন ক'রে, এক বা একাধিক কমিটির হাতে এই সব ব্যবসা পরিচালনা করার ভার দেয়। এই সব কমিটির অধীনে ও তত্ত্বাবধানে এক এক জন বেতনভুক কর্ম্মাধ্যক্ষ থাকে, এবং তাদের হাতেই প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসাগুলি চালান'র ভার থাকে। মূলধন সংগ্রহ করা হয়, প্রধানতঃ জন-সাধারণের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে। নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দেবার, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে শোধ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডিবেঞ্চার বিক্রী করে এই ঋণ নেওয় হয়। সহরের করদাতগণই আসলে এই ঋণ পরিশোধ ক'রবার দায়িত্ব নেয়। যদি লাভ হয় ত' হলে তাদের করভার লাঘব হয়। আর যদি লোকসান হয়, ত' হলে তাদের ঘাড়ে বোঝা বাড়ে। করদাতাগণ সমষ্টিগতভাবে এই সব ব্যবসায়ের মালিক, এবং সেগুলি চালাবার ভার থাকে তাদেরই প্রতিনিধিদের উপর। এক মালিকের কারবারে, বা অংশীদারী কারবারে মালিকের যে রকম প্রত্যক্ষ-ভাবে কারবার পরিচালন ক'রে থাকে, এখানে সে রকম নয় সেই জন্য পরিচালনার কাজে, সে রকম উৎসাহ কর্ম্ম-তৎপরতা ও সতর্কতা এক্ষেত্রে আশা করা যায় না। বরঞ্চ, লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালনার ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারী ব্যবসায়ের পরিচালনার ব্যবস্থার একটা সাদৃশ্য আছে। কারণ দুই জায়গাতেই পরিচালনার কাজ প্রত্যক্ষভাবে বেতনভুক কর্ম্মাধ্যক্ষদের হাতে থাকে। তবে, একটা বড় রকমের প্রভেদও আছে। লিমিটেড কোম্পানীতে, শেয়ার-মালিকদের বাদ দিলে, সর্ব্বশেষ ক্ষমতা থাকে "বোর্ড

অফ্ ডিরেক্টরস্” এর হাতে। ডিরেক্টরদেব মধ্যে, সকলে না হ'লেও, প্রায় সকলেই বিচক্ষণ শিল্পপতি বা বণিক হ'য়ে থাকে। ব্যবসায চালানর কাজে তাদেব অভিজ্ঞতা প্রচুর। তা ছাডা শেযাব-মালিকদের তুষ্ট ক'ববাব জন্য কিসে ভাল ডিভিডেণ্ড দেওযা যায তাব দিকে তাদেব সর্ব্বদা নজব বাখতে হয। ব্যবসাযেব উন্নতিব উপব তাদেব নিজেদেবও আর্থিক লাভ যথেষ্ট নির্ভব কবে। অন্যপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটিব সদস্যদেব মধ্যে যদি একজনও বিচক্ষণ ব্যবসাযী না থাকে, তাতে আশ্চর্য্য হবাব কিছু নাই। এবং এইরূপ অনভিজ্ঞ লোকেদেব হাতে যদি ব্যবসা চালাবাব শেষ ক্ষমতা থাকে তা হ'লে সে ব্যবসাযে যে অপব্যয ও বিশৃঙ্খলা হবাব সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে সে বিষযে কোন দ্বিমত হ'তে পাবে না। বিলাতে মিউনিসিপ্যালিটি চালিত ব্যবসাগুলি সবিশেষ দক্ষতাব সঙ্গে চালান' হ'যে থাকে। তাব কাবণ, সেখানকাব মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে কৃতি ব্যবসাযীব সংখ্যা যথেষ্ট, এবং তাবা তাদেব ব্যবসাযী-সুলভ মনোভাব ও কর্ম্ম-পদ্ধতিব সাহায্যে এইসব ব্যবসাব পবিচালনা কবে। বেশীব ভাগ দেশেই এই সুবিধা নাই, এবং সেই কাবণে সবকাবী কাববাবে তেমন সাফল্যও হযনি। এই প্রসঙ্গে আবও একটি বিষয উল্লেখযোগ্য। সবকাবী কাববাবে কর্ম্মচাবী নিযোগেব ব্যাপাবে সব সময যোগ্যতাব মর্য্যাদা দেওযা হয না। অনেক সমযে সদস্যদেব অনুবোধে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য ব্যক্তিবা চাকুবী পায। সবকাবী ব্যবসা যে অনেক জাযগায তেমন ভাল ভাবে চলে না, এও তাব একটি কাবণ। সবকাবী ব্যবসা থেকে সত্যকাবেব উপকাব পেতে হ'লে কবদাতাগণেব এই সব বিষযে অবহিত থাকা প্রযোজন। সবকাবী ব্যবসাযে আবও একটি অসুবিধা আছে। সমযে সমযে, ব্যবসাযেব ক্ষেত্র একটি সহবেব গণ্ডীব মধ্যে আবদ্ধ থাকায অতিকায কাববাবেব ব্যযসঙ্কোচেব উপাযগুলি অবলম্বন কবা যায না। ফলে তৈবী-খবচা বেশী পড়ে। জল বা বিদ্যুৎ শক্তি সবববাহেব ব্যাপাবে এ বকম সমস্যা অনেক জাযগাতেই হ'যে থাকে। এ সমস্যাব সমাধান হয, যদি কতকগুলি প্রতিবেশী সহবেব মিউনিসিপ্যালিটি এবং গ্রামাঞ্চলেব জেলা-বোর্ড মিলিতভাবে ঐ সব ব্যবসা কবে। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ড থেকে কযেকজন সদস্য নির্ব্বাচন ক'বে, তাদেব নিযে একটি বোর্ড গঠন কবা যায, এবং তাদেব হাতে এই ব্যবসাযের প্রতিষ্ঠা ও পবিচালনাব ভাব দেওযা যায। উদাহবণ স্বরূপ London Metropolitan Water Boardএব নাম উল্লেখ কবা যেতে পাবে।

যেমন মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নানা রকম ব্যবসা চালায, তেমনি প্রায সকল দেশেই কেন্দ্রীয সবকার কতকগুলি বড বড ব্যবসায চালায, যেমন পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, মালবাহী জাহাজ, ইত্যাদি। এখানেও সবকারেব চলতি আয থেকে, কিংবা জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা ধার কবে ব্যবসায প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হয়। এবং শেষ-

ক্ষমতা থাকে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে। ব্যবসা করার কাজ, যদি রাজ্য-শাসনের অঙ্গ হিসাবে সরকারী দপ্তর মারফৎ করা হয়, তা হ'লে সুফল পাওয়া শক্ত। কারণ ব্যবসা চালান'র নীতি এবং পদ্ধতি যদি দলগত রাজনীতির তর্ক বিতর্কের বিষয় হয়, তা' হ'লে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন ব্যবসা চালান সম্ভব হয় না। তা ছাড়া, সরকারী দপ্তরখানায় যে পদ্ধতিতে কর্ম্মচারীদের নিয়োগ, পদচ্যুতি, পদোন্নতি ও শাস্তি হয়, কিংবা অর্থব্যয় সংক্রান্ত যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা প্রতিপালন করা হয়, সেগুলি ব্যবসা চালান'র পক্ষে উপযোগী নয়। সেই জন্য, আলাদা আইনের দ্বারা একটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন ক'রে তাদের হাতে ব্যবসার কাজের ভার দেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশের রেলওয়ে বোর্ডের উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় সরকারী মালবাহী জাহাজ চালান'র জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

একচেটিয়া কারবার

(১)

বাজারে অনেকগুলি প্রতিযোগী যোগানদার থাকলে, কেউই খুসীমত মালের দর চড়িয়ে রাখতে পারে না। কারণ খরিদ্দার কম দরে মাল পেলে বেশী দরে কিনবে না। অতএব বাজারের প্রয়োজন মত পরিমাণের যোগান রাখবার জন্য যে সর্ব্বোচ্চ তৈরী-খরচা পড়ে, তার ওপর চলতি রীতি অনুসারে সামান্য কিছু লাভ রেখে সকলকেই বেচতে হয়। কেউই বেশী লাভের প্রত্যাশায় নিজের খুসিমত দর স্থির ক'রতে পারে না। কিন্তু যদি যোগানের সমস্তটুকু, কিংবা যোগানের প্রায় সমস্তটুকু একজনের বা একটি প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে এসে পড়ে, তা হলে যোগানের পরিমাণ বাড়িয়ে কমিয়ে যে রকম খুসী, দর নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া সম্ভব হয়। এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হ'লে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্টিত হয়। একচেটিয়া কারবারী এমন ভাবে দর স্থির করে, যাতে ক'রে তার নীট লাভ সবচেয়ে বেশী হয়। তার ফলে যে সব সময়েই দর অত্যন্ত বেশী হয়, তা নয়। অনেক সময়ে যথেষ্ট কম দর রেখেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হয় চার রকম কারণে ঃ—

১। প্রাকৃতিক কারণে ;

২। আইনের বলে ;

৩। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজনে: এবং

৪। প্রতিযোগিদের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে।

(২)

প্রকৃতির কার্পণ্যের দরুণ কোন সামগ্রী অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হ'লে, একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেডিয়াম ও হীরার ব্যবসার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমে যে সামান্য পরিমাণ রেডিয়াম পাওয়া যেত, তা আসৃত বোহেমিয়া থেকে। তারপর যখন আমেরিকায় নূতন খনির কাজ সুরু হ'ল, তখন থেকে দর নির্দ্দিষ্ট করবার ক্ষমতা আমেরিকার হাতে গিয়ে প'ড়ল। কিছুকাল পরে বেল্‌জিয়াম অধিকৃত কঙ্গো দেশে নূতন খনি আবিষ্কৃত হয়। সেখানে এত ভাল এবং এত বেশী মাল উঠতে লাগল যে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে আমেরিকার খনিগুলি কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হ'ল। অনেক দিন ধ'রে বেলজিয়ানরা রেডিয়ামের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেছিল এবং নিজেদের ইচ্ছামত দর নির্দ্দিষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু এই ধরণের একচেটিয়া অধিকার

দীর্ঘস্থায়ী করা শক্ত। কারণ, যেখানে অতিলাভের কারণ দুষ্প্রাপ্যতা, সেখানে অন্য কোথাও ঐ সামগ্রী পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে স্বভাবতঃই জোর অনুসন্ধান চলতে থাকে। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে কানাডায় নূতন খনি আবিষ্কৃত হ'ল, এবং সেখান থেকে যথেষ্ট পরিমাণ রেডিয়াম উঠ্‌তে লাগ্‌ল। দুই পক্ষে কিছুকাল দ্বন্দ্ব চলবার পর এখন তারা নিজেদের মধ্যে আপোষ ক'রে একজোটে দর নির্দ্দিষ্ট করবার ব্যবস্থা করেছে। নূতন জায়গা থেকে যোগান আসার ফলে কি ভাবে একচেটিয়া অধিকার ভেঙ্গে পড়ে, তার দৃষ্টান্ত হীরার ব্যবসাতেও দেখতে পাওয়া যায়। বহুকাল ধ'রে যা কিছু হীরার যোগান হ'ত তার প্রায় সবটুকই আসত দক্ষিণ আফ্রিকার ও জার্ম্মান অধিকৃত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চল থেকে। ঐ সমস্ত খনির মালিকেরা একজোট হ'য়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে হীরার ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত ক'রতে সমর্থ হয়। উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর এই অধিকার অক্ষুন্ন ছিল, এবং এই সময়ে তারা যোগান নিয়ন্ত্রিত ক'রে, এবং চড়া দর বেঁধে খুব বেশী হারে লাভ ক'রতে সমর্থ হয়েছিল। পরে বেলজিয়াম এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে এত বেশী পরিমাণে হীরা আসতে লাগল যে, তীব্র প্রতিযোগিতা সুরু হল এবং আগেকার অনেক খনি কাজ বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হল। এখন, এই সমস্ত খনির মালিকেরা মিলে একজোট হয়ে দর নির্দ্দিষ্ট করবার ব্যবস্থা করেছে।

আইনের দ্বারা সৃষ্টি করা একচেটিয়া অধিকারের দৃষ্টান্ত পেটেণ্ট ও কপিরাইট স্বত্বে পাওয়া যায়। যাতে লোকের নূতন যন্ত্রাদি ও নির্ম্মাণকৌশল আবিষ্কার করাতে উৎসাহ হয়, এবং নূতন নূতন বিষয়ে গবেষণা করায় ও বই লেখায় উৎসাহ হয়, সেইজন্য পেটেণ্ট ও কপিরাইট স্বত্ব দেওয়া হয়। কখন কখন রাজস্ব তোলার সুবিধার জন্য, গভর্ণমেণ্ট আইন ক'রে কোন কোন ব্যবসায় নিজেদের একচেটিয়া অধিকারে রাখে যেমন ফ্রান্সে তামাক ও দিয়াশলাইয়ের ব্যবসা।

(৩)

কতকগুলি ব্যবসায়ে এমন ধরণের যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার হয়, এবং এমন ধরণের শিল্প কৌশল অবলম্বন ক'রতে হয় যে, এক একটি এলাকায় এক একটি প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া অধিকার থাকলেই, তবে সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশী কাজ পাওয়া সম্ভব হয়। জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ব্যবসাগুলি, এবং ট্রামগাড়ী ও রেলগাড়ী চালানর ব্যবসা এই থাকে পড়ে। এই সব শিল্পগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, এর প্রত্যেকটিতেই কাজ আরম্ভ করবার আগে অনেক খরচ ক'রে, মাটীতে বসান' পাকাপোক্ত সরঞ্জামের ব্যবস্থা ক'রতে হয়। জল বা গ্যাস সরবরাহ ক'রতে হ'লে রাস্তার নীচে মোটা মোটা নল বসাতে হয়। ঐ রূপ নলের পথে জল কিংবা গ্যাসের সরবরাহ হয়, এবং রাস্তার দুধারের যে কোন জায়গায়, সরু নল দিয়ে এই নলের সঙ্গে যোগ ক'রে, পৌঁছে দেওয়া হয়। সেইরকম, বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করবার জন্য প্রথমে মাটীর তলা দিয়ে, কিংবা মাটীর ওপর খুঁটি পুঁতে তার

ওপর দিয়ে মোটা তার বসিয়ে, সেই পথে বিদ্যুৎ-শক্তি নিয়ে যাওয়া হয়; এবং সেই তারের সঙ্গে সরু তার দিয়ে যোগ ক'রে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়। যেখানে যেখানে এই ভাবে যোগ স্থাপন করা হয়েছে, শুধু সেইখানে সেইখানেই এই সব জিনিষ সরবরাহ করা যায়। ট্রাম বা রেলগাড়ী চলাচলের জন্যও তেমনি প্রথমে মাটির ওপরে লাইন বসাতে হয়। যতদূর পর্য্যন্ত লাইন গেছে, তার বাইরে কোন গাড়ী যেতে পাবে না। এই হিসাবে, এই সমস্ত শিল্পগুলিকে ভূমি-সংলগ্ন শিল্প বলা চলে।

জন-সাধারণের স্বার্থের খাতিরে, সরকারী ব্যবস্থায়, এই সব ব্যবসায়ে এক একটি এলাকায় এক একটি কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। পথের জমিতে নল বসাবার বা লাইন পাতবার জন্য সরকারের অনুমতি ও সাহায্য দরকার। এই অনুমতি এক একটি এলাকায় একটির বেশী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় না। কেন এ রকম করা হয় তা, উপরে উল্লেখ করা বিশেষত্বটি মনে রাখলে সহজেই বোঝা যায়। এই সব ব্যবসায়ে যে টাকা ফেলা হয় তার প্রধান অংশ, স্থায়ী মূলধন বাবদ্ খরচ হয়। যেমন, জল মজুত রাখবার জন্য ট্যাঙ্ক বসান; জলবাহী বা গ্যাসবাহী নল পাতা; পাম্পের ব্যবস্থা করা, বিদ্যুৎ শক্তি তৈরীর যন্ত্রাদি বসান এবং বিদ্যুৎবাহী তার খাটান, রাস্তায় ট্রামের লাইন পাতা, এবং উপর দিয়ে বিদ্যুৎবাহী তার নিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। এ ছাড়া, এ সব ব্যবসা চালু হবার পরে যে চলতি খরচা ক'রতে হয় তারও বেশীর ভাগটা লাগে ঠাট বজায় রাখতে।। কাট্‌তি বেশীই হউক কি কমই হউক, এই খরচা সমান হারে ক'রে যেতে হয়। একখানা ট্রামগাড়ীতে ২ জন যাত্রীই যাক্ কি ৪০ জনই যাক, ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর, ইনস্‌পেক্টর বা ম্যানেজারের মাহিনা বা আফিস চালান'র তাবৎ খরচ, কোনটিরই কোন ব্যতিক্রম হয় না। একটি রেলপথে ২০ খানি ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে যতগুলি ইঞ্জিনিয়র, ষ্টেশন-মাষ্টার বা অন্যান্য কর্ম্মী দরকার, ২ খানি ট্রেনের জন্যও তাই। ২০ খানার জায়গায় যদি ২২ খানা ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় তা' হ'লে বাড়তি খরচের মধ্যে কিছু কয়লা ও কিছু তেল ইত্যাদি লাগবে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ড্রাইভার বা গার্ডদের কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে হ'তে পারে। তার মানে, দু খানা বাড়্‌তি ট্রেণ চালাতে যে বাড়্‌তি খরচ প'ড়বে সেটি সমগ্র খরচের তুলনায় নগণ্য বলা চলে। জল, গ্যাস বা বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের ব্যাপারেও এই একই মন্তব্য করা চলে। যোগান বাড়াবার ফলে যে বাড়্‌তি খরচা পড়ে, তা সমগ্র খরচের তুলনায় অতি সামান্য। এ সব ব্যবসায়ে যে পণ্য উৎপাদন করা হয়, বা এগুলি দ্বারা যে উপকার পরিবেশন করা হয়, তার তৈরী-খরচার মুখ্য অংশটি (Prime cost) অপ্রধান, এবং আনুষঙ্গিক অংশটিই (Supplementary cost) প্রধান। যোগানের পরিমাণ যেমন বাড়ে, তৈরী-খরচার মুখ্য অংশটি সমান অনুপাতে বাড়ে বটে; কিন্তু

আনুষঙ্গিক অংশটি আগেকার মতই থেকে যায়। এই অংশটিই প্রধান হওয়ার দরুণ, যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যোগানের প্রতি মাত্রার নীট তৈরী-খরচা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে। তৈরী খরচা কম না হ'লে, কম দরে যোগান দেওয়া যায় না। অতএব, যদি একটি এলাকার সমস্ত চাহিদাটুকু মেটাবার ভার একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে, তবেই দর সবচেয়ে কম হ'তে পারে। সুতরাং, জনস্বার্থের খাতিরে, এই সব ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কারণ, যে কাজ এক প্রস্থ মূলধনী সামগ্রীর সাহায্যে এবং এক প্রস্থ আনুষঙ্গিক খরচার পাওয়া যায়, তার জন্য দুই প্রস্থ লাগাতে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দেশের সঙ্গতির অপচয় করবার অনুমতি ও উৎসাহ দেওয়া।

সরকারী অনুমতি পাওয়ার বাধা যদি না থাকৃত তা হ'লেও এই সব ব্যবসায়ে, একটি এলাকায় দুটি প্রতিষ্ঠান থাকার সম্ভাবনা খুবই কম হ'ত। কারণ প্রথমতঃ, কাজ সুরু করবার আগেই অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা ক'রতে হয়। অতএব অত্যন্ত ধনী প্রতিষ্ঠান না হ'লে প্রতিযোগী হ'য়ে নাম্‌বার সামর্থ্য ও সাহস হ'তে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, চল্‌তি খরচার আনুষঙ্গিক অংশটিই প্রধান হওয়াতে, যার গ্রাহক-সংখ্যা কিছু বেশী তার মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচা কম হবে। অতএব তার পক্ষে দর কমিয়ে প্রতিযোগীর গ্রাহক ভাঙ্গিয়ে নেওয়া এবং প্রতিযোগীকে হটিয়ে দেওয়া সহজ হবে। গ্রাহক-সংখ্যা যত বাড়বে তৈরী-খরচা তত কম্‌বে; অর্থাৎ আনুপাতিক বল তত বাড়বে। অতএব দর ততই কমান' সম্ভব হবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগীর পক্ষে কারবার গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

উপরোক্ত ব্যবসায়গুলির মত, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবসাতেও জনস্বার্থের খাতির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কারণ, এই সমস্ত ব্যবসার দ্বারা যে উপকার পরিবেশন করা হয়, তারা প্রকৃতিই এ রকম যে, প্রত্যেক এলাকায় একটির বেশী প্রতিষ্ঠান থাকলে, পুরোপুরী উপকার পাওয়া যায় না। একটি সহরে যদি ২টি টেলিফোন কোম্পানী কাজ চালায়, তা হ'লে গ্রাহকদের মধ্যে এক ভাগের সঙ্গে যোগ থাকবে এক কোম্পানীর, ও আর এক ভাগের সঙ্গে যোগ থাকবে অন্য কোম্পানীর। এক কোম্পানীর গ্রাহক অন্য কোম্পানীর গ্রাহকের সঙ্গে টেলিফোন যোগে কথাবার্ত্তা চালাতে পারবে না। এ রকম হলে টেলিফোন রাখার সুবিধা অনেকাংশে ক্ষুন্ন হবে।

(৪)

জনস্বার্থের খাতিরে ভূমিসংলগ্ন ব্যবসায়গুলিতে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন হওয়াতে, একদিকে যেমন সরকারের তরফ থেকে একই এলাকায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ করবার অনুমতি দেওয়া হয় না, অন্যদিকে তেমনি একচেটিয়া কারবারী যাতে অতি

লাভের লোভে গ্রাহকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করতে না পারে, তার জন্যও উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করবার ব্যবস্থা করতে হয়। যেখানে যোগানদারে যোগানদারে প্রতিযোগিতা থাকে, সেখানে খরিদ্দারের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয় না। কারণ, প্রত্যেক যোগানদারই জানে যে, লাভ বেশী করতে হলে, বিক্রী বাড়াতে হবে, এবং বিক্রী বাড়াতে হলে খরিদ্দারকে খুসী করতে হবে। অতএব যোগানদারদের মধ্যে একটা রেষারেষি চলে' কে কত কম দামে কত ভাল জিনিষ, বা কত ভাল কাজ দিতে পারে। ফলে, গ্রাহকেরা কম দামে ভাল জিনিষ বা ভাল কাজ পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে। একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রাহকেরা এই স্বয়ং-ক্রিয় রক্ষাব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়। তখন সরকারের পক্ষে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলে চলে না। এই হস্তক্ষেপ নানা উপায়ে করা হয়ে থাকে।

একটি উপায় হচ্ছে, লাভের পরিমাণ বেঁধে দেওয়া। যত মূলধন খাটবে তার ওপর একটি নির্দ্দিষ্ট হারের চেয়ে বেশী লাভ করা চলবে না। উদ্দেশ্যটা এই যে, তার চেয়ে বেশী লাভ হবার সম্ভাবনা হ'লে, দর কমিয়ে সেটা খাইয়ে দেওয়া হবে। যদি বেশী লাভ হয়, তা হলে উদ্বৃত্ত অংশটি সরকারের প্রাপ্য হবে। এই উপায়ে অনেক ক্ষেত্রে মোটামুটি সুফল পাওয়া গেলেও, এর দুটি বড় রকমের গলদ আছে। একটি হচ্ছে, মূলধনের যা উচিত মূল্য, তার চেয়ে বেশী করে দেখান'। যে ব্যবসা পত্তন করেছে বা পত্তন করবার অনুমতি পেয়েছে সে, নূতন কোম্পানী গ'ড়ে, কাজের ভার তাদের হাতে তুলে দেবার সময়, মূল্য হিসাবে তার যা ন্যায্য পাওনা তার চেয়ে অনেক বেশী', নগদে এবং শেয়ারে নিতে পারে। এই সমস্ত টাকাটাই কোম্পানীর মূলধন ব'লে গণ্য হবে। ফলে, খুব বেশী রকম লাভ ক'রলেও লাভের হার কষবার সময় মূলধনের এই ফাঁপান অঙ্কের হিসাবে কষা হবে ব'লে, কাগজে কলমে কম দেখান যাবে। মূলধন ফাঁপানর আর একটি কৌশল হচ্ছে, বাড়তি লাভ মজুত তহবিলে (Reserve Fund) নিয়ে যাওয়া, এবং ঐ পরিমাণের নূতন শেয়ার মালিকদের মধ্যে, বাড়তি টাকা না নিয়ে বিলি করে দেওয়া। আর একটি গলদ এই যে, এর ফলে, তৈরী-খরচা কমাবার আকিঞ্চন থাকে না; বরঞ্চ পরিচালনার কাজে ব্যয়বাহুল্যের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাতে খরিদ্দারের কোন উপকার হয় না।

খরিদ্দারদের স্বার্থ রক্ষা করবার আর একটি উপায় হচ্ছে, দর বেঁধে দেওয়া। একচেটিয়া কারবারী প্রধানতঃ চড়া দরের সাহায্যে বেশী লাভ করবার চেষ্টা করে। অতএব যদি দরের একটি সর্ব্বোচ্চ অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়, যে এর চেয়ে বেশী দর নেওয়া চলবে না, তা হ'লে খরিদ্দার নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। তবে এ উপায়ের মুস্কিল এই যে, উচিৎ দর ঠিক্ করা আপাতদৃষ্টিতে যতটা সহজ বলে মনে হয়, আসলে তা নয়। বড় বড় যন্ত্রশিল্পে এত রকমের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়, এবং

এত রকমের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয় যে, ঠিক মত পড়তা ক'ষতে অতিশয় সূক্ষ্ম হিসাবের দরকার হয়। বিচক্ষণ ও বহুদর্শী শিল্প-পতিদেরও এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধান হতে হয়। এবং অনেক সময়ে পরীক্ষামূলক ভাবে বিভিন্ন দর রেখে, প্রত্যেকটির ফল কি রকম হয় বিশ্লেষণ ক'রে তবে তারা পাকাপাকিভাবে দর স্থির ক'রতে পারে। সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে এই কাজ ঠিক ভাবে করা সহজ নয়। ফলে, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী সর্ব্বোচ্চ দর এত উঁচিয়ে ধরা হয় যে, গ্রাহকদের তাতে কোন সুবিধা হয় না। কারণ তার চেয়ে কম দর রেখেই একচেটিয়া কারবারী সবচেয়ে বেশী নীট লাভ আদায় ক'রতে পারে।

আর একটি উপায় হচ্ছে, ব্যবসায়টি সরকারী ব্যয়ে পত্তন ক'রে, পরিচালনার জন্য কোন কোম্পানীকে, একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে 'লীজ' অর্থাৎ ভাড়া দেওয়া। এক-চেটিয়া অধিকার থাকার দরুণ যে অতিরিক্ত লাভ হ'বার সম্ভাবনা আছে তার সবটুকু, বা তার প্রায় সবটুকু, লীজের মূল্য হিসাবে আগে থেকেই আদায় করে নেওয়া চলে। এতে ক'রে অবশ্য খরিদ্দারদের, দর সম্বন্ধে, কোন সুবিধা হয় না। কিন্তু অতিরিক্ত লাভটি কোম্পানীর মালিকদের ব্যক্তিগত লাভ না হ'য়ে, সরকারের হাতে যাওয়াতে এই অর্থের দ্বারা পরোক্ষ ভাবে জনসাধারণের উপকার হয়। পরিচালনার কাজে কোম্পানীকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ে যা লাভ হবে তার সবটুকুই কোম্পানীর প্রাপ্য হওয়াতে, মিতব্যয়িতা ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার দিকে কোম্পানীর যথেষ্ট নজর থাকে। তবে অপকৃষ্ট কাজ দিয়ে খরিদ্দারদের বঞ্চিত করার ঝোঁক থাকার একটা সম্ভাবনা থাকে। এ সম্বন্ধেও, লীজ দেবার সময় খরিদ্দারদের স্বার্থের অনুকূল কতক-গুলি সর্ত্ত আরোপ ক'রে, সতর্ক হওয়া সম্ভব। এ ব্যবস্থার একটি গলদ হচ্ছে এই যে, লীজের সময় যথেষ্ট বেশী না হ'লে দীর্ঘ-মেয়াদী ও ব্যয়বহুল মূলধন নিয়োগ ও কর্ম্ম-ব্যবস্থা অবলম্বনের আকিঞ্চন থাকে না। এবং লীজ উত্তীর্ণ হবার সময় যখন কাছে এসে পড়ে, তখন কম সময়ের মধ্যে কত বেশী লাভ করা যায় সেই দিকেই নজর থাকে, এবং চালু যন্ত্রপাতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মেরামত পর্য্যন্ত হয় না।

শেষ উপায় হচ্ছে, এই সব ব্যবসায়গুলি সরাসরি সরকারের হাতে নেওয়া ; তার মানে সরকারী ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা, এবং শাসনকার্য্যের অঙ্গ হিসাবে সরকারী দপ্তর মারফৎ পরিচালনা করা। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই, এমন কি আমেরিকাতেও, আজকাল এই ব্যবস্থার প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাফের ব্যবসা এখন সব দেশেই সরকারের হাতে। ভারতে সম্প্রতি টেলিফোনের ব্যবসায়ও সরকারের হাতে নেওয়া হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিশেষ দপ্তর মারফৎ এই তিনটি ব্যবসায় চালান হয়। ভারতে রেলপথগুলি সরকারী সম্পত্তি এবং সরকারী পরিচালনার অধীন।

বিলাতে, ফ্রান্সে, জার্ম্মানীতে এবং অন্য অনেক দেশেও রেল চালানর ব্যবসা সরকারের হাতে। সহরে জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ এবং ট্রামগাড়ী চালানর ব্যবসায়গুলি অনেক জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটির কাজের অন্তর্গত। আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সাধারণতঃ জল সরবরাহের কাজ ছাড়া অন্য ব্যবসায়গুলির দায়িত্ব নেয় না। তবে আইনতঃ তাদের অন্য ব্যবসায়গুলি চালাবার ক্ষমতা আছে। সম্প্রতি মাদ্রাজে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের কাজ পুরোপুরি সরকারের হাতে নেওযার জন্য উপযুক্ত আইন পাস করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

যারা সরকারের হাতে ব্যবসা চালানর ভার দেওয়া পছন্দ করে না, তাদের প্রধান যুক্তি হ'ল এই যে, ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা না থাকলে ব্যয়-সঙ্কোচের আকিঞ্চন থাকে না, এবং শিল্প-কৌশলের উন্নতি করবারও চেষ্টা থাকে না। সরকারী কর্ম্মচারীরা জানে যে, যেমন তেমন ক'রে কাজ ক'রলেও চাকুরী বজায় থাকে ; এবং যতই দক্ষতা ও উৎসাহ দেখান হউক না কেন, তার জন্য বিশেষ কোন পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। এই জন্য তাদের কাছ থেকে ভাল কাজ প্রত্যাশা করা যায় না। এ যুক্তির এই জবাব দেওয়া চলে যে বেসরকারী অতিকায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে অধিষ্ঠিত থাকে তারা সকলেই বেতনভুক্ কর্ম্মচারী। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি তাদের কাছ থেকে সন্তোষজনক কাজ পায়, তা হ'লে সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে না পাবার কোন কারণ নাই। এ সম্পর্কে আরও যুক্তি এই দেখান হয যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার কাজে শেষ ক্ষমতা থাকে ডিরেক্টরদের হাতে, যারা প্রায় সকলেই বহুদর্শী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী হ'যে থাকে। অন্যপক্ষে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষে যারা থাকে তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে নামজাদা লোক হ'লেও, ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ। তা ছাড়া, অধস্তন কর্ম্মচারীদের নিয়োগ ও পদবৃদ্ধির ব্যাপারে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার যেরূপ কদর দেওয়া হয়, সরকারী প্রতিষ্ঠানে তা হয না। এখানে স্বজন পোষণ ও দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা বড় বেশী রকম প্রশ্রয় পায। এই অভিযোগর মধ্যে যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। সরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সত্য-কার উপকার পেতে হ'লে ঐগুলির পরিচালনার কাজ, যথাসম্ভব দৈনন্দিন দেশ-শাসনের কাজ থেকে পৃথক করে রাখা দরকার। ভারত সরকারের রেল ব্যবসায় পরিচালনার ব্যবস্থায় এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। একটি বিশেষ আইনের দ্বারা স্বতন্ত্র রেলওয়ে বোর্ড গঠন ক'রে তাদের হাতে পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের রেল বিভাগের মন্ত্রী অবশ্য এই বোর্ডের সভাপতি। কিন্তু অন্যান্য সভ্যদের বেশীর ভাগ বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞদের ভেতর থেকে নির্ব্বাচন করা হয়। ব্যবসায়ের মূলনীতি মন্ত্রীমণ্ডলী স্থির করে। কিন্তু দৈনন্দিন পরিচালনার ব্যাপারে বোর্ডের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত

হয়। সম্প্রতি ছয়টি * সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সম্বন্ধে এই নীতি স্থির হয়েছে যে, লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালনার ভার যেমন এক একটি 'বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স্' এর হাতে থাকে, এগুলির জন্যও সেই রকম এক একটি 'বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স্' গড়া হবে। এই বোর্ডগুলিতে সরকারী কর্ম্মচারীও থাকবে, এবং বেসরকারী লোকও নেওয়া হবে।

সহরে জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ কিংবা ট্রাম চালান' প্রভৃতি ব্যবসায়গুলি সহরের মিউনিসিপ্যালিটির হাতে থাকার সপক্ষে সুযুক্তি আছে। গ্রাহকেরা সকলেই সহরের অধিবাসী; অতএব চাহিদার পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন নয়; এবং এই পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনাও কম। তা ছাড়া এ সব ব্যবসাগুলি অনেক দিনের চালু সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়। অতএব এগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র-পাতি ও সাজ সরঞ্জাম এবং সুদক্ষ কর্ম্মচারী সংগ্রহ করা কঠিন নয়। এই সব কারণে, এই সমস্ত ব্যবসায়ে লোকসান হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বিষয় চিন্তা করবার থাকে। সাধারণ সহরগুলি আয়তনে বিশেষ বড় হয় না। যদি প্রত্যেক সহরে উপরোক্ত ব্যবসাগুলি চালাবার জন্য আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়া হয়, তা হলে অতিকায় কারবারের সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কতকগুলি সহর ও তার অন্তর্বর্ত্তী গ্রামাঞ্চল নিয়ে একটি বড় এলাকার জন্য একটি ক'রে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার। পরিচালনার জন্য রেলওয়ে বোর্ডের অনুরূপ বোর্ড গঠন ক'রে তাদের হাতে সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করাই সমীচীন। প্রত্যেক সহরের দু এক জন প্রতিনিধিকে এই বোর্ডে স্থান দেওয়া চলে। তা' হ'লে কোথাও কোন অভাব অভিযোগের কারণ। ঘট্‌লে অনায়াসে কর্ত্তৃপক্ষের নজরে এনে তার প্রতিবিধান করা সহজ হবে। সম্প্রতি দিল্লী অঞ্চলে যানবাহন চলাচলের ব্যবসায়টি একটি আধা সরকারী বোর্ডের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

* The Hindustan Air craft factory, the Sindri Fertiliser Factory The Penicilin Factory The Machine Tool Factory, The Cable Factory and The Delhi Pre-fab Factory.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১

জোট বেঁধে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা

বাজারে প্রতিযোগিতা থাকলে খরিদ্দারের জোর থাকে। কারণ প্রত্যেক যোগানদারকেই নিজের স্বার্থের খাতিরে খরিদ্দারদের খুসী রাখবার চেষ্টা ক'রতে হয়। যেটা খরিদ্দারদের সুবিধা, সেটা যোগানদারের অসুবিধা। যোগানদারেরা যদি নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কমাতে পারে কিংবা একেবারে বন্ধ ক'রতে পরে, তা হ'লেই তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির সুবিধা সবচেয়ে বেশী হয়। এই কাজ তারা অনেক ক্ষেত্রে, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে করবার চেষ্টা করে। মেয়াদ ও উদ্দেশ্য ভেদে এই চুক্তি নানা ধরণের হ'য়ে থাকে। তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। **কর্ণার**—অল্প কয়েক দিনের জন্য বাজার দখল করবায় উদ্দেশ্যে এক রকম জোট বাঁধা হয়ে থাকে, তাকে ইংরাজীতে বলে কর্ণার (Corner)। 'কর্ণার' করা মানে কোন-ঠেসা করা। জনকতক ব্যাপারী, যুক্তি ক'রে কোন একটি মাল বাজারে যতখানি মজুত আছে, তার সমস্তটুকু বা প্রায় সমস্তটুকু কিনে নেয়। সময়ে সময়ে দু চার দিনের মধ্যে যে সমস্ত মাল আস্‌বার সম্ভাবনা আছে, সেগুলিও আগাম কিনে নেয়। এই ভাবে সমস্ত যোগানটিকে হাত ক'রে, দর চড়িয়ে, অপরিমিত লাভ করবার চেষ্টা করে। বাজারে অস্বাভাবিক কারণে মালে টান ধরেছে সেটা বুঝতে, এবং বাইরে থেকে বাড়তি মাল আমদানী করবার ব্যবস্থা করতে, বাজারের খানিকটা সময় লাগে। সেই সময়টুকুর মধ্যেই ঐ ব্যাপারীরা বেশ কিছু লাভ করে নেয়। অবশ্য এমনও হয় যে, অপ্রত্যাশিতভাবে যথেষ্ট বাড়তি যোগান বাজারে এসে পড়্‌ল। তখন, যারা দুষ্ট বুদ্ধি করেছিল, তাদের ঠকতে হয়।

২। **বাঁধা দরে বিক্রি করার চুক্তি**—এতে সকলে মিলে ঠিক্ করে যে, একটা নির্দ্দিষ্ট দরের চেয়ে কম দরে কেউ মাল বিক্রি করবে না। বিলাতে রুটি, দুধ, কয়লা, জুতা, জামা কাপড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিষ বিক্রির ব্যাপারে এই ধরণের চুক্তির দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। কলিকাতায়, সরকারী নিয়ন্ত্রণের যুগের আগে, পিতল কাঁসার বাসন, লোহার পাইপ প্রভৃতি কোন কোন জিনিষের ব্যবসায়ে এই ধরণের দর বাঁধার চুক্তির সন্ধান পাওয়া যেত। আন্তর্জাতিক বানিজ্যেও এই ধরণের চুক্তি বিরল নয়। চিনি, রবার সিমেণ্ট, লোহা, ইলেক্‌ট্রিকের জিনিষ প্রভৃতি অনেক জিনিষেরই দর বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে। বড় বড় জাহাজী কোম্পানীগুলি একজোটে আনা নেওয়ার মাশুল ঠিক্ করে, এবং সেই

দরে সকলে কাজ করে। জাহাজী কোম্পানীদের সংহতির নাম 'শিপিং কন্‌ফারেন্স্' (Shipping Conference)। দর বাঁধার চুক্তিগুলি প্রায়ই বেশী দিন বজায় থাকে না। তার কারণ দর উঁচিয়ে ধরার দরুণ লাভ বেশী হ'তে থাকে। ফলে যোগান বাড়াবার চেষ্টা হ'তে থাকে, যাতে লাভ আরও বেশী হয়। কিন্তু দর বেশী হ'লে চড়া দরে সবটুকু বিক্রি করা যায় না। অতএব দর কমাবার দিকে চাপ পড়ে, এবং চুক্তি ভেঙ্গে যায়।

৩। **যোগান কম রাখার চুক্তি** বাজার মন্দার সময় এই ধরণের চুক্তি প্রায়ই হ'য়ে থাকে। যেমন, কলকাতায় চট্‌কলের মালিকেরা কোন সময়ে মাসে কেবল তিন হপ্তা কাজ চালু রাখবার চুক্তি করে, কখনও বা কতকগুলি তাঁত 'সীল' (Seal) ক'রে বন্ধ রাখবার ব্যবস্থা করে, এই রকম। আন্তর্জাতিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে রবার, চিনি, তামা, টিন, দস্তা প্রভৃতি নানা সামগ্রীর যোগান নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা অনেকবার হয়েছে।

৪। **'পুল'** (Pool) বা লাভ ভাগ ক'রবার চুক্তি—এই ধরণের চুক্তির একটা রকম আছে যাতে, যে যত পরিমাণে মাল তৈরী ক'রবে, সেই অনুপাতে একটি নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা জমা দেবে। যত টাকা জমা প'ড়ল, তার একটা ভাগ জমা-তহবিলে (Reserve Fund) রেখে বাকিটুকু সকলের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। আর এক রকমে, প্রত্যেকে কে কত মাল তৈরী ক'রবে তার পরিমাণ ঠিক ক'রে দেওয়া হয়। যে নিজের বরাদ্দের চেয়ে বেশী মাল তৈরী ক'রবে সে, যতখানি বাড়তি তৈরী করেছে তার অনুপাতে একটা জরিমানা দেবে। তাই থেকে, যে বরাদ্দের চেয়ে কম তৈরী করেছে সে যতখানি কম করেছে, সেই পরিমাণে খেসারৎ পাবে।

৫। **কণ্ট্রাক্ট (Contract=বরাৎ) ভাগ করার চুক্তি**—যে সব ব্যবসায়ে টেণ্ডার (Tender=মাল সরবরাহ করার প্রস্তাব) দিয়ে কণ্ট্রাক্ট পেতে হয়, সেই সব ব্যবসায়ে এই ধরণের চুক্তি হয়। সকলে মিলে একটি সমিতি গড়ে, এবং সেই সমিতি ঠিক্ করে দেয়, কে কোন্ কণ্ট্রাকটি পাবে। ব্যবস্থা করা হয় যে, অন্যেরা হয় টেণ্ডার দেবে না কিংবা বেশী দরে টেণ্ডার দেবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এক একটি এলাকা এক এক জনকে বরাদ্দ করে দেওয়া হয়।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে ধরণের সব চুক্তির উল্লেখ করা হ'ল সেগুলির কোনটিতেই চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাতন্ত্র্যে বিশেষ হাত পড়ে না। এগুলির মেয়াদও বেশী দিনের জন্য হয় না। এর পর যে সব চুক্তির উল্লেখ করা হবে, সেগুলির কোনটিতে কম, কোনটিতে বেশী, কোনটিতে বা সম্পূর্ণভাবে স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করার ব্যবস্থা থাকে।

৬। **'কার্টেল'** (Cartel)—'কার্টেল' শব্দটি জার্ম্মান ভাষার, এবং জার্ম্মানীতেই এই ধরণের সংহতির বিশেষ প্রসার দেখা যায়। এর প্রধান বিশেষত্ব এই যে চুক্তিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সকলে মিলে একটি বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে

যা মাল তৈরী হয়, তার সমস্তটুকু এই বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কেউই স্বতন্ত্র বিক্রয়-ব্যবস্থা রাখে না। সমস্ত মাল এই বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান মারফৎ বিক্রয় হয়। কে কত মাল তৈরী ক'রবে, তাও অনেক সময়ে নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। চুক্তির সময়ে একটা হিসাব রাখার দর ঠিক্ হয়। বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান এই দরে মালগুলি কেনে, এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের হিসাবে তার পাওনা টাকা জমা তোলে। দেশ বিদেশের বিভিন্ন বাজারে এই সব মাল বিক্রি করবার সমস্ত ব্যবস্থা বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান করে। অনেক সময়ে বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দরে বিক্রয় করা হয়, যাতে নীট লাভ সবচেয়ে বেশী হয়। প্রত্যেক চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান মাল তৈরীর অনুপাতে এই লাভের অংশ পায়। এখানে দেখা গেল, মাল তৈরীর কাজে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের আগেকার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে; কিন্তু মাল বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্রভাবে কিছু করবার হাত থাকে না। দীর্ঘ-মেয়াদী কার্টেল-চুক্তিতে কখনও কখনও মাল তৈরীর কাজেও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকে; যেমন, যন্ত্রপাতি ও নির্ম্মান-কৌশল সম্বন্ধে পরস্পরকে পরামর্শ দেওয়া, পেটেণ্ট-স্বত্ব আদান প্রদান করা, ইত্যাদি।

বিলাতে ও আমেরিকায় এই ধরণের সংহতির বিশেষ প্রসার হয় নি। তার কারণ বিলাতের আইনের বিশেষত্ব। জার্ম্মানীতে কার্টেল-চুক্তি বদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে, চুক্তির সর্ত্ত পালনে আইনের সাহায্যে বাধ্য করা যায়। সেইজন্য সেখানে আরও ঘনিষ্ঠতর সংহতি স্থাপনের কোন প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু বিলাতে এবং আমেরিকায়, যে চুক্তি ব্যবসায়ে স্বাধীন চেষ্টার অধিকার খর্ব্ব করে, সে চুক্তি আদালতে গ্রাহ্য হয় না। অতএব চুক্তিভঙ্গকারীকে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করা যায় না। যাতে চুক্তির সর্ত্তাবলী আইনের সাহায্যে বলবৎ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে তিন রকমের সংহতি স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে।

১। **'ট্রাষ্ট'** (Trust)—এক রকমের নাম 'ট্রাষ্ট'। বিলাতে 'ট্রাষ্টের' আইনের উৎপত্তি হয়, মৃত পিতার নাবালক পুত্রকন্যার স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে। অনেক সময়ে লোকে মৃত্যুকালে তাদের সমস্ত সম্পত্তি কোন বিশ্বাসী বন্ধুকে দান ক'রে যেত, এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে, তার নাবালক পুত্রকন্যার ভরণ পোষণ ও শিক্ষার জন্য ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করা হবে, এবং তারা সাবালক হ'লে, উদ্বৃত্ত সম্পত্তি তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ঐ বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলে তখনকার দিনের আইনে তার কোন প্রতিকার ছিল না। কারণ দান করা হ'লে, আইনের চক্ষে গ্রহীতার সম্পূর্ণ স্বত্ব সাব্যস্ত হ'ত। আইনের এই ফাঁক পূরণ করবার জন্য ধীরে ধীরে ট্রাষ্টের আইন গ'ড়ে ওঠে। এইরূপ দানের নাম হ'ল 'ট্রাষ্ট' সৃষ্টি করা (Trust করা মানে বিশ্বাস করা)। ঐ বন্ধুকে আইনের ভাষায় 'ট্রাষ্টী' বলা হয়। ট্রাষ্টের আইন অনুসারে, ট্রাষ্টী যদি

ট্রাষ্টের সর্ত্ত ভঙ্গ করে তা' হ'লে তার শাস্তির ব্যবস্থা হয়। আমেরিকার শিল্পপতিরা এই ট্রাষ্টের আইন কাজে লাগিয়ে, সংহতি গঠন করবার চেষ্টা করেছিল। 'ট্রাষ্ট' গঠন করবার ধারা হচ্ছে, প্রথমে জনকতক লোককে ট্রাষ্টী খাড়া করা হয়। তারপরে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান একজোট হ'তে চায়, তাদের শেয়ারের মালিকেরা নিজেদের শেয়ারগুলি এই ট্রাষ্টীদের দান করে দেয়, এবং বদলে সেই দামের 'ট্রাষ্ট সার্টিফিকেট' (Trust Certificate - ট্রাষ্টের নিদর্শন পত্র) পায়। সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানী স্বত্ব এই ভাবে ট্রাষ্টীদের হাতে আসার দরুণ, তাদের মনোনীত লোকেদের হাতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার দেওয়া সম্ভব হয়, এবং এই ভাবে প্রত্যেক জায়গায় তাদের অনুমোদিত নীতি ও কর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে কাজ চালাতে পারা যায়। আমেরিকায় এক সময়ে ট্রাষ্টের বহুল প্রসার হয় কিন্তু পরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ট্রাষ্টের (Standard Oil Trust) এক মামলায় আদালতে সিদ্ধান্ত হয় যে, এক আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য অন্য আইনের সাহায্য নেবার চেষ্টা আইনসঙ্গত নয়। অতএব ট্রাষ্টের সর্ত্তাবলী আইনের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না। এখন আর আসল ট্রাষ্ট গঠন করা হয় না। তবে সাধারণভাবে বড় বড় 'হোল্ডিং কোম্পানী' (Holding Company = স্বত্বধারী কোম্পানী) ও 'অ্যামালগামেসন্'গুলিকে (Amalgamation = যুক্ত কারবার) ট্রাষ্ট নামে অভিহিত করা হয়।

৮। **হোল্ডিং কোম্পানী** (Holding Company — স্বত্বধারী কোম্পানী) এক্ষেত্রে একটি কোম্পানী নিজের শেয়ারের বিনিময়ে কতকগুলি কোম্পানীর সমস্ত বা বেশীর ভাগ শেয়ার কিনে নেয়। এই স্বত্বধারী কোম্পানীটি একটি সম্পূর্ণ নূতন কোম্পানীও হ'তে পারে, আবার সংযোগকামী কোম্পানীগুলির মধ্যেও একটি হ'তে পারে। প্রত্যেক কোম্পানীর বাইরের ঠাট ঠিক আগেকার মতই বজায় থাকে, এবং প্রত্যেকেই আগেকার মত স্বতন্ত্রভাবেই কারবার করে। কিন্তু, স্বত্বধারী কোম্পানী সকলের স্বার্থের অনুকূল একটি সাধারণ নীতি নির্দ্ধারণ করে, এবং সকল জায়গায় যাতে সেই নীতি অনুসারে কাজ চলে, তার ব্যবস্থা করে। 'ইম্পিরিয়ল কেমিক্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রীস্ লিমিটেড' (Imperial Chemical Industries Ltd.) এই রকমের একটি স্বত্বধারী কোম্পানী।

৯। **যুক্ত কারবার** (Amalgamation বা Merger)*— এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কোম্পানীগুলির আর পৃথক সত্তা বজায় থাকে না। সবগুলি মিলে মিশে এক হ'য়ে যায়, এবং তাদের নিয়ে একটি নূতন বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ইম্পিরিয়ল টোব্যাকো কোম্পানী (Imperial Tobacco Company) এই রকমের একটি যুক্ত কারবার।

* Amalgamation করা মানে যোগ করে দেওয়া। Merge করা মানে একটার ভেতর আর একটা মিশিয়ে দেওয়া।

(২)

সংহতি গঠন সহজ কাজ নয়।

বাজারে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কত রকমে জোট বাঁধবার চেষ্টা করা হয়, তা আমরা দেখ্‌লাম। সমস্ত প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানকে একত্র করা গেছে, এ রকম দৃষ্টান্ত বড় পাওয়া যায় না। তবে বাজার দর ইচ্ছামত চড়িয়ে রাখবার ক্ষমতা পাবার জন্য সমস্ত যোগান আয়ত্তে আনবার দরকারও হয় না। শতকরা ৭০ ভাগ আন্দাজ আয়ত্ত ক'রতে পারলেই এই ক্ষমতা অল্পবিস্তর হাতে আসে। নানা কারণ আছে, যার জন্য সকলকে সঙ্ঘে যোগ দিতে রাজী করা যায় না। প্রথমতঃ ত, যে সমস্ত শিল্পপতি চিরকাল পরস্পরকে প্রতিযোগী হিসাবেই দেখে এসেছে, তাদের এক জায়গায় সম্মিলিত ক'রে, বন্ধুভাবে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে, আলাপ আলোচনা ক'রতে রাজী করানই দুরূহ ব্যাপার। তা ছাড়া, বেশী লাভ করাই সকলের কাছে একমাত্র কাম্য নয়। নিজের চেষ্টায় কারবার বজায় রাখায়, এবং তার উন্নতি করায় যে আত্মতুষ্টি আছে, তা থেকে সকলে বঞ্চিত হ'তে চায় না। উপরন্তু, সব প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও আয়তন সমান নয়। বড় বড় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের জোরে টিকে থাক্‌বার ভরসা রাখে। অতএব তাদের সংহতিতে যোগ দেবার আকিঞ্চন কম। অথচ তারা বাইরে থাক্‌লে সংহতির জোর হয় না। ট্রাষ্টে বা অনুরূপ সংহতির মধ্যে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে আত্ম-বিলুপ্তি ক'রতে সম্মত করাতে অনেক সময়ে অত্যন্ত বেশী খেসারৎ দিতে হয়। ফলে, নবগঠিত সংহতির মূলধনের অঙ্ক এত বেশী ক'রতে হয় যে বেশী হারে ডিভিডেণ্ড অর্জ্জন করবার সম্ভাবনা থাকে না। লাভের মধ্যে, জনসাধারণের মধ্যে যারা নূতন সংহতির শেয়ার কেনে, তাদের টাকার একটি মোটা অংশ, চালু কারবারগুলির মালিকদের পেট ভরাতে খরচ হয়। কার্টেল-চুক্তিতে কোন নূতন ব্যয়-বহুল প্রতিষ্ঠান গ'ড়তে হয় না। তবে সেখানে আর একটি মুস্কিল আছে। কেউই কম মাল তৈরী ক'রতে রাজী হ'তে চায় না, কারণ মোট মালের পরিমাণের যে যত বেশী অংশ সরবরাহ ক'রবার অধিকার পাবে, তার লাভও তত বেশী হবে। অথচ, বাজারে মোট মালের পরিমাণ কমিয়ে না রাখলে দর উঁচিয়ে রাখা যায় না; অতএব লাভও বেশী করা যায় না। সেইজন্য, অনেক সময়ে দেখা যায় যে কার্টেলের তরফ থেকে বিদেশে রপ্তানীর উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে; এবং সেই উদ্দেশ্যে যে যত মাল রপ্তানী করছে, তাকে সেই অনুপাতে 'বাউন্টি' (Bounty) বা অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

যেখানে সরকারী শিল্প – সংরক্ষণ নীতির ফলে বিদেশ থেকে মাল আমদানী নিষেধ আছে, কিংবা আমদানী ক'রলে উঁচু হারে কর দিতে হয় সেখানে, দেশের বাজারে একচেটিয়া

সংহতির পক্ষে যোগান কম রেখে দর উঁচু রাখা সহজ হয়। সেইজন্য দেখতে পাওয়া যায়, আমেরিকা ও জার্মানীতে একচেটিয়া সংহতির প্রসার সবচেয়ে বেশী। কারণ, এই দেশ দুটিতে সংরক্ষণ নীতির আদর অনেক দিনের। তবে সংরক্ষণ নীতি চালু না থাকলে যে সেখানে একচেটিয়া সংহতির প্রসার হয় না, তা নয়। বিলাতে এ রকম সংহতি মোটেই বিরল নয়।

(৬)

একচেটিয়া অধিকার কায়েমী করবার চেষ্টায় নানা রকম অসদুপায় অবলম্বন।

কার্টেল বা ট্রাষ্ট–জাতীয় সংহতিগুলি নানা রকম অসৎ উপায়ে তাদের একচেটিয়া অধিকার কায়েমী করবার চেষ্টা করে। যদি তারা কেবল কম দরে মাল সরবরাহ ক'রে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রত তা হলে বিশেষ কোন আপত্তির কারণ থাকত না। বরং দেশের তাতে উপকারই হ'ত। এবং অনেক ক্ষেত্রে কম দরে মাল সরবরাহ করবার সামর্থ্যও তাদের থাকে। কারণ, কারবারের আয়তন অত্যন্ত বড় হওয়াতে তাদের পক্ষে নানা রকম ব্যয়-সঙ্কোচের উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হয়। অতিকায় কারবারে কি ধরণের সুবিধা হয় তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সংহতিগুলি এই সমস্ত উপায় আরও বেশী মাত্রায় কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু, কেবল কম দরে মাল সরবরাহ করবার শক্তি অর্জ্জন ক'রেই তারা ক্ষান্ত থাকে না। তারা নানা নিন্দনীয় উপায়ে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা করে, এবং যেখানে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রতে সমর্থ হয়, সেখানে দর উঁচিয়ে গ্রাহকদের শোষণ করবার চেষ্টা করে।

এই সমস্ত নিন্দনীয় উপায়গুলির একটি হচ্ছে **'বয়কট'** (Boycott—বর্জ্জন করা, সম্পর্ক না রাখা)। ইহাতে, যে দোকানদার প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের মাল বিক্রী করে, তাকে মাল দেওয়া বন্ধ করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল হারভেষ্টর কোম্পানী (International Harvester Company) এক সময়ে এই উপায়ে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট ক্ষতি করতে সমর্থ হয়েছিল। এই প্রকাণ্ড কারবারটি নানা রকমের কৃষি-যন্ত্র তৈরী করে। তার মধ্যে কতকগুলি তারা ছাড়া আর কেউ তৈরী ক'রত না, এবং বাকিগুলি কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানেও তৈরী হ'ত। কৃষি-যন্ত্রের ব্যাপারীদের সব রকম কৃষি-যন্ত্র না রাখলে

চলে না। তাদের বলা হ'ল যে, যদি তারা তাদের যা মাল দরকার, সব ইণ্টারন্যাশন্যাল হারভেষ্টার কোম্পানীর কাছ থেকে নেয়, তবেই তাদের মাল দেওয়া হবে, নচেৎ নয়। কাজেই প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির টি'কে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। ফোর্ড কোম্পানী, এখনও যারা তাদের গাড়ী ছাড় অন্য গাড়ী বেচবে না এইরকম প্রতিশ্রুতি দেয়, শুধু তাদের মারফৎই গাড়ী বেচে।

ডেফার্ড রিবেট্‌ (Deferred rebate —দামের খানিকটা অংশ ফেরৎ দেবার প্রতিশ্রুতি)—জাহাজী কন্ফারেন্সগুলি এই উপায় প্রায়ই নিয়ে থাকে। যে সব ব্যাপারী এদের জাহাজে মাল পাঠায়, তাদের ব'লে দেওয়া হয় যে, তাদের কাছ থেকে এখন যে মাশুল আদায় করা হচ্ছে তার একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ, এক বৎসর বা ঐ রকম একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর ফেরৎ দেওয়া হবে, যদি তারা ঐ সময়ের মধ্যে কন্ফারেন্সের অন্তর্গত জাহাজ ছাড়া অন্য জাহাজে মাল না পাঠায়। রিবেটের পরিমাণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শতকরা দশ ভাগ বা ওর কাছাকাছি হয়। রিবেট পাবার জন্য অনেক ব্যাপারী কন্ফারেন্সের আনুগত্য স্বীকার ক'রে। ফলে, স্বতন্ত্র জাহাজী কোম্পানীর পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে কাজ পাওয়া যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ে।

স্থান বিশেষে দর কমান—ট্রাষ্ট বা অনুরূপ প্রকাণ্ড কারবার দেশ বিদেশের বহুসংখ্যক বাজারে একই সময়ে মাল বিক্রী ক'রে থাকে। এত জায়গা থেকে এত পরিমাণে লাভ উশুল হয় যে, যদি দু একটি বাজারে সাময়িক ভাবে লোকসান দিয়ে বিক্রী করা যায়, সে লোকসান বড় একটা গায়ে লাগে না। অপক্ষে প্রতিযোগী ছোট কারবারকে দুটি একটি বাজারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে হয়। এই সব বাজারে, যেখানে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের মাল বিক্রী হচ্ছে সেখানে তৈরী-খরচার চেয়ে কম দরে মাল বিক্রী আরম্ভ করা হয়। এ অবস্থায় ছোট কারবারীর পক্ষে বেশী দিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। তারপর বাজারটি সম্পূর্ণ হাতে আসবার পর দর চড়িয়ে, যা কিছু লোকসান হয়েছে সব পুষিয়ে নেওয়া হয়।

এগুলি ছাড়া আরও গর্হিত উপায়ও অনেক সময়ে নেওয়া হয়। যেমন, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের বদনাম রটান, তাদের কারিগর ভাঙ্গিয়ে নেওয়া এবং কর্ম্মচারীদের ঘুষ দিয়ে বশ করা, তাদের কাঁচা মাল ও ধার পাওয়া বন্ধ করা, তাদের মিছামিছি মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে হয়রাণ করা ইত্যাদি।

(৪)

এগুলি নিবারণ করা সহজ নয়

এই ধরণের সব অনাচার যে চলতে দেওয়া উচিৎ নয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এগুলি নিবারণ করা সহজ কাজ নয়। আমেরিকাতে ট্রাষ্টের উৎপাত সবচেয়ে বেশী হয়েছে, এবং সেখানে নানা উপায়ে তাদের শক্তি খর্ব্ব করবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোনটিতেই বিশেষ সুফল পাওয় যায় নি। ১৮৯০ সালে শার্ম্ম্যান এ্যাক্ট (Sherman Act) দ্বারা ট্রাষ্ট গঠন বে-আইনী ঘোষিত হয়, এবং যারা এই কাজ ক'রবে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হয় কিন্তু আইনের ধারাগুলির ভাষার অস্পষ্টতার দরুণ এবং শিল্পপতিদের অর্থবল ও চতুরতার দরুণ, এই আইন দ্বারা বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নি। পরে, ১৯১৪ সালে 'ক্লেটন এ্যাক্ট' (Clayton Act) পাস করা হয়। এতে নানা রকমের দুর্নীতির ব্যাখ্যা ক'রে সেগুলিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ফেডারেল ট্রেড কমিশন' (Federal Trade Commission) নাম দিয়ে একটি কমিশন বা কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। দুর্নীতির খোঁজ খবর নেওয়া এবং সেগুলি নিবারণ করার ভার এই কমিশনের হাতে দেওয়া হয়। এর পরে, এবং প্রধানতঃ এই কমিশনের কর্ম্মতৎপরতার ফলে দুর্নীতি অনেকটা কমেছে বটে, কিন্তু ট্রাষ্টগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হয় নি। ইতিমধ্যে ট্রাষ্ট সম্বন্ধে লোকের মত এখন যথেষ্ট বদল হয়ে গেছে। এখনকার মতে ট্রাষ্ট-গঠন দেশের স্বার্থের পরিপন্থী ত নয়ই, বরঞ্চ অনুকূল। কারণ এই ব্যবস্থার সাহায্যে মাল তৈরীর খরচ অনেক কম পড়ে, এবং সেই কারণে দেশের সম্পত্তির সবচেয়ে সদ্ব্যবহার হয়। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমলে দেশকে অর্থসঙ্কট থেকে বাঁচাবার জন্যে দেশের বৈষয়িক জীবনে ব্যাপকভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়, এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যবসায়ের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠনে উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যবস্থার অনেকখানি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারে, বেআইনী বলে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু যে দুই বৎসর ঐ ব্যবস্থা চালু ছিল, সেই সময় প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একযোগে কাজ করবার যে অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা জন্মেছে, তাতে ক'রে একচেটিয়া সংহতি গঠন আগেকার চেয়ে সহজ-সাধ্য হয়েছে।

সভ্য জগতের অন্যান্য দেশেও ছোটখাট কারবারের আগেকার দিনের আদর যে আর কখনও ফিরে আসবে, তা বলে মনে হয় না। অথচ, প্রকাণ্ড বড় বড় কারবার বেসরকারী হাতে রেখে শিল্পপতিদের মর্য্যাদা বাড়াতে ও জনসাধারণকে শোষণ করবার

সুযোগ দিতে বেশীর ভাগ লোকই রাজী নয়। তাই দেখতে পাওয়া যায়, সমস্ত শিল্প-প্রধান দেশে বড় বড় ব্যবসায়ের একটির পর একটি, সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করা হচ্ছে। বিলাতে কয়লা, বিদ্যুৎ-শক্তি রেল ও বিমান চলাচল, টেলিগ্রাফ ও বেতার, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি অনেকগুলি বড় বড় ব্যবসায় ইতিমধ্যেই সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে। লৌহ শিল্পটিকে হাতে নেওয়ার জন্যও উপযুক্ত আইন পাস করা হয়েছে। ফ্রান্সে আরও বেশী সংখ্যক বড় বড় কারবার সরকারের হাতে নেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের যে শিল্পনীতি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়গুলিকে সরকারী হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

অর্থ বা টাকাকড়ি এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

অর্থের প্রয়োজন ও ব্যবহার

টাকাকড়ির চলন অনেক দিনের। খুব প্রাচীন কালে, যখন প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনের যাবতীয় সামগ্রী নিজেরাই সংগ্রহ ক'রত, কিংবা তৈরী ক'রে নিত, তখন অবশ্য টাকাকড়ির কোন প্রয়োজন ছিল না, পরে, গ্রাম-জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরেও, যতদিন গ্রামগুলি স্বয়ং-পূর্ণ ছিল ততদিন টাকাকড়ির সাহায্য না নিয়েই স্বচ্ছন্দে কাজ চলে যেত। কর্ম্ম-বিভাগ যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হ'ত না। সকলেই জানাশুনা লোক; বাসও এক জায়গায়। অতএব সরাসরি বিনিময়, অর্থাৎ অদল বদলের দ্বারা কাজ চালাতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ত না। কিন্তু তারপর যখন, কর্ম্ম-বিভাগের এলাকা বড় হ'তে লাগ্‌ল এবং তার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্ব বাড়তে লাগ্‌ল তখন, সকলে নিতে রাজী হয় এমন একটি জিনিষ লেন-দেনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার না ক'রলে, কাজ চালান ক্রমশঃ দুষ্কর হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রয়োজনের তাগিদে ও সুবিধার টানে, নানা রকমের জিনিষ দিয়ে এই কাজ চালাবার চেষ্টা হয়েছে। প্রথম প্রথম, অনেক দেশে প্রধান খাদ্যশস্যটীকে লেন দেনের মাধ্যম হিসাবে, তার মানে অর্থ হিসাবে, ব্যবহার করা হ'ত। যে দেশে সকলে ভাত খায়, সে দেশের লোকেদের চাল ও ধান নিতে আপত্তি হবার কথা নয়। অতএব তাঁতি, কলু, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, গুরুমশাই, পুরোহিত সকলেই নিজের নিজের জিনিষের বা কাজের বদলে উপযুক্ত পরিমাণে ধান নিত, এবং তাদের যখন যা কিছু দরকার হ'ত, উপযুক্ত পরিমাণ ধানের বদলে সেগুলি সংগ্রহ ক'রত। এরকম ব্যবস্থা এখনও কোন কোন দূর গ্রামাঞ্চলে চালু থাকা বিচিত্র নয়। ধানের মত গম, যব, গরু, ছাগল, ভেড়া, উট, পশুর চামড়া, পশম, লবণ প্রভৃতি নানা জিনিষ এই রকমে অর্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভার্জিনিয়ার প্রধান রপ্তানীর মাল ছিল তামাকপাতা। এক সময়ে এই তামাকপাতা সেখানে অর্থের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হ'ত। কালক্রমে সকল দেশেই এই কাজের জন্য ধাতুর ব্যবহারের প্রসার হ'তে লাগল। প্রথমে তামা, এবং পরে রূপো, এবং সবশেষ সোণা। রূপোর কদর অনেকদিন ধ'রে চলেছিল। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে বিলাতে প্রথমে, অর্থের কাজের জন্য, রূপোর চেয়ে সোণাকে বেশী মর্য্যাদা দেওয়া হয়। ঐ শতাব্দির শেষ ভাগে ফ্রান্স,

জার্মাণী, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি সব বড় বড় দেশেই ইংরাজের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ভারতের ব্যবস্থায় একটু বিশেষত্ব ছিল। সেটী আমরা পরে আলোচনা ক'রব।

(২)

সরাসরি বিনিময়ের অসুবিধা-

১। প্রথম অসুবিধা হচ্ছে এই যে, সরাসরি বিনিময়ে দু-তরফা অভাবের মিল থাকা দরকার। দুজনের মধ্যে আদান প্রদান হ'তে হ'লে, এর যে জিনিষ দেবার আছে তা ওর দরকার হওয়া চাই, আবার সেই সঙ্গে ওর যে জিনিষ দেবার আছে তা এর দরকার হওয়া চাই। এই রকম মিল না হ'লে সরাসরি বিনিময় অচল। কবিরাজ-মশাই যদি নিরামিষাশী হন, তা হলে জেলের বাড়ী চিকিৎসা হয় না। গুরুমশায়ের যদি খড়ম পরা অভ্যাস থাকে, তা হলে মুচির ছেলের বর্ণ-পরিচয় হয় না।

২। দ্বিতীয় অসুবিধা হচ্ছে লেনদেনের পরিমাণ খাপ খাওয়ান' নিয়ে। যে জিনিষই দেওয়া যাক্, অন্ততঃ একটা গোটা দিতে হবে। এই গোটার পরিমান সব জিনিষের সমান নয়। কোনটার হয়ত খুব বড়, কোনটার হয়ত নিতান্ত ছোট। এরকম দুটী জিনিষের মধ্যে অদল বদল হওয়া খুবই শক্ত। তাঁতীর বাড়ীতে ছুঁচের দরকার হয়েছে। সেই সঙ্গে কামারের বাড়ীতেও কাপড়ের দরকার হয়েছে। কিন্তু একখানা কাপড়ের বদলে যদি ছুঁচ নিতে হয়, তা হ'লে অন্ততঃ এক সের নিতে হয়। কিন্তু অত ছুঁচ নিয়ে তাঁতি কি ক'রবে? অতএব তাঁতীরও ছুঁচ পাওয়া হয় না, কামারেরও কাপড় পাওয়া হয় না।

৩। সরাসরি বিনিময়ে আর একটি অসুবিধা এই যে, যার চাহিদার তাগিদ যত বেশী তাকে তত ঠক্তে হয়। অদল বদলের সময় যখন দুজনে দর কষাকষি হয়, কে কত পাবে এবং কত দেবে, তখন যদি একজনের অবস্থা এমন হয় যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ অপরের মাল না পেলেই তার নয়, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির যদি অবস্থা এমন হয় যে প্রথম ব্যক্তির দেবার মাল তার খুব বেশী দরকার নেই, কিংবা পরে পেলেও চলে, তখন প্রথম ব্যক্তির পক্ষে বেশী মাল দিয়ে কম মাল নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যেখানে খোলা বাজারে টাকাকড়ির মাধ্যমে কেনা-বেচা হয় সেখানে এরকমের অসুবিধা কাউকে ভোগ করতে হয় না। সকলেই সমান দরে মাল পায়।

৪। টাকাকড়ির চলন না থাক্‌লে আরও একটি অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়; সঞ্চয় করা যায় না। এখন দেখতে পাই, অনেক লোকে খাটবার বয়সে যা রোজগার করে তা সব খরচ করে না; যা উদ্বৃত্ত থাকে তা জমিয়ে রাখে। পরে, ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা

বা প্রসারের জন্য, বা অন্য কোন কাজে যখন একসঙ্গে বেশী খরচ করতে হয়, তখন এই সঞ্চিত ধন থেকে সে প্রয়োজন মেটান হয়। বুড়ো বয়সে যখন কর্ম্মক্ষমতা কমে যায় তখন জীবন ধারণের জন্যও এই সঞ্চিত ধন কাজে লাগে। টাকাকড়ির ব্যবহার আছে বলেই এ সঞ্চয় সম্ভব হয়েছে। ধান, চাল, তেল, নুন, কাপড়, জুতা, সিন্দুক, আলমারী, এ সব মজুত করে রাখা যায় না। হেপাজত ক'রে রাখায় খরচ ও পরিশ্রম আছে। তা ছাড়া, এ সব জিনিষ বেশী দিন থাকেও না, নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই সব জিনিষ টাকাকড়িতে পরিণত ক'রে সঞ্চয় ক'রে রাখায় কোনও অসুবিধা নেই। আজকাল আবার, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা হওয়াতে সঞ্চয় করা আরও সহজ হয়ে গেছে।

(৩)

অর্থের কাজ—সরাসরি বিনিময়ে কি ধরণের সব অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়, তা আমরা দেখ্‌লাম। অর্থের ব্যবহারে এই সব অসুবিধা দূর হয়েছে। অর্থের দ্বারা আমরা কি কি কাজ পাই, সেগুলি চার দফায় উল্লেখ করা যেতে পারে—

১। অর্থ লেনদেনের মাধ্যমের কাজ করে। তাঁতীর তেল দরকার হ'লে সে আর কাপড় নিয়ে কলুবাড়ী যায় না। সে কাপড় বিক্রী ক'রে অর্থ সংগ্রহ করে, এবং এই অর্থ দিয়ে তেল কেনে। আসলে সে কাপড়ের বদলে তেল সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এ কাজ সরাসরি অদল বদল ক'রে হ'ল না, হ'ল অর্থের মধ্যস্থতায়।

২। কোন্ জিনিষের মূল্য কত তা উল্লেখ করা হয় অর্থের অঙ্কের দ্বারা। এতে ক'রে বিভিন্ন জিনিষের আপেক্ষিক মূল্যের হিসাব করা সহজ হয়েছে। ধরা যাক্, কোন একটী জায়গায় এখনও সরাসরি বিনিময়ের প্রথা চালু আছে; এবং সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ১টী ঘোড়ার বদলে ৩টী গরু পাওয়া যায়, ৭টী গরুর বদলে ৪ মণ ঘি পাওয়া যায়; এবং ১ মণ ঘির বদলে ১৪ খানি ধূতি পাওয়া যায়। একজন ঘোড়ার বদলে ধূতি সংগ্রহ করতে চায়। ক'খানি ধূতি পেলে উচিত মূল্য পাওয়া হবে স্থির করতে তাকে ৩টি অঙ্ক কষতে হবে। কিন্তু যদি সব জিনিষের মূল্য হিসাব করা হয় অর্থের অঙ্কে, যেমন, ঘোড়ার দাম ১২০৲; গরুর দাম ৪০৲; ঘিয়ের মণ ৭০৲ এবং ধূতির দাম ৫৲, তা হ'লে একটা ঘোড়ার দামে কখানা ধূতি কেনা যেতে পারে তা আর হিসেব ক'রে বা'র ক'রতে হয় না।

৩। কোন্ জিনিষ কত মূল্যবান্ তার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবার জন্য অর্থ, মাপকাঠির কাজ করে। যে জিনিষ চাহিদার অনুপাতে যত দুর্লভ সে জিনিষ তত মূল্যবান। তার মানে সেই জিনিষের বিনিময়-মর্য্যাদা (value-in exchange) তত বেশী। অর্থাৎ সেই জিনিষের এক মাত্রার বিনিময়ে অন্যান্য জিনিষ তত বেশী বেশী মাত্রায় পাওয়া যায়। উপরের উদাহরণে ঘোড়ার বিনিময়-মর্য্যাদা সবচেয়ে বেশী; তারপর ঘিয়ের; তারপর গরুর; এবং সবচেয়ে কম, ধূতির। কিছু মাপতে হ'লে আমরা প্রথমে একটা মাত্রা ঠিক ক'রে নি। কোন

জিনিষ কতখানি লম্বা মাপতে হ'লে আমরা প্রথমে ১ ইঞ্চি, কি ১ ফুট, কি ১ গজ, এইরকম একটা লম্বার মাপ ঠিক করে নিয়ে, তার সঙ্গে তুলনা ক'রে বলি, অমুক জিনিষটা ১০ ফুট লম্বা। তেমনি ওজন মাপতে হ'লে ওজনের মাত্রা হিসাবে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লোহার ওজন ঠিক ক'রে নি, ১ সের কি ১ মণ; এবং তারপর এর সঙ্গে তুলনা ক'রে বিভিন্ন জিনিষের ওজনের হিসাব দি, ১ সের কি ১০ সের এইরকম। সময়ের হিসাব দিতে হ'লে সেই-রকম সময়ের মাত্রা ব্যবহার করি, ১ মিনিট কি ১ ঘণ্টা এইরকম। যা মাপা হবে, মাপবার মাত্রা তার সম-ধর্ম্মী হওয়া চাই। মিনিটের হিসাবে ওজন নির্ণয় করা যায় না; গজ ফুট দিয়ে সময় মাপাও যায় না। বিনিময়-মর্য্যাদা মাপতে হ'লে এমন একটি জিনিষকে মাত্রা হিসাবে ব্যবহার করা চাই যার নিজের বিনিময়-মর্য্যাদা আছে। সোনার এবং রূপার এ গুণ আছে। উপরন্তু এই দুইটি ধাতুর আরও দুটী বিশেষ গুণ আছে। এ দুটি অতি দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে; আর এ দুটির মজুত পরিমাণের তুলনায় বছর বছর যা নূতন তৈরী হয় তা নগণ্য। অতএব জোগানের পরিমাণের বিশেষ তারতম্য কখনও হ'তে পায় না; এবং সেই হেতু এ দুটির বিনিময় মর্য্যাদাও বহুকাল ধ'রে মোটামুটি একই পরিমাণের থাকে। এই সব কারণে, বিনিময়-মর্য্যাদা মাপবার কাজে সোণা ও রূপার যোগ্যতা খুব বেশী। ১৮৯৩ সালের আগে, এদেশে প্রত্যেক টাকা তৈরী হ'ত এক তোলা ওজনের রূপো * দিয়ে। অতএব ১ তোলা রূপোর বিনিময় --মর্য্যাদা বল্‌তে যা বোঝাত ১ টাকার ক্রয়—শক্তি বল্‌তেও তাই বোঝাত। তার মানে, টাকা দিয়ে, সব জিনিষের বিনিময় মর্য্যাদা মাপবার, মাত্রার কাজ হ'ত। অমুক জিনিষের দাম ১০৲ টাকা বল্‌তে যা বোঝাত সেই জিনিষের বিনিময়-মর্য্যাদা ১০ মাত্রা বল্‌তেও তাই বোঝাত। ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় দেশগুলিতে সে সময়ে, প্রধান মুদ্রাটি তৈরী হ'ত সোণা দিয়ে। অতএব ঐ সব দেশে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোণা ছিল বিনিময়-মর্য্যাদা মাপবার মাত্রা।

এখন আর কোন দেশেই সোণা রূপার তৈরী অর্থ চালু নেই। সব দেশেই এখন নোট বা কাগজী মুদ্রার প্রচলন হয়েছে। কাগজী মুদ্রার বস্তুগত কোন বিনিময়-মর্য্যাদা নাই। অতএব সঠিক ভাবে বিনিময়-মর্য্যাদা মাপবার যোগ্যতা, এখনকার টাকাকড়ির আছে, বলা চলে না।

৪। অর্থের আকারে ক্রয়-শক্তি সঞ্চয় ক'রে রাখার সুবিধা অনেক। সেই জন্য এখন অনেক বেশী লোক অনেক বেশী পরিমাণে সঞ্চয় করতে পারে।

টাকা কড়ি থাকাতে ভোগ্যবস্তু ব্যবহারে সুবিধা—

টাকাকড়ি হাতে থাকার মানে নির্ব্বিশেষ ক্রয়-শক্তি হাতে থাকা। প্রত্যেকেই রুচি এবং প্রয়োজন মত যখন খুসি, যে জিনিষ খুসি, এবং যতটুকু খুসি কিনতে পারে। এর ফলে

* ১২ ভাগের এক ভাগ খাদ মেশান।

প্রত্যেকেই নিজের দেওয়া কাজ বা সামগ্রীর বিনিময়ে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে উপকার, আরাম ও আনন্দ সংগ্রহ করতে পারে।

টাকাকড়ির প্রচলন থাকায় বিত্ত-সৃষ্টির কাজে সুবিধা—

এখনকার দিনে উৎপাদনের কাজ কি ব্যবস্থায় চলে, তা আমরা প্রথম খণ্ডে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, এর বিশেষত্ব হচ্ছে সূক্ষ্ম কর্ম্ম-বিভাগ। অতিকায় কারবার, এর একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে, এবং এক দেশেরই বিভিন্ন অংশের মধ্যে, বিপুল পরিমাণে নানা দ্রব্য সামগ্রীর আদান প্রদান, এর একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় সহায়। সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে টাকাকড়ি ব্যবহারের অভ্যাস না থাকলে এর কোনটীই সম্ভব নয়।

ঋণ দেওয়া ও ঋণ নেওয়া, এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা, এ সব কাজও টাকাকড়ির ব্যবহার থাকার দরুণই সহজসাধ্য হয়েছে।

(৪)

অর্থের কাজে সোণা ও রূপার বিশেষ যোগ্যতার কারণ—

১। এই দুর্ল্লভ ধাতু দুটি চিরকালই জনসাধারণের আদর পেয়ে এসেছে, কেউই নিতে নারাজ হয় না। লোককে সহজে যে জিনিষ নিতে সম্মত করা যায় না, সে জিনিষকে কখনও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চালু করা যায় না।

২। সোণা বা রূপার একটুখানির ক্রয়শক্তি অনেকখানি সেইজন্য দেওয়া, নেওয়া, ও নিয়ে যাতায়াত করায় যথেষ্ট সুবিধা হয়।

৩। সোণা বা রূপা চেনা সহজ; আসল কি নকল বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

৪। সোণা বা রূপাকে খণ্ড খণ্ড করলে ক্রয়শক্তি কমে যায় না। সোণা রূপার মত হীরা জহরতেরও একটুখানির ক্রয়শক্তি অনেকখানি। কিন্তু এগুলিকে খণ্ড খণ্ড ক'রলে ক্রয়শক্তি অনেক ক'মে যায়।

৫। সোণা ও রূপার বিনিময়-মর্য্যাদা দীর্ঘকাল ধ'রে মোটামুটি সমান থাকে। এই জন্য, ভবিষ্যৎ কালের দেনা-পাওনা বিষয়ে চুক্তি করবার সময়, সোণা বা রূপার হিসাবে করা হ'লে, কোন পক্ষেরই বিশেষ লোকসানের সম্ভাবনা থাকে না।

৬। সোণা বা রূপা নষ্ট হয় না, এবং সেইজন্য সঞ্চয় ক'রে রাখায় যথেষ্ট সুবিধা হয়।

৭। এ ছাড়া সোণা ও রূপার এমন গুটিকতক বস্তুগত গুণ আছে যার দরুণ এই দুইটি ধাতু দিয়ে, ভারী 'ডাইসে' (Dice—ছাঁচ) ছাপা নিখুঁত মুদ্রা তৈরী করা যায়। যেমন, খুব ছোট ছোট টুকরা করা যায়, এবং আবার সেগুলিকে জুড়ে এক করা যায়; চাপ দিয়ে বা

টেনে বাড়ান যায় ; অথচ কাচের মত ক্ষণভঙ্গুর হয় না , ডাইসে ফেলে অক্ষর বা ছবির স্পষ্ট ছাপ তোলা যায়, ইত্যাদি।

মুদ্রা—প্রথম প্রথম সোণা বা রূপার ব্যবহার হ'ত পিণ্ড আকারে। দাম দেবার সময় প্রয়োজন মত টুক্‌রো ক'রে কেটে নিয়ে ওজন ক'রে দিতে হ'ত। এ ব্যবস্থায় দুটি বড় রকমের অসুবিধা ভোগ ক'রতে হ'ত। প্রত্যেককে দাম নেবার সময়, নকল কি আসল পরীক্ষা করে নিতে হ'ত, আর দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করবার ঝঞ্ঝাট পোহাত হ'ত। মুদ্রার ব্যবহারের দ্বারা এই অসুবিধা দূর হয়েছে। মুদ্রা তৈরীর কাজ সরকারী টাঁকশালে হয়। সাধারণ লোকের মুদ্রা তৈরী করবার অধিকার থাকে না। প্রত্যেক মুদ্রার ওজন কত হবে, এবং কতটুকু খাঁটি সোনা বা রূপা থাকবে ও কতটুকু খাদ থাকবে তা আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। অতএব দাম দেওয়ার সময় মুদ্রা গুণে দিলেই চলে। পরীক্ষাও ক'রতে হয় না, ওজনও ক'রতে হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থের বিভিন্ন রূপ ও তাহাদের বিশেষত্ব

'অর্থ' শব্দে কি কি বোঝায় —

কেনা বেচার কাজে, বা অন্য রকমের দেনা-পাওনা চুক্তি করার কাজে যা কিছু সাধারণতঃ ব্যবহার হয়, তার মানে যা কিছু পাওনাদারেরা সচরাচর বিনা আপত্তিতে নিয়ে থাকে, সে সবই অর্থ নামে অভিহিত হবার যোগ্য। এর মধ্যে পড়ে—

১। ধাতুমুদ্রা
২। নোট
৩। চেক
৪। বিল অফ্ এক্‌চেঞ্জ

১। ধাতুমুদ্রা—

(ক) প্রধান মুদ্রা—সকল দেশেই একটি ক'রে প্রধান মুদ্রা চালু থাকে; যেমন এদেশে টাকা, বিলাতে পাউণ্ড, আমেরিকায় ডলার ইত্যাদি। জিনিষ পত্রের দাম নির্দ্দেশ করা, দেনা পাওনার হিসাব করা ও চুক্তি করা, ঋণ নেওয়া ও পরিশোধ করা প্রভৃতি যাবতীয় আর্থিক কাজ এই প্রধান মুদ্রার হিসাবে হয়ে থাকে। আগে সব জায়গায় এই প্রধান মুদ্রাটি পুরো দামের রূপা দিয়ে তৈরী হ'ত। ভারতের টাকা, আমেরিকার ডলার, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক, জার্ম্মানীর মার্ক প্রভৃতি সব ছিল পুরো দামের রৌপ্যমুদ্রা। বিলাতে পাউণ্ড ব'লতে আগে বোঝাত এক পাউণ্ড ওজনের রূপা; এবং ওখানে তখনকার প্রধান মুদ্রা শিলিং তৈরী হ'ত এক পাউণ্ডের ২০ ভাগের ১ ভাগ রূপা দিয়ে। প্রত্যেক জায়গায় প্রধান মুদ্রায় কত খানি রূপা থাকবে তা আইন দিয়ে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ত, এবং যে উপযুক্ত পরিমাণে রূপা নিয়ে আসত তাকেই টাঁকশাল থেকে মুদ্রা তৈরী করে দেওয়া হ'ত। এইরূপ অবাধ মুদ্রা তৈরীর ব্যবস্থা থাকলে, মুদ্রা আকারে রূপার যে দাম থাকবে, পিণ্ড আকারেও সেই দাম থাকতে বাধ্য। কারণ ১ তোলা রূপার দাম যদি ৸৶৹ হয় তা হ'লে লোকে বাজারে রূপা বিক্রী না করে সে রূপা টাঁকশালে নিয়ে গিয়ে টাকা তৈরী ক'রে নেবে। অতএব রূপোর বাজারে জোগানে টান ধরবে এবং দর বাড়বে। তেমনি যদি রূপোর দাম ১৶৹ তোলা হয় তা হ'লে লোকে রূপো কিনতে বাজারে না গিয়ে টাকা গলিয়ে প্রত্যেক টাকা থেকে ১ তোলা ক'রে রূপো সংগ্রহ ক'রবে। অতএব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, অবাধ মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু থাকলে মুদ্রার চেহারার মূল্য ও বস্তুগত মূল্য সমান থাকতে বাধ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রূপোর জায়গায় সোণার তৈরী প্রধান মুদ্রা চালু করা হয়। বিলাতে এই পরিবর্ত্তন করা হয় ১৮১৬ সালে, এবং অন্যান্য জায়গায় ১৮৭৩-৪ সালে। সোণার মুদ্রা যে আগে থাকতে চালু ছিল না তা নয়। তবে এখন থেকে রূপোর অবাধ মুদ্রণের ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল, এবং সোণাকেই একমাত্র মূল্যমান হিসাবে গণ্য করা হ'তে লাগল। বিলাতের এই স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল 'পাউণ্ড ষ্টার্লিং' বা 'সভারেণ' (Sovereign), আমেরিকায় দশডলারী মুদ্রা বা ঈগল (Eagle), ফ্রান্সে ২০ ফ্রাঙ্কের মুদ্রা, জার্ম্মানীতে ২০ মার্কের মুদ্রা, ইত্যাদি। প্রত্যেক জায়গায় প্রধান মুদ্রাতে কতখানি সোনা থাকবে তা আইন দিয়ে নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল, এবং অবাধ মুদ্রণ ব্যবস্থা ছিল। বিলাতে প্রত্যেক 'সভারেণে' যে পরিমাণ সোণা থাকত তাতে হিসাব ক'রলে ১ আউন্স সোনার দাম হ'ত ৩পাঃ ১৭শিং ১০½পেন্স। এই ধরণের ব্যবস্থাকে **স্বর্ণমান** বলে।

ভারতেও ১৮৯৩ সালে স্বর্ণমান প্রবর্ত্তিত হ'ল এবং রূপার টাকার অবাধ মুদ্রণ ব্যবস্থা বন্ধ করা হ'ল। তবে এখানে কোন স্বর্ণমুদ্রা চালু করা হ'ল না; টাকাই প্রধান মুদ্রা হিসাবে বহাল রহিল। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ পাউণ্ডের সঙ্গে একটি নির্দ্দিষ্ট বিনিময়-হার স্থাপিত হ'ল—১পাঃ = ১৫৲ টাকা। সরকারের কাছ থেকে এখানে যে কেউ পাউণ্ডের বদলে এই হারে টাকা পেতে পারত, এবং যার বিদেশী পাওনাদারের পাওনা মেটাবার জন্য বিদেশী অর্থ দরকার হ'ত সে এখানে টাকা জমা দিলে, সেই মূল্যের পাউণ্ড বিলাতে পেতে পারত। টাকার রূপোর ভাগ ক্রমশঃ যথেষ্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং টাকার মুদ্রা হিসাবে মূল্য এবং বস্তুগত মূল্যের মধ্যে কোন সম্বন্ধই রহিল না। টাকা আসলে হ'ল একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনার প্রতীক বা প্রতিনিধি। ভারতে এইভাবে, স্বর্ণমুদ্রা চালু না ক'রে, স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থা Gold Exchange standard বা **'বিদেশী স্বর্ণমুদ্রার মান'** নামে পরিচিত।

গত বিশ্ব যুদ্ধের ফলে, সব দেশেই এখন সোনার তৈরী প্রধান মুদ্রার প্রচলন বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছে। তার জায়গায় নোট বা কাগজে ছাপা মুদ্রা, এখন প্রধান মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এদেশে এখন প্রধানতঃ নিরেশ ধাতু দিয়ে তৈরী টাকা ও সেই সঙ্গে এক টাকার নোট প্রধান মুদ্রা হিসাবে চলছে। বিলাতের প্রধান মুদ্রা এখন ১পাউণ্ডের নোট। অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

(খ) খুচরা বা বিভিন্ন মূল্যের অপ্রধান মুদ্রা—এগুলি নিরেশ ধাতু দিয়ে তৈরী হয়, এবং এদের ক্ষেত্রে অবাধ মুদ্রণের ব্যবস্থা থাকে না। এদেশের সিকি, দোয়ানী, আনি প্রভৃতি; বিলাতের শিলিং ও পেনি; আমেরিকার সেণ্ট প্রভৃতি এই রকমের খুচরা মুদ্রা। প্রধান মুদ্রার হিসাবে এগুলির মূল্য নির্দ্দিষ্ট করা থাকে; যেমন টাকার চার ভাগের এক ভাগ, কি আট ভাগের এক ভাগ, কি ষোল ভাগের এক ভাগ; পাউণ্ডের কুড়ি ভাগের

এক ভাগ ; ডলারের একশত ভাগের এক ভাগ ; এই রকম। যাতে ক'রে যে কেউ ইচ্ছামত প্রধান মুদ্রার বদলে খুচরা, এবং খুচরার বদলে প্রধান মুদ্রা পেতে পারে, তার সরকারী ব্যবস্থা থাকে।

২। **'নোট' বা কাগজে ছাপা মুদ্রা**। নোট তিন রকমের—

(ক) প্রতিশ্রুতি-যুক্ত নোট—স্বর্ণমান চালু থাকার সময় এই ধরণের নোটের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। আমাদের দেশে ৫৲ টাকার, ১০৲ টাকার, ৫০৲ টাকার, ১০০৲ টাকার ও আরও বেশী মূল্যের নোট চলে। বিলাতে তেমনি ৫ পাউণ্ড, ১০ পাউণ্ড, ও তার চেয়ে বেশী মূল্যের নোট চলে। এই রকম সব দেশেই। দেশের প্রধান ধাতুমুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে রোজকার বেচাকেনায়, এই সব নোট বহুল পরিমাণে ব্যবহার হ'ত। নোটের গায়ে প্রধান মুদ্রার হিসাবে মূল্য ছাপা থাকে, এবং সেই সঙ্গে একটি প্রতিশ্রুতি ছাপা থাকে, যে কেউ নোট ভাঙ্গাতে চাইলে তাকে নোটের বদলে উপযুক্ত পরিমাণ প্রধান মুদ্রা দেওয়া হবে। আগে এখানে নোট ভাঙ্গিয়ে রূপার টাকা পাওয়া যেত, এবং অন্যান্য দেশে সেই সেই দেশের প্রধান স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যেত। এখন সব দেশেই প্রধান মুদ্রা হয়েছে, কাগজের নোট। অতএব এখন এই প্রতিশ্রুতির অর্থ দাঁড়িয়েছে, বড় নোটের বদলে ছোট নোট দেবার প্রতিশ্রুতি।

প্রথমে যখন নোটের চলন আরম্ভ হয়, তখন যে কোন ব্যাঙ্কই ইচ্ছা ক'রলে নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়তে পারত। অবশ্য নোট ভাঙ্গিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি পালন করবার জন্য প্রত্যেককেই যথেষ্ট পরিমাণ প্রধান মুদ্রা সব সময়ে মজুত রাখতে হ'ত। তবে এক সঙ্গে সব নোট ভাঙ্গাবার জন্য আসত না। সেইজন্য যে যত মূল্যের নোট বাজারে ছেড়েছে তাকে যে ঠিক তত মূল্যের প্রধান মুদ্রা মজুত রাখতে হ'ত তা নয়। অনেক কম রাখলেই কাজ চলে যেত। এখন বেশীর ভাগ দেশেই নোট ছাড়বার অধিকার ও দায়িত্ব কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। আমাদের দেশে এ কাজ 'রিসার্ভ ব্যাঙ্ক' ক'রে। তেমনি বিলাতে এই কাজ করে 'ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড'। আমেরিকায় এখনও অনেক ব্যাঙ্কের নোট ছাড়বার অধিকার বজায় আছে।

"ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড" এর নোটের বরাবরই খুব মর্য্যাদা ছিল। তার কারণ, মাত্র ১৯,৭৫০,০০০ পাউণ্ড বাদ দিয়ে আর যত নোট বাজারে ছাড়া হ'ত, তার সমান মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা কি স্বর্ণপিণ্ড সব সময়ে ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে মজুত রাখা হ'ত। নগদ মজুতের পরিমাণ এত বেশী হওয়ার দরুণ, "ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড" যে কখনও নোটের বদলে স্বর্ণ মুদ্রা দেবার প্রতিশ্রুতি পালনে অসমর্থ হ'তে পারে এ সন্দেহ কারও মনে কখনও স্থান পেত না। ১৯১৪ সালের পর এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলে। ঐ সময়ে ইংরাজকে, যুদ্ধের খরচ মেটাবার জন্য বিপুল পরিমাণে সোনা রপ্তানি করতে হয়।

এই জন্য দেশের সমস্ত স্বর্ণ সম্পদ্ সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা ক'রতে হয় এবং বাজার থেকে স্বর্ণমুদ্রাগুলি তুলে নিতে হয়। স্বর্ণমুদ্রার জায়গায় তখন ১ পাউণ্ড ও ১০ শিলিং এর নোট চালু করা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সোনার ব্যাবহার ও রপ্তানি সম্বন্ধে এমন সব বাঁধা-ধরা নিয়ম করা হ'ল যে নোটের বদলে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে কারও কোন উপকার হবার সম্ভাবনা রইল না। ফলে, কার্য্যতঃ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করা হ'ল। দেশের ভেতর, যুদ্ধের খরচ চালাবার জন্য ক্রমশঃই বেশী বেশী নোট ছাড়া হ'তে লাগ্ল, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ, যুদ্ধের পরে দেখা গেল যে পাউণ্ডের হিসাবে সোনার দর অনেক বেড়েছে।

১৯২৫ সালে পুনরায় স্বর্ণমানে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল। কিন্তু এবার একটু নূতন ধরণের স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হ'ল। পুরোপুরি স্বর্ণমান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে আগেকার মত স্বর্ণমুদ্রা চালু করা দরকার হ'ত। কিন্তু অত সোনা সংগ্রহ করবার সঙ্গতি তখন ইংরাজের ছিল না। সেই জন্য ব্যবস্থা হ'ল যে অর্থের কাজের জন্য নোটগুলিই চালু থাকবে, কিন্তু যে সোনা চাইবে তাকেই ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলাণ্ড আগেকার দরে সোনা সররবাহ ক'রবে। এই সোনা ৪০০ আউন্সের বাটের আকারে দেওয়া হবে। বাট ভেঙ্গে কাউকে বিক্রী করা হবে না। দেশের প্রধান মুদ্রা আবার স্বর্ণমুদ্রা হ'ল না বটে, কিন্তু সোনার হিসাবে প্রধান মুদ্রার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হ'ল। এই ধরণের স্বর্ণমানের নাম Gold Bullion Standard বা **স্বর্ণ-পিণ্ড মান**। ১৯৩১ সালে আন্তর্জাতিক আর্থিক বিপর্য্যয়ের ফলে ইংরাজকে পুনরায় স্বর্ণমান ছাড়্তে হয়েছিল। এই অবস্থা এখনও চল্ছে।

ভারতেও ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ পর্য্যন্ত স্বর্ণ পিণ্ড মান চালু ছিল।

(খ) প্রতিশ্রুতি-বিহীন নোট এ নোটের বদলে কোন পূরোদামের সোনা বা রূপা দিয়ে তৈরী প্রধান মুদ্রা দেবার প্রতিশ্রুতি থাকে না। এখনকার প্রধান মুদ্রাগুলি এই রকমের নোট। এখনকার অন্য নোটগুলিও আসলে এই থাকে পড়ে, কারণ তাদের বদলে যে প্রধান মুদ্রা পাওয়া যায় সেগুলি নিজেরাই প্রতিশ্রুতি বিহীন নোট। এই সব নোটের নিজস্ব বস্তুগত কোন মর্য্যাদা নাই। এ'দের ক্রয়শক্তি সম্পূর্ণভাবে আইনের সৃষ্টি। আইনের নির্দ্দেশ আছে বলেই এগুলি দেনা পাওনা মেটাবার কাজে ব্যবহার হ'তে পারে। লোকে জানে যে যেমন এই সব নোটে পাওনা নিতে হবে, তেমনি এর দ্বারা দেনাও মেটান যাবে। তা ছাড়া, আয়-কর, রেলভাড়া, পোষ্ট-কার্ডের দাম প্রভৃতি নানা রকম সরকারী পাওনা এই নোট দিয়ে মেটান যায়। সেই জন্য এই ধরণের নোট, অর্থ হিসাবে চালু রাখায়, কোন অসুবিধা হয় না। তবে, সরকারের হাতে অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে এই ধরণের নোট ছাড়্বার অধিকার থাক্লে, একটি বিপদের সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। অর্থব্যবস্থায় স্বর্ণমান বা রৌপ্য-মান চালু থাক্লে দেশে অর্থের পরিমাণ হঠাৎ বিশেষ কমবেশী হ'তে পায় না। ফলে,

দীর্ঘকাল ধরে অর্থের ক্রয়শক্তি মোটামুটি সমান থাকে। এটা, দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্য বিশেষ দরকার। অর্থের ক্রয়শক্তি অল্পকালের মধ্যে বেশী রকম ওঠানামা ক'রলে দেশের কত দিক্ দিয়ে ক্ষতি হয়, তা' আমারা পরে আলোচনা ক'রব। স্বর্ণমান বা রৌপ্যমান চালু থাকা কালে, যখন ব্যবসার প্রসার হওয়ার দরুণ বাজারে অধিক পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন ব্যাঙ্কগুলি বাড়্তি 'ডিপজিট' বা বাড়্তি নোটের আকারে ঋণ দিয়ে এই চাহিদা মেটাতে পারে। প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, এবং প্রয়োজন মিটে গেলে এই বাড়্তি অর্থের অস্তিত্বও লুপ্ত হয়। কিন্তু যখন সরকারী খরচ চালাবার জন্য, বাজারে নূতন প্রতিশ্রুতি-বিহীন নোট ছাড়া হয়, তখন এ নোট আবার গুটিয়ে নেওয়া কার্য্যতঃ অসম্ভব হয়। একবার এ কাজ আরম্ভ ক'রলে ক্ষান্ত হওয়া শক্ত। একে ত নোট ছাপ্তে যা খরচ পড়ে তা নগণ্য। তার ওপর এই ভাবে বাড়্তি খরচ মেটাতে পারা মানে, ট্যাক্স বাড়িয়ে লোকের অপ্রিয়ভাজন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। তাই দেখ্তে পাওয়া যায়, যখনই অতীতে কোন দেশের সরকার এই পিচ্ছিল পথে পা বাড়িয়েছে, তখনই ক্রমশঃ এত বেশী পরিমাণে নোট ছাড়া হয়েছে যে নোটের ক্রয়শক্তি খুব বেশী রকম কমে গেছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ের 'এসাইন্যাট' (Assignat), আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের সময়ের 'গ্রীনব্যাক' (Greenback), প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের যুদ্ধরত সমস্ত দেশগুলির নোটের, এই দশা হয়েছে। আমাদের দেশে গত বিশ্বযুদ্ধের সময় এত বেশী নোট ছাড়া হয়েছিল, যে টাকার ক্রয়শক্তি আগেকার প্রায় চার ভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য, বড় রকমের যুদ্ধে জড়িয়ে প'ড়লে, দেশরক্ষার প্রয়োজনে যখন বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় করা অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে, তখন নোট ছাপিয়ে খরচা মেটান' ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কেবল নূতন নূতন ট্যাক্স চাপিয়ে এত অর্থ সংগ্রহ করা যায় না। তবে এই কাজে সরকারের পক্ষে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য পরিমাণ অর্থও তৈরী না হয়; এবং যুদ্ধ থেমে গেলে যতদূর সম্ভব এবং যত শীঘ্র সম্ভব, সরকারী খরচা কমিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে বাড়্তি অর্থ বাজার থেকে তুলে নেওয়া উচিত।

(গ) যে দুরকম নোটের কথা বলা হ'ল, তা ছাড়া আরও এক রকমের নোট আমেরিকায় চলে। তার নাম 'বুলিয়ান সার্টিফিকেট' (Bullion Certificateগচ্ছিত স্বর্ণ বা রৌপ্যের রসিদ)। এগুলি চালু করার ফলে বাজারে অর্থের জোগান কিছু বাড়ে না। কারণ প্রত্যেকটি নোটে যে পরিমাণ অর্থের উল্লেখ থাকে সেই মূল্যের সোনা কিংবা রূপা, পিণ্ড আকারে বা মুদ্রা আকারে, কোষাগারে জমা রেখে, তবে নোট ছাড়া হয়। দুটী সুবিধার জন্য এই নোট ব্যবহার করা হয়। প্রথম, সোনা বা রূপার মুদ্রা অনেক দিন ব্যবহার ক'রতে ক'রতে হাতের ঘষানিতে যে ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয় নিবারণ হয়। এবং দ্বিতীয়, অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ নিজের সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করা যায়, যা সোনা বা রূপার আকারে করা যায় না।

ধাতু-মুদ্রা ও নোট এই দুই রকম অর্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হ'ল। এ ছাড়া আরও দুরকম অর্থ ব্যবহার হয়। একটি 'চেক' (Cheque = আদেশ পত্র), আর একটি বিল্-অফ্ এক্সচেঞ্জ (Bill of Exchange = হুণ্ডী, দাবী-পত্র)। এ দুটিকে অর্থ নামে অভিহিত করা সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। এ কথা ঠিক যে ধাতুমুদ্রা বা নোটের সঙ্গে এ দুটির, আইন-গত ও ব্যবহারগত গুটিকতক গুরুতর প্রভেদ আছে। তবে অর্থের যেটা পরিচায়ক বিশেষত্ব যে, এ জিনিষ অনেক লোক বিনা দ্বিধায় দেনা পাওনা মেটাবার কাজে হামেশা ব্যবহার করে, সে গুণ চেক্ এবং বিল-অফ এক্সচেঞ্জের যথেষ্ট আছে। অতএব এ দুটিকে অর্থ হিসাবে গণ্য করায় কোন অসঙ্গতি নেই।

৩। চেক্- —বিলাত, আমেরিকা এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশগুলিতে, আজকাল চেকের ব্যবহার খুব বেশী। আমাদের দেশেও, অন্ততঃ বড় বড় সহরগুলিতে চেকের ব্যবহার যথেষ্ট প্রসার পেয়েছে। চেক্ আসলে একটি আদেশ-পত্র। কোন লোকের নামে যদি কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা থাকে, তা' হ'লে সেই লোক ঐ ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাট্‌তে পারে। তার মানে একখানা চিঠি লিখে নির্দ্দেশ দিতে পারে, যে অমুক লোককে এত টাকা দেওয়া হ'ক। এই চিঠি দাখিল ক'রলে ব্যাঙ্ক টাকা দিয়ে দেয়, এবং আমানতকারীর হিসাবে সেই পরিমাণ খরচা তোলে। এই চিঠি বা চেকের ছাপা ফর্ম্ম, ব্যাঙ্ক সরবরাহ করে। একটি নমুনা নীচে দেওয়া হ'ল—

No 12345 Calcutta 19

Bengal Central Bank Limited.

Pay — — — — or Bearer

Rupees ————

Rs

তারিখ, যাকে টাকা দিতে হবে তার নাম, এবং কত টাকা দিতে হবে তা, কথায় এবং অঙ্কে লেখ্‌বার জন্য জায়গা ছাড়া আছে। ঐগুলি ভর্ত্তি করে নীচে ডানদিকে আমানতকারীকে সই ক'রতে হয়। ব্যাঙ্কের কাছে এই চেক্ দাখিল ক'রলে, ব্যাঙ্ক সই মিলিয়ে দেখে টাকা দিয়ে দেয়। পাওনাদারের নামের পরে যদি "or bearer" (=কিংবা বহনকারীকে) লেখা থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে যে, যে কেউ এই চেক্ ব্যাঙ্কে দাখিল ক'রবে তাকেই টাকাটা দেওয়া হবে। যদি ঐ জায়গায় "or order (=কিংবা তার নির্দ্দেশমত) লেখা থাকে তা হ'লে বুঝতে হবে যে, পাওনাদার যদি চেকের পেছনে অন্য একজনকে টাকাটা দেবার নির্দ্দেশ দিয়ে সই করে দেয়, তা হ'লে তাকে ব্যাঙ্ক টাকাটা দেবে। সেও যদি আবার অন্য একজনকে দেবার নির্দ্দেশ দিয়ে সই করে দেয় তা হ'লে সেই তৃতীয় ব্যক্তি টাকাটা পাবে। এই ভাবে

একই চেকের সাহায্যে পর পর অনেকগুলি দেনা পাওনা মেটান চলে, এবং শেষে যে চেকখানি নেবে সে গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুল্‌তে পাবে। অবশ্য এ ভাবে চেকের ব্যবহার বড় বেশী হয় না; কারণ চেকে টাকার যে অঙ্ক লেখা থাকে, ঠিক্ সেই পরিমান টাকা পর পর কতকগুলি লোকের দেবার এবং নেবার প্রয়োজন হবে, তা বড় হয় না। চেকের ওপর আড়াআড়ি দুটো লাইন টেনে দিলে, তাকে ক্রস্ (Cross) করা বলে। ক্রস্ করা চেক্ সরাসরি ব্যাঙ্কে গিয়ে ভাঙ্গান যায় না। পাওনাদারকে সেই চেক্ নিজের ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়, এবং সেই ব্যাঙ্ক তখন প্রথম ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করে।

চেক্ ব্যবহারে কতকগুলি সুবিধা আছে। বেশী পরিমাণে টাকাকড়ি নিজের কাছে বা বাড়ীতে রাখা নিরাপদ নয়, চুরি ডাকাতি হ'তে পারে। বেশীর ভাগ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে নিজের কাছে চেক্‌বহি খানা রাখলে, এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচা যায়, অথচ যখন যাকে যত টাকা দেবার দরকার, স্বচ্ছন্দে দেওয়া যায়। যত টাকার দেনাই হ'ক না কেন, আনা পাই পর্যান্ত মিলিয়ে একখানি চেকে তা দেওয়া যায়। চেক্ ক্রস্ করে দিলে, ডাকে পাঠালেও টাকা মারা যাবার ভয় থাকে না। অর্ডার চেক্ দেওয়া হলে, যে চেক্‌খানা ভাঙ্গায় তাকে, চেকের পেছনে একটা সই দিতে হয়। অতএব টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে তার রসিদ জমা হয়ে যায়। যে টাকা পেলেই ব্যাঙ্কে পাঠায়, এর টাকা দেবার সময় চেকে দেয়, তার পুরো জমা খরচের হিসাব ব্যাঙ্কের খাতায় ওঠে, তার আলাদা করে আর হিসাব না রাখলেও চলে।

এত সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও চেক্ দিয়ে ঠিক্ নোটের স্থান পূরণ করা যায় না। অপরিচিত লোককে চেক্ নিতে রাজী করান যায় না। যে চেক দেবে, তার সাধুতা বা সঙ্গতি সম্বন্ধে যে লোক কোন সন্দেহ পোষণ করে না, সেই রকম লোককেই, চেকে তার পাওনা মিটিয়ে নিতে রাজী করান যায়। কারণ, ব্যাঙ্কে যদি চেকের টাকা দিতে অস্বীকার করে তা হ'লে ব্যাঙ্ককে দায়ী করা যায় না। নোট নিতে লোকে এরকম দ্বিধা করে না। কারণ, নোটের পেছনে থাকে একটী প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যাঙ্কের প্রতিশ্রুতি যে, চাইলেই নোটের বদলে প্রধান মুদ্রা দিয়ে দেওয়া হবে। এই জন্য নোট হাতে হাতে চলে। নেবার সময় যে লোক দিচ্ছে সে কি দরের লোক, এ কথা কাউকে চিন্তা ক'রতে হয় না। এখন সোণার বা রূপার তৈরী প্রধান মুদ্রা কোথাও চালু নেই। নোটই এখনকার প্রধান মুদ্রা। এ নোট সকলেই নিতে বাধ্য; অতএব এ নোটের সম্বন্ধে নিতে রাজী হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

৪। বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জ—বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জ প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহার হয়ে থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতা দুজনে যখন এক দেশেরই লোক হয় তখন দেখতে পাওয়া যায় যে অর্ডার পেয়ে মাল সররাহ করবার পর, বিক্রেতা ক্রেতার নামে দামের দাবী জানিয়ে একখানা 'বিল' বা দাবীপত্র তৈরী করে পাঠায়। বিল-অফ-এক্সচেঞ্জ আসলে এই রকমের

একখানা 'বিল' বা দাবীপত্র। তবে দেশের মধ্যে মাল বেচে টাকা আদায় করা, আর বিদেশে মাল পাঠিয়ে টাকা আদায় করার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। ক্রেতা তার নিজের অর্থেই দাম দিতে পারে। অন্য দিকে বিক্রেতা যদি তার নিজের দেশের অর্থে দাম না পায় তা হ'লে তার দাম আদায় ক'রে কোন লাভ হয় না। এ ছাড়া, এক দেশ থেকে আর এক দেশে মাল যেতে এবং সেখান থেকে এদেশে টাকা আসতে বেশ কিছু সময় লাগে। অনেক ক্ষেত্রে আবার, ক্রেতাকে দাম দেবার জন্য কিছু সময় না দিলে ব্যবসা বাড়ান যায় না। অন্যদিকে বিক্রেতা তার মূলধন আটকে রাখতে পারে না। তার চাই মাল পাঠানর সঙ্গে সঙ্গে দাম আদায় হয়ে যাওয়া। তা না হ'লে, সে মূলধনের অভাবে ব্যবসার প্রসার ক'রতে পারবে না। এখন, বিল-অফ একচেঞ্জ এমন ভাবে লেখা হয়, এবং আইনে একে এরকম মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে, যে এইসব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হ'য়েছে। বিল-অফ এক্সচেঞ্জের একখানি নমুনা নীচে দেওয়া হ'ল

কলকাতার শ্রীমন্ত বণিক্ বিলাতের টমাস কুককে মশলা বেচেছে। দাম ঠিক্ হয়েছে ১০০ পাউণ্ড। ঐ দামের দাবী জানিয়ে বিলখানি তৈরী হ'য়েছে। বিলখানির নীচে সই

Accepted
Thomas Cook

£ 100/ Calcutta
23 3 1950

To Thomas Cook Esq

Three months after date pay to Srimanta Banik Esq or order the sum of one hundred pounds for value received

Srimanta Banik

বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে এইরকম দাঁড়ায়-

দাম স্বীকার করিলাম
ইতি—টমাস কুক

১০০ পাউণ্ড কলিকাতা
২৩শে মার্চ্চ, ১৯৫০

টমাস কুক মহাশয়,

অদ্য হইতে তিন মাস পরে, প্রাপ্ত মালের মূল্য বাবদ শ্রীমন্ত বণিককে কিংবা তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে একশত পাউণ্ড দিবেন।

ইতি—
শ্রীমন্ত বণিক

করেছে শ্রীমন্ত বণিক্। সে টাকা পাবে। সে হ'ল দাবীদার। ইংরাজীতে তাকে বলা হয় বিলের 'Drawer'। টমাস কুকের টাকা দেবার কথা। সে হ'ল 'দায়ী'। ইংরাজীতে তাকে বলা হয় বিলের 'Drawee'। বিলখানা টমাস কুক বা তার প্রতিনিধির কাছে হাজির করা হ'লে, সে বিলের ওপর আড়াআড়ি ভাবে লিখে দিয়েছে 'Accepted' অর্থাৎ 'দায় স্বীকার করিলাম'। এই কথা লিখে নাম সই করে দিয়েছে। বিলে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে। তিন মাস বাদে যে কেউ বিলখনা টমাস কুকের কাছে হাজির ক'রলে, টমাস কুক তাকে ১০০ পাউণ্ড দিয়ে দেবে।

বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জ যে ভাবে লেখা হয়েছে লক্ষ্য ক'রলে দেখা যায় যে এটি অনেকটা চেকের মত। আইনেতে চেক্‌কে একটি বিশেষ রকম বিল-অফ-এক্সচেঞ্জ বলে ধরা হয়, অর্থাৎ যে বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জ কোন ব্যাঙ্কের ওপর কাটা হয়, তাকে চেক্ বলে *। আইনের চোখে বিল-অফ-এক্সচেঞ্জকে 'Negotiable Instrument' বা হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলে গণ্য করা হয়। এর অর্থ উচিৎ মূল্য নিয়ে বিলখানা যদি কোন লোককে দিয়ে দেওয়া হয়, তা হ'লে দায়ীর কাছ থেকে বিলের টাকা আদায় করবার অধিকার তখন তার হয়। সেও আবার এই ভাবে অন্য লোককে এই অধিকার বিক্রয় ক'রতে পারে। এই রকম করে একই বিল অনেক হাত ফেরৎ হ'তে পারে। বিলে যদি 'or order' (অর্থাৎ নির্দ্দেশ মত) লেখা থাকে তা হ'লে হস্তান্তর করবার সময় বিলের পেছনে সই ক'রে দিতে হয়। আর যদি 'or bearer,' (অর্থাৎ, বহনকারীকে) লেখা থাকে, তা হ'লে সই করবারও প্রয়োজন হয় না। বিলের তলায় দাবীদারের সই থাকলেই যথেষ্ট। দায়ীর সই হবার আগেই বেচা কেনা স্বচ্ছন্দে হ'তে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। বিলের টাকা দেবার সময় হ'লে, যার কাছে তখন বিলখানা আছে সে বিলখানা সই করে, দায়ীকে দিয়ে, তার কাছ থেকে টাকাটা আদায় ক'রতে পারে। দায়ী যদি টাকা দিতে অসমর্থ হয়, কিংবা অস্বীকার করে, তা হ'লে ঐ বিলের পেছনে যে যে লোক সই করেছে পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেককে ঐ দেনার জন্য দায়ী করা যায়। কেউ না দিলে দাবীদারকে ঐ টাকা দিতে হবে। বিলখানা যার যার হাত দিয়ে গিয়েছে তাদের মধ্যে কেউ যদি বিনামূল্যে বা প্রবঞ্চণার দ্বারা ঐ বিল পেয়ে থাকে, তা হ'লে পরে যে লোক উচিৎ মূল্যে এবং বিনা সন্দেহে বিলখানি কিনেছে তার অধিকার কোন মতে ক্ষুণ্ণ হয় না। আইনের চোখে এই ধরণের মর্য্যাদা থাকার দরুণ বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জ বিক্রী ক'রতে কোন বেগ পেতে হয় না।

আমরা আগে শ্রীমন্ত বণিকের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছি। সে তিন মাসের ধারে মাল বিক্রী করেছে। কিন্তু মাল পাঠানর সঙ্গে সঙ্গেই দামটা পেলে তার ভাল হয়। আর সে এই দেশের অর্থে তার পাওনাটা পেতে চায়, বিলাতের অর্থে নয়। বিলখানা এখানকার

* চেকের টাকা, চেক্ দেখান মাত্র দিয়ে দিতে হয়। বিল-অফ-এক্সচেঞ্জের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার জন্য কিছু সময় দেওয়া হয়।

কোন ব্যাঙ্ককে বেচে দিলে তার দুটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। চলতি দর অনুসারে পাউণ্ড পেছু কত টাকা পাবে হিসাব করে, তার থেকে তিন মাসের ব্যাজ বাদ দিয়ে বিলটার দাম ঠিক্ হয়। অনেক ব্যাঙ্ক বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জ কেনা বেচার কাজ করে। লোকের যেমন বিল বিক্রী করবার প্রয়োজন হয়, তেমনি কেনবারও প্রয়োজন হয়। শ্রীমন্ত বণিক্ যে সময়ে বিলাতে মশলা বেচেছে, সেই সময় হয়ত কলকাতার আর একজন ব্যাপারী নারায়ণ দাস কম্বলীওয়ালা বিলাতের জন শেফার্ডের কাছ থেকে ১০০ পাউণ্ড মূল্যের পশম কিনেছে। সে যদি শ্রীমন্ত বণিকের ১০০ পাউণ্ডের বিলটি ব্যাঙ্ক থেকে কিনতে পারে, তা হ'লে তার বেশ সুবিধা হয়। কারণ সে সেই বিলটি জন শেফার্ডকে ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে দেনা শোধ ক'রতে পারে। জন শেফার্ড সেই বিল খানি নিয়ে টমাস কুকের কাছ থেকে ১০০পাউণ্ড আদায় ক'রতে পারে। একখানি বিল দিয়ে দুটো দেশের মধ্যে দুটো সওদার দেনা পাওনা মেটান হ'ল, এবং কোন দেশ থেকেই অন্য দেশে অর্থ পাঠানর দরকার হ'ল না। আসলে অবশ্য ঠিক এ ধরণের বিল কিনে লোকে বিদেশের দেনা মেটায় না। বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কদের মধ্যে যোগাযোগ থাকে। এক দেশের ব্যাঙ্ক অন্য দেশের ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখে, যাতে সেই ব্যাঙ্কের ওপর চেক্ কাটতে পারে। এক ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের ওপর যে চেক্ কাটে তাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট (Bank Draft) বলে। কলকাতার ব্যাঙ্ক শ্রীমন্ত বণিকের বিলখানা কিনে নিয়ে তা দর বিলাতের ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেয়, বিলের টাকা আদায় ক'রে তাদের হিসাবে জমা করবার জন্য। তারপর যখন নারায়ণ দাস কম্বলীওয়ালা বিলাতের দেনা মেটাবার ব্যবস্থার জন্য এই ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয় তখন তার কাছ থেকে উপযুক্ত পরিমাণে টাকা নিয়ে, বিলাতের ব্যাঙ্কের উপর একখানি ড্রাফ্ট তাকে দেয়। সে সেই ড্রাফ্ট জন শেফার্ডকে পাঠিয়ে দেয়, এবং জন শেফার্ড ব্যাঙ্কে গিয়ে সেই ড্রাফ্ট ভাঙ্গিয়ে ১০০ পাউণ্ড আদায় করে।

কখন কখন বাজার থেকে টাকা ধার করবার জন্য বিল অফ-এক্সচেঞ্জের ব্যবহার হয়। সে সব ক্ষেত্রের, 'for value received' বা 'প্রাপ্ত মালের মূল্য বাবদ' এই অংশটী নিরর্থক। কোন ব্যক্তির হয়ত তিন মাসের জন্য ১০০০৲ টাকার ধার দরকার হয়েছে। সে ঐ সময়ের জন্য ৫৲ টাকা সুদ দিতে প্রস্তুত। সে সেই উদ্দেশ্যে দাবীদার সেজে একখানা ৩ মাসের মেয়াদী ১০০০৲ টাকার বিল অভ-এক্সচেঞ্জ কেটে, বাজারে ৫৲ টাকা ব্যাজ বাদে অর্থাৎ ৯৯৫৲ টাকায় বিলখানা বেচে দিলে। যে বিলখানা কিনলে সে ৩ মাস অপেক্ষা করে দাবীদারের কাছ থেকে ১০০০৲ টাকা আদায় করতে পারে। কিন্তু সে কিছুদিন বাদে অন্য একজনকে বেচে দিতে পারে। সেও আর একজনকে বেচতে পারে। এইরকমে বিলখানা অনেক হাত ঘুরতে পারে। তিন মাস উত্তীর্ণ হবার সময় বিলখানা যার হাতে থাকবে, দাবীদার তাকে টাকাটা দিয়ে দিবে। বিল-অফ এক্সচেঞ্জগুলি সহজে এবং নিশ্চিন্ত হয়ে কেনা বেচা করা যায় বলেই টাকা ধার করবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করার রীতি গ'ড়ে উঠেছে। এই

সব বিলকে Finance Bill বা Accommodation Bill (টাকা ধার করবার বিল) বলে।

অবশ্য-গ্রাহ্য অর্থ (Legal Tender)

আমরা দেখলাম যে দেনা পাওনা মেটানর কাজে চার রকম অর্থের ব্যবহার হয়। কিন্তু আইনতঃ পাওনাদার সব রকম অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। সে, ইচ্ছা করলে চেক্ কিংবা বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জ নিতে অস্বীকার ক'রতে পারে। যে অর্থ নিতে পাওনাদার আইনতঃ বাধ্য তাকে অবশ্য গ্রাহ্য অর্থ বলে। আমাদের দেশে টাকা, আধুলি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক টাকার থেকে একশত টাকার অবধি নোটগুলি অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অবশ্য-গ্রাহ্য। সিকি, দুয়ানি প্রভৃতি অপ্রধান ধাতুমুদ্রাগুলি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে, অর্থাৎ একটাকা পর্য্যন্ত অবশ্য-গ্রাহ্য। -ঃ যখন স্বর্ণমান চালু ছিল তখন বিলাতে সভারেণ ও অর্দ্ধ সভারেণ এবং ব্যাঙ্ক-অফ্-ইংল্যাণ্ডের নোটগুলি অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অবশ্য গ্রাহ্য ছিল। শিলিং, চল্লিশ শিলিং পর্য্যন্ত, এবং অন্যান্য অপ্রধান মুদ্রা এক শিলি পর্য্যন্ত অবশ্য-গ্রাহ্য ছিল। ব্যাঙ্ক অফ্-ইংল্যাণ্ডের কাছে তাদের নোট নিয়ে গেলে তারা তার বদলে স্বর্ণমুদ্রা দিতে বাধ্য ছিল। ফ্রান্সে স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ফ্রাঙ্কের অপ্রধান মুদ্রাটীও অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অবশ্য-গ্রাহ্য ছিল। এখন অবশ্য স্বর্ণমুদ্রা চালু নেই, এবং যে নোট প্রধান মুদ্রা হিসাবে চালু আছে সেইটিই অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অবশ্য-গ্রাহ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

মূল্যমান হিসাবে পাশাপাশি দুটি ধাতুর ব্যবহার—গ্রেশামের সূত্র।

ধাতুমুদ্রার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিলাতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও আমেরিকায় ১৮৭৩ ৭৪ খৃষ্টাব্দে সোণাকে একমাত্র মূল্যমান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তার আগে বহু কাল ধ'রে সোনা ও রূপা দুটি ধাতুই, ঐ সব দেশে মূল্যমান হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। নির্দিষ্ট পরিমাণ রূপা দিয়ে তৈরী একটি মুদ্রা, এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোণা দিয়ে তৈরী আর একটি মুদ্রা, এই দুরকম মুদ্রাই ঐ সব দেশে প্রধান মুদ্রা হিসাবে চালু ছিল। দুরকম মুদ্রারই অবাধ মুদ্রণ ব্যবস্থা ছিল, অর্থাৎ যে কেউ টাকশালে সোণা বা রূপা জমা দিলে তাকে ঐ নির্দ্দিষ্ঠ হারে সোণার বা রূপার প্রধান মুদ্রা দেওয়া হ'ত। এ ব্যবস্থা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। যে কারণে এই ব্যবস্থা অচল হ'য়ে প'ড়ল সেটি **গ্রেশামের সূত্র** নামে পরিচিত।

যদি এই দুরকম প্রধান মুদ্রার মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন কর্‌বার চেষ্টা না হ'ত অর্থাৎ যদি এই এ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহার করা হ'ত, তা হ'লে অনির্দ্দিষ্ট কাল ধ'রে দুরকম মুদ্রাই চালু রাখা অসম্ভব হ'ত না। অবশ্য তার ফলে, অর্থ ব্যবহার করবার সময় যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হ'ত। কারণ সে ব্যবস্থায়, প্রত্যেক জিনিষের দাম বা প্রত্যেক কাজের পারিশ্রমিক একবার রৌপ্য মুদ্রার হিসাবে এবং আর একবার স্বর্ণমুদ্রার হিসাবে, এই দুই রকম ভাবে নির্দ্দেশ ক'রতে হ'ত। তেমনি দেনা-পাওনার ব্যাপারে, ধার নেওয়া এবং ধার পরিশোধ করা কোন্ মুদ্রায় হবে তা সর্ত্ত কর্‌বার সময় আগে থাকতে ঠিক ক'রতে হ'ত। কর ধার্য্য করা এবং রাজস্ব আদায় করা, অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা করা প্রভৃতি সব রকম আর্থিক ব্যাপারে এই দুই রকম হিসাবে কাজ করার প্রয়োজন হ'ত। কিন্তু এই সব ধরণের অসুবিধা সত্ত্বেও দুইটি প্রধান মুদ্রা যথেষ্ট পরিমাণে বরাবর চালু না থাকবার কোন কারণ ঘট্‌ত না। এবং তাতে ক'রে একটি আনুষঙ্গিক উপকার এই হ'ত যে, কোনও সময়ে অতি মাত্রায় অর্থের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে আর্থিক বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা অনেক কম হ'ত।

মূল্যমান হিসাবে একসঙ্গে সোনা ও রূপার ব্যবহার এভাবে হয় নি। যখন স্বর্ণমুদ্রা চালু করা হ'ল, তখন আগের থেকে চালু রৌপ্যমুদ্রার হিসাবে তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হ'ল। যেমন আমেরিকায়, রৌপ্যমুদ্রা ডলারের হিসাবে আড়াই ডলারের, পাঁচ ডলারের, দশ ডলারের এবং ২০ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা চালু করা হ'ল। তেমনি বিলাতে রৌপ্যমুদ্রা শিলিং এর হিসাবে ২২

শিলিং এর স্বর্ণমুদ্রা গিনি (guinea) চালু করা হ'ল। পরে উহার মূল্য ২১ শিলিং করা হয়। ফ্রান্সে এবং অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ভাবে রৌপ্যমুদ্রার হিসাবে স্বর্ণমুদ্রার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুটি ধাতুরই অবাধ মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু রইল। তার ফল এই দাঁড়াল যে, টাকশাল থেকে' সোণার হিসাবে রূপার এবং রূপার হিসাবে সোণার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হ'লে। সোনা ও রূপার মধ্যে এইরকম বাঁধাধরা সম্বন্ধ বজায় রাখার চেষ্টা বিফল হওয়াতে, শেষে রূপার অবাধ মুদ্রণ বন্ধ করতে হয়।

আমরা নানা রকমের হিসাবে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত একাধিক মান ব্যবহার করি। যেমন ওজনের হিসাব সের দিয়েও করা হয়, আবার পাউণ্ড দিয়েও করা হয়। একরকমের হিসাব থেকে অন্য রকমের হিসাবে নিয়ে যাওয়ায় কখনও কোন ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ সব সময়েই ৪০ সের = ৮২২/৭ পাউণ্ড। তার কারণ সের বা পাউণ্ডের ওজনের কখনও নড়চড় হয় না। কিন্তু সোণা বা রূপার বিনিময়-মর্য্যাদার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। জোগান বা চাহিদা কমবেশী হলে বিনিময়-মর্য্যাদারও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন ঘটে। এখন যদি একটি ধাতুর যোগান, অন্যটির অনুপাতে বেশী রকম বাড়ে কিংবা কমে তা হ'লে সোণারূপার বাজারে তাদের আগেকার আপেক্ষিক মূল্য আর বজায় থাকতে পারে না। একটি আর একটির অনুপাতে সস্তা কিংবা মাগ্যি হয়ে যায়। অথচ অর্থের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আগেকার হারে বিনিময় চলতে থাকে। অর্থাৎ, অর্থের ক্ষেত্রে একটি ধাতুকে তার প্রাপ্য কদরের চেয়ে বেশী কদর দেওয়া হয়; এবং অন্যটীকে তার প্রাপ্য কদরের চেয়ে কম কদর দেওয়া হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয় যে, বেশী কদর দেওয়া ধাতুটী ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে অর্থে পরিণত করা হ'তে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কম কদর দেওয়া ধাতুটি বাজারে পিণ্ড আকারে বেশী মূল্যে বিক্রয়ের জন্য অর্থের ক্ষেত্র থেকে তুলে নেওয়া চল্‌তে থাকে। গ্রেশামের সূত্র ব'লতে এই ব্যাপারটি বুঝায়। গ্রেসামের সূত্র সংক্ষেপ হ'ল এই যে, বেশী কদর দেওয়া অর্থ কম কদর দেওয়া অর্থকে স্থানচ্যুত করে (Bad money drives out good money)

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ফ্রান্সে, মুদ্রা তৈরীর আইন অনুসারে রূপা ও সোণার আপেক্ষিক দর ছিল সাড়ে পনেরতে এক (১৫১/২ : ১); অর্থাৎ টাঁকশালে ১৫১/২ আউন্স রূপা জমা দিলে যে মূল্যের রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া হ'ত, ১ আউন্স সোণা জমা দিলে ঠিক্ তত মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হ'ত। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে, বাজারে রূপার দর এর চেয়ে সামান্য কিছু কম ছিল। তার মানে, অর্থের আকারে রূপাকে তার প্রাপ্য কদরের চেয়ে বেশী কদর দেওয়া হচ্ছিল। ফলে দেশের অর্থভাণ্ডারে রৌপ্যমুদ্রার অংশ বাড়্‌তে লাগ্‌ল, এবং স্বর্ণমুদ্রার অংশ কম্‌তে লাগ্‌ল। স্বর্ণমুদ্রা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবার আগেই কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল। ১৮৫০ সাল নাগাৎ অষ্ট্রেলিয়াতে ও আমেরিকার ক্যালি-ফোর্নিয়া অঞ্চলে অনেকগুলি নূতন নূতন সোণার খনি আবিষ্কৃত হয়, এবং অতি অল্পকালের

মধ্যেই বাজারে সোণার জোগান যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং সোণার দাম কম্‌তে থাকে। ফলে তখন স্রোত উল্টো দিকে বইতে আরম্ভ ক'রল। যার সোণা আছে, সে সেই সোণা বাজারে বিক্রয় না ক'রে স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত ক'রতে লাগ'ল; অন্যপক্ষে রৌপ্যমুদ্রা গালিয়ে পিণ্ড আকারে বিক্রয় করা চল্‌তে লাগ্‌ল। এই রকম প্রায় পঁচিশ বছর ধরে চলেছিল।

এই যে ১৮৫০ সালের আগে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর ধরে অর্থভাণ্ডারে রূপার প্রাধান্য বাড়্‌ছিল, এবং ঐ সময়ের পরে প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর ধরে সোণার প্রাধান্য বাড়্‌ছিল, সে সময়ে একটি জিনিষ লক্ষ্য কর'বার এই ছিল যে, যে সময়ে বাজারে রূপার আপেক্ষিক মূল্য কম্‌ছিল, সে কমা খুব ধীরে ধীরে হয়েছিল; আবার যে সময়ে সোণার আপেক্ষিক মূল্য কম্‌ছিল, সে কমাও খুব ধীরে ধীরে ঘটেছিল। তার কারণ, দেশে অর্থের আকারে সোণা ও রূপা দুই ধাতুই বিপুল পরিমাণে মজুত ছিল। অতএব যখন বাজারে রূপার জোগান বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোণার অনুপাতে রূপার দর কম্‌তে আরম্ভ ক'রল, তখন একদিকে অনেক পরিমাণে রূপা অর্থভাণ্ডারে প্রবেশ ক'রতে থাকায় বাজারে বাড়্‌তি রূপার চাপ হাল্কা হ'তে লাগ'ল, এবং অন্যদিকে অনেক পরিমাণে সোণা অর্থভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে আস্‌তে থাকায় বাজারে সোণার ঘাট্‌তি পূরণ হ'তে লাগল। এই দুমুখো গতির ফলে সোণা ও রূপার আপেক্ষিক জোগানে যথেষ্ট তারতম্য ঘটা সত্ত্বেও তাদের আপেক্ষিক মূল্যের সে পরিমাণে পরিবর্তন ঘট্‌তে পায় নি। এই অভিজ্ঞতা থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, যদি অনেকগুলি বড় বড় দেশে একসঙ্গে এবং একই বিনিময় হারে সোণা ও রূপার তৈরী দুরকমের প্রধান মুদ্রা চালু রাখা হ'ত তা হ'লে কোন সময়েই এরকমের ব্যবস্থা ভেঙ্গে প'ড়তে পারত না। যা হ'ক, তা হয় নি।

১৮৭০ সালের কিছু আগে থেকে, আমেরিকায় নূতন নূতন খনি আবিষ্কৃত হওয়ায়, এবং রূপা শোধন করবার নূতন কৌশল অবলম্বন করায়, আবার রূপার জোগান খুব বেশী ক'রে হতে লাগল। ফলে, কেবল রূপার মুদ্রা তৈরী হ'তে লাগল, এবং সোণার মুদ্রা স'রে যেতে লাগল। তখন দেশের স্বর্ণসম্পদ্ রক্ষা কর'বার জন্য, ১৮৭৩ সালে রৌপ্য মুদ্রার অবাধ মুদ্রণ বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল, এবং কেবল মাত্র স্বর্ণমাণ গ্রহণ করা হ'ল। আমেরিকাতেও ঐ একই সময়ে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

গ্রেশামের সূত্রের ক্রিয়ার একটি দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হয়েছে। এর অন্য দৃষ্টান্তও দেখা গিয়েছে। বিলাতে এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে যখন ধাতুনির্ম্মিত প্রধান মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল তখন মাঝে মাঝে একটি অসুবিধা বিশেষভাবে ভোগ ক'রতে হ'ত এই, যে নূতন মুদ্রাগুলি প্রায়ই বাজার থেকে অদৃশ্য হ'ত। পুরাণো মুদ্রায় ওজন কমে যায়। হাতে হাতে ক্ষয়ে যাওয়ার দরুণও বটে, এবং অনেক সময়ে দুষ্ট লোকে নানা রকম কৌশলপূর্ণ উপায়ে সোণা রূপা বার ক'রে নিত, সে জন্যও বটে। জিনিষপত্র কেনার কাজে নূতন ও পুরাতন

দুরকম মুদ্রারই সার্থকতা সমান। কিন্তু যারা সোণা রূপার কাজ করে তারা নূতন মুদ্রা গলিয়ে বেশী পরিমাণ মাল পেতে পারে। অতএব তাদের কাছে নূতন মুদ্রার কদর বেশী। অর্থাৎ পুরাণো মুদ্রাগুলি অর্থভাণ্ডারের বাইরে যে কদর পায়, অর্থভাণ্ডারের ভেতর থাক্‌লে তার চেয়ে বেশী কদর পায়। অতএব গ্রেশামের সূত্র অনুসারে পুরাণো মুদ্রাগুলিই থেকে যায়, আর নূতন মুদ্রাগুলিকে গালাবার জন্য বার ক'রে নেওয়া চল্‌তে থাকে। যারা বিদেশে অর্থ পাঠাতে চায় তারাও নূতন মুদ্রাগুলি পছন্দ করে কারণ, বিদেশী পাওনাদার ওজন হিসাবে সোণা রূপা নেবে, মুদ্রা গুণ্‌তি ক'রে নেবে না। যারা সঞ্চয় করে, তারাও নূতন মুদ্রাগুলি বেশী পছন্দ করে। এই তিন শ্রেণীর লোকের নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বেছে বেছে নূতন মুদ্রাগুলি সংগ্রহ ক'রত। ফলে সেগুলি বেশীদিন বাজারে চালু থাক্‌তে পেত না।

অবশ্য বাজারের লেনদেন চালাবার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী যদি না থাকে তা' হ'লে নূতন মুদ্রাগুলি তুলে নেওয়া যায় না। তেমনি যদি পুরাণো মুদ্রা-গুলির এমন অবস্থা হয়ে থাকে যে লোকে নিতে চায় না, তা হ'লেও নূতন মুদ্রাগুলি তুলে নেওয়া যায় না। এই রকম ঘটলে গ্রেশামের সূত্র কার্যকরী হয় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

ব্যাঙ্ক বল্‌তে আমর সাধারণতঃ এমন একটা প্রতিষ্ঠানের কথা বুঝি, যার কাজ হচ্ছে জনসাধারণের (যাদের কাছে উদ্বৃত্ত ক্রয়শক্তি পড়ে আছে বা সঞ্চিত আছে) কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া এবং সেই টাকা, সেই সমস্ত লোক অথবা আর এক দল লোককে (যেমন ব্যবসায়ী মহলে) ধার দেওয়া। কিন্তু 'টাকা" কথাটির অর্থ কি, এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে জ্ঞান থাকা, দরকার—অর্থাৎ ব্যাঙ্ক যে টাকা ধার দেয় সেটা কি সরকারী টাকা না আর কিছু? এ কথা ঠিক যে, ব্যাঙ্ক যা ধার দেয় সে টাকা শেষ পর্যন্ত সরকারী টাকাতেই লোকে তুলে নেয়, কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়।

অনেক সময় ব্যাঙ্ককে "Cheque এর গৃহ" বলা হয়—অর্থাৎ সরকারী টাকা ছাড়া ব্যাঙ্ক তার Cheque এর সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে টাকা সৃষ্টি করতে পারে, এবং যে পর্যন্ত জনসাধারণের ব্যাঙ্কের ওপরে আস্থা সম্পূর্ণ রূপে বলবৎ থাকে, সে পর্য্যন্ত লোকে সরকারী টাকার পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্কের চেক নিতে রাজী হয়। অনেক সময়ই দেখা যায় যে টাকার পরিবর্ত্তে চেক্ নিয়ে লোকে একেবারে তখনই ব্যাঙ্কে না গিয়ে, সে চেক্ অন্য কোনও পাওনাদারকে সহি করে হস্তান্তর করে দেয় এবং এভাবে ব্যাঙ্ক থেকে নগদ সরকারী টাকা তুলে আন্‌বার পূর্ব্বে হয়তো দশ বার এভাবে চেক্ হস্তান্তর হয়, যার ফলে একখানি ১০০৲ টাকার চেক্ ১০×১০০৲ অর্থাৎ ১০০০৲ নগদ সরকারী টাকার কাজ চালিয়ে নেয়। সুতরাং ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তৈয়ারীর গোড়ার কথা হচ্ছে এই যে, ব্যাঙ্কের ওপর চেক্ কেটে টাকা তুলিবার অধিকার কোনও লোককে অথবা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া। এই অধিকার কি কি অবস্থায় দেওয়া হয় সেইটাই আমাদের বর্ত্তমানে বিবেচনার বিষয়।

টাকা জমা দিয়ে চেক্ কাট্‌বার অধিকার

সাধারণতঃ এই চেক্ কাট্‌বার অধিকার (চেক্ বই) লোক্‌কে দেওয়া হয়, যখন সে ব্যাঙ্কে টাকা আমানত অর্থাৎ জমা রাখে; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার হিসাবে টাকা থাকে, ততক্ষণ তার

চেক্‌কে Honour বা সম্মান করা হয়; অর্থাৎ সেই Cheque ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে এলে, নগদ টাকা বাহককে দিয়ে দেওয়া হয় (অবশ্য Cross Cheque হ'লে নগদ না দিয়ে অপর কোন ব্যাঙ্ক, যার কাছে ঐ চেক-গ্রহিতার হিসাব আছে তার মাধ্যমে দেওয়া হয়)।

আমরা যখন কোন ব্যাঙ্কে হিসাব খুলতে যাই অর্থাৎ যাকে ইংরাজিতে ব'লে "Account opening"—তখন আমরা কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে যাই, এবং ব্যাঙ্কের জমা বিভাগ বা Deposits Section-এর যিনি ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তার সঙ্গে কথা ক'য়ে একটা হিসাব খুলবার ফরম্ বা Account opening Form ভর্ত্তি ক'রে দেই। এই ফরম ব্যাঙ্কের কাছে গ্রাহ্য হ'তে হ'লে যিনি Account খুলবেন তাঁর পরিচিত কোন লোক দ্বারা ব্যাঙ্কে পরিচয় বা "Introduction" ক'রে দিতে হয়। এই পরিচয়কারী এমন হওয়া চাই, যার সঙ্গে ব্যাঙ্কের লেনদেন আছে। এইটি হ'য়ে গেলে তারপর জমা দেবার খাতা পূরণ ক'রে টাকা ব্যাঙ্কের নগদ বিভাগ বা Cash Departmentএ জমা দিতে হয়। এই টাকা জমা হবার পর জমা বিভাগ থেকে টাকা উঠাবার জন্য চেক্ বই Constituentদের (ব্যাঙ্কের খাতায় যাদের হিসাব আছে) নামে দেওয়া হয়, যাতে সহজে টাকা তোলা যেতে পারে।

এই ভাবে প্রত্যহ বহু লোক ব্যাঙ্কে নূতন হিসাব খুলতে আসে এবং তার মধ্যে সবাই, সব টাকা, পরদিনই তুলে আনে না—সুতরাং ব্যাঙ্কের হাতে একটা উদ্বৃত্ত টাকা থেকে যায়। কিন্তু ব্যাঙ্কও, একেবারে এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে লোকের দয়ার ওপরে থাকতে চায় না—সেজন্য জমা নেবার বিভিন্ন রকমের বন্দোবস্ত আছে, যাতে ব্যাঙ্ক খানিকটা অন্ততঃ বুঝতে পারে, যে হাতে কত নগদ্ টাকা রাখ্‌লে, যারা টাকা তুলতে আসবে তাদের টাকা ফেরৎ দিতে বেগ পেতে হবে না। এ কারণে, ব্যাঙ্কের বিভিন্ন রকমের জমার মধ্যে, কেবল ফেরত দেবার সময়ের তারতম্য নিয়েই যা কিছু একটু রকম ফের আছে। কারণ, যদিও সাধারণতঃ চাইবামাত্র ফেরত দেবার অঙ্গীকার ক'রেই ব্যাঙ্ক টাকা গচ্ছিত রাখে, তবুও কতক কতক ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক আগেই আমানতকারীকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেয়, যে সে অন্ততঃ একটা বিশেষ সময়, যেমন ছয়মাস কিংবা এক বৎসরের পূর্ব্বে টাকা ফেরত চাইবে না—অথবা সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তুলতে পারবে না, এবং তাও একবারে এক হাজারের বেশী নয়।

উপরের কয়েক লাইনে যা বলা হয়েছে তার প্রথম রকমের জমাকে বলা হয় "স্থায়ী আমানত" বা Fixed Deposit। এ রকম জমা সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য নেওয়া হয়

* পূর্ব্বে কেবল Current Deposit Account খুলতেই Introduction দরকার হ'ত। আজকাল Savings Account খুলতে হ'লেও অনেক ব্যাঙ্কেই পূর্ব্ব পরিচিত কোনও Constituent এর সুপারিশ-এর প্রয়োজন হয়। Fixed Deposit এবং Cash Certificate এ Introduction এর প্রয়োজন হয় না, কারণ প্রচলিত ব্যাঙ্কিং আইনে এবং রীতি-নীতি হিসাবে যাদের এরকম হিসাব আছে তাদের পুরোপুরি Constituent বলে স্বীকার করা হয় না।

এবং বড় বড় ব্যাঙ্কে শতকরা বাৎসরিক ২৲ টাকা থেকে ২৷৷৹ টাকা সুদ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের পক্ষে এই রকম জমা সব চাইতে সুবিধা, কারণ ব্যাঙ্ক নিশ্চিন্ত মনে এই টাকা ঐ সময় অর্থাৎ এক বৎসর লগ্নী করতে পারে অর্থাৎ খাটাতে পারে—কারণ এই টাকা এক বৎসরের মধ্যে আমানতকারী ফেরৎ চাইবে না, এই অঙ্গীকার করেই জমা দিয়েছে। কিন্তু এতে ব্যাঙ্কের খানিকটা অসুবিধাও আছে, কারণ এতে অনেকটা টাকা সুদ বাবদ দিতে হয়। একে বলে Time Deposit বা মেয়াদী জমা।

এই ব্যবস্থার উল্টো বন্দোবস্ত হচ্ছে "চলতি আমানত" যাকে ইংরাজিতে বলে 'Current Deposit'—এ ক্ষেত্রে জমা টাকা যে কোনও মুহূর্ত্তে চেক্ দিয়ে তুলে নেওয়া যায়। সাধারণতঃ একটা নিয়ম আছে যে প্রত্যেক হিসাবে অন্ততঃ পক্ষে ২০০ কিংবা বেশী টাকা সব সময় প'ড়ে থাকা দরকার। কিন্তু এই নিয়মের ব্যাতিক্রম বহু সময়েই হ'য়ে থাকে এবং সাধারণতঃ ব্যাঙ্কে চেক্ গেলে চেকের 'সম্মানের' জন্য (চেক্ ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্য) যদি একাউণ্টের শেষ কপর্দ্দকটুকুও লাগে তাও দিয়ে দেওয়া হয়। এখানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে এই সব চলতি হিসাবের খাতায় যে টাকা উদ্বৃত্ত স্বরূপ পড়ে থাকে, তার উপরে নির্ভর ক'রে ব্যাঙ্ক কখনই কোন টাকা দাদন দিতে পারে না কারণ এ টাকা চাইবামাত্র দেবার প্রতিশ্রুতিতেই জমা নেওয়া হয়েছে। এইজন্য এদের বলে "Demand Deposit'—বা চাইবামাত্র দেয় জমা। এতে স্বভাবতঃই ব্যাঙ্ক খুব কম সুদ দেয়—যেমন বৎসরে শতকরা ৷৹ আনা মাত্র—এবং এই সুদেরও একটি নিম্নতম অঙ্ক থাকে, যার কমে সুদ হিসাবে জমা করা হয় না। এই হিসাবে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেওয়া এবং টাকা তোলা যায় এবং তার জন্য ব্যাঙ্ককে য সমস্ত কাজ করতে হয়, তার পারিশ্রমিক হিসাবে বৎসরে দুইবার Incidental charges বা আনুষঙ্গিক খরচা বাবদ ২ টাকা, ৪ টাকা বা এই রকম একটা কিছু পরিমাণ টাকা হিসাবে খরচা তোলা হয়।

এই দুই রকমের জমা ছাড়া এর মাঝামাঝি আর একরকম জমা আছে যাকে বলে Savings Account—বা "সঞ্চয় হিসাব"। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটা বন্দোবস্ত যার সাহায্যে সাধারণ লোকে অল্প অল্প ক'রে সামান্য সঞ্চয় গড়ে তুলতে পারে। এতে চলতি আমানতের চাইতে কিছু বেশী সুদ দেওয়া হয়—সাধারণতঃ শতকরা বাৎসরিক এক টাকা। কিন্তু এ হিসাবে চলতি আমানতের মতো সব সময় টাকা তুলতে দেওয়া হয় না—আবার স্থায়ী আমানতের মতো নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে টাকা তোলা যাবে না, এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নাই। এর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে সপ্তাহে একবার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত তোলা যায়।

ব্যাঙ্কে ওপরে যে তিন রকমের জমার কথা বলা হয়েছে, এ ছাড়াও Certificate

এবং অন্যান্য বিশেষ রকম জমার ব্যবস্থা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ক'রে থাকে। সাধারণতঃ চল্‌তি আমানত এবং সঞ্চয়ী আমানতের হিসাবে আমানতকারীদের চেক্ বই দেওয়া হয় এবং এই সমস্ত চেক্ বাজারে চালু হ'বার ফলে "ব্যাঙ্কের টাকা", (Bank Money বা Credit Money) সৃষ্টি হয়।

জামিন অথবা বন্ধক দিয়ে চেক কাট্‌বার অধিকার

টাকা জমা দিয়ে চেক্ কাট্‌বার ফলে যতো টাকা ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে তার চাইতে অনেক বেশী গুণ টাকা সৃষ্টির কৌশল ব্যাঙ্কের জানা আছে; এবং সকল দেশে এই উপায়েই ব্যাঙ্ক, জাতির এবং রাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির পথ প্রস্তুত ক'রে থাকে। টাকা জমা দিয়ে চেক্ কাটলে বাস্তবিক ব্যাঙ্কের খুব বেশী পরিমাণে টাকা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না; কারণ যে কোনও বড় ব্যাঙ্কের চেক্‌ও বেশী দিন লোকের হাতে হাতে ঘোরে না; বিশেষতঃ আমাদের দেশে চেক্ পেলে লোকে সাধারণতঃ ব্যাঙ্কে গিয়ে নগদ টাকা নিয়ে আসে। কিন্তু ব্যাঙ্ক বাস্তবিকই বিশ্বাসের ওপরে টাকা সৃষ্টি করে, যখন সে লোককে টাকা ধার দেয়। অর্থাৎ যে লোকটী টাকা ধার নেয় সে টাকা জমা দেয় না—বরঞ্চ টাকা তুলে নিয়ে আসে. এখন জমা না দিয়ে কি ক'রে টাকা তুলে নিয়ে আসে এইটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক দুই উপায়ে ধার দেয়—এক হচ্ছে Fixed Loan বা "নির্দ্দিষ্ট ঋণ" অর্থাৎ ধারের টাকার অঙ্ক প্রথমেই নির্দ্ধারিত হয়, এবং সেই সম্পূর্ণ টাকা সুদ সমেত একেবারে ফেরৎ দিতে হয়। আর একরকমের ঋণ, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ীদের প্রায়ই দিয়ে থাকে—তার নাম হচ্ছে Overdraft। এই প্রকারের ঋণ নেবার নিয়ম এই যে, সাধারণতঃ লোকটির অথবা প্রতিষ্ঠানটির একটি চলতি হিসাব থাকে। যে পরিমাণ পর্য্যন্ত ধার দেবার চুক্তি হয় সেই পরিমাণ টাকা এই হিসাবে জমা তোলা হয়। এটি সাধারণতঃ লাল কালিতে লেখা হয়। এতে এই বোঝায় যে টাকাটা তার জমা নেই; বরঞ্চ এই টাকাটা তার ব্যাঙ্কের কাছে দেনা আছে। এই ধার করা জমার টাকা, যেমন যেমন দরকার, Cheque দিয়ে তোলা যায়—সুতরাং Constituentএর যদি দরকার না থাকে তা হ'লে অযথা বেশী টাকা ধার করে বেশী সুদ দেবার প্রয়োজন হয় না।

কখন কখন 'personal security' বা ব্যক্তিগত জামিনে 'Overdraft' দেওয়া হয়। এই ঋণ-গ্রহিতার কাছ থেকে শুধু একখানি pro-note অথবা দায়স্বীকারচিঠি নেওয়া হয়। এ নিয়মে

ব্যাঙ্ক আজকাল অনেকটা সাবধান হয়ে গিয়েছে এবং ব্যাঙ্কের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা না থাকলে এরকম সুবিধা সাধারনতঃ পাওয়া যায় না।

ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ Overdrft দেয় জিনিষপত্র দলিল ইত্যাদি জমা বা বন্ধক রেখে—এগুলিকে বলে Secured Overdraft এইsecurity আবার বহু রকমের আছে। এখন এ বিষয় আলোচনা করতে গেলে Bank এর Balance Sheet আলোচনা করাই সমীচীন হবে।

ব্যাঙ্কের দেনা পাওনার বিবরণী

(Bank Balance Sheet)

ব্যাঙ্কের Balance Sheet হচ্ছে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি এবং দায়ের একটী বর্ণনাপত্র। ব্যাঙ্কের সম্পত্তির মধ্যে অন্যের কাছে থেকে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য টাকা ধরা হয়ে থাকে। দায়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের কাছে অন্য সকলের প্রাপ্য দাবী ধরা হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ ব্যাঙ্কের ব্যাবসায় আরম্ভ করতে হ'লে মূলধন দরকার—এটা কোন একজন বা বহু ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ককে দিয়াছে; সুতরাং এটা ব্যাঙ্কের একটী দায়। ধরা যাক্ ব্যাঙ্ক এই টাকা নগদ পেয়েছে—সেক্ষেত্রে টাকাটা ব্যাঙ্কের দেনা পাওনার বিবরণীতে ব্যাঙ্কের সম্পত্তির মধ্যে দেখান হ'বে। যদি খানিকটা অন্য ব্যাঙ্কে এবং খানিকটা নগদ থাকে, তবে খানিকটা "Cash in hand" বলে দেখান হ'বে এবং বাকী যে টাকাটা ব্যাঙ্কে আছে সেটাকে "Cash at Bank" ব'লে দেখান হ'বে। তারপর মনে করা যেতে পারে যে ব্যাঙ্কের ব্যবসায় চালানোর জন্য একটা বাড়ীর দরকার এবং এই বাড়ী কেনা হ'লে বাড়ীর দামটাও Asset বা সম্পত্তির মধ্যে দেখান হ'বে।

এখন ব্যাঙ্কের ব্যবসায় চললে হিসাবগুলোকি ভাবে ব্যালান্স সীটে দেওয়া হবে সেইটি ভাবতে হ'বে। ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হ'চ্ছে ব্যাবসায়ীদের ঋণ দেওযা—সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে আমানতকারীদের কাছ থেকে পাওয়া টাকা, এবং সম্পত্তির নগদ টাকা থেকে কিছু নিয়ে, ব্যাঙ্ক কোন একটী অথবা কয়েকটী প্রতিষ্ঠানকে ধার দিয়েছে (ধরা যাক্ তার নাম নয়াভারত শিল্প-প্রতিষ্ঠান)। সেক্ষেত্রে Cash থেকে এই টাকাটা কম দেখিয়ে Loans and Advances বা ঋণদান হিসাবে দেখান হ'বে এবং এটাও ব্যালান্স সীটে সম্পত্তির দিকেই লেখা হ'বে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না বাস্তবিক সেই প্রতিষ্ঠান একটী Cheque লিখে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে টাকা তুলে নেয়,

সে পর্য্যন্ত Cash in hand এর কোন পরিবর্ত্তন হ'বে না বা ব্যাঙ্কের ব্যালান্স সীটেরও কোনও পরিবর্ত্তন হ'বে না। কিন্তু এমন হ'তে পারে যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, এই চেক্, মাল কিনবার মূল্য হিসাবে হুগলী মেশিনারী কোং কে দিয়ে দিল এবং ধরে নেওয়া যাক্ যে ঐ কোম্পাণীর Account ও এই ব্যাঙ্কেই আছে। তাহ'লে এই চেক্ এই ব্যাঙ্কেই এই হুগলী মেশিনারীর একাউন্টে জমা হ'বে। এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের Cash বা নগদ টাকা খরচের কোন দরকারই হ'ল না—ব্যাঙ্কের চেক্ দিয়ে টাকার কাজ চ'লে গেল।

অনেক সময় ব্যাঙ্ক চেক্ অথবা বিল Disconnt করে; অর্থাৎ সুদ বা বাট্টা বাদ দিয়ে নগদ দামে কিনে নেয়। একখানা ২ মাসের মেয়াদী ১০০০৲ টাকার বিল ৯৯০৲ টাকা দিয়ে কেনা মানে, ২ মাসের জন্য ৯৯০৲ ধার দিয়ে ১০৲ টাকা সুদ পাওযা। বাস্তবিক পক্ষে এই ১০০০৲ টাকা ২ মাস চলে গেলে পরে তবেই ব্যাঙ্ক লাভ করবে—সুতরাং এই সময়ের মধ্যে যদি ব্যাঙ্কের ব্যাল্যান্স সীট তৈয়ারী করা হয় তবে এই ১০৲ টাকা অবিভক্ত মুনাফার (Undivided profits) খাতায় লেখা হবে।

আমরা একটা ছোট ভারতীয় ব্যণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স সীট উদ্ধৃত করলাম। এর থেকে আমাদের ভাবতীয ব্যাঙ্ক ব্যবসার সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাবে।

ব্যাঙ্কেব দায় বিষয় বিবেচনা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার যে ব্যাঙ্কের সব রকম দেনার গুরুত্ব সমান নয়। ব্যালান্স সীট তোল্‌বার সময়, বিভিন্ন খাতের দাযগুলি এমন ভাবে সাজান হয় যে, যে দায়েব গুরুত্ব যত বেশী সে দায তত নীচে স্থান পায়। আলোচ্য ব্যাঙ্কের আদাযীকৃত মূলধন হচ্ছে ৭৪, ৭০২৮১টাকা— এবং এর মজুত তহবিল হচ্ছে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা—অর্থাৎ ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের প্রায় একচতুর্থাংশ। এর মানে হচ্ছে এই যে ব্যাঙ্কের সংরক্ষণ নীতি সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সজাগ।

ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের টাকা, তাদের নিজেদের কাছে সম্পত্তি হ'লেও, ব্যাঙ্কের কাছে দায় -কারণ এই জমা টাকা চাইলেই ফেরত দিতে হবে এই সর্ত্তেই এই সমস্ত লোক এইখানে টাকা জমা দিয়েছে। এখানেও হিসাবগুলি কম জরুরীর দিক থেকে আরম্ভ ক'রে বেশী জরুরীর দিকে ক্রমশঃ নেমে গিয়েছে। সেজন্য Security Deposit (কর্ম্মচারীদের এবং অন্যান্যের) সকলের নীচে লেখা হয়েছে এবং fixed Deposit বা মেয়াদি জমা সকলের আগে লেখা রয়েছে। ব্যাঙ্কের ব্যালন্স সীট বরাবর এই নিয়মেই করা হয়ে থাকে, যাতে ব্যাঙ্ক ফেল পড়লে, টাকা ফেরৎ দেবার অগ্রগণ্যতা স্থির করবার সময় "নীচ হ'তে ওপরে" এই নীতি অনুসারে কাজ হতে পারে।

আমানতী দায়ের পরে খরচের বাবদ কয়েকটী বিশেষ দায় লেখা হয়েছে। তারপরে আছে যে লভ্যাংশ কেউ দাবী করে নাই, সুতরাং ব্যাঙ্কের কাছে পড়ে আছে।

Royal Bengal

Balance Sheet as

CAPITAL & LIABILITY

	Rs. As.P.	Rs. As.P.
Capital Account		74,70,281 0 0
Authorised 20,00,000 shares of Rs. 10/- each	2,00,00,000 0 0	
Issued 7,50,000 shares of Rs. 10/- each	75,00,000 0 0	
Subscribed and Paid up 7,43,939 shares of Rs. 10/- each	74,39,390 0 0	
Forfeited shares	30,891 0 0	
Reserve Fund		18,50,000 0 0
Provision for Taxation		5,66,596 9 6
Deposits		10,14,56,408 13 7
Fixed Deposit & Cash Certificates etc	2,53,50,201 3 11	
Current & Savings Bank	7,25,81,325 7 3	
Other sums (including unadjusted accounts) due by the Bank	34,36,462 2 5	
Security Deposit	88,420 0 0	
Liabilities		4,727 4 6
For Expenses	4,560 9 0	
Other Finances	166 11 6	
Unclaimed Dividend		1,18,100 0 0
Bills for Collection as per Contra		89,57,728 10 8
Acceptances for Constituents as per Contra		29,80,320 9 1
Branch Adjustments		6,71,914 15 10

Bank Limited.

at 31st December, 1947,

PROPERTY & ASSETS

	Rs.	As.P.	Rs.	As.P
Cash & Balances			1,61,96,364	7 0
In hand	48,13,157	9 4		
With Bankers in Current A/cs	82,34,306	13 8		
Call Deposit with Banks	31,50,000	0 0		
Stamps in hand			9,362	0 0
Investments :—(Market Value Rs. 5,49,43,135-5-0)			5,06,26,440	7 5
In Govt. Securities	4,75,64,995	8 5		
(of which 3% Conversion Loan of the face value of Rupees One lac deposited with Bengal Bonded Warehouse Association for Head Office Building site)				
In Municipal & Port Trust Debentures	9,26,554	8 0		
In Joint Stock Co. 5½% Debentures	16,34,137	8 0		
In Joint Stock Co. Pref. & Ordy. shares	5,00,752	15 0		
Compulsory Excess Profits Tax Deposit with Government			1,37,888	0 0
Income Tax deducted at source			5,10,596	9 6
Interest Accrued on Investments			2,72,372	0 4
Loans, Cash Credits & Overdrafts Etc.			4,37,82,926	0 10
Particulars required by Act VII of 19:3 :—				
(*a*) Debts considered good and full secured	4,14,70,262	7 1		
In the above are included Rs. 86,587-11-6 debts due by Directors and by firms in which a Director is a partner or guarantor. The total of maximum balance under this heading during the year was Rs. 5,16,302-10-0				
b) Debts considered good and secured by personal liabilities of one or more parties as under :—	23,12,663	9 9		
(i) Bills discounted Rs. 13,40,974 5 10				
(ii) Personal liabilities of one or more parties, temporary overdrafts etc. Rs. 9,71,689 3 11				
(*c*) Debts due by Officers	Nil			

Royal Bengal

Balance Sheet as

CAPITAL & LIABILITY—*Contd,*

	Rs.	As P	Rs.	As.P
Brought forward				
Profit & Loss Account			6,29,791	10 3
Balance as per last a/c.	6,49 600	14 9		
Less—Dividend for the year ending 31st December 1946 @ 6½% p.a.	4,43,129	1 0		
Profit for the year ending 31st December, 1947	2,06,471	14 9		
	11,39,916	6 0		
	13,46,388	3 9		
Less—Transferred to reserve Fund	1,50,000	0 0		
	11,96,388	3 9		
Less—Provision for Taxation	5,66,596	9 6		
Total Rs.			**12,47,05,900**	**0 0**

Bank Limited.

as 31st December, 1947

PROPERTY & ASSETS—*Contd*

			Rs. As.P	Rs. As.P.
Brought forward ..				
Other sums (including unadjusted accounts) due to the Bank				1,68,474 8 3
Stocks of Stationery and Printiug				94,986 10 1
Dead stock				2,89,846 10 10
Upto last a/c. (at cost)	Rs	3,11,399 6 2		
Since added	,,	82,767 0 0		
	Rs.	3,94,166 6 2		
Less—Written off etc	,,	10,596 0 11	2,83,570 5 3	
Less—Depreciation				
Upto last a/c.	Rs.	65,753 1 5		
Since added	,,	27,970 9 0	93,723 10 0	
Land and Building				6,80,101 6 6
Upto last a/c (at cost)	Rs	6,84,449 3 4		
Since added	,,	27,380 4 6	7,11,829 7 10	
Less—Depreciation				
Upto last a/c	Rs	29,522 1 4		
Since added	,,	2,139 0 0	31,728 1 4	
Bills Receivable as per Contra				89,57,725 10 2
Constituents Acceptences as per Contra				29,80,320 9 1
Total Rs. ...				12,47,05,900 0 0

Bills for Collection (বা আদায়ার্থ বিল) হচ্ছে মোট যত টাকার বিল্ আমানতকারী-দের হিসাবে আদায় করবার জন্ত ব্যাঙ্কের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে তার হিসাব। ব্যালান্স সীটের অপর দিকে আবার এই সংখ্যাটিকে Bills Receivable as per Contra হিসাবে সম্পত্তি ব'লে দেখান হয়ে থাকে, তার কারণ হচ্ছে এ টাকাটা আসলে ব্যাঙ্কের নয় -ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের হয়ে ব্যাঙ্ক আদায় করে দিচ্ছে এই মাত্র।

তার পরের হিসাব হচ্ছে Acceptances for Constituents as per Contra—এর মানে হচ্ছে এই যে, অনেক সময় ব্যাঙ্ক তার অমানতকারীদের তরফ থেকে হুণ্ডি অথবা বি "Accept" করে দেয়, অর্থাৎ দায় স্বীকার করে নেয়। টাকা হয়তো আদায় হবে ৩০ দিন কিংবা ৬০ দিন পর; কিন্তু জনসাধারণের অথবা ব্যবসায়ী মহলের আস্থাভাজন কোনও ব্যাঙ্ক দায় স্বীকার করে নিলে সে Bill অথবা Hundi'র কদর অনেক বেড়ে যায়, এবং যে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান সেটা ভাঙ্গিয়ে বা discount করে টাকা দিতে পারে। সেজন্মে ব্যাঙ্ককে অনেক সময়েই অমানতকারীদের হয়ে দায় স্বীকার করে নিতে হয। কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক Bills for Collection হিসাবের মতো আর একটি বিপরীত বা Contra ব্যালান্স সীটের সম্পত্তির দিকে দেখায়, তার নাম হচ্ছে "Constituents Acceptances as per Contra"—অর্থাৎ ব্যাঙ্ক দায় স্বীকার করেছে সেটা ঠিক; কিন্তু আসলে ব্যাঙ্ক টাকাটা আবার আমানত কারীর (যার হয়ে ব্যাঙ্ক দায স্বীকার করেছে) কাছ থেকেই আদায় করবে।

Branch Adjustment হচ্ছে, ব্যাঙ্কের নিজেদের বিভিন্ন বিভাগের হিসাব নিকাশ মেলানোর হিসাব। এর পরেই আসছে Profit and Loss Account—এখানে আগের হিসাবের উদ্বৃত্ত থেকে গত সালের লভ্যাংশ বাদ দিয়ে তার সঙ্গে এই সালের লাভ যোগ করা হয়েছে। এতে দাড়াচ্ছে ১৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩৮৮ টাকা ✓০ আনা ৯ পাই। কিন্তু এর সব টাকাই লাভ হিসাবে বিলি করলে চলবে না; কারণ মজুত তহবিলে এবং সরকারী ট্যাক্স দেবার জন্ত সেই সেই বাবদ টাকা বরাদ্দ ক'রে রাখ্তে হবে—এবং ফলে ঐ দুই হিসাবে ১ লক্ষ ৫০, হাজার টাকা ও ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার, ৫৯৬ টাকা ৷৴০ আনা ৬ পাই বাদ দেওয়া হয়ে গেলে শেষ পর্য্যন্ত লাভ দাঁড়াল ৬ লক্ষ, ২৯ হাজার ৭৯১৷৶০ আনা ৩ পাই।

Assets বা সম্পত্তির দিকে Floating followed by fixed এই নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে সম্পত্তি যত সহজে নগদ টাকায় পরিণত করা যায়, সে সম্পত্তি তত আগে লেখা হয়েছে। প্রথমতঃ ব্যাঙ্কের নিজের হাতে যে নগদ টাকা আছে এবং অন্তান্ত ব্যাঙ্কে এই ব্যাঙ্কের যে টাকা আছে তার হিসাব দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এই টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চলতি হিসাবে রাখা হয়। তা ছাড়া বড় বড় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ নিজেদের মধ্যে চাহিবামাত্র দেবার প্রতিশ্রুতিতে টাকা লেনদেন করে। একে বলে Call

Deposit—এর মানে হচ্ছে এই যে কোন ব্যাঙ্কের সাময়িক নগদ টাকার প্রয়োজন হ'লে সে অন্য কোনও ব্যাঙ্কের কাছে at call অর্থাৎ চাহিবামাত্র ফেরৎ দেবার প্রতিশ্রুতিতে, ধার নেয়। এই প্রয়োজন ব্যাঙ্কের আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন হয় না। এমন হ'তে পারে যে হঠাৎ কোন বড় Constituent অনেক টাকা তার জমা থেকে তুলে নিল। সাধারণতঃ এরকম টাকার প্রয়োজন হয়, হঠাৎ বেশী টাকার (D. D.) Demand Draft অথবা Telegraphic Transfer (T. T) কোনও Branchএ এলে। সর্ব্বদাই কোনও ব্যাঙ্কের কোনও শাখা, তার অপর শাখার ওপর Demand Draft পাঠায়। অর্থাৎ কোনও লোকের হয়তো কল্‌কাতা থেকে বোম্বাইতে টাকা পাঠাতে হ'বে, অথবা নিয়ে যেতে হ'বে। সেক্ষেত্রে সে নগদ টাকা না নিয়ে গিয়ে কোনও ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখায় গিয়ে নগদ টাকা জমা দিয়ে ব্যাঙ্কের একখানি Draft কিনে নেয়—এটাএকটি হুকুমনামা বা order যা ব্যাঙ্কের কল্‌কাতা ব্রাঞ্চ তার Bombay ব্রাঞ্চকে দিচ্ছে। এতে লেখা থাকে যে, বাহককে অথবা তার আদিষ্ঠ কোনও লোককে, যেন এতো টাকা নগদ দেওয়া হয়, কারণ সে এ পরিমাণ দ্রব্য মূল্য (কল্‌কাতা শাখায়) জমা দিয়েছে। যদি কেউ কল্‌কাতায় কোন ব্যাঙ্কে ৫ লক্ষ টাকা নগদ জমা দিয়ে সেই ব্যাঙ্কের বোম্বে ব্রাঞ্চের ওপর ড্রাফ্‌ট কেনে, তখন বোম্বে ব্রাঞ্চে ঐটী নিয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ ৫ লক্ষ টাকা দেবার জন্য রাখতে হ'বে। অনেক সময় ব্যাঙ্কের খবর পেতে অনেক দেরী হয়—হয়তো ইতিমধ্যেই ঐ লোকটী গিয়ে হাজির হয়েছে। তখন হঠাৎ যদি ব্যাঙ্কের এতো টাকা নগদ না থাকে তবে সে হেড অফিস কিংবা অন্য কোথাও থেকে টাকা না আসা পর্য্যন্ত, অন্য ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেয়—আবার টাকা এলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফেরৎ দিয়ে দেয়। Telegraphic Transferএ আরও বেশী অসুবিধা সৃষ্টি হ'তে পারে, কারণ সেখানে ব্রাঞ্চ থেকে ব্রাঞ্চে টাকা দিবার হুকুম টেলিগ্রাফে দেওয়া হয়।

Transfer অনেক বেশী এসে পড়বার ফলে, কিংবা অপর কোথাও থেকে টাকা আসবার সামান্য খানিকটা দেরী হয়ে যাওয়ার ফলে, অথবা অন্য কোনও কারণে, কোনও ব্যাঙ্কের বিশেষ টাকার দরকার হ'লে, অন্যান্য সমপর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক তাকে অল্প সময়ের অসুবিধা কাটিয়ে উঠ্‌বার জন্য সাহায্য করে। অবশ্য যদি অন্য কোনও ব্যাঙ্কের এমন অবস্থা হয় যে, তার হিসাবে অথবা তার Central Bank এর হিসাবে, অনেক টাকা অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে প'ড়ে আছে, তবেই সে এভাবে অপর ব্যাঙ্ককে সাহায্য করতে পারে। এক্ষেত্রে যদি প্রথমোক্ত ব্যাঙ্কের আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের কোন দ্বিধা না থাকে, তবে তার কর্ত্তৃপক্ষ এই ভেবে কাজ করবে যে, নগদ প'ড়ে থাকাতে টাকা খাটানো হ'চ্ছে না—তার চাইতে বরং অন্য ব্যাঙ্কে দিয়ে যা কিছু সামান্য সুদ পাওয়া যায় তাই লাভ।

Stamp in hand, এর পরে দেখান হয়েছে, কারণ যতো টাকার ডাক টিকিট ব্যাঙ্কের হাতে আছে সেটাও প্রায় নগদ টাকারই সামিল।

এর পরে দেওয়া হয় ব্যাঙ্কের Investment অর্থাৎ ধন বিনিয়োগ। এই কাজটি ঠিক মত করার উপরই ব্যাঙ্কের স্থায়ীত্ব সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে। ধন বিনিয়োগের কৌশলে কোনও ত্রুটী থাকলেই ব্যাঙ্কের বিপদ অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে। ব্যাঙ্কের ধন বিনিয়োগ কথাটী দুই অর্থে ব্যবহার হ'য়ে থাকে—প্রথমত যে টাকা ব্যাঙ্ক নিজ দায়ীত্বে লাভের জন্য (Profit) নিয়োগ করে—একে বলে নিজলগ্নী যাকে ইংরাজীতে বলে Investment—এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের লাভ এবং ক্ষতি দুই হ'তে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক নিজ দায়ীত্বে লাভ করবার চেষ্টা করে না—ব্যাঙ্ক খালি বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিয়ে তাদের কাছ থেকে সুদ (Interest) পেয়েই সন্তুষ্ট থাকে। প্রায় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রকমের সম্পত্তি বন্ধক রেখে, এই ধরণের ঋণ দেওয়া হয়। একে সাধারণতঃ Advance, Loan, Cash Credit, Overdraft অর্থাৎ ঋণ, দাদন, জমাতিরিক্ত ঋণ ইত্যাদি বলা হয়।

আলোচ্য ব্যালান্স সীটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রথমতঃ কোম্পানীর কাগজে ধন বিনিয়োগ করা হ'য়েছে—এর সুবিধা এই যে টাকা নষ্ট হ'বার বিশেষ সম্ভাবনা নাই; এবং যদি কেনা বেচার ফলে কিছু লাভ নাও হয় তবে সরকারের কাছ থেকে প্রতি ছয় মাস অন্তর একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানীর কাগজ গুলি ৪, ৭৫, ৬৪, ৯৯৫৷৫ পাই দিয়ে কেনা হ'য়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বাজার দর তার চাইতে অনেক বেশী অর্থাৎ ৫, ৪৯, ৪৩, ১৩৫।/০ ; অর্থাৎ কিনা এগুলি এখন বিক্রী করলে ব্যাঙ্কের প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা লাভ দাঁড়ায় (যাকে অনেক সময় Secret Reserve বলা হয়ে থাকে)। এ ছাড়া Municipal এবং Port Trust Debenture, Joint Stock-Company Debenture এবং সেয়ারে অনেক টাকা বিনিয়োগ করা হ'য়েছে। সরকারের নিকট বাধ্যতামূলক ভাবে Excess Profits Tax বাবদ যে টাকা জমা আছে সেটা এর পরে উল্লেখ করা হ'য়েছে। আয়কর আইনানুসারে যা আদায় ক'রে নেওয়া হ'য়েছে সেটা এর পরে দেখান হ'য়েছে।

কোম্পানীর কাগজের ওপর যত সুদ পাওনা হয়েছে, সেটি এর পরে আছে—এর পরিমাণও নেহাৎ মন্দ নয়—২ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৭২ টাকা ৪ পাই।

ঋণ, দাদন, জমাতিরিক্ত ঋণ ইত্যাদি এর পরে দেখান হ'য়েছে। যে ব্যাঙ্কের ব্যালান্স সীট এর লগ্নী নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেখানে দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্কের নিজ লগ্নী থেকে এটা কিছুটা কম আছে। সব সময়ই যে এ রকম থাকবে তার কোন মানে নেই—এবং বাস্তবিক পক্ষে সাধারণতঃ নিজ লগ্নী থেকে ঋণ দাদন, জমাতিরিক্ত ঋণ ইত্যাদিই বেশী দেওয়া হ'য়ে থাকে। আলোচ্য ব্যালান্স সীট দেখে মনে হয় যে, এই ব্যাঙ্ক বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবসায় করে; এবং যদিও বাইরে টাকা খাটানোর ফলে বেশী সুদ পাওয়া যায়, তবুও বাইরে টাকা লগ্নী করবার যে ঝুঁকি এবং টাকা মারা যাবার ভয় আছে, এ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ সে

বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। এরা কোম্পানীর কাগজ কিনে তার নিশ্চিত সুদ নিয়ে (কম হ'লেও) সন্তুষ্ট থাক্‌তে চায়—অর্থাৎ এরা ইংরাজীতে, যাকে বলে safety first সেই নীতি অনুসারে চল্‌তে চায়। এই নীতি নিয়ে চল্‌লে সব দিক্ দিয়েই যে ভালো হ'বে তা নয়, কারণ এতে ব্যাঙ্কের লাভের অঙ্ক কমে যায়। তা ছাড়া ব্যাঙ্কের কাজ ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা। সুতরাং এ কাজ করতে গিয়ে কিছুটা ঝুঁকি নিতেই হবে—তা না হলে ত' ব্যাঙ্কের সব টাকাতেই কোম্পানীর কাগজ কিনে, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত আরামে কাটাতে পারে। কিন্তু সে রকম ভাবেও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চলেনা। তার কারণ ঋণ যত বেশী দেওয়া হয়, আমানতকারীর সংখ্যা তত বাড়তে থাকে। যে সমস্ত ব্যক্তি অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোন ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে, তারা খাতিরে প'ড়ে সেই ব্যাঙ্কে তাদের বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয়দের টাকা জমা রাখতে রাজী করায়। এই ভাবে ব্যাঙ্কের হাতে বেশী বেশী টাকা আস্‌তে থাকে ; এবং সেই টাকা খাটিয়ে বেশী বেশী লাভ করা সম্ভব হয়।

আমানত বাড়াতে হ'লেই জনসাধারণের শুভেচ্ছা এবং পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়। সেখানেই দেশবাসীর এবং ব্যবসায়ী মহলের ব্যাঙ্কের ওপর কি পরিমাণ বিশ্বাস আছে সেটা হ'য়ে ওঠে প্রধান। জনসাধারণের ওপর ব্যাঙ্কের প্রভাব বিস্তার কর্‌তে হ'লে, তাদের মনে বিশ্বাস জাগানো হচ্ছে, ব্যাঙ্কের পক্ষে গোড়ার কথা। বিশ্বাস বা আস্থা—যাকে ইংরাজীতে বলে Credit—(বাংলায় অনুবাদ কর্‌লে বাজার সম্ভ্রম বলা যেতে পারে) এটি মানুষের মনের ব্যাপার। সুতরাং যতদিন কোন ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের মনে এই Credit ঠিক রাখতে পারে ততদিনই সেই ব্যাঙ্ক সমাজ সেবার কাজ ক'রে যেতে পারে--কিন্তু যখনই এই বিশ্বাসের কোথাও ঘুণ ধর্‌তে আরম্ভ হয় তখনই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ব্যাঙ্কের কর্ণধারগণ এরকম হওয়া দরকার, যাদের সততা সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে কোন রকম সন্দেহের কারণ না থাকে।

ঋণ, দাদন, ইত্যাদির হিসাব তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমতঃ যে সমস্ত দাদনে যথেষ্ঠ পরিমাণে জামিন আছে এবং টাকা মারা যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই সেগুলি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কত টাকা ব্যাঙ্কের কোনও Director বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে, আইনতঃ সেটাও জানিয়ে দিতে হয় ; এবং সেই জন্যই এক্ষেত্রে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ৪ কোটীর কিছু বেশী টাকা ঋণের মধ্যে, ব্যাঙ্কের Director অথবা তাদের কোনও কোম্পানীকে ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৩০২ টাকা ॥৵০ আনা পর্য্যন্ত কোনও সময় দেওয়া হয়েছিল। আইনে এই রকম ভাবে দেখানোর নিয়ম করা হয়েছে এই কারণে যে, অনেক সময় দেখা গেছে যে ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা বিপন্ন ক'রেও ব্যাঙ্কের Directorরা বহু টাকা নিজেদের অন্যান্য কোম্পানীর মধ্যে উপযুক্ত জামিন না নিয়েই দাদন দিয়েছে, যার

ফলে কিছুদিন বাদে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হ'য়ে গিয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে মোট দাদনের তুলনায় এরকম দাদন অতি সামান্যই দেওয়া হয়েছে। এটা ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সততারই পরিচায়ক।

দ্বিতীয় দফায় উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত ভাল ব'লে স্বীকৃত দেনা, যেগুলি যথাসময়ে পরিশোধ করা সম্বন্ধে এক বা একাধিক ব্যক্তি জামিন আছে। এগুলি আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(i) ডিস্‌কাউন্ট (Discount) করা বিলের পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৭৪ টাকা ।/০ আনা দশ পাই দেখান হয়েছে ; এর মানে হচ্ছে, যে সমস্ত বিল বা হুণ্ডির এখনও মেয়াদ বা due date হয়নি, সেগুলি ব্যবসায়ীগণ ব্যাঙ্কের কাছে কিছু কম দামে বিক্রী করে নগদ টাকা নিয়ে নিয়েছে। বিলে যাদের স্বাক্ষর বা Endorsement আছে, ব্যাঙ্ক তাদের সঙ্গতিসম্পন্ন এবং বাজার সম্ভ্রমসম্পন্ন মনে কর্‌লে, সামান্য কিছু বাটা বা Discount দিয়ে কিনে নেয়।

(ii) কিছু টাকা ব্যাঙ্ক থেকে কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কয়েকজনের দায়িত্বে কোন accountএ overdraft হিসাবে অনেক সময় দেওয়া হয়। এরকম কাজ অবশ্য ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কমই করে, কারণ ব্যক্তিবিশেষের creditএর উপরেই এ সমস্ত টাকা ধার দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ এরকম দাদনই পছন্দ করে, যাতে টাকা আদায় কর্‌তে হ'লে ব্যাঙ্কের অন্য কারও উপর নির্ভর কর্‌তে না হয়। ব্যাঙ্ক চায় যে, জামিন হিসাবে দেওয়া সম্পত্তি, যেমন কোন শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ, বা অন্যান্য সম্পত্তি, ব্যাঙ্কের হেপাজতে থাক্‌বে। অর্থাৎ যদি এমনিতে টাকা আদায় না হয়, তবে সেগুলি বিক্রী করে দিয়ে সহজে টাকা আদায় হ'তে পারে।

ঋণ দাদনের তৃতীয় দফা হিসাবে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের যে টাকা ধার দেওয়া হ'য়েছে সেটা উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সে রকম কোন দাদন ব্যাঙ্ক করে নাই।

ঋণ দাদনের কয়েক দফা দেখানর পরে—ব্যাঙ্কের পাওনা দেখান হ'য়েছে। এর পরে আছে Dead Stock—অবিক্রীত মাল। যে সমস্ত জিনিষপত্র কাগজ ষ্টেশনারী ইত্যাদি ঐ বৎসরের মধ্যে খরচ না হ'য়ে উদ্বৃত্ত পড়ে আছে বা যার জের আগামী সালেও টান্‌তে হচ্ছে, সেই সমস্ত জিনিষের দামও এখানে দেওয়া হ'য়েছে। এর মধ্যে কি পরিমাণে নতুন আমদানী করা হ'য়েছে, এবং কি পরিমাণে পূর্ব্বের হিসাবে ছিল, তা বলা হ'য়েছে। তা ছাড়া কি পরিমাণ, লোকসান হওয়ার দরুণ, writing off করা হ'ল, অর্থাৎ হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হ'ল, এবং কি পরিমাণে ক্ষয় ক্ষতি বা Depreciation হিসাবে বাদ দেওয়া হ'ল, সেটাও এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর পরে আছে ব্যাঙ্কের নিজের বাড়ী জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি। গত হিসাবে কতো দেখান হ'য়েছিল এবং তার পরে আলোচ্য বছরে কতো খরিদ করা হ'য়েছে, তা দেখান হ'য়েছে। এ ছাড়া ক্ষয়ক্ষতি হিসাবে কতো ধর হ'য়েছে, সেটাও উল্লেখ করা হ'য়েছে।

এর পরে Bills for Collection এর পাল্টা হিসাব বাবদ Bills Receivable বা প্রাপ্য বিল। তার পর, Constituents Acceptances as per Contra। মানে হচ্ছে এই যে, "ব্যালান্স সীট" এর অপর দিকে যেমন দেখান হ'য়েছে যে, ব্যাঙ্ক তার আমানতকারী এবং Constituentদের হ'য়ে কত টাকার বিল হুণ্ডী ইত্যাদির জামিন হ'য়েছে, সেই রকম এক্ষেত্রে তার পাল্টা হিসাব দেখান হ'য়েছে। অর্থাৎ কিনা ব্যাঙ্ক যেমন দায়িত্ব নিয়েছে তেমনি ব্যাঙ্ক আবার তার আমানতকারী এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা ঐ টাকার জামিন বা অঙ্গীকার পত্র সই করিয়ে নিয়েছে।

Analysis of Investment Portfolio

ঋণ দাদনের বিশ্লেষণ

আমরা ব্যাঙ্কের ব্যালান্স সীট নিয়ে এ পর্য্যন্ত আলোচনা ক'রছি। এখন আমরা ব্যালান্স সীটের একটা বিশেষ অংশ, যাকে আমরা Advances বলে উল্লেখ ক'রেছি (ঋণ দাদন জমাতিরিক্ত ঋণ ইত্যাদি) সেই সম্বন্ধে আলোচনা ক'রব।

ব্যালান্স সীটে আমরা কেবল মোট কতো টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে সেটা জানতে পারি, কিন্তু কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানকে কি জামিনে এবং কি ভাবে ঋণ দেওয়া হয়েছে সেকথা জানতে হ'লে, আমাদের ব্যাঙ্কের Advances বিভাগের দ্বারস্থ হ'তে হ'বে, কারণ Analysis বা বিশ্লেষণ না ক'রে দেখলে, কি ভাবে ব্যাঙ্কের কাজ বাস্তবিক ভাবে চলে, সেটা আমরা বুঝতে পারব না।

সাধারণতঃ ভারতীয় ব্যাঙ্ক এমন ভাবে টাকা খাটায় যাতে এর liquidity বা সম্পত্তিকে নগদ টাকায় পরিবর্ত্তিত করবার ক্ষমতা বিশেষ ক্ষুন্ন না হয়। এটাই এদেশে সব চাইতে বড়ো কথা, কারণ আমাদের দেশে এখনো আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মত ব্যাঙ্কিং এর অভ্যাস প্রসার লাভ করেনি বা মজ্জাগত হয়নি। এ দেশে, কোন ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সামান্য একটু গুজব রটলেই, লোকে ভয় পেয়ে সমস্ত গচ্ছিত টাকা তুলে নেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। সেইজন্য এখানে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষদের সব সময়েই এই রকম বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

এ দিক থেকে ওপরে যে ব্যালান্স সীট আমরা উদ্ধৃত ক'রেছি, সেটা বেশ উপযোগী বলে মনে হয়। কারণ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বেশ মোটা টাকার কোম্পানীর কাগজ কেনা হয়েছে। এই কাগজ বিক্রী করে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না।

এখন 'Advances এর বিষয়ে আসা যাক্। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কি কি ভাবে টাকা দাদন ক'রে সেইটে প্রথমতঃ আলোচনা করা দরকার। এখানেও floating followed by fixed নীতি হিসাবে ধরা যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য একটা তালিকা নীচে উদ্ধৃত করা গেল। এতে বিষয়টা বোঝবার অনেক সুবিধা হবে। এবং এই থেকেই জানা যাবে কি ভাবে ব্যাঙ্ক যথেষ্ট পরিমানে উচ্চ সুদের হার বজায় রেখেও, এর liquidity বা সম্পত্তিকে নগদ টাকায় পরিবর্ত্তনের ক্ষমতার হানি যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারে। কারণ সাধারণতঃ, যে দাদনে লোকসানের ঝুঁকি যত বেশী, সে দাদনে সুদও আদায় করা যায় তত বেশী। অন্য পক্ষে, যারা সোণা বা কোম্পানীর কাগজ গচ্ছিত রেখে ঋণ নেয়, তাদের কাছ থেকে বেশী সুদ আদায় করা যায় না।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্বন্ধে একটি চলিত কথা আছে যে, ভাল ব্যাঙ্কব্যবসায়ী হ'তে হ'লে কোম্পানীর কাগজে টাকা খাটান ও বাড়ী বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়ার মধ্যে প্রভেদ বোঝা চাই। ব্যাঙ্কের লাভ হয় দাদনের সুদ থেকে। সুতরাং এ কথাই স্বভাবতঃ মনে হয় যে, যে সব দাদনে বেশী সুদ পাওয়া যায়, সেগুলি ক'র্‌লেই ব্যাঙ্কের লাভ হবে। কিন্তু কোন ব্যাঙ্কের কর্ণধার এইরকম এক চোখো নীতি অবলম্বন ক'রে চল্‌লে বিপদ অবশ্যম্ভাবী—কারণ দাদনের ব্যাপারে সুদ ছাড়া আরও দুইটী বিষয়ে সব সময় লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমতঃ যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপত্তা আছে কিনা, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা ধার দেওয়া হ'চ্ছে, সেটা সে ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ কর'তে না পারলে, ব্যাঙ্কের হাতে এমন কিছু ধরা ছোঁয়ার উপযুক্ত সম্পত্তি আছে কিনা যা বেচে ব্যাঙ্ক সহজেই নিজের টাকা আদায় ক'রে নিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বন্ধকী সম্পত্তি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে নগদ টাকায় পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা। এ বিষয়, ওপরে খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে। এখন বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হবে। বিষয়টী এখানে N H S, এবং L, এই চারিটী সাঙ্কেতিক অক্ষর দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে।

LIQUIDITY SCHEDULE

Securities	Liquidity	Nature of Security	Approx. Interest yield	Remarks
Call Loans	H H L	S S	1/2%	*
Treasury Bills	H H L	S S	∠1%	* *
G P Notes	H L	S S	3%	* * *
Gold	H L	S S	4%	* * *
Bank's own F/D	L	S S	4%	* *
‡ Stock Exchange Shares	L	S	5%	* *
Bill Discounting	L	S L	5%	* *
Stock of goods in Bank's Godown	N L	S L	6%	* *
Against Hypothecation of Goods	N L	S L	6%	* *
Against Stock in Trade	N L	S L	6%	*
Against Trust Receipts	N N L	S L L	7%	*
House & Lands (Mortgage)	N N L	S L	7½%	*
Against Personal Security	N N L	S L L	7½% or more	*

Explanations on the abbreviations used :

SS—Fully secured
S—Secured
SL—Less secured
SLL—Not adequately secured
HHL—Very highly liquid
HL—Highly liquid
L—Liquid
NL—Not sufficiently liquid
NNL—Non-liquid i.e Rigid

*** Very good
** Good
* Not good

‡ ১৯৪৬-৪৭ সালের শেয়ার বাজারের দুর্গতির পর থেকে ভালো ব্যাঙ্ক এখন একাজ বিশেষ ক'রতে চায় না।

কয়েকটি দাদন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে। বিশেষতঃ Stock Exchange Shares, Bill Discounting, Stock of Goods in Bank's Godown ইত্যাদির ওপরে যে সমস্ত দাদন করা হয়, সেগুলি নিয়ে অনেক সময় অনেক বিপত্তি উপস্থিত হয়। বাজারের শেয়ারের অসুবিধা এই যে অনেক সময় ভুয়া শেয়ার অথবা জাল শেয়ারের ওপর টাকা দাদন ক'রে ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং কোন ভাল ব্যাঙ্ক, আগে ব্যাঙ্কের নামে শেয়ার Transfer বা নাম খারিজ না ক'রে, তার ওপর টাকা ধার দেয় না। দ্বিতীয়তঃ শেয়ার বাজারের অবস্থা এতই অস্থির, এবং দর এত বেশী ওঠা নামা করে, যে যথেষ্ট পরিমাণ Margin বা বাজার মূল্য এবং দাদনের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য না রেখে লগ্নী করা বিশেষ আশঙ্কা জনক। Bill discounting বা বিল কেনার অসুবিধা এই যে ভালো ব্যাবসায়ী দ্বারা স্বীকৃত (Accepted) বিল ছাড়া বিল আদায় হবার কোন নিশ্চয়তা নাই; সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। ব্যাঙ্কের গুদামে মাল রেখে, তার ওপরে ধার দেওয়ার পদ্ধতি অনেক ব্যাঙ্কেই প্রচলিত। সাধারণতঃ ব্যাবসায়ী একটি ঘর ভাড়া নিয়ে, সেটা ব্যাঙ্কের নামে ভাড়া ক'রে দেয়। তারপর তার মধ্যে মাল রাখা হয়, এবং সাধারণতঃ Double Lock বা উভয় পক্ষের তালা লাগান থাকে। মাল বের করতে অথবা রাখতে হলে উভয় পক্ষ অর্থাৎ ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়ী উভয়ের লোকেই উপস্থিত থাকে। সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের একজন দারোয়ান সেখানে সব সময়ের জন্য রাখা হয় এবং তার মাইনে বাড়ী ভাড়া এবং ব্যাঙ্কের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের মাঝে মাঝে Inspection বা তদারকী খরচা বাবদ, মাসে কিছু টাকা ব্যাঙ্ককে দিতে হয়। তা ছাড়া Overdraft এর প্রতিদিনই Balance এর ওপরে সুদ দিতে হয়।

এ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে সাধারনতঃ LimitBook ব'লে একটা বই রাখা হয়। এতে সব Overdraft বা ঋণ গ্রহিতাদের যতো Security বা সম্পত্তি থাকে তার পুরো হিসাব লেখা থাকে এবং প্রতিদিনের দর লিখে রাখা হয়। এর ফলে কতো টাকা পর্য্যন্ত চেক পাশ হ'তে পারে তার একটা সোজা হিসাব Securities Department এ থাকে। এই খাতা দেখেই ব্যাঙ্কের Agent বা অন্য কোনও কর্ম্মচারী সে একাউন্টের চেক্ পাশ করে। এ বইটা সাধারনতঃ এই রকমঃ—

Name of Party... .... · ....

Date	Securities	Market Rate	Total Value	Margin	Drawing limit	Remark

CASH RESERVE

নগদ মজুত

ব্যাঙ্কের হাতে নগদ কত টাকা মজুত আছে এটা ব্যাঙ্কের স্থায়ীত্বের দিক থেকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। এটি সব সময়ই মোট আমানতের শতকরা হিসাবে দেখান হ'য়ে থাকে। আলোচ্য ব্যালেন্স সীটে মোট আমানত ১০,১৪,৫৬,৪০৮৸/৭ পাই এর মধ্যে অন্য ব্যাঙ্কে এবং ব্যাঙ্কের নিজের হাতে মোট নগদ টাকা আছে ১,৬১,৯৭,৩৬৪৶ আনা; অর্থাৎ এক্ষেত্রে Cash Reserve দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৬%-। আমাদের দেশে নগদ টাকা মজুত রাখা সম্বন্ধে আইনে কোনও বিশেষ বাঁধা বাঁধি নেই—তবে সাধারণতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক (Commercial Bank) এই রকম হারে নগদ টাকা হাতে রেখে কাজ করে। ভারতে যে সমস্ত বিদেশী Foreign Exchange Bank আছে, তারা সাধারণতঃ এর চাইতে অনেক কম নগদ টাকা নিয়ে বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালায়। তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে তাদের Credit বেশী—অর্থাৎ কিনা তারা তাদের দক্ষতা এবং সততার দ্বারা আমানতকারীদের বিশেষ আস্থা অর্জ্জন ক'রেছে, যার ফলে আমানতকারীদের অনেক কাজ ব্যাঙ্কের চেক্ দিয়েই চলে, এবং চেক্ ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা তোল্‌বার প্রয়োজন অনেকটা কম হয়। কিন্তু তা হ'লেও সব ব্যাঙ্ককেই কিছুটা নগদ টাকা সব সময় হাতে রাখতেই হয়। কোন একটি ব্যাঙ্কের আমানত-কারীরা যদি অপর কাউকে একটা চেক্ দেয়, তবে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির সেই ব্যাঙ্কেই একাউণ্ট থাক্‌লে, নগদ টাকার কোনও দরকার হয় না, কারণ সেই ব্যাঙ্কেই এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে 'Transfer" বা সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তার অন্য ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, অথবা যদি তার নগদ টাকার তখনই প্রয়োজন হয়, তা হ'লে নগদ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে চেক্-ভাঙ্গিয়ে তুলে আন্‌তে হয়—এবং এরকম ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে নগদ মজুত প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া ব্যাবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের মাইনে দেওয়া ইত্যাদি কাজেও নগদ টাকার প্রয়োজন হয়।

এখন দেখা যাচ্ছে যে ব্যাঙ্কের পক্ষে কোন্ প্রকারের লগ্নী সব চাইতে ভালো হবে, সেটা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ের ওপর। লাভের দিকে বেশী ঝুঁক্‌লে অন্য দিকে অর্থাৎ লগ্নীর ভালো মন্দ বিবেচনা হয়তো উচিত মত করা হবে না। তা ছাড়া এমন হতে পারে যে, কোন একটি বিশেষ লগ্নীর টাকা মারা যাবেনা, এটা ঠিক হ'লেও, হয়তো আদায় হতে অনেক দেরী হবে; অথবা বহুদিন পর্য্যন্ত জের টান্‌তে হবে, এরকম মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িয়ে পড়্‌তে হবে—যেমন বাড়ীঘর বন্ধক রেখে টাকা দিলে খুবই হওয়া সম্ভব। সুতরাং কিছুটা লগ্নী এমন হওয়া দরকার যার Liquidity খুব বেশী, যদিও সুদ কম; কারণ ব্যাঙ্কের ওপরে আমানতকারীরা জুলুম বা Run আরম্ভ ক'র্‌লে সেটা সহজেই নগদ টাকায়

পরিণত করা যাবে। ভারতবর্ষে এবং বিশেষতঃ কলকাতায়, জনসাধারণের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে খানিকটা অশ্রদ্ধার ভাব থাকায়, এরকম লগ্নীই প্রায় শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ করা হ'য়ে থাকে। ওপরে যে তালিকা দেওয়া হ'য়েছে, তার মধ্যে সাধারণ ভাবে বল্‌তে গেলে তিন্‌টে তারকা চিহ্নিত রকমের লগ্নী এর মধ্যে পড়ে। তারপর দুইটি তারকা চিহ্নিত লগ্নী মোট লগ্নীর প্রায় ৩০।৪০ ভাগ করা হ'য়ে থাকে। এক তারকা চিহ্নিত লগ্নীর মোট পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা ১৫।২০ ভাগের বেশী কখনই করা উচিত নয়; কারণ তা হ'লে ব্যাঙ্কের বিপদে পড়্‌বার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

যদি এই ভাবে মোটামুটি ব্যাঙ্কের লগ্নীর গড়পড়তা হিসেব ঠিক রাখা যায়, এবং যদি টাকা দাদন দেবার সময় বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে ঐ ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে যাচাই ক'রে নেওয়া হয়, এবং সম্পূর্ণ আইনসম্মত ভাবে লেখাপড়া করে নেওয়া যায়, তবে কোন ব্যাঙ্কের বিশেষ বিপদে পড়্‌বার সম্ভাবনা থাকে না।

Reserve Bank of India Actএতে বলা হ'য়েছে যে যাদের Scheduled Bank—বা Reserve Bank of Indiaর তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া হবে, তাদের কতকগুলি বাধা নিষেধ মেনে চ'ল্‌তে হবে। তার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে এই যে এই সমস্ত ব্যাঙ্ককে তাদের মোট মেয়াদী আমানত বা Time Deposit এর শতকরা দুইভাগ (2 Per cent) এবং চাহিবামাত্র দেয় (Demand deposit) এর শতকরা ৫ ভাগ সব সময় Reserve Bank of Indiaর কাছে জমা রাখ্‌তে হবে। এ আইনের ফলে এ দেশীয় ব্যাঙ্কিংএর বাস্তবিক কতখানি উন্নতি অথবা স্থিরতা হ'য়েছে তা বলা শক্ত, কারণ আমাদের দেশে এ ব্যবসায় এখনও নূতন, এবং সেজন্যে এরকম বাধা নিষেধ ছাড়া লগ্নীর ওপরেও খানিকটা বাধা নিষেধ আরোপ কর্‌বার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে ব'লে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কি রকম বন্দোবস্ত আছে সেটা আলোচনা ক'র্‌লে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের নগদ মজুত রাখবার সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা আইন নেই; তবে এ সম্বন্ধে ঐ দেশীয় ব্যাঙ্কে বহুকালের প্রচলিত নীতি এবং ব্যবস্থাই এর প্রধান নিয়ন্তা। বিলাতে সকল ব্যাঙ্কই সাধারণতঃ মোট আমানতের শতকরা ৯ ভাগ (9 Per cent) নগদ মজুত রাখে এবং দাদনের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ "liquid Asset" হিসাবে রাখে—অর্থাৎ Cash Money, at Call and Short Notice এবং Bill of Exchange এই সমস্ত খাতে অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ টাকা খাটান হয়। বাস্তবিক শতকরা ৯ ভাগ নগদ রাখা সম্বন্ধে বিলাতের ব্যাঙ্ক বিশেষ সজাগ থাকে, এবং যদি কোন কারণে দাদনের দিক থেকে শতকরা ৩০ ভাগ সহজে নগদে পরিণত করবার মতো না থাকে (অর্থাৎ যদি এর চাইতে ক'মে যায়) তবে ব্যাঙ্ক নগদ টাকা শতকরা ৯ ভাগের চাইতে কিছু বেশী রাখ্‌বার চেষ্টা করে।

অবশ্য, কখন কখন এমনও হয় যে শতকরা ৯ ভাগ নগদ রাখ্‌বার নিয়ম কিছুটা কমও করা হয়, যদি নগদে পরিণত করবার মতো দাদন শতকরা ৩০ ভাগের অনেক বেশী থাকে।

আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ব্যাঙ্কিং এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে ইংলণ্ডে যেমন Cash Reserve চিরাচরিত প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, আমেরিকাতে সে রকম হয় না। আমেরিকাতে আইনের দ্বারা এ বিষয়টী পরিচালিত হয়। ১৯১৭ সালের আইনে মেয়াদী জমার (Time Deposit) ওপর শতকরা ৩ ভাগ (এখানে মেয়াদী জমা মানে হ'চ্ছে যে জমা একমাসের নোটিশ দিয়ে তোলা যায়) এবং ব্যাঙ্কের ভৌগোলিক অবস্থান প্রভেদে চাহিবামাত্র দেয় জমার (Demand Deposit) শতকরা ৭ ভাগ, ১০ ভাগ, বা ১৩ ভাগ নগদ রাখা ব্যাঙ্কের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লে স্থিরীকৃত হ'য়েছে। নিউ ইয়র্ক এবং চিকাগো শহরে, ফেডারেল রিসার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের, অন্যান্য বহু ব্যাঙ্কের টাকা জমা রাখ্‌তে হয় ব'লে Cash Reserve অন্ততঃ শতকরা ১৩ ভাগ রাখা বাধ্যতামূলক করা হ'য়েছে। অন্যান্য রিসার্ভ শহরে (Reserve Cities—যেখানে Federal Reserve Bank এর শাখা আছে) মাঝামাঝি অর্থাৎ শতকরা ১০ ভাগ রাখা স্থিরীকৃত হ'য়েছিল। এই ১০ অথবা ১৩ যে শতকরা হারের কথা বলা হ'য়েছে, এই টাকা যে কোনও সদস্য ব্যাঙ্কের (Member Bank) Federal Reserve Bank এ জমা রাখ্‌তে হ'বে। ব্যাঙ্কের নিজের ক্যাস বাক্সে বা Underground Vault এ যে নগদ টাকা জমা আছে (Till Money) সেটা এর মধ্যে ধরা হয়না। বিলাতেও এই রকম মোট আমানতের শতকরা ৪½ ভাগ ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইংলণ্ডের কাছে জমা রাখা হয়॥ কোন কোন দেশে এরকম আইনে "Cash" কথাটার অর্থের একটু তারতম্য আছে, অর্থাৎ দেশের Central Bank এ জমা ছাড়া অন্যান্য টাকাও আইনের চক্ষে এই শতকরা হারের হিসাবে ধরা যেতে পারে।

Time Deposits এবং Demand Deposits আলাদা ভাবে হিসাব করবার কারণ সহজেই বোঝা যায়—কারণ Cash Reserve এই বিষয়টীর গোড়ার কথা হচ্ছে, Liquidity বা ব্যাঙ্কের দাদনকে যখন তখন নগদ টাকায় রূপান্তরিত করবার ক্ষমতা। Demand Deposit সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষকে একটু বেশী তৎপর থাকা দরকার, কারণ তার চাহিদা যে কোনও সময়ে হ'তে পারে। Time Deposits মেয়াদ অনুসারে ধীরে ধীরে দিতে হয়; সুতরাং এটা অনেকটা সুবিধাজনক এবং ব্যাঙ্কের পক্ষে কম বিপজ্জনক।

আমেরিকাতে ১৯৩০ সালের পর থেকে, পর পর কয়েক বৎসর বাজারে অত্যধিক পরিমাণ সোনা আমদানীর ফলে এবং অন্যান্য কারণে এত নগদ টাকা ব্যাঙ্কে জমা হ'তে থাকে যে, গভর্ণমেণ্ট ঋণ পত্র বিক্রী ক'রে অথবা Bank Rate বাড়ানোর সাধারণ নিয়মে, উদ্বৃত্ত টাকা Reserve System এ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হ'ল না। তখন দেখা গেল

যে, সমস্ত ব্যাঙ্কেই Cash Reserve এর পরিমাণ অনেক বেশী আছে। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে Credit Expansion বা বেশী বেশী ব্যাঙ্কের টাকা তৈরী হওয়ার দরুণ যাতে মুদ্রাস্ফীতি না হ'তে পারে, সেজন্য আইন পাশ করে, Cash Reserve এর ন্যূনতম পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালের আইনে এই ব্যবস্থা করা হল যে, Time Deposits এর শতকরা ৬ ভাগ এবং Demand Deposits শতকরা ১৪, ২০ এবং ২৬ ভাগ Federal Reserve Bank এ জমা রাখ্‌তে হ'বে। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে ব্যবসায় বাণিজ্য খানিকটা মন্দা হওয়াতে একে কমিয়ে আবার শতকরা ৫ ভাগ এবং ১২, ১৭½ and ২২¾ ভাগ করা হ'ল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (Central Bank) Governorকে এই নগদ মজুতের হার কম বৃদ্ধি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—অবশ্য সেখানেও একটা সর্ব্বনিম্ন হার বেঁধে দেওয়া আছে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, যে ব্যাঙ্কের নগদ মজুত বা Cash Reserve বিবরণী ব্যাঙ্কের স্থায়ীত্বের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ প্রায় সব দেশেই ভালো ব্যাঙ্কদের—যেমন American Federal Reserve System এর Member Banksদের এবং ভারতবর্ষে Scheduled Banksদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে মোট আমানতের কিছু টাকা জমা রাখ্‌তে হয়। তা ছাড়া নিজের ক্যাশ বাক্সে এবং মাটির নীচের ঘরে (Vault) কিছু পরিমাণ নগদ টাকা সব সময়ে রাখ্‌তে হয়, যাকে ইংরাজীতে বলে Till Money। এ ছাড়া প্রায় সব দেশেই ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রাথমিক নিয়ম অনুসারে প্রায় শতকরা ২৫।৩০ ভাগ Liquid Investments বা অতি সহজে নগদ টাকায় পরিণত করা যায় এরকম লগ্নী থাকে। সুতরাং Cash Reserve বল্‌তে এ সম্পূর্ণ জিনিষটাই বোঝায়। তবে সঙ্কীর্ণ অর্থে বল্‌তে গেলে, যে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা থাকে, তাকেই বলে Cash Reserve ও সাধারণতঃ নিজের ক্যাশ বাক্সে রাখা টাকাও এর মধ্যে ধরে নেওয়া হয়।

Clearing House

হুণ্ডি বিনিময় প্রতিষ্ঠান

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যাঙ্কের অপরের সঙ্গে লেনদেন ক্রমশঃই বৃহদাকার ধারণ করে। A ব্যাঙ্কে যার হিসাব আছে সে যদি B ব্যাঙ্কের কোনও cheque পায়, তবে তাকে A ব্যাঙ্কের একাউন্টে জমা দিতে হয়, এবং A ব্যাঙ্কের লোককে গিয়ে সেই টাকা তুলে আনতে হয়। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রথম আমলে এই রকম ব্যবস্থাই ছিল। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে London এর Joint Stock Bankগুলিতে, ব্যাঙ্কের চেক ভাঙ্গিয়ে আনবার

জন্য প্রত্যেক ব্যাঙ্কে "Walk clerks" বা "হেঁটে টাকা আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত সরকার" ব'লে কর্ম্মচারী থাকতো। এদের কাজ ছিল ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ঘুরে ব্যাঙ্কের অন্য ব্যাঙ্কের ওপর প্রাপ্য চেকের এবং বিলের টাকা আদায় করা। কালক্রমে এই সমস্ত Walk clerkরা সকলে সব যায়গায় হাঁটাহাঁটি না করে একটা যাযগায় সবাই দেখা ক'রে পরস্পরের দেনা পাওনা ঠিক ক'রে নিতে সুরু করল। এই কেরাণীদের পরিশ্রম বাঁচানোর চেষ্টাই হচ্ছে এই যুগের Clearing Houseএর গোড়াপত্তন।

বর্ত্তমান সময়ের Clearing Houseএর কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বল্‌তে হয়, আসলে এটা Cash Reserve মূলতত্ত্বেরই একটী অনুসিদ্ধান্ত মাত্র; কারণ এর ফলে সমস্ত ব্যাঙ্কের নগদ মজুতের পরিমাণ যথেষ্ট কমান সম্ভব হয়েছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিভিন্ন দেশে নগদ মজুদ রাখবার বিষয়ে যে শতকরা হার নির্ণয় করা হয়েছে, সে রকম কম নগদ টাকায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালানো সম্ভব হয়, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই, যে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক নিজেদের মধ্যে চেক আদান প্রদান করবার সময় নগদ টাকায় করে না—সকলেরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে হিসাব থাকে, এবং সেই হিসাবের মাধ্যমেই সমস্ত ব্যাঙ্কের দেনাপাওনা মেটান হয়।

আমাদের দেশে কল্‌কাতা, বোম্বাই এবং অন্যান্য বড় বড় সহরে Clearing House আছে। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের রোজ যথেষ্ট সংখ্যক চেক আদান প্রদান হয় তারাই এর সদস্য হ'তে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের একটি কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি থাকে এবং সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই Reserve Bank of Indiaই এর পরিচালনা করে। যে সমস্ত যায়গায় Reserve Bank of Indiaর কোনও শাখা নাই, অথচ যথেষ্ট পরিমাণ চেক লেন দেন হয়, যেমন পাটনা সহরে—সেখানে Imperial Bank of India এর পরিচালনা করে।

প্রত্যেকটি সদস্য ব্যাঙ্ককে Reserve Bank of Indiaতে (অথবা Imperial Bank) Clearing account ব'লে একটা হিসাব খুলতে হয়, এবং সেখানে প্রয়োজন মত টাকা জমা রাখতে হয়। প্রত্যেক দিন সদস্য ব্যাঙ্কের Clearing বিভাগ থেকে দু'বার ক'রে Clearing Houseএ তাদের ব্যাঙ্কের খাতায় credit করবার জন্যে জমা দেওয়া cheque পাঠান হয়। এই চেকগুলি হাতে পাওয়া মাত্র Clearing Houseএর কর্ম্মচারীরা, সেইগুলি যে যে ব্যাঙ্কের ওপরে আছে, তাদের খোপে ফেলে দেয়। তারপর সমস্ত চেক্ বিলি হ'য়ে গেলে, মোট প্রত্যেক ব্যাঙ্কের, কার ওপর কত টাকার পাঠানো হ'লো, তার হিসেব ঐ Clearing Accountএ জমা-খরচ করা হয়। অর্থাৎ United Bank of India যদি ১০ লক্ষ টাকার চেক্ Collectionএর জন্য পাঠায় এবং paymentএর জন্য ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চেক্ পায়, তবে দিনের শেষে তার Reserve Bank Clearing Accountএ প্রথমে তার ১০ লক্ষ

টাকা Credit বা জমা হ'বে এবং পরে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার debit বা খরচ দেখান হ'বে। সাধারণতঃ দু'বার collectionএর জন্য পাঠান হয়।

কিন্তু এর মধ্যে একটু অসুবিধার ব্যাপার আছে। আমরা ধরে নিয়েছি যে, যে সব চেক্ আদায়ের জন্য পাঠান হবে, তার সবগুলির টাকাই আদায় হ'বে—কিন্তু সেটা ঠিক নয়। কারণ কতক চেক্ ব্যাঙ্কিং আইন অনুসারে payment করা চলেনা বলে, এবং কতক চেকের Drawerএর হিসাবে যথেষ্ঠ টাকা সে সময় ছিল না ব'লে, ফেরত আসে। এর ফলে Return cheques নিয়ে একটা সমস্যা হ'য়ে ওঠে। সেজন্যে ব্যাঙ্কে চেক Clearing House থেকে collection এর জন্য পাবার খুব অল্প সময়ের মধ্যে, constituentদের খাতা দেখে cheque honour করা হ'বে কিনা সেটা ঠিক করে ফেলতে হয়। নিয়ম হচ্ছে এই যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত না দিলে, clearing house ধরে নেবে যে, সব চেকই পাশ হয়ে গিয়েছে। সাধারণতঃ collectionএর জন্য delivery দুইবার হয়; কিন্তু return একবারই হয়; যার ফলে দ্বিতীয় "lot" cheque আসবার ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই তাদের honour করা হ'বে কিনা, সেটা ব্যাঙ্ককে স্থির করে নিতে হয়।

এর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, clearing house system থাকার ফলে বহু টাকার নগদ কারবার করার হাত থেকে সমস্ত ব্যাঙ্কই রেহাই পাচ্ছে; এবং তার ফলে cash reserve এমনিতে যা রাখার প্রয়োজন হতো, তার চাইতে অনেক কম থাকলেও, ব্যাঙ্কের কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্টদের (constituents) টাকা দিতে কোনও অসুবিধা হ'চ্ছে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Central Bank

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন (The need for a Central Bank)

ওপরে Clearing House সম্বন্ধে যে আলোচনা হ'য়েছে, তার থেকে এইটে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এমন একটা পর্য্যায়ে এসে পৌঁছালো, যার ফলে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকে একযোগে চালানোর জন্য, এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ও সরকারী কাজে লাগবার জন্য একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন হ'লো; এবং ক্রমশঃ দেখা গেলো, যে এমন অনেক কাজ এই প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত করা যেতে পারে, যার ফলে কোন দেশের গভর্ণমেণ্টও অনেকটা নিশ্চিন্তে তাদের অর্থনৈতিক দিকটা সাম্‌লাতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের নামই হচ্ছে Central Bank বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

বিলাতে ব্যাঙ্ক অব্-ইংল্যাণ্ড বহুদিন যাবৎ দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালাবার ফলে Centralised Banking বা কেন্দ্রীভূত ব্যাঙ্কিং, এই মূলতত্ত্ব ধরেই ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চলে আসছিল। ১৬৯৪ সালে রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের আমল থেকে, ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড, সরকারের ব্যাঙ্কিং এজেণ্ট হিসাবে, দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মের তদারক হিসাবে, কারেন্সী এবং নোট চালানোর কাজ এবং সরকারী ঋণ লেনদেন করার কাজ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে করার ফলে, নানা রাজনৈতিক বিপর্য্যয় স্বত্ত্বেও ইংরেজের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েনি। আমেরিকাতে বহুদিন Decentralised বা বিকেন্দ্রীভূত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৯০৭ সালের অর্থনৈতিক ভাঙ্গা গড়ার সময়, আমেরিকানরাও বুঝতে পারলো যে, কেন্দ্রীভূত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সে দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। ঐ অর্থনৈতিক সঙ্কটে দেখা গেল যে, বিপদের সময় ব্যাঙ্কগুলিকে সাময়িক অর্থ সাহায্য দিয়ে বাঁচাতে পারে, এমন একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন। এই বিবেচনা করবার জন্য ১৯০৮ সালে একটা অর্থনৈতিক কমিশন সেখানে বসানো হয়েছিল, এবং তাদের সুপারিস ক্রমে ১৯১৩ সালের ফেডারেল রিসার্ভ এক্ট পাশ করা হয়। এর ফলে ১২টী ফেডারেল জেলাতে দেশকে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ফেডারল জেলাতে একটী ফেডারেল রিসার্ভ ব্যাঙ্ক খোলা হয়। এদের সবার উপর তত্ত্বাবধান করবার জন্য একটা বোর্ড অফ্ গভার্ণারস্ (Board of Governors) গঠন করা হয়।

Constitution & Functions
গঠন ও কার্য্য

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ দেশের একটা আইনের বলে স্থাপিত হয় (By an Act of Parliament)। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা সরকারী ব্যাঙ্ক এক কথা নয়। ষ্টেট ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব ব্যাঙ্ক—এর মালিক হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট, এবং এটা গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের মতো—যেমন Finance Department, Home Department ইত্যাদির মত একটি।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তিন রকমের হ'তে পারে। প্রথমতঃ কোন কোন দেশে State Bank কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ করে, যেমন Pakistan State Bank। এর প্রধান অসুবিধা এই যে এরকম Central Bank এর পক্ষে দলগত রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান সম্ভব নয়।

এর একেবারে বিপরীত ব্যবস্থা হচ্ছে Shareholders Bank—অর্থাৎ জনসাধারণের কাছে Public Limited Companyর মতো শেয়ার বিক্রী ক'রে এই ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহ করা হয়। এর মালিকত্ব জনসাধারণের হাতেই থাকে ; কিন্তু সাধারণ Public Limited Companyর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব যেমন Shareholderদের থাকে, এক্ষেত্রে সেটা হয় না ; কারণ যে আইনের বলে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে সেটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই গভর্ণমেণ্টের হাতে Administration বা চালানোর ক্ষমতা থাকে। সাধারণতঃ একটা কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board) থাকে। তার কিছু সংখ্যক সদস্য সরকারের মনোনীত, এবং কিছু সদস্য ব্যাঙ্কের অংশীদারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। এ ছাড়া যে সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে এই ব্যাঙ্কের শাখা থাকে, সেখানেও এই রকম একটা স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটি থাকে।

ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম চালানোর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব থাকে Governor এর হাতে। তিনিই বাস্তবিক পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্ণধার। সাধারণতঃ Share holder এর ইচ্ছানুসারে এবং Government এর অনুমোদন সাপেক্ষে এই কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করা হয়; যেমন Bank of England এ ২ বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হয়। অবশ্য এই সময় উত্তীর্ণ হ'লে, আবার পুনর্নিয়োগ অনেক সময় করা হয় ; যেমন Montagu Norman কে ২৪ বৎসর ক্রমান্বয়ে Bank of England এর Governor এর পদে বহাল রাখা হয়েছে।

এই দুই রকমের ব্যবস্থার মাঝামাঝি ব্যবস্থা হিসাবে অনেক সময় Government, share holderদের ওপরেও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ইচ্ছা করলে, শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ারের মালিকত্ব কিনে নেয়। এরকম সব শেয়ারই যদি সরকার কিনে নেয়, তখন একে বলে Nationalisation বা জাতীয় করণ। Reserve Bank of Indiaর বেলায় ১৯৫০ সালে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভারতীয় রিসার্ভ ব্যাঙ্ক
Reserve Bank of India

ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম দেওয়া হয়েছে—Reserve Bank of India- এই ব্যাঙ্ক ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে চালু হয়—১৯৩৪ সালের রিসার্ভ ব্যাঙ্ক আইনানুসারে। ১৯২৫ সালের হেল্ল কমিশন ভারতবর্ষের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করে। কিন্তু নানারকম আইন কানুনের বাধাবিপত্তির জন্য, ১৯৩৩ সালের আগে এর বাস্তব কোনও বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হয়নি।

ভারতীয় রিসার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫০ সালে জাতীয়করণ বা nationalise করা হ'য়েছে—অর্থাৎ এর সমস্ত শেয়ার গভর্ণমেণ্ট খরিদ ক'রে নিয়েছে। আগে এই ব্যাঙ্ক একটি Shareholder দের ব্যাঙ্ক ছিল এবং এর মূলধন ছিল ১০০ টাকা দামের ৫,০০০০০ লক্ষ শেয়ার, অর্থাৎ মোট ৫ কোটি টাকা। এই টাকার মধ্যে ভারত সরকার আইনানুসারে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনে নেয়।

ব্যাঙ্কের কাজ চালাবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড অব ডিরেক্টারস্ আছে—এর সদস্য সংখ্যা ১৬। ১ জন গভর্ণর এবং ২ জন ডেপুটী গভর্ণর কেন্দ্রীয় বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হয়। ৪ জন ডিরেক্টর ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়। ৮ জন ডিরেক্টর অংশীদারগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। এ ছাড়া আর একজন সরকারী কর্ম্মচারীও ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়।

কেন্দ্রীয় বোর্ডের পক্ষে সমস্ত জায়গায় কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করা অসুবিধা জন্য, চারটি স্থানীয় বোর্ড (Looal Board) গঠন করা হয়। এই স্থানীয় বোর্ডে অংশীদারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত ৫ জন সদস্য আছে -তা ছাড়া তিন জন পর্যান্ত কেন্দ্রীয় বোর্ডের দ্বারা মনোনীত (তাদের ব্যাঙ্কের অংশীদার হওয়া চাই) সদস্য থাকৃতে পারে।

ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান হচ্ছে, দেশের নোট চালুর ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেই সম্পর্কিত জমা রাখা, যাতে দেশের আর্থিক ব্যাপার সুষ্ঠ,ভাবে চলতে পারে। এ ছাড়া দেশের Credit system বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে সৃষ্ঠ আর্থিক কাঠামো (যেমন ব্যাঙ্কের চেক্, ড্রাফ্ট ইত্যাদির দ্বারা সৃষ্ঠ অর্থ) ভালো ভাবে তদারক করা এবং চালানোও রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রধান কর্ম্ম। ব্যাঙ্কের নোট চালুর ব্যাপার তত্ত্বাবধান করবার জন্য একটি Issue Department এবং ব্যাঙ্কিং এবং ক্রেডিট বিষয়ের জন্য একটি Banking Department আছে ; এদের assets বা সম্পত্তি আলাদা ভাবে রাখা হয়। ব্যাঙ্ক রেট (Bank Rate) নিয়ন্ত্রণ এবং কোম্পানীর কাগজ কেনা বেচা করাও এই সংক্রান্ত কাজ।

এ ছাড়া রিসার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কদের (Commercial Bank) তাদের মোট চাহিবা-মাত্র দেয় আমানতী দায়ের (Demand liabilities) শতকরা ৫ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের

শতকরা ২ ভাগ জমা রাখে। এ নিয়ম সাধারণতঃ তালিকাভুক্ত বা Scheduled ব্যাঙ্কদের বেলায়ই প্রযোজ্য ; তবে অ-তালিকাভুক্ত বা Non Scheduled Bankদেরও এরকম জমা নেওয়া হয়।

কৃষি ঋণদানের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতীয় রিসার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে কাজ করে। ব্যাঙ্ক এ সমস্ত কাজ Scheduled Bank এবং প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ক'রে থাকে। এর ফলে চাষীদের দৈনন্দিন ব্যাপারে এ ব্যাঙ্কের সাহায্য পাওয়ার বিশেষ সুবিধা হয় না—বিশেষতঃ ৯ মাসের বেশী কোন কৃষি-বিল discount করা হয় না।

বিদেশী মুদ্রা (Foreign exchange) এবং বহির্বাণিজ্য (Foreign Trade) ঠিক ভাবে যাতে চলে, সেটা দেখাও এ ব্যাঙ্কের কাজ। সেজন্য ভারতীয় মুদ্রার (Rupee) বিনিময় মূল্য (External Value) যাতে স্থির থাকে সেটা লক্ষ্য রাখা এবং তার বিধিব্যবস্থা করাও এ ব্যাঙ্কের একটা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভারত সরকারের এবং অন্যান্য ষ্টেট সরকারের ব্যাঙ্কার বা আর্থিক প্রতিনিধি হিসাবে এ ব্যাঙ্ক সমস্ত কাজ চালায়। সরকারের Public Debt বা কোম্পানীর কাগজের বিভাগও এখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগের Account বা হিসাবও এখানে রাখা হয়।

অন্যান্য কাজের মধ্যে টাকা স্থানান্তরের সুবিধা (Remittance facility), ক্লিয়ারিং হাউসের নিয়ন্ত্রণ (Clearing House), ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বহুপ্রকার দেশের অতি প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্রিয়াকলাপ এই ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত আছে।

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড

Bank of England

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ইহা একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, এবং এর ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় করবার সনদ্ "The Governor and Company of the Bank of England" এই নামে দেওয়া হয়েছিল। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরেই এই ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। এর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজারা প্রয়োজন হ'লে স্বর্ণকারদের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন - কিন্তু Charles II এর সময়ে, টাকা ফেরত দেবার কথার খেলাপ হওয়াতে, তারা আর টাকা ধার দিতে অস্বীকার করে। এই বিপদের সময়ে গভর্ণমেণ্টকে কয়েকজন ব্যক্তি (যাদের ওপরে "The Governor and Company of the Bank of England" নামে সনদে অভিহিত করা হ'য়েছে) রাজা তৃতীয় উইলিয়মের গভর্ণমেণ্টকে ১২,০০,০০০ পাউণ্ড ধার দিতে রাজী হয়। এর পরিবর্ত্তে এরা Bank of England নামে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালাবার সনদ প্রাপ্ত হয়।

বন্দোবস্ত এই হয় যে, ব্যাঙ্ক এই ঋণ বাবদ, বছরে ১ লক্ষ পাউণ্ড সুদ (শতকরা ৮৲ টাকা) পাবে, এবং তা ছাড়া management বা পরিচালন খরচা হিসাবে বছরে ৪০০০ পাউণ্ড পাবে। এ ছাড়া লণ্ডন সহর এবং তার ৬৫ মাইলের মধ্যে এ ব্যাঙ্ক নোট চালাবার এক-চেটিয়া অধিকার পেল।

১৭০৮, ১৮৪৪, ১৯০৮ এবং ১৯৩৯ সালে পব পব কয়েকটী আইন পাশ ক'রে, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের কার্য্যের ব্যাপকতা যেমন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি খানিকটা সরকারের আয়ত্তাধীনেও আনা হয়েছে। কিন্তু এ কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে, যদিও ব্রিটিশ সরকার এবং ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের মধ্যে বরাবরই একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তবুও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্ককে আইনানুসারে কতক-গুলি বাধানিষেধ মেনে চল্‌তে হয় সেটা ঠিক: কিন্তু যে রকম সুষ্ঠু ভাবে এই ব্যাঙ্ক গত কয়েক শতাব্দী ধ'রে দেশের সেবা করে এসেছে, তাতে সরকারের হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের কার্য্যকলাপ একটী "Court" বা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। এর সদস্যদের মধ্যে একজন গভর্ণর, একজন ডেপুটী গভর্ণর এবং অংশীদারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্য ২৪ জন থাকেন। গভর্ণর এবং ডেপুটী গভর্ণর সাধারণতঃ ২ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন এবং গভর্ণরের কার্য্যকাল শেষ হ'লে, ডেপুটী গভর্ণরই সেই পদ গ্রহণ করেন।*

গভর্ণর, ডেপুটী গভর্ণর এবং আরও কয়েকজন সদস্য নিয়ে একটি Committee of Directors ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করেন।

১৮৪৪ সালের আইনে Issue এবং Banking Department আলাদা করা হয় এবং ১ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড Fiduciary limit বা নোট চালু করবার শেষ সীমা হিসাবে স্থিরীকৃত হয়। এর বেশী নোট চালু করতে হ'লে সে বাবদ পুরো টাকার সোণা জমা রেখে তবে করতে পারা যাবে। এই সীমারেখা ক্রমশঃ বাড়াতে বাড়াতে ১৯৫২ সালের জুন মাসে ১৫০ কোটী পাউণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে।

নোট চালু করা ছাড়া, অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মতো ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকেও ব্যবসায়ীক ব্যাঙ্কের টাকা জমা রাখা, তাদের দেখাশুনা করা, ব্যাঙ্ক রেট ও সরকারী ঋণ (Public Debt) নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি কাজ চালাতে হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিটিশ লেবার পার্টির হাতে যখন গভর্ণমেণ্ট ন্যস্ত ছিল তখন ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডকে nationalise বা জাতীয়করণ করা হয়।

* এই নিয়ম বর্ত্তমানে লঙ্ঘন করা হয়েছে। Right Hon. Montagu Normen ২৪ বৎসর যাবৎ ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের গভর্ণর হিসাবে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত

International Monetary Control

বিগত মহাযুদ্ধের সময় থেকে এবং বাস্তবিক পক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার পরে থেকে, পৃথিবীর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অনেক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে চলেছে। ১৯৩০-৩৩ সালের আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক দুর্যোগের পর থেকে, বাস্তবিক পক্ষে কোন দেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামো বিশেষ সহজ ভাবে চলতে পারেনি। ১৯৩৯-৪৬ সালের মহাযুদ্ধের পর প্রায় সমস্ত দেশেই অল্পবিস্তর মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়—চীন দেশেই এর সমধিক প্রকোপ দেখা যায়। বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে দেশীয় মুদ্রার কেনা-বেচার দর ক্রমাগত ওঠানামা ক'র্তে থাকে। এর ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণেই, অর্থাৎ মুদ্রার আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক (বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত) মূল্য যথাসম্ভব স্থির রাখবার জন্য, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অবাধে চালু করবার জন্যে, এবং বিদেশী ও দেশী মুদ্রার কেনা-বেচার দর যতটা সম্ভব স্থির রাখ্‌বার জন্য, পৃথিবীর ৪৪টী দেশের প্রতিনিধি আমেরিকার Bretton woods নামক স্থানে সভা করে স্থির করে যে, দুটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়া হোক্—একটা হচ্ছে International Monetary Fund বা আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার এবং আর একটা International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)—বা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার

International Monetary Fund

এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে I.M.F এর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হার যথাসম্ভব স্থির রাখা। অধ্যাপক Keynes এর সর্ব্বশেষ সূত্রের ভিত্তি অনুযায়ী, স্বর্ণমাণকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়; কিন্তু Par Value বা বিদেশী মুদ্রার সমতা খানিকটা flexible বা পরিবর্ত্তনশীল রাখ্‌বার বন্দোবস্ত করা হয়। আশা করা হ'য়েছিল যে, এতে পৃথিবীব্যাপি বাণিজ্যের প্রসার হ'বার সুবিধা হ'বে, এবং অন্যান্য Exchange সংক্রান্ত দুর্নীতি বন্ধ হবে। এর ফলে, আন্তর্জ্জাতিক বিদেশী মুদ্রার Clearing House এর কাজ চালাবার একটা বন্দোবস্ত করা হয়।

এই অর্থভাণ্ডারের মোট মূলধন ৮৮ কোটী ডলার (৪৪০০ Million Dollars) স্থিরীকৃত হয়, এবং সদস্য দেশ সমূহের দেয় টাকাও অঙ্গীকার পত্রের সর্ত্ত অনুসারে স্থিরীকৃত হয়। প্রধান প্রধান দেশগুলির দেয় অংশ এইরূপ :—

U. S. A—2750 Million Dollars
Great Britain—1300 Million ,,
USSR—1200 Million ,,
China—550 Million ,,
France—450 Million ,,
India—400 Million ,,

এই সকল চাঁদা কিছু পরিমাণ সোণা অথবা U S Dollar এ দেয়; বাঁকী কিছুটা ঐ সভ্য দেশের (member country) মুদ্রাতে দেয়।

সদস্য দেশের চাঁদার যে অংশ সোনাতে (অথবা U.S. ডলারেতে) দিতে হবে, সেটা সমস্ত চাঁদার শতকরা ২৫ ভাগ অথবা সে দেশের সমস্ত মজুত সোণার শতকরা ১০ ভাগ হওয়া চাই; এর মধ্যে যেটাই কম হয়, সেটাই দেয় ব'লে ধরে নেওয়া হয়। ভারতের পক্ষে সমস্ত মজুত সোণার শতকরা ১০ ভাগই কম হওয়াতে, সেই পরিমাণ সোণা আন্তর্জ্জাতিক ধনভাণ্ডারেতে পাঠান হয়। ভারতীয় মুদ্রাতে (টাকা—Rupee) যে পরিমাণ অংশ দিতে হবে, তার মধ্যে কিছু পরিমাণ, ধনভাণ্ডারের ভারতীয় রিসার্ভ ব্যাঙ্কে যে একাউণ্ট আছে সেখানে জমা দেওয়া হ'য়েছে; আর বাঁকী টাকা চাহিবামাত্র দেয় অঙ্গীকার পত্র বা Demand Promissory Note এতে (আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের স্থিরীকৃত দরে Rupee তে পরিবর্ত্তিত হ'বে) দেওয়া হ'য়েছে।

ধনভাণ্ডার ১৯৪৭ সাল থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধের সময় এবং তার পরে কিছু দিন প্রত্যেক দেশে, মুদ্রার বৈদেশীক মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় মূল্য বিশেষ ভাবে ওঠানামা করছিল—এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, কতক কতক দেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে, মুদ্রা মূল্যের কোনও স্থিরতা না থাকায়, মুদ্রা কালোবাজারে কেনা বেচা আরম্ভ হ'য়েছিল। এ বন্ধ কর্‌বার একমাত্র উপায় হচ্ছে "Control" বা প্রত্যেক দেশের মুদ্রামূল্য একটা বিশেষ হারে বেঁধে দেওয়া। কিন্তু এর মধ্যে একটু কম বেশী কর্‌বার ব্যবস্থা না থাকলে, সমস্ত বন্দোবস্তই বানচাল হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে—তার কারণ আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির ব্যাপার এতো জটীল, এবং এর মধ্যে এতো রকমের শক্তি এবং ঘটনা খেলা ক'রে যে, Par Value বা মুদ্রামূল্য একটা বিশেষ দরে বেঁধে রাখা একরকম অসম্ভব। এ রকম অবস্থা একবার যুদ্ধোত্তর ফরাসী দেশে হ'য়েছিল।

Franc-Dollar মুদ্রামূল্য ১১৯.১০৭ দরেতে বেঁধে রাখা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে এবং এর ফলে Franc নিয়ে দেশ বিদেশে কালোবাজারের কেনা বেচা সুরু হয়।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সদস্যদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে ৩০ দিনের মধ্যে সদস্যদের, ঐ নোটিশের ৬০ দিন পূর্ব্বে, স্বর্ণ মূল্যের হারে, মুদ্রামূল্য যা ছিল, সেটা লিখে জানাতে হ'বে। এই মুদ্রামূল্যই Scheduled Par value বা স্থিরীকৃত আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রামূল্য ব'লে ধ'রে নেওয়া হ'ল—এবং মুদ্রামূল্য ওঠানামা বন্ধ করবার ব্যবস্থা হিসাবে, যে দেশের যখন প্রয়োজন সে দেশ I.M.F. থেকে এই দরে অন্যদেশের মুদ্রা খরিদ করতে পারবে এই ব্যবস্থা হ'ল। এর মানে এই নয়, সব সময় I.M.F. এর মাধ্যমেই সব আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন করতে হ'বে; সাধারণভাবে ব্যবসায় এবং অর্থের বাজারের বেপারীদের দ্বারাই এসব কাজ হ'বে—তবে এরকম একটা ব্যবস্থা থাকলে বাজার দর এই স্থিরীকৃত দর থেকে বেশী দূরে যেতে পারবেনা এজন্যই এই বন্দোবস্ত।

যদি কোনও সদস্য মনে করে যে এই Scheduled Rate তার পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে এবং তাকে বেশী বেশী I. M. F. এর ওপরে নির্ভরশীল হ'তে হচ্ছে তা হ'লে সে এই rate বদলাবার জন্য দরখাস্ত ক'রতে পারে এবং I. M. F. এর কর্ম্মকর্ত্তারা সমীচীন বোধ করলে এ দর বদলে দিতে পারে।

ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক

International Bank for Reconstruction and Development.

যুদ্ধকালীন আন্তর্জ্জাতিক ভাঙ্গাগড়ার ফলে, যে সমস্ত দেশের কলকারখানার এবং অন্যান্য আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হ'য়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ এবং অন্যান্য বিষয়ে অনগ্রসর দেশের উন্নতির জন্যে টাকা লেনদেনের বা দাদন করবার জন্য এই সর্বদেশীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। এর মূলধন হচ্ছে ১০০ কোটি ডলার। প্রত্যেক শেয়ারের দাম ১ লক্ষ ডলার। ইউনাইটেড্ ষ্টেটের শেয়ার সব চাইতে বেশী—৩১৭৫০টি। শতকরা শেয়ারের ২০ ভাগ Call করা হ'য়েছিল তার মধ্যে ২ ভাগ স্বর্ণ অথবা U. S. Dollars এ দেয়, এবং বাকী ১৮ ভাগ, সদস্য দেশের নিজেদের মুদ্রাতে দেয়।

ওয়ালর্ড ব্যাঙ্কের সদস্যদের নাম দেওয়া গেলঃ—

Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Burma, Canada, Ceylon, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Iceland, India, Iran, Iraq, Italy, Japan, Lebanon, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Sweden,

Syria, Thailand, Turkey, Union of South Africa United Kingdom United States, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia

ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষকে তিনবার দাদন দিয়েছে। প্রথমবার ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার নেওয়া হয়, রেলওয়ের উন্নতির জন্য। দ্বিতীয়বার ১ কোটি ডলার নেওয়া হয় ২০০ ভারী ট্রাক্টর কিনে অনাবাদি পতিত জমি উদ্ধার করবার জন্য। তৃতীয়বার ১ কোটী ৮৫ লক্ষ ডলার Damodar Valley Corporation এর বৈদ্যুতিক সংগ্রামের জন্য।

এশিয়ার এবং ইউরোপের দেশসমূহে ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের দাদনের একটী বিবরণী নীচে দেওয়া হ'ল।

ASIA

Borrower	Purpose	Amount (In Dollars)
India	Railways	34,000,000
India	Agricultural machinery	10,000,000
India	Electric power	18 500 000
Iraq	Flood control and irrigation	12,800,000
Pakistan	Railways	27,200,000
Pakistan	Agricultural machinery	3,250,000
Thailand	Railways	3,250 000
Thailand	Irrigation	18,000 000
Thailand	Port development	4,400,000

EUROPE

Borrower	Purpose	Amount (In Dollars)
Belgium	Steel and electric power	16,000,000
Belgium	Development of the Belgian Congo	30,000 000
Denmark	General reconstruction	40,000,000
Finland (Guarantor) Bank of Finland	Electric power, wood products industries and limestone powder production	12,500 000
Finland (Guarantor) Bank of Finland	Electric power, wood-products industries, farm improvement, and construction of forest roads	20,000,000
Finland	Timber production	2,300,000

Borrower	Purpose	Amount
France (Guarantor) Credit National	General reconstruction	250,000,000
Iceland	Electric power	2,450,000
Iceland	Agriculture	1,008,000
Italy (Guarantor) Cassa per il Mezzogiorno	Development of Southern Italy	10,000,000
Luxembourg	Steel and railroads	12,000,000
Netherlands	General reconstruction	195,000,000
Netherlands (Guarantor) Four Shiping Companies	Purchase of six merchant vessels	12,000,000
Netherlands (Guarantor) Herstelbank	Reconstruction and modernization of industrial plants	15,000,000
Netherlands (Guarantor) KLM Royal Dutch Airlines	Purchase of aircraft	7,000,000
Turkey	Port development and grain storage	16,400,000
Turkey	Seyhan Dam	25,200,000
Turkey (Guarantor) Industrial Development Bank	Development of private industry	9,000,000
Yugoslavia	Timber production	2,700,000
Yugoslavia	Electric power, coal mining, non-ferrous metals, manufacturing, foresty, agriculture, fisheries and transportation	28,000,000

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১)

টাকার মূল্য ও তাহার পরিমাণ-নির্ণয়

জিনিষপত্রের দাম মাপা হয় টাকার হিসাবে। যখন কোন জিনিষ কিন্‌তে আগেকার চেয়ে বেশী টাকা লাগে, তখন বলা হয়, সে জিনিষের দাম চ'ড়েছে; যখন কম টাকা লাগে, তখন বলা হয় দাম ক'মেছে। প্রত্যেক সওদার দুটো দিক্‌। একটা জিনিষ বা উপকার, অন্যটা টাকা। অতএব, যেমন টাকা বেশী বা টাকা কম লাগ্‌লে, একদিকে জিনিষের দাম বেড়েছে বা কমেছে বোঝায়, তেম্‌নি অন্যদিকে টাকার দাম কমেছে বা বেড়েছে বোঝায়। যখন কোন বিশেষ জিনিষের যোগানে বা চাহিদায় পরিবর্ত্তন ঘটে তখন মাত্র সেই জিনিষের দাম বদ্‌লায়। অন্য যে সব জিনিষের সঙ্গে এই জিনিষের কোন সম্পর্ক নেই, সে সব জিনিষের দামের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু সময় সময় দেখা যায় যে, প্রায় সব জিনিষেরই দাম অল্পবিস্তর বেড়েছে বা কমেছে। তখন বুঝতে হবে যে টাকারই দাম কমেছে বা বেড়েছে। এবং তার কারণ খোঁজবার জন্য টাকার যোগান ও চাহিদার দিকে নজর দিতে হবে।

সূচক-সংখ্যা (Index Number)—টাকার ক্রয়শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি মাপবার জন্য সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন জিনিষের গড়-পড়তা দাম শতকরা কত বেড়েছে বা কত কমেছে, তা এই সূচক-সংখ্যা দিয়ে হিসাব করা হয়। হিসাব আরম্ভ করবার জন্য, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বৎসরকে প্রথম বৎসর (Base year) বলে ধরে নেওয়া হয়; এবং নানা জিনিষের একটি ফর্দ্দ তৈরী করে, সেগুলির চল্‌তি দর সংগ্রহ করে লেখা হয়। পরে, যে সময়ের খবর জান্‌বার দরকার হয়, সেই সময়ে ঐ জিনিষগুলির চল্‌তি দর কত, সেগুলি সংগ্রহ করা হয়; এবং প্রথম বৎসরের প্রত্যেক দরের জায়গায় ১০০ বসালে পরবর্ত্তী কালের ঐ ঐ দরের জায়গায় কত বসান দরকার, তার হিসাব করা হয়। পরে, এই শেষোক্ত অঙ্কগুলির সমষ্টিকে জিনিষের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়ে, ঐ সময়ের গড়ের দর হিসাব করা হয়। এই সংখ্যাই হ'ল ঐ সময়ের সূচক-সংখ্যা। এই সূচক-সংখ্যা এক শ'এর চেয়ে যত বেশী হবে, গড়ের দর শতকরা তত বেড়েছে বুঝ্‌তে হবে, অর্থাৎ, টাকার দাম বা ক্রয়শক্তি শতকরা তত কমেছে, বুঝ্‌তে হবে। সূচক-সংখ্যা এক শ'এর কম হ'লে বুঝ্‌তে হবে, টাকার দাম শতকরা তত বেড়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে।

	প্রথম বৎসর ১৯৩৯ সাল		১৯৫১ সাল	
চাল—প্রতি মণ	৫৲	=১০০	৩৫৲	=৭০০
ডাল— ঐ	৭৲	=১০০	২৮৲	=৪০০
সঃ তেল—ঐ	১৫৲	=১০০	৯০৲	=৬০০
ধুতি—প্রতি জোড়া	২৲	=১০০	১৪৲	=৭০০
কয়লা—প্রতি মণ	।৵০	=১০০	২।০	=৬০০
বাড়ী ভাড়া—প্রতি ঘর	১০৲	=১০০	৩০৲	=৩০০
মোট		৬০০		৩,৩০০
গড়ের দর		১০০		৫৫০

১৯৫১ সালের সূচক-সংখ্যা হ'ল ৫৫০।

সমুচিত ওজন দেওয়া সূচক-সংখ্যা (Weighted Index numbers)—উপরে যে ভাবে সূচক-সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে, তার একটি ত্রুটি এই দেখান হয় যে, চাল, ডাল প্রভৃতি প্রত্যেকটি জিনিষের দামের জায়গায় ১০০ বসান হয়েছে। তা করা উচিত নয়। কারণ যদি এই সূচক-সংখ্যা অনুসারে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ১৯৩৯ সালে যে পরিবারের ১০০৲ টাকা আয়ে যে ভাবে চল্‌ত, ১৯৫১ সালে সেই ভাবে চল্‌তে সেই পরিবারের ৫৫০৲ টাকা আয় হওয়া দরকার, তা হ'লে এই সিদ্ধান্ত ভুল হবে। কারণ, যে পরিবারে মাসে ১/ মণ চাল খরচ হয়, সে পরিবারে মাসে ১/ মণ ডাল বা সঃ তেল খরচ হয় তা কখনও হ'তে পারে না। অতএব হিসাব করবার সময় বিভিন্ন জিনিষের বিভিন্ন মর্য্যাদা বা ওজন দেওয়া দরকার। যদি উল্লিখিত জিনিষগুলির আপেক্ষিক ওজন যথাক্রমে ৮, ২, ১, ৩, ৩ ও ৩ হয় তা' হ'লে সূচক-সংখ্যার হিসাব এই ভাবে হবে।

আপেক্ষিক গুরুত্ব		প্রথম বৎসর ১৯৩৯ সাল		১৯৫১ সাল	
৮	চাল—প্রতি মণ	৫৲	=৮০০	৩৫৲	৫৬০০
২	ডাল— ঐ	৭৲	=২০০	২৮৲	৮০০
১	সঃ তেল—ঐ	১৫৲	=১০০	৯০৲	৬০০
৩	ধুতি—প্রতি জোড়া	২৲	=৩০০	১৪৲	২,১০০
৩	কয়লা—প্রতি মণ	।৵০	=৩০০	২।০	১,৮০০
৩	বাড়ী ভাড়া—প্রতি ঘর	১০৲	=৩০০	৩০৲	৯০০
২০	মোট		২০)২০০০		২০)১১,৮০০
	গড়ের দর		১০০		৫৯০

এই হিসাবে, ১৯৫১ সালের সূচক-সংখ্যা হ'ল ৫৯০।

সাধারণ ও বিশেষ সূচক-সংখ্যা—সাধারণ ভাবে, যখন জিনিষপত্রের দর চ'ড়তে থাকে কিংবা কমতে থাকে, তখন সব জিনিষের দর সমান অনুপাতে বদ্লায় না। কোনটা বেশী, কোনটা কম, কোনটা প্রথম মুখেই, কোনটা বা কিছু সময় পরে। সেইজন্য টাকার ক্রয়শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে সকল লোকের সমান সুবিধা বা অসুবিধা হয় না। এই কারণে, যদি নির্ব্বিচারে সকল রকম জিনিষের দর নিয়ে সূচক-সংখ্যা হিসাব করা হয়, তা হলে এইরূপ সাধারণ সূচক-সংখ্যা, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ঠিকমত কাজে লাগানো যায় না। তাই, উদ্দেশ্যভেদে এক এক ধরণের সামগ্রীর দর নিয়ে বিশেষ বিশেষ সূচক সংখ্যা তৈরী করা হয়। পাইকারী দর নেওয়া হবে কি খুচরা দর নেওয়া হবে তাও উদ্দেশ্যের দিকে নজর রেখে ঠিক করা হয়। অল্প বেতনের চাকুরিয়াদের, কিংবা কল কারখানার মজুরদের কি পরিমাণ মাগ্যিভাতা দেওয়া উচিত জান্‌তে হ'লে, সমাজের ঐ স্তরের লোকদের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীগুলির খুচরা দর নিয়ে যে সূচক-সংখ্যা তৈরী হবে, সেই সূচক-সংখ্যাই কাজে লাগবে। টাকার ক্রয়শক্তি বদল হওয়ার ফলে বিদেশীদের সঙ্গে বাণিজ্যে আগেকার চেয়ে সুবিধা হয়েছে কি অসুবিধা হয়েছে জান্‌তে হ'লে, আমদানী পণ্য ও রপ্তানী পণ্যের আলাদা আলাদা সূচক-সংখ্যা তৈরী ক'রে সে দুইটির তুলনা করা দরকার। কৃষি-জাত সামগ্রীগুলি ও শিল্প-জাত সামগ্রীগুলির আলাদা আলাদা সূচক-সংখ্যা তৈরী করে দেখা গেছে যে, বাণিজ্য-চক্রের নিম্নগতির সময় কৃষিজাত সামগ্রীর দর অপেক্ষাকৃত বেশী কমে।*

---

* সরকারী দপ্তর থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে যে সূচক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, তার একটি নমুনা এখানে দেওয়া হ'ল। এর থেকে বোঝা যাবে, কি ভাবে বিভিন্ন ধরণের জিনিষের আলাদা আলাদা সূচক সংখ্যা তৈরী হয়, এবং সবগুলি মিলিয়ে একটি সাধারণ সূচক সংখ্যা তৈরী হয়—

Base : year ended August 1939=100

Groups & Sub-groups	week ended 13.52	3.3.51
I. Food Articles	353·8	413 0
Cereals	448	487
Pulses	455	518
Others	218	291
II. Industrial		
Raw materils	501·9	555·5
Fibres	549	501
Oilseeds	468	724
Minerals	452	398
Others	397	626

(২)

গড়-পড়্তা বাজার দর কম বেশী হওয়ার কারণ।

এই কারণ প্রধানতঃ তিনটি—

১। বাজারে জিনিষপত্রের যোগান বেশী বা কম হওয়া;

২। বাজারে চালু অর্থের পরিমাণ কম বেশী হওয়া;

৩। প্রত্যেকটি মুদ্রা গড়ে কম বা বেশী বার ব্যবহার হওয়া।

এই তিনটি, এবং গড়ের বাজার দরের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি রকম, তা একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলে বোঝবার সুবিধা হবে। ধরা যাক যে, কোন একটি ছোট গ্রামে কোন এক দিন যা কিছু বেচা-কেনা হয়েছে, তার হিসাব এই রকম—

১০	খানা	ধুতি	—	৪৲	হিঃ	—	৪০৲
১০	মণ	চাল	—	১০৲	হিঃ	—	১০০৲
২০	সের	চিনি	—	১৲	হিঃ	—	২০৲
১০টা		সার্ট	—	৫৲	হিঃ	—	৫০৲
২০	সের	ঘি	—	৫৲	হিঃ	—	১০০৲
১০	মণ	কয়লা	—	১৲	হিঃ	—	১০৲
৮০	সংখ্যা পণ্য						৩২০৲

Groups & Sub-gronps	week ended 1.3.52	3.3.51
III. Semimannfactures	353.4	377.9
Leather	346	528
Mineral oils	218	195
Vegetable oils	467	727
Cotton yaru	498	462
Metals	203	189
Oil-cakes	432	500
Others	288	344
IV. Manufactures	309.8	373.8
Textiles	451	434
Jute	620	561
Cottnn	410	382
Rapon & Silk	535	771
Woollen	388	329
Metal products	306	279
Others	302	294
V. Miscellaneous	692·3	742·3
All commodities	398.7	426.4

সামগ্রীর সংখ্যা ৮০, মোট দাম ৩২০৲ টাকা। অতএব গড়ে প্রত্যেকটি জিনিষ ৪ টাকা হিসাবে বিক্রয় হয়েছে। সব সমেত ৩২০ টাকা হাত ফেরৎ হয়েছে। কিন্তু, তাহা থেকে এ কথা বোঝায় না যে ৩২০টি আলাদা আলাদা টাকা ব্যবহার হয়েছে। একই টাকা একাধিক বার ব্যবহার হয়ে থাক্‌তে পারে। এক জন লোক ধুতি বেচে যে টাকা পেলে, সেই টাকা দিয়ে চাল কিনে থাক্‌তে পারে। আবার চাল-অলা সেই একই টাকা দিয়ে চিনি কিনে থাক্‌তে পারে। ঐ গ্রামের লোকেদের কাছে যত টাকা আছে, তার মধ্যে কোন কোনটি মোটে ব্যবহার হয় নি, কোন কোনটি এক বার ব্যবহার হয়েছে, কোনটি দুবার, কোন কোনটি তিন বার, এই রকম। যদি জানা থাকে যে ঐ গ্রামের লোকেদের কাছে সব সমেত ১৬০ টাকা ছিল, তা হলে বুঝতে হবে যে গড়ে প্রত্যেক টাকাটি ৩২০ ÷ ১৬০ অর্থাৎ ২ বার ব্যবহার হয়েছে।

অতএব, উপরের হিসাব থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, সামগ্রীর সংখ্যাকে গড়ের দর দিয়ে গুণ ক'রলে যা হবে, মোট অর্থের পরিমাণকে গড় পড়তা ব্যবহারের সংখ্যা দিয়ে গুণ ক'রলেও তাই হবে।

এইবার কল্পনা করা যাক্ যে, একবৎসর বা ঐ রকম কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ধ'রে সারা দেশে যত কিছু লেন দেন হয়েছে তার খোঁজ পাওয়া সম্ভব, এবং উপরের মত হিসাব লেখা সম্ভব। তা হ'লে এক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে মোট লেন দেনের পরিমাণকে গড়ের দাম দিয়ে গুণ ক'রলে যা হবে, দেশে যত অর্থ আছে তার পরিমাণকে, ব্যবহারের গড়ের সংখ্যা দিয়ে গুণ ক'রলেও তাই হবে। ফিশার সাহেব (Fisher) এই সিদ্ধান্তটিকে সাঙ্কেতিক আকার দিয়েছেন এই রকম—

$$T \times P = M \times V \text{ ; বা}$$

$$P = \frac{MV}{T}$$

এই সাঙ্কেতিক সিদ্ধান্তটি ফিশার সাহেবের 'ফরমুলা' (Formula = সাঙ্কেতিক সিদ্ধান্ত) নামে পরিচিত। এখানে,

T = পণ্যাদির পরিমাণ, অর্থাৎ যা কিছু কেনা বেচা হয়েছে তার পরিমাণ। (Trade)

P = ঐ পণ্যাদির গড়ের দাম। (Price level)

M = অর্থের পরিমাণ, অর্থাৎ, ঐ দেশে ধাতুমুদ্রা, নোট, ব্যাঙ্কের ডিপজিট প্রভৃতি যত রকমের অর্থ ব্যবহার হয়, তার মোট পরিমাণ। (Money)

V = ঐ অর্থ গড়-পড়্‌তা যতবার ব্যবহার হয়েছে তার সংখ্যা ; অর্থাৎ টাকা চলাচলের গতি। (Velocity of circulation)

ফিশারের ফরমুলা থেকে এ কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে যদি 'M' অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ বদলায়, এবং 'T' ও 'V' অপরিবর্ত্তিত থাকে, তা হ'লে 'P' অর্থাৎ গড়ের দাম, অর্থের পরিমাণের সঙ্গে সমান অনুপাতে বদলাবে। অর্থের পরিমাণ যদি শতকরা ১০ ভাগ বাড়ে, তা হ'লে গড়ের দামও শতকরা ১০ ভাগ বাড়বে। অর্থের পরিমাণ যদি শতকরা ১০ ভাগ কমে, তা হ'লে গড়ের দামও শতকরা ১০ ভাগ কম্‌বে।

সাধারণ অবস্থায় 'T' ও 'V' বিশেষ কিছু বদ্‌লায় না। আর যদিও বা বদ্‌লায়, অত্যন্ত ধীরে ধীরে এবং অনেক সময় নিয়ে বদ্‌লায়। কারণ 'T' অর্থাৎ কেনা-বেচার পরিমাণ নির্ভর করে, দেশের জন-সংখ্যার ওপর ; দেশে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের কত দূর উন্নতি হয়েছে তার ওপর, অর্থাৎ কত রকমের পণ্যাদি তৈরী হয় এবং মাথা-পিছু কত মূল্যের পণ্য তৈরী হয়, তার ওপর ; যত সামগ্রী তৈরী হয় তার কত অংশ উৎপাদনকারী নিজে ব্যবহার করে, কত অংশ সরাসরি বিনিময় হয়, এবং কত অংশ অর্থের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয়, তার ওপর ; এবং একই মাল কতবার হাত ফেরৎ হয়, তার ওপর। সাধারণতঃ, এর কোনটাই দু পাঁচ বৎসরে বিশেষ কিছু বদলায় না।

'V' সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। দেশের টাকা কড়ি কত তাড়াতাড়ি হাত বদল হচ্ছে তা নির্ভর করে, লোকে আয়ের কত অংশ জমায় এবং কত অংশ খরচ করে ; কি কি বাবদ্‌ খরচ করে ; এবং এক এক বারে কোন্‌ জিনিষ কি কি পরিমাণে কনে, তার ওপর। এসবই নির্ভর করে অনেক দিনের অভ্যাসের ওপর। এ অভ্যাস সহজে বদ্‌লায় না।

অতএব, এ সিদ্ধান্ত মোটামুটি সত্য যে 'অর্থের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘ'টলে, গড়পড়তা বাজার দরেরও সেই অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। (Quantity Theory of Money).

অতীতে দেখা গেছে যে, যখনই অর্থের পরিমাণ বেশী রকম বাড়ান হয়েছে, তখনই গড়-পড়্‌তা বাজার দরও সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুদ্ধের আগে এদেশে ২০০ কোটি টাকারও কম নোট চালু ছিল। যুদ্ধের খরচ চালাবার জন্য এই পরিমাণ বাড়িয়ে ১২৫০ কোটি টাকার চেয়েও বেশী করা হ'ল। ফলে এখনও গড়-পড়তা বাজার দর যুদ্ধের আগের তুলনায় ৪ গুণের চেয়েও বেশী রয়েছে। ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধের সময়েও ঠিক্‌ এই রকমই ঘটেছিল। ইউরোপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে প্রায় দুশ বৎসর ধরে ক্রমান্বয়ে জিনিষপত্রের দর বেড়ে চলেছিল। তারও কারণ, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি। তখন নোটের প্রচলন হয় নি। সোণার ও রূপার তৈরী মুদ্রা চ'লত। সেই সময়ে নূতন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশ থেকে অনবরত খুব বেশী পরিমাণে সোণা ও

রূপা আমদানী হচ্ছিল। সেই সোণা ও রূপার সাহায্যে ক্রমাগত অর্থের পরিমাণ বাড়ান হচ্ছিল। এবং তার ফলেই জিনিষপত্রের দর চ'ড়ছিল।

উপরের আলোচনায় ধ'রে নেওয়া হয়েছে যে, কেনা-বেচার পরিমাণ ও টাকা চলাচলের গতি বিশেষ কিছু বদ্‌লায় না। এ কথা মোটামুটি ঠিক্ হ'লেও, পুরোপুরি নয়। সেই জন্য, কোন ক্ষেত্রে বাজার দরের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান ক'রবার সময়, এ দুটির কোনটির বদল হয়েছে কিনা সে দিকেও নজর দেওয়া দরকার।

বিশেষতঃ বাণিজ্য চক্রের নিম্নগতি ও উর্দ্ধগতির সময় বাজার-দরের যে অত্যধিক হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে, তার কারণ নির্ণয়ে এ দুটির পরিবর্ত্তন উপেক্ষা করা চলে না।

এক এক সময় যখন বাজার অত্যন্ত মন্দা যায়, মালের চাহিদার অভাবে নানা রকমের কল কারখানা বন্ধ হ'য়ে যায়, এবং অনেক লোক বেকার হ'য়ে পড়ে তখন বাজারে বাড়্‌তি টাকা চালু ক'রতে পারলে, দেশের লাভ বই লোকসান হয় না। কারণ, এই বাড়্‌তি টাকা যাদের হাতে আসে, তারা সেই টাকা দিয়ে জিনিষপত্র কিন্‌তে থাকে। ফলে, যে সব জিনিষ বিক্রী হচ্ছিল না, সে সব জিনিষ বিক্রী হ'তে থাকে, এবং অনেক কল কারখানা চালু হ'তে থাকে। তার ফলে ক্রমশঃ বেকারের সংখ্যা কমতে থাকে। যারা কাজ পায়, তারা তাদের মাইনের টাকা দিয়ে নানা রকমের জিনিষ কিন্‌তে থাকে; সেই জন্য জিনিষের চাহিদা আরও বাড়ে, এবং আরও লোকের চাকুরী জুট্‌তে থাকে। অতএব, যতদিন না দেশের সমস্ত মূলধন ও শ্রমশক্তি অল্পবিস্তর সম্পূর্ণভাবে কাজে লেগে যায়, ততদিন টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বাজার দর মোটামুটি সমান থাকে। কিন্তু তার পরেও যদি টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়া চলে, তখন আর বাড়্‌তি জিনিষ তৈরী হ'তে পারে না। তখন বাজার দর টাকার পরিমাণের অনুপাতে চড়্‌তে থাকে। এই অবস্থাকেই আসলে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা বলা চলে। সময়ে যদি মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের ব্যবস্থা করা না হয়, এবং বাজার দরকে যদি দ্রুতবেগে চড়্‌তে দেওয়া হয়, তা হ'লে শেষে এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, লোকের আর টাকার ক্রয়শক্তির ওপর আস্থা বজায় থাকে না। তখন লোকে আর টাকা হাতে রাখ্‌তে চায় না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা দিয়ে জিনিষ কিনে ফেল্‌তে চায়; অর্থাৎ টাকা চলাচলের গতি বেড়ে যায়। তখন টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে, তার চেয়ে ঢের বেশী অনুপাতে বাজারদর বাড়্‌তে থাকে।

তেমনি বাণিজ্য চক্রের নিম্নগতির সময় একটা অবস্থা এমন আসে, যখন অনেক লোকের মনে বিশ্বাস জন্মে যায় যে বাজার দর আরও অনেক নাম্‌বে। তখন তারা আর জিনিষপত্র কিন্‌তে চায় না। নিতান্ত যা না কিন্‌লে নয়, তাই কেনে। তার

মানে, টাকা চলাচলের গতি কমে যায়। তার ফল এই হয় যে, টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে কমে, তার চেয়ে বেশী অনুপাতে বাজার দর প'ড়ে যায়।

(৩)

টাকার দাম কম বেশী হওয়ার ফলাফল।

টাকার দাম যখন কম্‌তে থাকে, অর্থাৎ জিনিষপত্রের দাম যখন বাড়্‌তে থাকে, তখন বাঁধা আয়ের লোকেরা অসুবিধায় পড়ে। কল কারখানার কারিগর ও মজুর, আফিসের কর্ম্মচারী, স্কুল কলেজের শিক্ষক প্রভৃতি যারা নির্দ্দিষ্ট হারে মাহিনা পায় তারা ক্রমশঃ গরীব হ'তে থাকে; কারণ তাদের মাহিনার টাকায় যে জিনিষপত্র কেনা যায়, তার পরিমাণ ক্রমশঃই কম্‌তে থাকে। অবশ্য এ রকম অবস্থা যদি বেশী দিন ধ'রে চলে, তা হ'লে অনেক ক্ষেত্রে একটু বর্দ্ধিত হারে মাহিনা ও মজুরী আদায় করা সম্ভব হয়। কিন্তু, ক্রমাগত যদি জিনিষপত্রের দর চড়তে থাকে, তা হ'লে মাহিনা ও মজুরী কোন সময়েই তার নাগাল পায় না।

যারা বাড়ীর ভাড়া, জমির খাজনা বা টাকার সুদ পায়, তাদেরও বাঁধা মাহিনার চকুরেদের মত অসুবিধায় পড়'তে হয়। কারণ, চুক্তির মেয়াদ যতদিন না ফুরোয় ততদিন এগুলি বাড়ান যায় না। পুরোণো ভাড়াটিয়ার ভাড়া বাড়ান এত দৃষ্টিকটু হয় যে অনেক ক্ষেত্রে বাড়ীঅলারা সে কাজ ক'রতে সঙ্কোচ বোধ করে। জমির খাজনা, আবার, অনেক ক্ষেত্রে দেশাচার অনুযায়ী আদায় ক'রতে হয়; অতএব কোন ক্রমেই বাড়ান' চলে না।

অন্যপক্ষে, ব্যবসায়ীদের সকল দিক্ দিয়ে সুবিধা হয়। যাদের ঘরে মাল মজুত আছে, তাদের সে মালের দাম বেড়ে যাওয়ায় লাভ বেশী হয়। ব্যাপারীরা যে সময়ে মাল কেনে তার অন্ততঃ কিছু কাল পরে সেই মাল বিক্রী করে। ইতিমধ্যে সে মালের দর চ'ড়ে গেলে, তারা অনায়াসেই বেশী লাভ ক'রতে সমর্থ হয়। কল কারখানায় যে সময়ে কাঁচা মাল কেনা হয়, আর যে সময়ে সেখান থেকে তৈরী মাল বেরোয়, তার মাঝে বেশ কিছু সময় যায়। এই সময়ের মধ্যে যদি তৈরী মালের দাম বেড়ে যায় তা হ'লে পড়্‌তার অনুপাতে অনেক বেশী লাভ হয়। যারা ধার করা টাকা নিয়ে কারবার করে, তাদের সুদ দেওয়া এবং আসল ফেরৎ দেওয়া, দুই দিক্ দিয়েই লাভ হয়। কারণ, টাকার দাম ক'মে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের বেশী টাকা দিতে হয় না। অন্য দেনাদারদেরও ঐ একই কারণে লাভ হয়, এবং পাওনাদারদের সেই অনুপাতে লোকসান হয়।

যখন টাকার দাম বাড়তে থাকে তখন ঠিক্ এর উল্টো ফল হ'তে থাকে। তখন বাঁধা আয়ের লোকদের লাভ হ'তে থাকে, এবং কারবারী লোকেরা অসুবিধায় পড়ে। পাওনাদারদের লাভ হয়, এবং দেনদাররা বিপদে পড়ে।

জিনিষ পত্রের দাম ক'মে যাওয়াটা দেশের শিল্প বাণিজ্যের পক্ষে ভাল নয়। কারণ লাভ অত্যন্ত ক'মে গেলে, কিংবা লোকসান হ'তে থাকলে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ চ'লে যায়। অবশ্য সামান্য দাম কমলে, অনেক সময়ে দেশের ভাল বই মন্দ হয় না। কারণ তাতে যে সব কারবার অনুপযুক্ত লোকদের হাতে আছে সেগুলো ফেল হ'য়ে যায়, এবং তাতে দেশের সঙ্গতির অপচয় বন্ধ হয়। আর, সুযোগ্য ও বিচক্ষণ শিল্পপতিদের, লাভ বজায় রাখবার জন্য, বেশী সতর্ক হ'য়ে এবং বেশী চেষ্টা ও যত্ন দিয়ে কাজ ক'রতে হয়। তার ফলে, অনেক সময়ে যন্ত্রপাতি ও শিল্প কৌশলের উন্নতি হয়। এতে দেশের লাভ। তবে, জিনিষপত্রের দাম যদি বড় বেশী ক'মে যায়, কিংবা অনেক দিন ধ'রে ক্রমাগত ক'মতে থাকে, তা হ'লে দেশের সমূহ ক্ষতি হয়। কারণ, তার ফলে, অনেক ভাল ভাল কারবার ফেল হ'য়ে যেতে পারে; কিংবা কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হ'তে পারে। তাতে বহু লোক বেকার হয়, এবং দেশময় অভাব ও অশান্তি দেখা দেয়।

ধীরে ধীরে ক্রমাগত জিনিষপত্রের দাম চড়ছে, এই অবস্থাটী দেশের শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল। কিন্তু, এ অবস্থা বরাবর বজায় রাখা চলে না। কারণ, একটা সময় আসবেই যখন, অন্ততঃ তখনকার মত, আর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব হবে না। তখন মুদ্রাস্ফীতির কুফলগুলি প্রকট হ'য়ে উঠবে। অতএব, সকল দিক্ দিয়ে বিচার ক'রলে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন ব'লে মনে হয় যে, দেশের সমগ্র কল্যাণের পক্ষে টাকার ক্রয়শক্তি স্থির থাকাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় খণ্ড

মূল্য নির্দ্ধারণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

মূল্য সমস্যার প্রকৃতি।

প্রথম খণ্ডে, প্রধানতঃ বিত্ত-সৃষ্টির আয়োজন ও তাহার উপযোগী সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। আমরা দেখেছি, যে সকল ব্যবস্থার ফলে আজকের দিনে এত বিপুল পরিমাণে এবং এত অসংখ্য রকমের দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, তার মূলে রয়েছে সূক্ষ্ম কর্ম্ম-বিভাগ। এই কর্ম্ম-বিভাগ আবার সম্ভব ও কার্য্যকর হয়েছে এই কারণে যে দেশে এবং বিদেশে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে অতি ব্যাপক ভাবে জিনিষপত্রের ও ব্যক্তিগত সেবার আদান প্রদানের সুযোগ ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে, এই আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে যে অর্থের ব্যবহার হয়ে থাকে, তার রূপ ও প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করা হয়েছে।

এইবার যে প্রশ্নের অবতারণা করা হবে, সেটি হচ্ছে বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর আপেক্ষিক মূল্যের প্রশ্ন। প্রত্যেকেই চায়, তার যে জিনিষ বা যে কাজ দেবার আছে সেটি বেশী দামে বিক্রয় হয়, এবং যে জিনিষ বা যে কাজের প্রয়োজন আছে সেটি কম দামে কেনা যায়। কিন্তু সকলকেই বাজার দরে কেনা বেচা করতে হয়। এ দরের উপর ব্যক্তিগত ভাবে কারও হাত নেই। এই দর কি ভাবে স্থির হয়? কি কি কারণ এর পেছনে রয়েচে? কি ভাবেই বা সেই কারণগুলি কাজ করে? পরবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে এই প্রশ্নেরই উত্তরের সন্ধান করা হবে। কখনও কখনও দেখা যায়, সমগ্র ভাবে সকল জিনিষেরই দরের হ্রাস বা বৃদ্ধি হচ্ছে। এরূপ অবস্থার আলোচনা আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে করেছি। আমরা দেখেছি যে এরূপ হবার প্রধান কারণ অর্থের পরিমানের হ্রাস-বৃদ্ধি। অর্থাৎ এ প্রশ্নটি আসলে অর্থের ক্রয়-শক্তির প্রশ্ন। কিন্তু এখন যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হবে, এটি সে প্রশ্ন নয়। এটি হচ্ছে, বিভিন্ন জিনিষের আপেক্ষিক মূল্যের প্রশ্ন। কিংবা আরও সঠিক ভাবে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, এ প্রশ্নটি বিভিন্ন জিনিষের আপেক্ষিক বিনিময়-মর্য্যাদার প্রশ্ন। কেন একটি জিনিষের এক মাত্রার বিনিময়ে অন্য একটি, বেশী মাত্রায় বা কম মাত্রায় পাওয়া যায়? এবং ঠিক এতখানি বেশী, বা এতখানি কমই, বা কেন পাওয়া যায়? অবশ্য আজ কাল সমস্ত বিনিময়ের কাজ অর্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অতএব আপেক্ষিক বিনিময়-মর্য্যাদার প্রশ্নটিকে আপেক্ষিক মূল্যের প্রশ্ন হিসাবে আলোচনা ক'রলে কোন দোষ হয় না। শুধু এইটুকু সাবধান হ'তে হবে যে, অর্থের ক্রয়-শক্তির হ্রাস বৃদ্ধির যে ফলাফল হয়ে থাকে, এ-প্রসঙ্গে যেন সেগুলিকে উপেক্ষা করা হয়।

(২)

মূল্য সমস্যার গুরুত্ব

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এ প্রশ্নের গুরুত্ব অনেকখানি। যে চাষী পাট বুনেছে, সে হয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে প্রচুর পরিমাণে ফসল তুলেছে। কিন্তু বাজারে পাটের ভাল দর না পেলে তার দুঃখ ঘোচে না। যে কারুশিল্পীকে বেশী দরে কাঁচা মাল কিনতে হয়, এবং কম দরে তৈরী মাল বেচতে হয়, সে উদয় অস্ত পরিশ্রম ক'রেও গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ ক'রতে পারে না। একদিন বাংলার পল্লীগ্রামে তাঁতী, কলু, কুমোর, কামার প্রভৃতি কারু-শিল্পীরা স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করত। এই মূল্য-সমস্যার চাপে পড়েই তারা এখন উচ্ছন্ন গেছে। যে লোক কোন বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, তাকে দুদিক্ দিয়ে এই মূল্য সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। যত লোক এই কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, যেমন জমি বা অন্য রকম প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক, মূলধনের মালিক, পরিচালনার কাজে নিযুক্ত নানা ব্যক্তি, এবং ছোট, বড়, মাঝারী নানা পদে অধিষ্ঠিত বহু সংখ্যক কর্ম্মচারী, কারিগর ও শ্রমিক, এদের সকলেরই উপার্জ্জন নির্ভর করে, প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যের ওপর, অর্থাৎ উৎপন্ন পণ্যটি বাজারে ভাল দরে বিক্রয় হওয়ার ওপর। এই হ'ল একটা দিক্। আর একটি দিক্ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাজের বা দানের আপেক্ষিক মূল্যের দিক্। কারবারে যথেষ্ট লাভ হ'লেই যে প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের ব্যবস্থা হবেই, তা নয়। সেটি নির্ভর ক'রছে, অন্য লোকের অনুপাতে তার কাজের আপেক্ষিক মূল্য কত, তার ওপর। এমন হওয়া মোটেই বিচিত্র নয় যে, যথেষ্ট লাভ হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকের অর্দ্ধাশন ঘুচ্ছে না; কেবল মালিকদের মোটা পেট আরও মোটা হচ্ছে।

দেশের বৈষয়িক জীবন সমগ্র ভাবে চিন্তা ক'রলে মূল্য সমস্যার গুরুত্বের আর একটা দিক্ চোখে পড়ে। দেশে নানা জিনিষ ও নানা কাজের প্রয়োজন। অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এগুলির যোগান দিচ্ছে। যার যা দেবার আছে, তার সে খরিদ্দার পায়। যার যা নেবার প্রয়োজন, সেটি সে পয়সা দিলেই কিনতে পায়। যে জিনিষের যতখানি প্রয়োজন, মোটামুটি ঠিক্ ততখানিই তৈরী হয়। এই মিল কি ক'রে ঘটে? বেশীর ভাগ জিনিষের নানা রকমের ব্যবহার আছে। কয়লা, কাঠ, লোহা প্রভৃতি অসংখ্য জিনিষের একাধিক ব্যবহার আছে। নানা কাজে, এবং নানা শিল্পে এগুলির প্রয়োজন হয়। এ সব জিনিষের কোনটরই অফুরন্ত যোগান হ'তে পারে না। অতএব যে পরিমাণ আছে, সেটি বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে এমন ভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া দরকার, যে দেশের সবচেয়ে সুবিধা হয়। তাই কি হয়? কি ভাবে এই ভাগ করার কাজটা প্রকৃতপক্ষে

করা হয়? এমন অনেক জিনিষ আছে যা তৈরী ক'রতে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা দরকার হয়। তৈরীর কাজ ধাপে ধাপে এগোয়। বিভিন্ন ধাপের কাজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সম্পন্ন হয়। এক ধাপের যেটি তৈরী মাল, পরের ধাপের সেটি কাঁচা মাল। কাজ যেমন এগিয়ে চলেছে, নানা আনুষঙ্গিক কারবারের দরকার হচ্ছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে পাওয়াও যাচ্ছে। এই সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা মত সহযোগিতা কি করে ঘটে? বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই ত আগে থাকতে কোন বোঝাপড়া থাকে না। কোন উপরঅলার চাপে ও নির্দ্দেশেও এই সহযোগিতার সৃষ্টি হয় না। কম্যুনিষ্ট দেশগুলি ছাড়া আর কোথাও সমগ্রভাবে দেশের বৈষয়িক জীবন সরকারী পরিকল্পনা ও সরকারী প্রচেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অন্য সব দেশে দুচারটে বড় বড় কারবার ছাড়া কৃষি শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কীয় যা কিছু প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম, জনসাধারণের স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হয়। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, এরকম অবস্থায় বিশৃঙ্খলা, ও দেশের সঙ্গতির অপচয় অনিবার্য্য। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কোন কেন্দ্রীয় শাসন বা পরিচালনা নেই, এ কথা ঠিক্ বটে। কিন্তু শাসন একটি আছে; সেটি বাজার দরের শাসন।

চাহিদার সঙ্গে যোগানের মিল ঘটান, বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে উপযুক্ত ভাবে ভাগ করে দেওয়া, মাল তৈরী করার বিভিন্ন ধাপের মধ্যে সঙ্গতি ও যোগাযোগ রক্ষা করা, এই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় কাজ বাজার দরের কারকর্তায় আপনা-আপনি সুশৃঙ্খল-ভাবে সম্পন্ন হয়। কোন কিছুর যোগান ও চাহিদার মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘট্‌লে সেটি বাজারদরে প্রতিফলিত হয়। যোগানে ঘাট্‌তি হলে বাজারদর চড়তে থাকে। চাহিদায় মন্দা পড়লে বাজারদর কম্‌তে থাকে। দর বাড়লে যোগানদারদের লাভ বেশী হতে থাকে। তখন যোগান বাড়াবার চেষ্টা চলে। চল্‌তি কারখানাগুলিতে বাড়তি সময় কাজ চালাবার বন্দোবস্ত হয়; নূতন নূতন কারখানা খোলারও চেষ্টা চল্‌তে থাকে। লাভ বেশী হওয়াতে কাঁচা মাল, সাজ সরঞ্জাম, লোকজন প্রভৃতি বেশী টাকা দিয়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, এবং কিছুদিনের মধ্যেই চাহিদার অনুযায়ী যোগানের ব্যবস্থা হয়। অপর পক্ষে দর কম্‌লে লাভ কমতে থাকে, এবং যোগানদারদের মধ্যে যাদের তৈরী খরচা অপেক্ষাকৃত বেশী তাদের কারবার বন্ধ করতে হয়, কিংবা কাজে ঢিলে দিতে হয়। ফলে যোগান কমতে থাকে। বাজার দর নির্দ্দেশ করে দেয়, দেশে কোন জিনিষের প্রয়োজন বেশী এবং কোন জিনিষের কম। বেশী লাভ দিয়ে, যে জিনিষের প্রয়োজনের অনুরূপ যোগান নেই সেই জিনিষ বেশী পরিমাণে যোগান দিতে লোককে প্রলুব্ধ করে। লাভ কমিয়ে দিয়ে, যে জিনিষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যোগান থাকে, সে জিনিষের যোগানের পরিমাণ কমাতে লোককে বাধ্য করে। বাজারদরের ওঠা-নামার ভেতর দিয়ে দেশের বৈষয়িক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দ্রব্যের এবং কাজের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে, সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে।

আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে বাজারদরের গুরুত্ব কতখানি তা আমরা দেখলাম। অতএব যদি মূল্য-সমস্যাটিকে অর্থতত্ত্বের মূল সমস্যা বলে অভিহিত করা হয়, তা হ'লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

বাজার—বাজারের পরিচায়ক বিশেষত্ব।

কেনা-বেচার কাজ বাজারে হয়। বাজার বল্‌তে আমাদের সাধারণতঃ একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের কথা মনে হয়, যেখানে অনেকগুলি দোকানদার কাছাকাছি দোকান সাজিয়ে বসে আছে, এবং বহুসংখ্যক খরিদ্দার চলাফেরা করছে, আর পাঁচটা দোকানে যাচাই করে তাদের প্রয়োজনমত জিনিষপত্র কিনছে। দোকানদারে দোকানদারে রেষারেষি রয়েছে, এবং তার ফলে যা সব কেনা-বেচা হচ্ছে তা' অল্প-বিস্তর একই দরে হচ্ছে। একই বাজারে, একই সময়ে একই জিনিষের বিভিন্ন দর চল্‌তে পারে না। এই শেষের কথটাই বাজারের ধারণার মূল কথা। নির্দ্দিষ্ট স্থানের কথাটা অল্পবিস্তর অবান্তর। প্রতিযোগিতা থাকা, এবং তার ফলে এক দরে জিনিষ বিক্রী হওয়া, এইটাই বাজারের পরিচায়ক বিশেষত্ব। বহুসংখ্যক যোগানদার অনেকখানি এলাকায় ছড়িয়ে থাকতে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে যদি প্রতিযোগিতা থাকে, এবং তার ফলে যদি তারা একই দরে কোন জিনিষ বিক্রী করে, তা হ'লে ঐ সমস্ত এলাকাটি ঐ জিনিষের একটি বাজার বলে গণ্য হয়। বেচা-কেনা করবার জন্য যোগানদারদের সঙ্গে খরিদ্দারদের মুখোমুখি কথা কওয়া সব সময়ে দরকার হয় না। চিঠি লেখা, টেলিগ্রাফ করা, টেলিফোনে কথা কওয়া, বিজ্ঞাপন দেওয়া, টেণ্ডার আহ্বান করা প্রভৃতি নানা উপায়ে আজকাল ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এই সমস্ত উপায়ে দূর দূরান্তরে অবস্থিত ব্যাবসায়ীদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা সম্ভব যে, সোণা, রূপা বড় বড় কোম্পানীর শেয়ার, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষের সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটি বাজার গড়ে উঠেছে। এই সব জিনিষের দর এক জায়গার চেয়ে আর এক জায়গায় সামান্য একটু কম বা বেশী হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই দূর দূরান্তর থেকে কেনবার বা বিক্রী করবার প্রস্তাব এসে হাজির হয় এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই দরের সমতা ফিরে আসে।

(২)

বাজারের বিস্তার

বাজারের বিস্তার নির্ভর করে, যে জিনিষের কথা হচ্ছে তার বিশেষত্বের উপর। টাট্‌কা শাক সব্জি, টাট্‌কা মাছ, টাট্‌কা দুধ, সদ্য ফোটা ফুল প্রভৃতি জিনিষের বাজার একটি সঙ্কীর্ণ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকৃতে বাধ্য। কারণ, এ সব জিনিষ বেশী দুর নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রলে নষ্ট হ'য়ে যায়। এ সব জিনিষ এক জায়গায় যে দরে বিক্রী হচ্ছে, ২০।২৫ মাইল তফাতে তার চেয়ে অনেক বেশী বা অনেক কম দরে বিক্রী হচ্ছে, এ রকম হামেশাই দেখা যায়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হওয়াতে এই সব জিনিষের বাজারে, মাঝে মাঝে দর অস্বাভাবিক রকমের বেশী বা কম হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। চাহিদায় একটু মন্দা পড়্‌লে, দর বড় বেশী নেমে যেতে পারে। চাহিদার একটু তেজ হ'লে দর বড় বেশী চড়্‌তে পারে। যোগানদারদের পক্ষে একজোট হ'য়ে সাময়িক ভাবে দর চড়িয়ে রাখার সুবিধাও এই সব বাজারে যথেষ্ট থাকে।

যে জিনিষের বাজার যত বিস্তীর্ণ, সে জিনিষের দরের ওঠানামা তত কম হয়, এবং সে জিনিষের ব্যাপারীদের তত কম লাভে সন্তুষ্ট থাকৃতে হয়। সোণা, রূপা, বা নামজাদা কোম্পানীর শেয়ার ও সরকারী ঋণপত্রের ব্যাবসা যারা করে, তাদের শতকরা ১ ভাগের চেয়েও অনেক কম লাভে কাজ করতে হয়।

গম, চিনি, তুলা, পশম, লোহা, ইস্পাৎ প্রভৃতি জিনিষগুলির বাজারও খুব বিস্তীর্ণ। তার কারণ—

১। এই জিনিষগুলি অনেক দেশে এবং বহুল পরিমাণে তৈরী ও বিক্রয় হয়।

২। নমুনা দেখে ও দেখিয়ে কেনা-বেচা করা চলে; কিংবা গুণ হিসাবে নাম বা সংখ্যা দিয়ে শ্রেণী বিভাগ করা থাকে, এবং এই নাম বা সংখ্যা উল্লেখ ক'রে কেনা বেচার চুক্তি করা যায়।

৩। দামের অনুপাতে, নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার খরচ কম; এবং নাড়াচাড়া করবার সময়, নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। মজুত ক'রে রাখ্‌লেও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না।

যে সব জিনিষ দামে কম, অথচ ভারী বা আয়তনে বড়, সে সব জিনিষের বাজার বিস্তীর্ণ হ'তে পারে না, তার কারণ, এ সব জিনিষ বেশী দুর নিয়ে যাওয়া পোষায় না।

আজকাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এত বেশী রকম বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, এবং আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের হার এত বেশী হয়েছে এবং তার উপর এক দেশ থেকে আর এক দেশে অর্থ পাঠাতে এত বেগ পেতে হয় যে, কোন জিনিষেরই আর তিন্‌টে চার্‌টে দেশ নিয়ে একটা বাজার বজায় থাক্‌ছে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সোণার কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। আজকাল এমন কি আমেরিকা বা ইংলণ্ডের মত দেশেও সোণা বেচাকেনা এবং আমদানী রপ্তানী করবার অবাধ স্বাধীনতা নেই। অতএব সোণার বাজার আজকাল দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে বিস্তৃতি লাভ ক'রতে পারে না। ঐ দুই দেশে সোণার যে সরকারী দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী দরে আমাদের দেশে সোণার কেনাবেচা চল্‌ছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

দীর্ঘকালীন দর

বাজারে কোন সময়ে যে দরে কোন জিনিষ বিক্রয় হয়, সেটি স্থির হয় নানা কারণের সমবেত ক্রিয়ার ফলে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি মূলগত ও দীর্ঘস্থায়ী কারণ। এগুলির ক্রিয়া অনেক দিন ধ'রে চলে, এবং এগুলির পূরো ফল পেতে অনেক সময় লাগে। আর কতকগুলি, উট্‌কো বা আগন্তুক কারণ। এগুলি হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। এই কারণগুলি ক্ষণস্থায়ী হ'লেও সময় সময় এত প্রবল হয় যে, বাজার দরের অস্বাভাবিক রকম হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কল্‌কাতার বাজারে ছানার দরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কল্‌কাতায় ছানার যোগান আসে প্রধানতঃ মফঃস্বল থেকে। অল্পকালের মধ্যে এই যোগানের পরিমাণ বিশেষ বাড়ান কমান' যায় না। সেই জন্য লগন্‌সার সময়, যখন মিষ্টান্নের চাহিদা অত্যন্ত বেশী হয়, তখন ছানার দর অস্বাভাবিক রকম চড়ে। অন্যপক্ষে, হরতালের দিন দেখতে পাওয়া গেছে, হাবড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে ছানা জলের দরে বিক্রী হচ্ছে। বাজারে সব সময়েই কোন না কোন আগন্তুক কারণ উপস্থিত থাকে। সেইজন্য বাজার দর দীর্ঘকাল স্থির থাকতে পায় না। প্রায় প্রত্যহই কিছু না কিছু ওঠানামা সব সময়ই হয়। যদি আগন্তুক কারণগুলির বাধা না থাকৃত, তার মানে, যদি দীর্ঘস্থায়ী কারণ গুলির ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত না ঘট্‌ত, এবং সেগুলির পূরো ফল পাবার মত উপযুক্ত

সময় দেওয়া হ'ত, এবং সেই সময়ের মধ্যে অন্য কোন কারণ উপস্থিত না হ'ত, তা হ'লে যে দর স্থির হ'ত সেই দরকে আমরা দীর্ঘকালীন দর বা 'স্বাভাবিক' দর এই আখ্যা দিচ্ছি। আসলে এই দরে কোন জিনিষ কদাচিৎ কখন বিক্রয় হয়। কিন্তু তা হ'লেও, এই দরেরই আশেপাশে বাজার দর ঘোরাফেরা করে। মূল্যসমস্যার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই দীর্ঘকালীন দর সম্বন্ধে। কেন চিনির দর সব সময়ে এক টাকা সেরের কাছাকাছি থাকে? কেন সে দর চার আনা বা ছয় আনা নয়; কিংবা দু টাকা নয়, বা তিন টাকা নয়? কেন এক সের সর্ষের তেলের দাম সব সময়ে তিন টাকার কাছাকাছি, এবং ঘিয়ের দাম সাত টাকার কাছাকাছি থাকে? কেন সেই সংখ্যা এক টাকাও নয়, দশ টাকাও নয়? কেন এক গজ সুতি কাপড়ের দাম তিন টাকার কাছাকাছি থাকে, এবং পশমী কাপড়ের দর কুড়ি টাকার কাছাকাছি থাকে? এই পার্থক্যের কারণ কি? এইটিই হ'ল আমাদের আলোচনার বিষয়।

অতীতে এই প্রশ্নের তিন রকমের উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছে। প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায়, "নিযুক্ত শ্রম-শক্তির আপেক্ষিক পরিমাণের" সিদ্ধান্তে। দ্বিতীয়টির, "আপেক্ষিক তৈরী-খরচার" সিদ্ধান্তে। এবং, তৃতীয়টির "আপেক্ষিক উপকারিতার" সিদ্ধান্তে। অতএব, পরবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে, প্রথমে এই মতগুলির আলোচনা করা হবে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাব যে, যদিও প্রত্যেকটিতেই যথেষ্ট পরিমাণে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তবুও কোনটিই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। এই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়, "চাহিদা ও যোগানের" সূত্রে। অতএব, সব শেষে এই সূত্রটি বোঝাবার চেষ্টা করা হবে।

"চাহিদা ও যোগানের" সূত্রটি, আবার, অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশেই প্রযোজ্য। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এরকম পরিবেশ পাওয়া শক্ত। একচেটিয়া কারবারী কি নীতি অনুসারে দ্রব্য-মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তা আমরা পরবর্ত্তী একটি পরিচ্ছেদে, আলোচনা করব। প্রায় ক্ষেত্রে, কিছু না কিছু একচেটিয়া অধিকারের বাধা থাকে। যে ক্ষেত্রে যে পরিমাণে এই রকমের বাধা থাকে, সে ক্ষেত্রে মূল্য-নির্দ্ধারণের ব্যাপারে সেই পরিমাণে 'চাহিদা ও যোগানের সূত্রের' ক্রিয়া ব্যাহত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিযুক্ত শ্রম-শক্তির পরিমাণের সিদ্ধান্ত

(১)

এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি

এই মত অনুসারে বিত্তসৃষ্টির সবটুকু কৃতিত্ব শ্রমিককে দেওয়া হয়েছে। বিত্ত-সৃষ্টির কাজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইহা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের পরিশ্রম প্রয়োগ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন কিছু তৈরী করতে বা সংগ্রহ ক'রতে এই পরিশ্রম লাগে বলেই, সেটি পেতে হ'লে তার জন্য মূল্য দিতে হয়। যে জিনিষে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না, যেমন খোলা জায়গায় রৌদ্র বৃষ্টি বা বাতাস, কিংবা নদীর ধারে জল, সে জিনিষ পেতে কোন মূল্য দিতে হয় না। যে জিনিষে যত বেশী পরিশ্রম লাগে, সে জিনিষের সেই অনুপাতে তত বেশী মূল্য দিতে হয়।

সোস্যালিজম্ বা কম্যুনিজম্ যে সমস্ত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে একটি প্রধান হ'ল দ্রব্যমূল্যের উপরোক্ত কারণ নির্দ্দেশ। কার্ল মার্কস্ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সোস্যালিজমের জন্মদাতা নামে অভিহিত হন। তিনি লিখেছেন—"The common social substance of all commodities is labour...A commodity has value because it is a crystallisation of social labour. The greatness of its value or its relative value depends upon the greater or lesser amount of that social substance contained in it; that is to say, on the relative mass of labour necessary for its production. The relative values of commodities are, therefore determined by the respective quantities or amounts of labour, worked up, realised, fixed in them." "অর্থাৎ, সমস্ত সামগ্রীতে যে, মানুষের দেওয়া সাধারণ বস্তুটি নিহিত আছে, সেটি মানুষের পরিশ্রম। কোন সামগ্রীর মূল্যের কারণ হ'ল এই যে, এটি পরস্পরের সহযোগে মানুষ যে পরিশ্রম করেছে তারই ঘনীভূত রূপ। যে সামগ্রীতে এই বস্তু যত বেশী থাকে, অর্থাৎ যে সামগ্রী তৈরী ক'রতে যত বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, সে সামগ্রীর মূল্যও তত বেশী। বিভিন্ন সামগ্রীর আপেক্ষিক মূল্য নির্ভর করে, সেগুলিতে কতখানি শ্রমশক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আবদ্ধ রয়েছে তার উপর"।

মার্কসের পূর্ব্বগামী অর্থতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে এ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রভৃতি অনেক নামজাদা লেখকের লেখায় অনুরূপ সিদ্ধান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ্যাডাম স্মিথ লিখেছেন—"It is natural that what is usually the produce of two days' labour or two hours' labour should be worth double what is usually the produce of one day's, or one hour's labour"—অর্থাৎ "এটাই স্বাভাবিক যে, যে জিনিষ তৈরী ক'রতে সচরাচর দুই দিনের বা দুই ঘণ্টার পরিশ্রম লাগে, তার দাম, যে জিনিষ তৈরী ক'রতে সচরাচর এক দিনের বা এক ঘণ্টার পরিশ্রম লাগে তার দ্বিগুণ হবে।

(২)

এ সিদ্ধান্ত কেন সমর্থনযোগ্য নয়।

আপাতদৃষ্টিতে, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্ব-প্রকাশ সত্য বলে মনে হয়। বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে জিনিস তৈরী ক'রতে বেশী পরিশ্রম লাগে সে জিনিষের দর বেশী, এবং যে জিনিষে কম লাগে তার দর কম, এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়। একখানা পালিস না করা চেয়ার আর একখানা পালিস করা চেয়ারের দামে যে পার্থক্য, ধান আর ঢেঁকি ছাঁটা চালের দামে যে পার্থক্য, গম আর যাঁতায় ভাঙ্গা আটার দামে যে পার্থক্য, কাপড়ের দাম আর তৈরী জামার দামে যে পার্থক্য, এ সবগুলিই যে প্রধানতঃ, যে অতিরিক্ত পরিশ্রম খরচ হয় তার জন্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তা হ'লেও আধুনিক যুগে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, বাজারে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের দামে যে পার্থক্য দেখা যায়, তার কারণ নির্দ্দেশ করা এত সহজ নয়। যুক্তির দিক দিয়ে আপেক্ষিক শ্রমশক্তির সিদ্ধান্ত কত ছিদ্রপূর্ণ তা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। অ্যাডাম স্মিথ বা রিকার্ডোর মত বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদর্শী অর্থতত্ত্ববিদগণ যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তার প্রধান কারণ, তাঁদের সময়ে বিভিন্ন সামগ্রীর আপেক্ষিক মূল্যের সহিত, নিযুক্ত শ্রমশক্তির আপেক্ষিক পরিমাণের, সত্যই একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য ছিল। তখনও যন্ত্রযুগের প্রথমাবস্থা। এখনকার মাপের অতিকায় শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের কাছাকাছি কিছু তখনও হয় নি। এখনকার দিনের ভোগ্যবস্তুর বৈচিত্র ও বিপুল পরিমাণ তখন কল্পনারও অতীত ছিল। তখনকার দিনের বেশীর ভাগ নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রী স্থানীয় কাঁচা মাল দিয়ে স্থানীয় লোকজনের দ্বারা ছোট ছোট কারখানায় তৈরী হ'ত। যন্ত্রপাতি যা ব্যবহার হ'ত তা সামান্য রকমের, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হাতিয়ার ছাড়া অন্য নামের অযোগ্য ছিল। বিত্তসৃষ্টির প্রধান কৃতিত্ব ছিল কারুশিল্পীর। প্রধানতঃ তারই শিক্ষা, অভিজ্ঞতা

ও পরিশ্রমের উপর, তৈরী জিনিষের গুণ ও পরিমাণ নির্ভর ক'রত। এরকম অবস্থায় দামের সঙ্গে শ্রমের পরিমাণের একটি নিকট সম্বন্ধ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন জিনিষ তৈরী হয় যন্ত্রে। শ্রমিকের কাজ, তার পরিচর্য্যা করা। শুধু মূলধনের কথা নয়; এখনকার বৈষয়িক জীবনে শিল্পপতির, পরিচালকবর্গের ও বণিকের দানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। তা ছাড়া আজকাল অনেক মাল তৈরী হয়, দূরদেশের বাজারের জন্য। অনেক জিনিষ, আবার, অত্যন্ত ঘুরপথে তৈরী হয়। তৈরীর কাজের প্রথম পর্ব্ব থেকে শেষ পর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক সময়ে তিন চার বৎসর কি তার চেয়েও বেশী লাগতে পারে। অতএব, লোকসানের ঝুকি নেওয়া এখনকার বৈষয়িক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এরকম ক্ষেত্রে পরিশ্রম শব্দটিকে একটি সম্পূর্ণ নূতন অর্থে ব্যবহার না করলে, পরিশ্রমের পরিমাণ দিয়ে মূল্যের পরিমাণ বোঝাবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

"মূল্যের কারণ, নিযুক্ত শ্রমশক্তির পরিমাণ" এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেখান যায়, তার বেশীর ভাগ "তৈরী খরচার সিদ্ধান্তের" বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। অতএব সেগুলি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। এখানে কেবল দুটি বিশেষ আপত্তির কথা বলা হবে।

১। সিদ্ধান্তটি এই যে বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করতে যে পরিশ্রম লাগে তারই অনুপাতে তাদের মূল্য স্থির হয়। অতএব ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, ভিন্ন ভিন্ন কাজে যে পরিশ্রম লাগে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু, তা কি সত্য? যে সব বস্তু সমধর্ম্মী নয়, অর্থাৎ যাদের মধ্যে কোন সাধারণ বিশেষত্ব নেই, তাদের তুলনা করা চলে না। আমরা যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকার চেষ্টাকে 'পরিশ্রম' এই সাধারণ শব্দ দ্বারা অভিহিত করি, তারা অনেক সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধর্ম্মী। অতএব, তাদের তুলনা করা অসম্ভব। একজন রাজমিস্ত্রী তুলি নিয়ে ও রং নিয়ে দেয়ালে কলি দিচ্ছে। আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলি নিয়ে ও রং নিয়ে ছবি আঁকছেন। এই দুরকম চেষ্টার তুলনা কি করে সম্ভব? কোন্ ভিত্তিতে তুলনা হবে? সময়ের ভিত্তিতে? দুটি কাজই যদি দুঘণ্টা ধরে করা হয়, তা হ'লে কি বুঝতে হবে যে তাদের মূল্য সমান হবে? লোকে কি সমান মূল্য দিয়ে থাকে?

'পরিশ্রম' শব্দটি দিয়ে নিশ্চয়ই শুধু শারীরিক পরিশ্রম বোঝান হচ্ছে না। কারণ তা হ'লে যারা পরিচালনার কাজ করে, কিংবা যন্ত্র উদ্ভাবন করে, তাদের কাজকে বাদ দিতে হয়। অতএব, শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রম, এই দুরকম পরিশ্রমের পরিমাণগত তুলনা ক'রতে পারা চাই। একটু ভাবলেই বোঝা যায়, এ কাজ একেবারেই অসম্ভব। আমরা যদি শুধু শারীরিক পরিশ্রমেরই হিসাব করি,

তা'হলেও মুস্কিল কম নয়। অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ শিক্ষানবিশ এবং শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগর, এ দুজনের কাজের তুলনা কি ক'রে করা হবে? যে মাটি কাটছে, আর যে ঘড়ি তৈরী ক'রছে, তাদের পরিশ্রম কি ক'রে তুলনা করা হবে? আসল কথা হ'ল এই যে, এক রকম কাজের সঙ্গে আর এক রকম কাজের প্রকৃতিগত পার্থক্য এত বেশী যে তাদের কোন সাধারণ মাত্রার হিসাবে তুলনা করা চলে না।

মার্কস্ যে তাঁর সিদ্ধান্তের এই গলদ ধ'রতে পারেন নি, তা নয়। কারণ, তিনি লিখেছেন, "It must not be inferred that under this theory, the lazier or clumsier the man, the more valuable his commodity, since the time required by a lazy man to produce a commodity is greater than that required by the more skilled." অর্থাৎ, "এই সিদ্ধান্তে এ কথা বোঝাচ্ছে না যে, যে শ্রমিক যত অলস ও আনাড়ি হবে, তার কাজের দাম তত বেশী হবে, যেহেতু কর্ম্মপটু শ্রমিকের চেয়ে তার সময় বেশী লাগবে"। তবে, তিনি এই গলদ শোধরাবার যে চেষ্টা করেছেন সেটি সার্থক হয়েছে বলা চলে না। তিনি লিখেছেন, "in saying that the value of a commodity is determined by the quantity of labuor worked or crystallised in it, we mean the quantity of labour necessary for its production in a given state of society, under certain social average conditions of production, with a given social average intensity, and average skill of the labour employed.' অর্থাৎ, "কোন সামগ্রী তৈরী ক'রতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করা হয় ও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ঠ করা হয়, তাই দিয়ে তার দাম স্থির হয়" এই কথা বলাতে আমরা এই জিনিষটি বোঝাতে চাই যে, সমাজের একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থায়, সাধারণতঃ যে আবেষ্টনীর মধ্যে পণ্য-প্রস্তুতির কাজ চলে, এবং গড়ে যে কর্ম্ম-নিষ্ঠা ও নিপুণতার সহিত পরিশ্রম করা হয়, সেই রকম পরিশ্রমের যতখানি প্রয়োজন হয়, তাহার দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয়"। তা হ'লে, বাস্তবিক যে পরিশ্রম প্রয়োগ করা হয়েছে তার হিসাব নেবার কথা হচ্ছে না। তার বদলে, বাস্তব জগতে যার কখনও দেখা মেলে না, এমন একটি বিশেষ প্রকৃতির পরিশ্রম কল্পনা করে নিতে হবে। লক্ষ লক্ষ লোকে, গড়ে যে সুযোগ সুবিধা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করে, এবং গড়ে যে কর্ম্মনিষ্ঠা ও নিপুণতার সহিত কাজ করে, সেই রকম সুযোগ সুবিধার মধ্যে, সেইরকম কর্ম্মনিষ্ঠা ও নিপুণতার সহিত যদি কেউ কাজ করে, তা হ'লে তার পরিশ্রমকে হিসাবের মাত্রা হিসাবে ব্যবহার করতে

হবে। এই কল্পিত পরিশ্রম, যে কাজে যত পরিমাণে প্রয়োজন হ'বে, তার মূল্যও সেই রকম হবে। এত কষ্ট-কল্পনার ফল কি হ'ল? গড় কষতে হলেই তুলনা করা দরকার। কিন্তু আমাদের আপত্তি হচ্ছে, বিভিন্ন রকমের পরিশ্রম তুলনা করা যায় না। অতএব গলদ আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই রইল।

মার্কস্ আর এক জায়গায় লিখেছেন যে, যার হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন রকম, পরিশ্রমের মাপ করতে হবে, সেটি হচ্ছে "simple abstract human labour'। এর'ও কোন বাস্তব সত্তা নেই, এবং স্পষ্ট ধারণা সম্ভব নয়। "Human labour" মানে মানুষের পরিশ্রম। 'Simple' এই বিশেষণটি প্রয়োগ করাতে এই বোঝাতে পারে যে, সে পরিশ্রমের কোন নিজস্ব গুণ নেই, অর্থাৎ সেটি সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত শুধু পরিশ্রম হিসাবে কল্পনা ক'রতে হবে। 'Abstract' বল্‌তে বোঝায়, যা চোখ, কাণ, নাক প্রভৃতি দিয়ে অনুভব করা যায় না, অর্থাৎ যাকে কেবল মন দিয়ে উপলব্ধি ক'রতে হয়। অতএব 'Simple abstract human labour' বাক্যটি অনুবাদ ক'রলে দাঁড়ায়, "নির্ব্বিশেষ মনোগ্রাহ্য পরিশ্রম"। এর মানে কি? শুধু কতকগুলি কথা সাজিয়ে বসালেই তার মানে হয় না।

তারপর যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় যে, গড়ের পরিশ্রমের কি নির্ব্বিশেষ পরিশ্রমের একটা স্পষ্ট ধারনা করা সম্ভব, তা হলেও আসল সমস্যার কোন সমাধান হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রের বিভিন্ন রকমের পরিশ্রমকে কি হিসাবে এই কল্পিত পরিশ্রমে পরিণত করা হবে? যে এক ঘণ্টা লেদ্‌যন্ত্রে কাজ করেছে তার পরিশ্রমকে ক' ঘণ্টার গড়ের পরিশ্রম কিংবা নির্ব্বিশেষ পরিশ্রমের সমান ব'লে গণ্য করা হবে? সেই রকম, যে তাঁত চালাচ্ছে, যে ঘড়ি মেরামত ক'রছে, যে এয়ারো-প্লেনের ইঞ্জিন তৈরী ক'রছে, যে রেডিও মারফৎ সংবাদ আদান প্রদান ক'রছে, যে কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রের নক্‌সা তৈরী ক'রছে, এই সব লোকের এক এক ঘণ্টার কাজ, কত ঘণ্টার গড়ের পরিশ্রম বা নির্ব্বিশেষ পরিশ্রমের সমান ধরা হবে? মার্কসের উত্তর হচ্ছে, এটা শ্রমিকদের চোখের আড়ালে আপনা আপনি ঠিক হয়। তার একমাত্র অর্থ এই হতে পারে যে, বাজারে দর কষাকষির ভেতর দিয়ে ঠিক হয়। তা' হ'লে যুক্তিটা দাঁড়াল এই যে, বিভিন্ন সামগ্রীর আপেক্ষিক মূল্য স্থির হয় কোন্‌টি তৈরী ক'রতে কত পরিশ্রম লেগেছে, তার উপর; আবার কোন্‌টিতে কত পরিশ্রম লেগেছে তার হিসাব হয় তাদের আপেক্ষিক মূল্য দিয়ে। অর্থাৎ, মূল্য দ্বারাই মূল্য স্থির হয়।

২। দ্বিতীয় আপত্তিটি এই যে এই সিদ্ধান্তে শ্রমিকের পরিশ্রমের সার্থকতা যে অনেকাংশে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনী সরঞ্জামের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর-

করে, এই কথাটি উপেক্ষা করা হয়েছে। যে লোক আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাপড়ের কলে কাপড় বুনছে, আর যে লোক পল্লীগ্রামে ব'সে পুরোনো ধরণের তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনছে, এদের দুজনের পরিশ্রমের ফল সমান নয়। প্রথম লোকটির ৮ খানা ধুতি বুনতে হয়ত ১ দিন সময় লাগে; এবং দ্বিতীয় লোকটির সেই জায়গায় হয়ত ৪ দিন লাগে। তাতে করে তাঁতের কাপড়ের দাম মিলের কাপড়ের দামের ৪ গুণ হয় না। মার্কস্ এ আপত্তির এই উত্তর দিয়েছেন যে, কোন জিনিষ তৈরী করতে কত পরিশ্রম লেগেছে, তার হিসাব করবার সময়, শেষ যে লোকটি কাজ করেছে, শুধু তার পরিশ্রমটিরই হিসাব নিলে চলবে না; যন্ত্রপাতি তৈরী, কাঁচা মাল তৈরী প্রভৃতি গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ধাপে ধাপে যাবতীয় কাজ দরকার হয়েছে, এই সমস্ত কাজে যত পরিশ্রম করা হয়েছে, সবটুকু হিসাবের মধ্যে ধ'রতে হবে। তিনি লিখেছেন, "The value of a certain amount of cotton yarn is the crystallisation of the quantity of labour added to the cotton during the spinning process, the quantity of labour previously realised in the cotton itself, the quantity of labour realised in the coal, oil, and other auxiliary substancess used, the quantity of labour fixed in the steam engine, the spindles, the factory building, and so forth', অর্থাৎ, একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূতার মূল্য যত পরিমাণ পরিশ্রমের ঘনীভূত রূপ, তার হিসাব করতে হ'লে সেই হিসাবের মধ্যে নিতে হবে—যে পরিশ্রম তুলাকে সুতায় পরিণত করার কাজে লেগেছে; তার আগে যে পরিশ্রম তুলার রূপ পরিগ্রহ করেছিল; কয়লা, তেল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীতে যে পরিশ্রম রূপান্তরিত হয়েছে; এবং যে পরিশ্রম ষ্টীম এঞ্জিনে, কলের চরখায়, কারখানার বাড়ীতে এবং অন্যান্য জিনিষে নিবদ্ধ হয়েছে এই সমুদয় পরিশ্রম। মার্কসের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যে সমস্ত জিনিষ মূলধনী সামগ্রী নামে পরিচিত, সেগুলিকে মানুষের পরিশ্রম থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই—সেগুলি পরিশ্রমেরই ফল। অতএব, সেগুলির আসল পরিচয় হচ্ছে, সেগুলি সঞ্চিত পরিশ্রম। অর্থাৎ, মূলধনী সামগ্রীগুলি ঘণীভূত সার্থকীকৃত পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কসের এই বিচারের মধ্যে যে একটি বড় রকমের সত্য নিহিত আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায়, অনেক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোকেরও মূলধন সম্বন্ধে একটা ঘোলাটে ধারনা আছে। তাঁদের ভাবটা হচ্ছে এই যে, দেশের চেহারা ফিরিয়ে দেবার জন্য আসলে যা দরকার, সেটি হচ্ছে কোন রকমে বেশ খানিকটা বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করা। দেশের শ্রী সম্পদের

আসল ভিত্তি যে দেশের লোকের পরিশ্রম, এই কথাটি জোর ক'রে, এবং বার বার বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু মূলধনী সামগ্রী তৈরী করার কাজে শ্রমিকের ছাড়া আর কারও কোন দান নেই, এ কথা বল্‌লে ভুল হবে। কোন মূলধনী সামগ্রীর তৈরীর কাজ যেমন সুরু থেকে ধাপে ধাপে এগোতে থাকে, প্রত্যেক ধাপে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করে, তারা কেউ সদ্যভোগ্য জিনিষ তৈরী করে না; অতএব, তারা যে জিনিষ তৈরী করছে, তার বিনিময়ে, তাদের সদ্যভোগ্য জিনিষ পাবার কথা নয়। অথচ তাদের তখনই খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি নানা রকম সদ্যভোগ্য জিনিষের প্রয়োজন। তারা যে এ জিনিষগুলি পায় তার কারণ হচ্ছে, অন্য কতকগুলি লোক, যাদের অর্থ আছে, এবং যাদের এই অর্থের বিনিময়ে নিজেদের ভোগের জন্য সদ্যভোগ্য জিনিষ সংগ্রহ করবার অধিকার আছে, তারা তা না ক'রে, কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে; এবং সেই অর্থ উপরোক্ত শ্রমিকদের পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হয়। যদি এই অর্থ সঞ্চিত না হত, অর্থাৎ যদি কতকগুলি লোক সাময়িকভাবে ভোগের ইচ্ছা সংবরণ না ক'রত, তা হ'লে মূলধনী সামগ্রী তৈরী হতে পারত না। অতএব মূলধনী সামগ্রী তৈরী করার কৃতিত্বের কতক অংশ সঞ্চয়কারীর প্রাপ্য। এখন যতটুকু ভোগ থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে যদি তার চেয়ে একটু বেশী ভোগের সম্ভাবনা না থাকে, তা' হ'লে সঞ্চয়ের আকিঞ্চন হয় না। সেই জন্য, যে টাকা ধার দেয়, সে সুদ চায়। অন্য পক্ষে, এই টাকা কাজে লাগে বলেই, যে ধার নেয়, সে সুদ দিতে রাজী হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মূলধনী সামগ্রীগুলি পরিশ্রমেরই ঘনীভূত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়, এ কথা বল্‌লে ভুল হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মূল্যের কারণ, পণ্য-প্রস্তুতির মোট খরচ

(১)

এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি

এই সিদ্ধান্তে কোন সামগ্রী তৈরী ক'রতে মোট যত খরচ পড়ে, সেইটিকে সেই সামগ্রীর মূল্যের কারণ বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। খরচের হিসাবের মধ্যে সমস্ত রকমের খরচ ধরতে হবে: অর্থাৎ, কাঁচা মাল ও অন্য উপকরণাদির দাম, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, জমি বা অন্য প্রাকৃতিক সম্পদের খাজনা, যে মূলধন খাটচে তার সুদ, এবং ব্যবসায়ে সচরাচর যে হারে লাভ হয় সেই লাভ। এই সমস্ত রকমের খরচ যোগ করে যে অঙ্কটি পাওয়া যাবে, সেইটি হ'ল সেই সামগ্রীর দীর্ঘকালীন দর। আগের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের প্রভেদ এইখানে। আগেরটিতে শুধু পরিশ্রমের পরিমাণের দ্বারা মূল্য-সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টা হয়েছে। এটিতে সব রকম খরচার হিসাব নেওয়া হয়েছে।

বাজারে কোন সামগ্রীর যতখানি যোগান আসে, তার সবটুকু তৈরী করতে সমান খরচ পড়ে না। উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্রাকৃতিক সুযোগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, অভিজ্ঞ কারিগর বা সুদক্ষ পরিচালনার দিক দিয়ে যার সুবিধা যত বেশী, তার তৈরী খরচাও তত কম পড়ে। তৈরী খরচার সিদ্ধান্তে যে খরচের কথা বলা হয়েছে সেটি হ'ল, যে উৎপাদনকারী সবচেয়ে বেশী অসুবিধার মধ্যে তৈরী করার কাজ চালাচ্ছে, তার তৈরী খরচা। এই খরচা দিয়ে দীর্ঘকালীন মূল্য নির্দ্ধারিত হয়।

যে যুক্তির উপর এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত সেটি হল এই যে, যদি কোন সামগ্রী তৈরী খরচার চেয়ে বেশী দরে বিক্রী হ'তে থাকে তা হ'লে যোগানদারেরা অত্যধিক লাভ ক'রতে থাকবে। অতএব তারা যোগান বাড়াবার চেষ্টা ক'রবে, যাতে লাভ আরও বেশী হয়। অন্য ব্যবসায়ের চেয়ে এই ব্যবসায়ে লাভ বেশী হওয়ার দরুণ যারা আগে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল না, তারাও এইদিকে ঝুঁকবে। ফলে যোগানের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। কিন্তু, চাহিদার প্রকৃতি সমান থাকাতে এত উঁচু দরে লোকে সব মালটুকু কিনতে চাইবে না। মাল বাজারে প'ড়ে থাকবে। তখন যোগানদারদের মধ্যে রেষারেষি আরম্ভ হবে, এবং তার ফলে দর নামতে থাকবে; এবং যতদিন না দর আগেকার অঙ্কে ফিরে আসে, ততদিন এই দর কমার ঝোঁক বজায়

থাকবে। সেই সময়, যদি তৈরী খরচার চেয়ে কম দরে বিক্রী হতে থাকে, তা হ'লে যোগান ক্রমশঃ কমতে থাকবে। তার কারণ, যোগানদারদের মধ্যে যাদের তৈরী খরচা অপেক্ষাকৃত বেশী. তাদের আর ব্যবসায়ে লাভ বজায় থাকবে না, এবং কারও কারও খরচাই উঠবে না। অতএব অনেকে এ ব্যবসায় ছেড়ে দেবে; এবং অনেকে আগেকার চেয়ে কম মাল তৈরী করতে থাকবে। ফলে, যোগান কমে যাবে। কিন্তু চাহিদার অবস্থা সমান থাকাতে লোকে আগেকার বেশী দরে যতখানি মাল কিনত, এখনকার কম দরে বরঞ্চ তার চেয়ে বেশী মাল কেনবার চেষ্টা ক'রবে। অতএব বাজারে যোগানে টান পড়বে। তখন খরিদ্দারে খরিদ্দারে রেষারেষি আরম্ভ হবে; এবং তার ফলে দর চড়তে থাকবে। দর যতদিন না আবার পুরোণো অঙ্কে ফিরে আসে, ততদিন এই দর চড়ার ঝোঁক বজায় থাকবে, এবং কালক্রমে দর আবার তৈরী খরচার সমান হবে।

(২)

এ সিদ্ধান্ত কেন সমর্থনযোগ্য নয়।

আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি সমীচীন বলে মনে হ'লেও, বিচার ক'রে দেখলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে অনেকগুলি গুরুতর গলদ আছে। সেইগুলি এবার একে একে উল্লেখ করা হবে। এর মধ্যে অনেকগুলি 'নিযুক্ত শ্রম-শক্তির সিদ্ধান্ত'' সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

১। এই দুটি সিদ্ধান্তেরই প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র যোগানের দিকটাই বিবেচনা করা হয়েছে; চাহিদার দিকটায় মোটেই নজর দেওয়া হয় নি। যে জিনিষ লোকের কোন কাজে লাগে না, সে জিনিষ তৈরী ক'রতে যতই কেন খরচ পড়ুক, বাজারে তার কোন মূল্য নেই। খরিদ্দার যখন মাল কেনে, তখন সে বিচার ক'রে দেখে দামের অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণে উপকার পাবে কি না। মালটি তৈরী ক'রতে কত পরিশ্রম লেগেছে, কি কত খরচ পড়েছে, সে কথা তার কাছে অল্পবিস্তর অবান্তর। যদি, যে মালই তৈরী হ'ক, খরচা পোষায় এমন দরে বিক্রী করা যেত, তা হ'লে ব্যবসায়ে কোন অনিশ্চয়তা থাকত না; এবং এত লোক, ব্যবসা আরম্ভ করবার পর, লোকসান দিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হত না।

২। যদি তৈরী খরচাই মূল্যের একমাত্র কারণ হত, তা হ'লে একই জিনিষের আজ এক রকম দর, কিছুদিন বাদে অন্য রকম দর, এ রকম হ'তে পারত না। কিন্তু এ রকম প্রায়ই হয়।

৩। যে সব দুর্লভ জিনিষ নতুন ক'রে তৈরী করা যায় না, বা তৈরী করা হয় না, সে সব জিনিষ যে দরে বিক্রী হয়, তার সঙ্গে তৈরী খরচার কোন সম্পর্ক নেই। যাদের পুরাতন ডাকটিকিট সংগ্রহ করার সখ আছে তারা অনেক সময়ে সামান্য দামের টিকিট অত্যন্ত বেশী দামে কিনে থাকে। নামজাদা বইএর পাণ্ডুলিপি বা প্রথম সংস্করণের

কপি এক এক সময়ে যে দরে বিক্রয় হয়, তা শুনলে অবাক হতে হয়। এসব জিনিষের দর একমাত্র চাহিদার দ্বারাই স্থির হয়।

৪। একচেটিয়া কারবারী খুসীমত দর স্থির করতে পারে, এবং অনেক ক্ষেত্রে এই দর তৈরী খরচার চেয়ে যথেষ্ট বেশী হয়, কারণ তাতে তার নীট লাভ সবচেয়ে বাড়ান যায়। অতএব একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে তৈরী খরচার সিদ্ধান্ত খাটে না।

আবার এরকমও দেখা যায় যে কোন সামগ্রী দেশে বেশ চড়া দরে বিক্রী করা হচ্ছে; কিন্তু বিদেশে, বাজার দখল করবার জন্য তার চেয়ে অনেক কম দরে বিক্রী করা হচ্ছে। একে ইংরাজীতে বলে Dumping (ডাম্পিং) বা মাল ঢেলে দেওয়ার নীতি। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দু জায়গাতে একই মাল বিক্রয় হচ্ছে। অতএব তাদের তৈরী খরচা এক। অথচ বিভিন্ন দরে বিক্রয় হচ্ছে। তৈরী খরচা যদি মূল্যের একমাত্র কারণ হ'ত তা হ'লে এ রকম হতে পারত না।

৫। যে সব ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক সামগ্রী এক সঙ্গে তৈরী হয়, সে সব ক্ষেত্রে কোনটিরই পৃথক ভাবে তৈরী খরচা নির্দ্ধারণ করা যায় না। যেমন ভেড়ার লোম, চামড়া, মাংস এবং চর্ব্বি। এদের প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা বাজার আছে, এবং প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা দরে বিক্রয় হয়। মেষপালনের সমগ্র খরচা, এই সব কয়টি জিনিষের দাম থেকে তুলতে হবে, এইটুকু মাত্র বলা চলে। কিন্তু কোন্‌টির কত দাম হবে, সে হিসাব তৈরী খরচা থেকে পাবার উপায় নাই।

৬। রেলের ব্যবসায়ে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ নিয়ে যাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন হারে মাশুল আদায় করা হয়। যাত্রীদের বেলাতেও, প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন হারে টিকেটের দাম নেওয়া হয়। ইট, কাট, কয়লা প্রভৃতি ভারী এবং অল্প দামের জিনিষের খুব কম মাশুল ধার্য্য করা হয়। অন্যদিকে মিহি কাপড়, রেশম বা পশমের জিনিষ, সোণা রূপা ইত্যাদি যে সব জিনিষের দাম খুব বেশী, সে সব জিনিষের খুব উঁচু হারে মাশুল ধরা হয়। চাল, ডাল, টাট্‌কা ফল বা সব্জি, ঘি, তেল, চিনি ইত্যাদি, নানা রকম শিল্পজাত সামগ্রী, কল কব্জা, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যত রকম জিনিষ রেলের সাহায্যে আনা-নেওয়া হ'য়ে থাকে সবগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, এবং প্রত্যেক ভাগের আলাদা আলাদা মাশুল ধার্য্য হয়। অত্যন্ত কম দামের জিনিষের উপর বেশী মাশুল দিতে হ'লে, সে জিনিষ দূরদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করা পোষায় না। অতএব সে রকম জিনিষের মাশুল কম করা হয়। যে জিনিষ যত দামী, সে জিনিষে তত মাশুল সয়; অতএব সে জিনিষের তত বেশী মাশুল ধার্য্য করা হয়।

রেল কোম্পানীকে যে কাজের জন্য পয়সা দেওয়া হয়, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সে কাজটি একই। সেটি হচ্ছে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় একটি বোঝা নিয়ে যাওয়া। অতএব রকমারী

জিনিষ নিয়ে যাওয়ার জন্য খরচ কম বেশী হবার কথা নয়। এক গাড়ী কয়লা ১০০ মাইল নিয়ে যেতে যে খরচ পড়ে, এক গাড়ী চিনি ১০০ মাইল নিয়ে যেতে তার কয়েক গুণ বেশী খরচ পড়ে, এরকম কখন হ'তে পারে না। অবশ্য, খরচের তারতম্য মোটেই যে হয় না, তা নয়। কয়লা, খোলা গাড়ীতে নিয়ে যাওয়া যায়। চিনি নিয়ে যাবার জন্য, কুলুপ দেবার বন্দোবস্তঅলা ঢাকা গাড়ী দরকার। কিন্তু এই ধরণের খরচের তারতম্য এত সামান্য, যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। আসলে রেলের ব্যবসায়ে একই কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দর আদায় করা হয়। কেন এ রকম করা হয়, সে প্রশ্নের উত্তর তৈরী খরচার সিদ্ধান্তে পাওয়া যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন হারে মাশুলের ব্যবস্থা ক'রতে হয়, তার দুটি কারণ আছে। প্রথম হচ্ছে', রেল ব্যবসায় চালাবার জন্য যে ভাবে খরচ করতে হয় তাতে করে, কোন একটি বিশেষ চালানের মাল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে দিতে মোট কত খরচ পড়ল, তার হিসাব করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, যদি একই হারে সব রকম মাল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তা হ'লে আয় এত কম হবে যে রেলের খরচা উঠবে না। ফলে, হয় রেল চালান বন্ধ করে দিতে হবে, না হয় বরাবর লোকসান দিয়ে চালান'র ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

রেলের স্থায়ী মূলধনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার হয়, চল্‌তি খরচ বা চল্‌তি আয়ের অনুপাতে সে অর্থ অত্যন্ত বেশী। মাটি কাটা, পুল নির্ম্মাণ করা, লাইন পাতা, ষ্টেশনের বাড়ী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত সংখ্যায় ইঞ্জিন ও গাড়ী সংগ্রহ করা, এই সব কাজ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। চল্‌তি খরচের মধ্যেও একটা বড় অংশ ঠাট বজায় রাখতে দরকার হয়; যেমন ষ্টেশনের কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের মাহিনা, আফিস চালান'র খরচ, বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়র, মিস্ত্রী ইত্যাদির মাহিনা, এই সব। চল্‌তি আয়ের প্রায় শতকরা আশী ভাগ লাগে, স্থায়ী মূলধনের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তার সুদ ও ঠাট বজায় রাখবার খরচ মেটাবার জন্য। ট্রেণের সংখ্যা কমই হ'ক কি বেশীই হ'ক, এই খরচ সমান থাকে। অতএব রেলের মালের পরিমাণ ও যাত্রীর সংখ্যা যত বেশী হয়, ততই এই খরচ চারিয়ে দেওয়া চলে, এবং তার ফলে মণপ্রতি ও মাথাপিছু খরচ তত কম পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু বেশী মাল, বা কিছু বেশী যাত্রী নিয়ে যেতে মোটেই খরচ বেশী লাগে না। একখানা বাড়তি ট্রেণের ব্যবস্থা করলেও, যে বাড়তি খরচ পড়ে, সে অতি সামান্য, এবং তা থেকে মোট খরচের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। রেলকর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করে কিসে মোট আয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হয়। সেই-জন্য তারা, যেখানে যতটা সয় সেইমত মালের মাশুল ও টিকিটের দাম স্থির করে। রেলের এই নীতিকে ইংরাজিতে বলে charging what the traffic can bear বা যেখানে যতটা সয় সেখানে ততটা দাম আদায় করার নীতি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)

আপেক্ষিক উপকারিতার সিদ্ধান্ত।

আগের দুটি সিদ্ধান্তে যেমন কেবল মাত্র যোগানের দিক থেকে মূল্যসমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তে তেমনি কেবল মাত্র চাহিদার দিক্ থেকে মূল্যের কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন সামগ্রীর আপেক্ষিক উপকারিতার দ্বারা তাদের আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। কোন্ মাল তৈরী কর'তে কত পরিশ্রম লেগেছে, কি কত খরচ পড়েছে, সে প্রশ্ন মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক। দাম দেবার কর্ত্তা, ক্রেতা। বাজারে কেউ তাকে কোন জিনিষ কিনতে বাধ্য করে না। সে স্বেচ্ছায় মাল কেনে, এবং তার বদলে দাম দেয়। অতএব দামের কারণের খোঁজ পেতে হ'লে ক্রেতা কেন দাম দেয়, সেইটি বিচার করা দরকার। দাম দেওয়ায় একটা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। অন্যপক্ষে, মাল পাওয়ায় একটা উপকার লাভ হয়। ক্রেতা মনে মনে বিচার করে দেখে, ঐ পরিমাণ উপকারের বদলে কতখানি পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করা চলে, অর্থাৎ কত দাম দেওয়া চলে। ততখানি পর্য্যন্ত দাম সে দিতে রাজী। বিক্রেতার কাজ হচ্ছে, দর কষাকষি করে তার কাছ থেকে সেই দাম আদায় করা। বিক্রেতারা যেহেতু সাধারণতঃ চতুর ও অভিজ্ঞ লোক হয়, সেইহেতু তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই দাম বা এর কাছাকাছি দাম আদায় করতে সমর্থ হয়। ফলে, যে সামগ্রীর উপকারিতা যত বেশী, সে সামগ্রী সেই অনুপাতে তত বেশী দামে বিক্রয় হয়।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে একটি আপত্তি সহজেই মনে আসে। উপকার-বোধ মনের বিষয়। কোন্ জিনিষ থেকে কে কতখানি তৃপ্তি পায় তা নির্ভর করে তার রুচি ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতার উপর। অতএব কতকগুলি লোক একই দামে কোন জিনিষ কিনেছে বলে তারা সকলেই একই রকম এবং একই পরিমাণ উপকার লাভ করেছে, এ কথা বলা চলে না। তা ছাড়া, একই দাম দেওয়াতে সকলেই একই পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছে, একথাও বলা চলে না। কারণ, সকলের সঙ্গতি সমান নয়। এক জনের এক টাকা খরচ ক'রতে যে কষ্ট হয়, আর এক জনের দশ টাকা খরচ করলেও সে কষ্ট হয় না। অতএব দামের পরিমাণ সমান হলেই, যে সব লোক কোন জিনিষ কিনেছে, তাদের উপকারের পরিমাণ বা ত্যাগের পরিমাণ সমান, এ কথা বলা চলে না।

এ যুক্তির বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর আপত্তি আছে। যে জিনিষ যত প্রয়োজনীয় সে জিনিষের দাম তত বেশী হওয়া দূরে থাকুক, বাস্তব জীবনে দেখা যায়, অনেক-গুলি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম খুবই কম, এবং অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম অত্যন্ত বেশী। চাল, ডাল, নুণ প্রভৃতি যে সব জিনিষ জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য, সেগুলি সুলভ। অন্যপক্ষে, হীরা, জহরৎ, রেশমী কাপড়, ভাল ভাল ছবি প্রভৃতি যে সব জিনিষ না হলে এমন কিছু যায় আসে না, সেইগুলিই সবচেয়ে দামী।

যদি 'উপকারিতা' শব্দটির দ্বারা মোট উপকার না বুঝে প্রান্তিক উপকার বোঝা যায়, তা হ'লে আর এ আপত্তির কোন কারণ থাকে না। সেইজন্য, সিদ্ধান্তটি পরিবর্ত্তন ক'রে "প্রান্তিক উপকারের সিদ্ধান্ত" আকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য তার প্রান্তিক উপকার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। খাদ্য শস্যের সমগ্র যোগানের মোট উপকারের সঙ্গে যদি রেশমী কাপড়ের সমগ্র যোগানের মোট উপকারের তুলনা করা হয়, তা হ'লে যে আগেরটি শেষেরটির চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হ'তে পারে না। কিন্তু মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে কোন জিনিষের মোট উপকারের পরিমাণ বিচার ক'রতে হয় না। একটু কম কি একটু বেশী, এই কথাই বিবেচনা করবার প্রয়োজন হয়। খাদ্য শস্যের সমগ্র যোগানের পরিমাণ এত বেশী যে, একটু বাড়তি যোগান থেকে যে বাড়তি তৃপ্তি পাওয়া যায় তা নিতান্তই কম। অন্যপক্ষে, রেশমী কাপড়ের সমগ্র যোগানের পরিমাণ এত কম যে, একটু বাড়তি যোগান থেকে যথেষ্ট পরিমাণ বাড়তি তৃপ্তি পাওয়া যায়। এই কারণে খাদ্য শস্যের দামের চেয়ে রেশমী কাপড়ের দাম এত বেশী।

আমরা প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ক্ষীয়মান উপকারের সূত্র ও চাহিদার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমরা সেই প্রসঙ্গে দেখেছি যে, যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক উপকার কমতে থাকে। সেইজন্য, দর যখন বেশী থাকে তখন লোকে বেশী মাল কেনে না। দর যেমন কমতে থাকে, লোকের ক্রয়ের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। প্রত্যেক খরিদ্দার বিচার করে দেখে যে, কেনার পরিমাণ আরও এক মাত্রা বাড়ালে যে বাড়তি উপকার হবে, সেটি বাড়তি খরচের চেয়ে বেশী কি না। যতক্ষণ এই প্রান্তিক উপকার দামের চেয়ে বেশী থাকবে, ততক্ষণ তার আরও বেশী কেন্‌বার ঝোঁক থাক্‌বে। অতএব, একথা বলা চলে যে, খরিদ্দাররা প্রত্যেকে বাজার দরের মাপে, বিভিন্ন জিনিষ থেকে প্রান্তিক উপকার পায়।

যদি প্রান্তিক উপকারের সিদ্ধান্তে মাত্র এইটুকুই বলা হ'ত যে, মূল্যের পরিমাণ ও প্রান্তিক উপকারের পরিমাণ সব ক্ষেত্রে সমান, তা হ'লে আপত্তি করবার বিশেষ

কোন কারণ থাকত না। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত শুধু এইখানেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। এতে ক'রে মূল্য ও প্রান্তিক উপকারের মধ্যে একটি কার্য্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রান্তিক উপকার মূল্যের কারণ বলেই মূল্যের সমান। কিন্তু যদি বিচার করে দেখা যায়, তা হ'লে এ বাক্য সমর্থন করা যায় না। কারণ প্রান্তিক উপকারের পরিমাণ, নিজেই মূল্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এ দুটির পরস্পর সম্বন্ধ এইভাবে দেখান চলে।
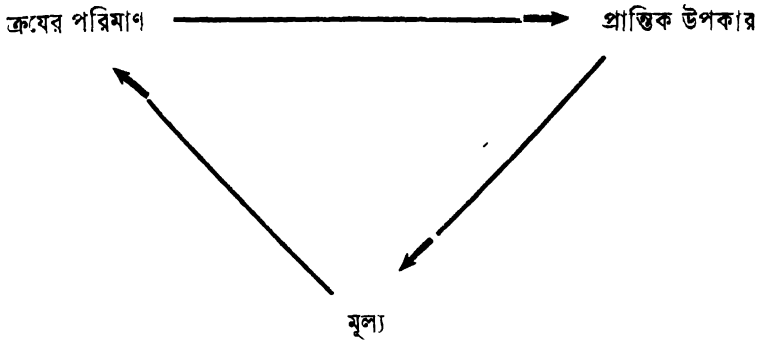
প্রান্তিক উপকার ক্রয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে; ক্রয়ের পরিমাণ কম হ'লে প্রান্তিক উপকার বেশী হয়। ক্রয়ের পরিমাণ যেমন বাড়তে থাকে, প্রান্তিক উপকারও সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। ক্রয়ের পরিমাণ আবার মূল্যের উপর নির্ভর করে। মূল্য কম হ'লে লোকে বেশী পরিমাণে ক্রয় করে। মূল্য বেশী হলে ক্রয়ের পরিমাণ ক'মে যায়। এখন যদি বলা হয়, মূল্যের কারণ প্রান্তিক উপকার, তা হ'লে এই মাত্র প্রতিপন্ন করা হয় যে, মূল্যের কারণ মূল্য নিজেই। অতএব প্রান্তিক উপকারের সিদ্ধান্তে মূল্য-সমস্যার মীমাংসা হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১)

চাহিদা ও যোগানের সূত্র

পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি পরিচ্ছেদে আমরা দেখলাম যে, শুধু চাহিদার দিক থেকে কিংবা শুধু যোগানের দিক থেকে মূল্য-সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা পাওয়া যায় না। আসলে এই দুইটির মিলিত ক্রিয়ার ফলেই মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। অধ্যাপক মার্শাল এই কথাটা বোঝাবার জন্য কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কাঁচির যেমন, মাত্র ওপরের ফলাটি কি নীচের ফলাটি দিয়ে কাটা হচ্ছে, এ কথা বলা চলে না, তেমনি শুধু যোগান কি শুধু চাহিদা দিয়ে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় এ কথাও বলা চলে না। যেখানে একটি ফলাকে স্থির রেখে আর একটি ফলা নাড়িয়ে কাটা হয়, সেখানেও আসলে দুটি ফলার সাহায্যেই কাটা হয়; তেমনি যে ক্ষেত্রে দেখা যায়, তৈরী-খরচা ও চাহিদার তীব্রতার মধ্যে একটি স্থিতিশীল এবং অন্যটি পরিবর্ত্তনশীল, সেখানেও উহাদের মধ্যে কোন একটির দ্বারা একান্তভাবে মূল্য নির্দ্ধারিত হচ্ছে এ কথা বলা চলে না।

মূল্য-নির্দ্ধারণে চাহিদা ও যোগানের মিলিত ক্রিয়া কি ভাবে হয় সেইটি "চাহিদা ও যোগানের সূত্রে" বোঝান হচ্ছে। সূত্রটি এইভাবে ব্যক্ত করা যায়—

"কৃষি ও শিল্পজাত যে সব পণ্য অবাধ প্রতিযোগিতার আওতায় তৈরী ও বিক্রয় হয়, সেগুলির দীর্ঘকালীন দর স্থির হয়, যে সব কারণসমুচয় দ্বারা চাহিদা নির্দ্ধারিত হয় এবং যে সব কারণসমুচয় দ্বারা যোগান নির্দ্ধারিত হয়, এই সমস্ত কারণগুলির যুগপৎ ক্রিয়ার ফলে;

"এবং যতক্ষণ চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণের চেয়ে কম কিংবা বেশী থাকে ততক্ষণ মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা এ দুটির মধ্যে সমতা আনবার চেষ্টা চলে; এবং যে মূল্যে এ দুটির সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই মূল্য স্থিতিশীল হয়;

"পুনশ্চ, এই স্থিতিশীল মূল্য একদিকে পণ্যের তৈরী-খরচার পরিমাণ ও অন্যদিকে উহার প্রান্তিক উপকারের পরিমাণ নির্দ্দেশ করে।"

সূত্রটি ভালভাবে উপলব্ধি ক'রতে হ'লে এর বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

(২)

মূল্য ও চাহিদার পরিমাণ

লোকে জিনিষ কেনে, তা থেকে উপকার পাবার আশায়। মানুষের প্রকৃতি এ রকম যে, কোন জিনিষ পাওয়ার পরিমাণ যত বাড়্তে থাকে আরও পাবার আকিঞ্চন তত কম্তে থাকে। কারণ, যোগানের পরিমাণ যখন একমাত্রা বাড়ে তখন যে বাড়্তি উপকার পাওয়া যায়, আরও এক মাত্রা বাড়্লে তার চেয়ে কম বাড়্তি উপকার পাওয়া যায়; তার পরের মাত্রায় বাড়্তি উপকার আরও কমে যায়; এই রকম। অর্থাৎ যোগানের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, প্রান্তিক উপকারের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেতে থাকে। এইটি ক্ষীয়মাণ উপকারের সূত্র বলে পরিচিত।

এই রকম হয় বলেই, দর বেশী থাক্‌লে লোকে কম কেনে; এবং দর যত কম্তে থাকে, লোকের কেনার পরিমাণও তত বাড়্তে থাকে। যতক্ষণ, আর এক মাত্রা বেশী কিন্‌লে, বাড়্তি উপকার মূল্যের চেয়ে বেশী হবার সম্ভাবনা থাক্‌বে, ততক্ষণ লোকে কেনার পরিমাণ বাড়িয়ে চলবে। অতএব মূল্যের সঙ্গে প্রত্যেক খরিদ্দারের কেনার পরিমাণের একটি নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। কোন নির্দ্দিষ্ট দরে খরিদ্দারেরা যে যত মাল কিন্‌বে, সেই সবগুলি যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেইটি, বাজারের সেই দরে সেই মালের মোট চাহিদার পরিমাণ। কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে বাজারের কোন মালের চাহিদার পরিচয় দিতে হ'লে, দুইটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সংখ্যার সারি দিয়ে এই পরিচয় দেওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—চিনির চাহিদার একটি কল্পিত পরিচয় নীচে দেওয়া হ'ল।

যদি প্রতি মণের দাম হয়	তা হ'লে বিক্রীর পরিমাণ হবে
৪২৲	৩০০ মণ
৪১৲	৩২০ "
৪০৲	৩৫০ "
৩৯৲	৩৭৫ "
৩৮৲	৪১০ "
৩৭৲	৪৫০ "
...	...

এখানে বাঁ দিকের টাকার অঙ্কগুলি ডানদিকের পরিমাণগুলির **চাহিদা-মূল্য** নির্দ্দেশ করছে। অর্থাৎ বাজারে ৩৫০ মণ কাটাতে হ'লে দর ৪০৲ টাকা হওয়া দরকার। বেশী হ'লে, ৩৫০ মণের সমস্তটা বিক্রী হবে না; কিছু পড়ে থাক্‌বে। কম হ'লে, ৩৫০ মণে কুলোবে না; খরিদ্দারেরা আরও চাইবে।

বাজারে কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে কোন জিনিষের চাহিদা কি রকম, সেটি রেখা-চিত্রের সাহায্যেও দেখান যায়। চিত্রটি এই রকম—
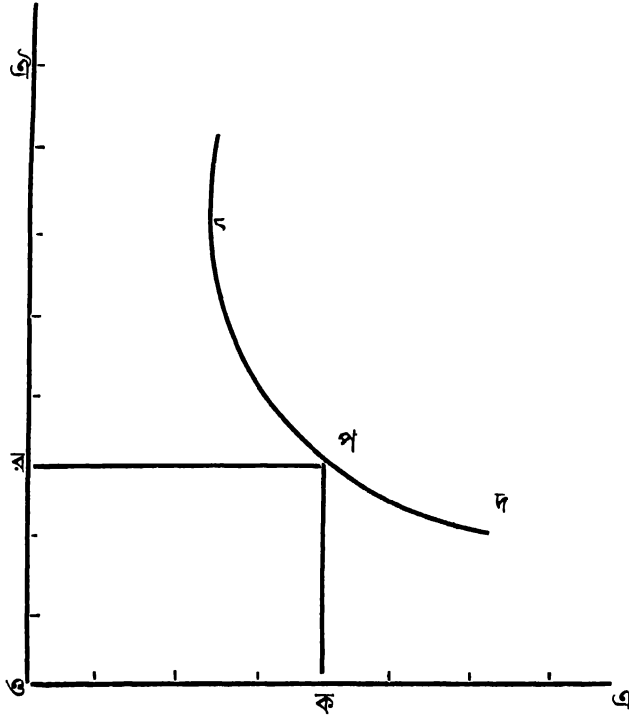
এখানে ওঐ বরাবর প্রতি মণের দর মাপা হচ্ছে। সেই রকম ওএ বরাবর কেনার পরিমাণ মাপা হচ্ছে। "চদ" হ'ল চাহিদার রেখা-চিত্র। এই রেখার ওপর যে কোন একটি বিন্দু 'প' থেকে 'পক' ও 'পর' দুটি খাড়া রেখা যথাক্রমে 'ওএ' ও 'ওঐ'র উপর ফেলিলে এই বোঝায় যে, বাজারে ঠিক্ 'ওক' পরিমাণ কাটাতে হ'লে দর হওয়া চাই 'পক' বা 'ওর'। অর্থাৎ 'ওক' পরিমাণের চাহিদা-মূল্য 'পক'। চাহিদা-রেখার সাধারণ রূপ হচ্ছে এই যে রেখাটি বাঁ দিক্ থেকে ডান দিকে এগোবে, এবং যত এগোবে তত 'ওএ'র কাছে এসে পড়বে। 'চদ' বরাবর 'প' এর সংস্থান সরান'র দরুণ 'পক' যখন বাড়বে, 'ওক' তখন কম্‌বে, এবং 'পক' যখন কম্‌বে, 'ওক' তখন বাড়্‌বে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, বাজারে প্রায় কোন জিনিষেরই চাহিদা বেশীদিন এক রকম থাকে না। দর কম বেশী হওয়ার ফলে যে বিক্রীর পরিমাণ বাড়ে এবং কমে, তাকে চাহিদার পরিবর্ত্তন বলে না। চাহিদার পরিবর্ত্তন হয়েছে বললে এই বোঝায় যে, আগে যে মূল্যে যত পরিমাণ মাল কাট্‌তি হ'ত এখন সেই মূল্যে তার চেয়ে বেশী কিংবা কম হচ্ছে। চাহিদার পরিবর্ত্তন হয় এই কারণে যে, এক জিনিষের চাহিদা অন্য অনেক জিনিষের মূল্যের ওপর নির্ভর করে। উপরে চিনির চাহিদা-সূচক যে সংখ্যা-সারি দেওয়া হয়েছে তাতে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে চিনির দর ৪২৲ টাকা থেকে ৪০৲ টাকায় নাম্‌লে, বিক্রীর পরিমাণ ৩০০ মণ থেকে উঠে ৩৫০ মণ হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি গুড়ের দর তার চেয়ে বেশী হারে নামে, তা হ'লে খানিকটা চিনির প্রয়োজন গুড় দিয়ে মেটান' হবে। ফলে হয়ত চিনির চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, ৩০০ মণের চেয়ে কম হ'য়ে যাবে। আবার চিনির দর কমার সঙ্গে সঙ্গে, যে সব জিনিষের সংযোগে চিনির বহুল ব্যবহার হয়, যেমন চা, ছানা ইত্যাদি, এগুলির কোনটির দর যদি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তা হ'লে লোকে আগেকার চেয়ে অনেক কম পরিমাণে চা এবং মিষ্টান্ন খাবে। অতএব চিনির ব্যবহার ক'মে যাবে, এবং চিনির দর কমা সত্ত্বেও দেখা যাবে যে আগেকার চেয়ে হয়ত কম চিনির কাট্‌তি হচ্ছে।

অতএব চাহিদা-সূচক সংখ্যা-সারি বা রেখা-চিত্রটিকে, কোন নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তের চাহিদার যেন ফটো চিত্র, এইভাবে কল্পনা করতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন দরের সঙ্গে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণের যে সম্বন্ধ দেখান হয়েছে সেটি সত্য বটে, **যদি আর সব কিছু আগেকার মত থাকে।**

(২)

মূল্য ও যোগানের পরিমাণ

দর কম বেশী হ'লে, সঙ্গে সঙ্গে যে চাহিদার পরিবর্ত্তন ঘটে, সেটি যেমন একটি রেখা-চিত্র দিয়ে দেখান যায়, তেম্‌নি যোগানের পরিমাণ যেমন বাড়ান 'কমান' যায়, সঙ্গে সঙ্গে তৈরী খরচার যে পরিবর্ত্তন ঘটে, সেটিও অনুরূপ একটি রেখা-চিত্র দিয়ে দেখান যায়। এ সম্বন্ধে পণ্য-প্রস্তুতির কাজ মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে।

১। চাষ আবাদের কাজ, মাছ ধরার কাজ এবং খনির কাজ। এগুলিকে আহরণ-শিল্প (Extractive industries) বলে।

২। সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে, বাড়ীতে ব'সে বা ছোট ছোট কারখানায়, হাতে জিনিষ তৈরীর কাজ। এগুলিকে হস্ত-শিল্প বা কুটীর-শিল্প (Handicrafts or Cottage industries) বলে।

৩। প্রাকৃতিক শক্তি-চালিত বড় বড় যন্ত্রের সাহায্যে বড় বড় কারখানায় এক সঙ্গে বিপুল পরিমাণে মাল তৈরীর কাজ। এগুলিকে যন্ত্র শিল্প (Manufacturing Industries)

১। আহরণ শিল্পগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ যত বাড়ান'র চেষ্টা করা যায়, তৈরী খরচাও উত্তরোত্তর তত বাড়তে থাকে। দেশে, জমির ফসলের যোগান দুরকমে বাড়ান যায়। বেশী জমির আবাদ ক'রে, এবং একই জমি থেকে আগেকার চেয়ে বেশী ফসল তুলে। এখন, সাধারণতঃ যে সব জমি উর্ব্বর বেশী, কিংবা নদী, রাস্তা বা রেল লাইনের কাছে হওয়াতে কিংবা অন্য কারণে চাষ করার সুবিধা বেশী, সেই সব জমি আগে চাষ করা হয়। অতএব আবাদী জমির পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টা ক'রলে, অপেক্ষাকৃত নিরেশ জমিতে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কাজেকাজেই, এই উপায়ে যে বাড়তি ফসল ফলান যায় তাব তৈরী-খরচা আগেকার চেয়ে বেশী পড়ে। আরও বাড়াতে গেলে, আরও নিরেশ জমিতে যেতে হয়, এবং তৈরী-খরচা আরও বাড়ে। একই জমি থেকে বেশী ফসল তুল্‌তে গেলেও, ফল একই হয়। "ক্ষীয়মাণ ফলনের সূত্রের" আলোচনা আমরা আগেই প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে করেছি। সূত্রটি এই যে, "যদি একখানি জমিতে শ্রমশক্তি ও মূলধন প্রয়োগের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়ান যায়, তা হ'লে প্রান্তিক ফলন ক্রমান্বয়ে ক'মতে থাকে"। ঐ একই কথা তৈরী খরচার হিসাবে এই ভাবে বলা যায় যে, 'যদি একই জমি থেকে ক্রমান্বয়ে বেশী বেশী ফসল তোল্‌বার চেষ্টা করা হয়, তা হ'লে প্রত্যেক বারের বাড়তি খরচা, তার আগের বারের বাড়্‌তি খরচার চেয়ে বেশী পড়ে।" অর্থাৎ, যদি দেখা যায় যে, এখন একখানা জমি থেকে ১০/ মণ ফসল তুলতে ৫০৲ টাকা খরচ পড়্‌ছে, তা' হ'লে পরের বছরে যদি ১১/ মণ ফসল তুল্‌তে হয় তা হ'লে বাড়্‌তি খরচ হয়ত প'ড়বে ৭৲; তার মানে, ১১/ মণের জন্য মোট খরচ পড়্‌বে ৫০৲+৭৲=৫৭৲ টাকা। তার পরের বছরে যদি ১২/ মণ তুল্‌তে হয়, তা হ'লে বাড়তি খরচ ৭৲ টাকার চেয়ে বেশী পড়্‌বে। ধরা যাক্ সেটা ৮৲ টাকা। তা হ'লে ১২/ মণের জন্য মোট খরচ ৫০৲+৭৲+৮৲=৬৫৲। ৭৲ টাকাটা হ'ল ১১/ মণের প্রান্তিক খরচ। তেমনি ৮৲ টাকা হ'ল ১২/ মণের প্রান্তিক খরচ। অতএব, সূত্রটি দাঁড়াল এই যে, একই জমি থেকে বেশী বেশী ফসল তুল্‌তে গেলে প্রান্তিক তৈরী খরচ ক্রমশঃই বাড়্‌তে থাকে।

দেশে, জমির ফসলের যোগান বাড়াবার দুটি উপায়েতেই দেখা গেল যে, প্রান্তিক তৈরী খরচা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কি পরিমাণ যোগানের কত প্রান্তিক তৈরী-খরচা পড়ে, সেটি একটি রেখা-চিত্র দিয়ে এইভাবে দেখান যায়—

১নং চিত্র
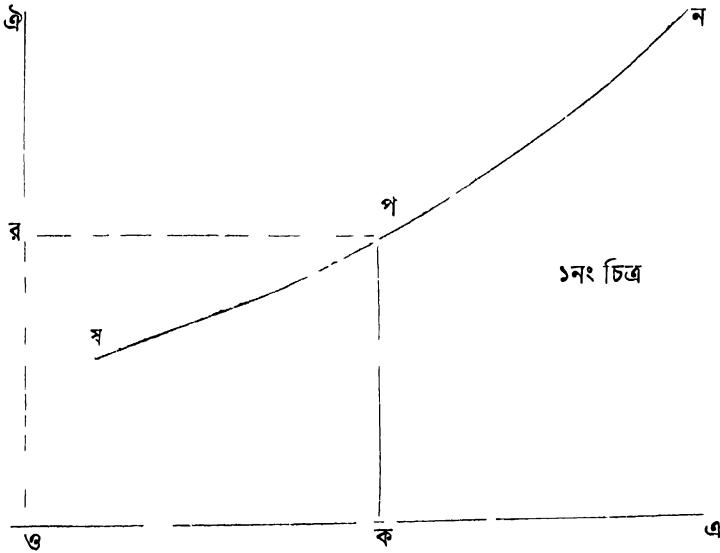
এখানে **'ওএ'** বরাবর যোগানের পরিমাণ মাপা হয়েছে, এবং **'ওঐ'** বরাবর প্রান্তিক তৈরী-খরচা মাপা হয়েছে। **'যন'** হ'ল যোগান-রেখা। 'যন'এর ওপর কোন বিন্দু **'প'** নিয়ে যদি তাই থেকে 'ওএ' ও 'ওঐ'র ওপর যথাক্রমে দুটি খাড়া রেখা **'পক'** এবং **'পর'** ফেলা যায় তা হলে এই বোঝায় যে, যোগানের পরিমাণ যখন **'ওক'** হয় তখন প্রান্তিক তৈরী-খরচা পড়ে **'পক'** বা **'ওর'**।

যোগান-রেখার সাধারণ রূপ হ'ল এই যে, এটি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এগোবে, এবং যত এগোবে তত 'ওএ' থেকে দূরে উঠতে থাকবে। অর্থাৎ, **'ওক'** বাড়ালে সঙ্গে সঙ্গে **'ওর'** বাড়বে; **'ওক'** ক'মলে সঙ্গে সঙ্গে **'ওর'** ক'মবে। অবশ্য, একটি অপরটির সমান অনুপাতে বাড়বে কিংবা ক'মবে তার কোন মানে নেই। হ্রাস-বৃদ্ধির হার বিভিন্ন পণ্যের বিভিন্ন রকম হ'য়ে থাকে।

যোগান-রেখা থেকে, যোগানের পরিমাণের সঙ্গে মূল্যের কি সম্বন্ধ সেটি বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। **'ওক'** পরিমাণ যোগান পেতে হ'লে, মূল্য **'ওর'** হওয়া চাই। তার চেয়ে কম হ'লে, **'ওক'**এর শেষ অংশটুকু তৈরী করা পোষাবে না, এবং সেইজন্য তৈরীও হবে না। তার চেয়ে বেশী হ'লে, **'ওক'** পরিমাণের চেয়ে আরও বেশী যোগান দেওয়া পোষাবে, এবং সেইজন্য দেওয়াও হবে। যে পরিমাণ যোগান

দরকার, মূল্য সেই পরিমাণের প্রান্তিক তৈরী-খরচার সমান হওয়া চাই। মূল্য বাড়লে যোগান বাড়ে; মূল্য কমলে যোগান কমে।

যোগান রেখা দিয়ে, যোগানের পরিমাণ কত হ'লে প্রান্তিক তৈরী-খরচা কত পড়ে সে খবর যেমন দেওয়া হচ্ছে, মূল্য কত হ'লে যোগানের পরিমাণ কত হয় সে খবরও দেওয়া হচ্ছে। **'ওঐ'** বরাবর তখন মূল্য মাপা হচ্ছে, এই রকম ধরতে হবে।

২। হস্ত-শিল্পে বা কুটীর-শিল্পে যে সব জিনিষ তৈরী হয়, তার যোগানের পরিমাণ যাই হ'ক না কেন, মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচা অল্পবিস্তর সমান থাকে। অবশ্য, হঠাৎ যদি কোন জিনিষের যোগানের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াবার চেষ্টা করা যায় তা হ'লে সাময়িকভাবে তৈরী-খরচা বাড়্‌তে পাবে। তার কারণ কারিগরদের বেশী-ক্ষণ কাজ করাতে রাজী ক'রতে হ'লে পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হ'তে পারে। হয়ত ভাঙ্গাচোরা যন্ত্রপাতিও তাড়াতাড়ি কাজ-চলা মত মেরামত ক'রে কাজে লাগান দরকার হ'তে পারে। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই নূতন নূতন কারিগর তৈরী হ'য়ে উঠ্‌বে, এবং নূতন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে। তখন তৈরী-খরচা আগে যা ছিল, আবার তাই হবে।

এই সব জিনিষের যোগান-রেখা হবে, **'ওএ'** রেখার সমান্তরালবর্ত্তী একটি সরল রেখা। ২ নং চিত্রে সেটি দেখান হয়েছে। এখানে 'ওক' যতই বাড়ুক কিংবা কমুক **'পক'** বা **'ওর'** বদ্‌লায় না। **'পক'** এখানে আর প্রান্তিক তৈরী-খরচা নয়; প্রত্যেক মাত্রার তৈরী-খরচা।
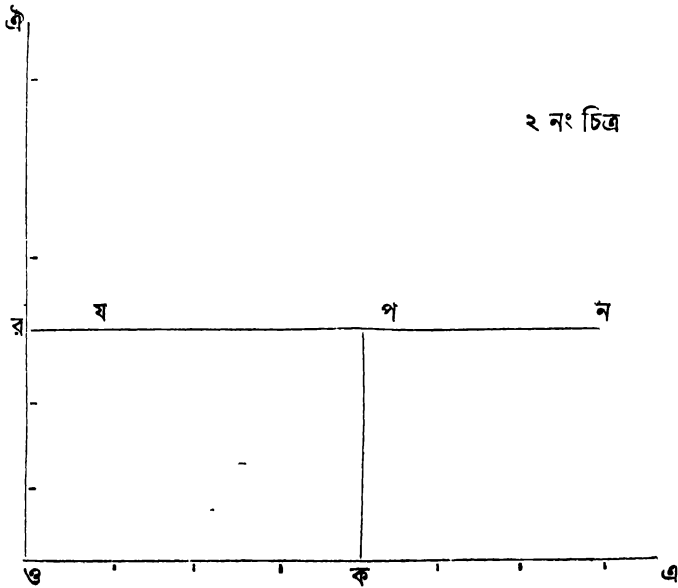
৩। যন্ত্র-শিল্পে, বেশী বেশী মাল তৈরী ক'রলে, মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচা ক্রমশঃ ক'মতে থাকে। তার কারণ, মাল তৈরী ক'রতে যে যে বাবদ্ খরচা ক'রতে হয়, তৈরীর পরিমাণ বাড়ালে তার সবগুলিতে সেই অনুপাতে খরচ বাড়ে না। অবশ্য কাঁচা মাল বাবদ্ যে খরচ ক'রতে হয়, সে খরচ সমান অনুপাতেই বাড়্বে। তেমনি, কাঁচা মালকে তৈরী-মালে রূপান্তরিত ক'রতে যে সব শ্রমিক ও কারিগরদের সাহায্য প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োজন হয় তাদের পারিশ্রমিক বাবদ্ যে খরচ, সে খরচও সমান অনুপাতে বাড়্বে। এই রকম আরও দু এক বাবদে খরচ হয়, যা সমান অনুপাতে বাড়ে। এই সমস্ত খরচের সমষ্টিকে মাল তৈরীর **প্রত্যক্ষ** বা **মুখ্য খরচ** (Prime cost) বলে। কিন্তু, মাত্র এই খরচটুকু ক'রলেই মাল তৈরী হয় না। তার জন্য এ ছাড়া অনেক কিছু খরচ করা দরকার হয়। 'ম্যানেজার', 'ফোরম্যান', 'ইন্‌স্‌পেক্টর' প্রভৃতি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মাহিনা দিতে হয়; বাড়ীর ভাড়া এবং জমি ও খনির খাজনা দিতে হয়; ট্যাক্স দিতে হয়; ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়ম দিতে হয়; এবং বাড়ী ও যন্ত্রপাতির ক্ষয়-পূরণ বাবদ্ কিছু কিছু টাকা সরিয়ে রাখ্‌তে হয়। এ ছাড়া মাল বিক্রীর ব্যবস্থা আছে, এবং আফিস চালান'র যাবতীয় খরচ আছে। এই সব খরচের সমষ্টিকে **ঠাট-খরচ** বা **আনুসঙ্গিক খরচ** (Overhead expenses or supplementary cost) বলে। অনেক ক্ষেত্রে এই অংশটিই মোট খরচের প্রধান অংশ হ'য়ে দাঁড়ায়। বেশী বা কম পরিমাণে মাল তৈরী ক'রলে, এই আনুষঙ্গিক খরচের বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে না। মালের পরিমাণ যত বেশী হয়, এই খরচ তত বেশী চারিয়ে দেওয়া যায়। ফলে, মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচা তত কম পড়ে। বড় কারখানায় তৈরী-খরচা কম পড়্‌বার আরও একটি কারণ আছে। যত বেশী মাল তৈরী করা যায় তত সূক্ষ্ম কর্ম্ম-বিভাগের সুযোগ বেশী পাওয়া যায়। প্রত্যেক ছোট ছোট প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নিযুক্ত করা যায়, ও বিশেষ উপযোগী যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। তাতে কম খরচে বেশী কাজ পাওয়া যায়। তেম্‌নি, পরিচালনার কাজেও কর্ম্ম-বিভাগ নীতি প্রয়োগ করা যায়। তা ছাড়া, মাল আনা নেওয়ার ব্যবস্থায় ও মাল বিক্রীর ব্যবস্থাতেও খরচ কমান যায়। অনেক সময়ে আবার ফেল্‌না জিনিষ কাজে লাগিয়ে কিছু বাড়্‌তি লাভের ব্যবস্থা করা যায়।

এই সব কারণে যন্ত্র-শিল্প-জাত সামগ্রীর যোগানের পরিমাণ বাড়ালে মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচা কমতে থাকে। এ ক্ষেত্রে যোগান-রেখার সাধারণ রূপ কি রকম হবে, ৩ নং চিত্রে দেখান হয়েছে।

৩নং চিত্র
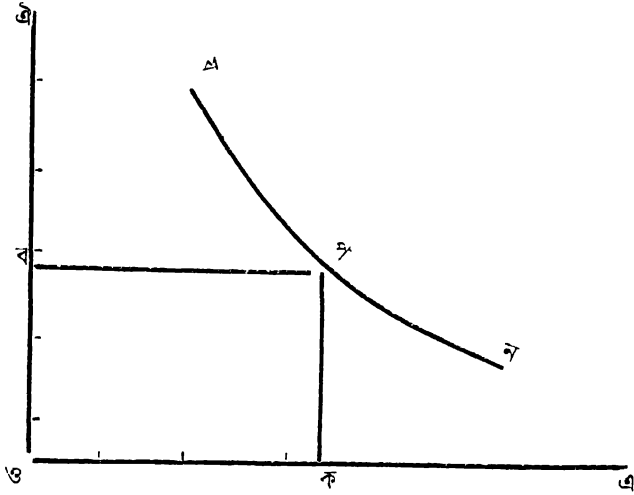
এখানে দেখান হয়েছে, যে বাজারে যোগানের পরিমাণ যখন **'ওক'** হয়, তখন মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচা পড়ে **'পক'**। **'ওক'** বাড়ালে **'পক'** কমে, অর্থাৎ যোগান বাড়ালে তৈরী-খরচা কমতে থাকে। অবশ্য, তৈরী খরচার মধ্যে বাজার-চলতি লাভও ধরা আছে। কারণ, চলতি হারে লাভ না হ'লে কোন কারবার বেশী দিন টি'কে থাকে না; এবং তা না হ'লে যোগানও বজায় থাকে না। বাজারে **'ওক'** পরিমাণ যোগান দিলে যদি সমস্তটুকু **'পক'** দরে নিয়মিতভাবে বিক্রী হয়ে যায়, তা হ'লে **'ওক'** পরিমাণ যোগান বজায় রাখা পোষাবে; অতএব নিয়মিতভাবে এই পরিমাণ যোগান আসবে।

প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (Representative firm)

বাজারে যে মাল আসে তার সবটুকু একটি কারখানায় তৈরী হয় না। অনেক-গুলি প্রতিষ্ঠানে স্বতন্ত্রভাবে মাল তৈরী হয়; এবং তাদের প্রত্যেকটিতে যে পরিমাণ তৈরী হয় সেগুলির সমষ্টি দিয়ে বাজারের মোট যোগানের পরিমাণ ঠিক হয়। যখন বলা হচ্ছে, বাজারে **'ওক'** পরিমাণ যোগান এলে তার মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচা পড়ে **'পক,'** তখন কোন্ প্রতিষ্ঠানের তৈরী-খরচা বোঝান হচ্ছে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। যে সব প্রতিষ্ঠান ঐ বাজারে মাল সরবরাহ করে তাদের প্রত্যেকটিরই তৈরী-খরচা **'পক,'** এ রকম মনে ক'রলে ভুল হবে। প্রায় ক্ষেত্রেই

এমন দুটি চারটি প্রতিষ্ঠান থাকে যাদের অতি আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারের দরুন কিংবা অতি নিপুণ কারিগর বা পরিচালক থাকার দরুন, কিংবা অন্য কোন বিশেষ কারণে, বেশীর ভাগ প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে তৈরী-খরচা কম পড়ে। বাজারের মূল্য নিৰ্দ্ধারণে এই রকম অসামান্য-সুবিধা-ভোগী প্রতিষ্ঠানের তৈরী-খরচার বিশেষ কোন প্রভাব নাই। তারা, বাজার দরে মাল বিক্রী ক'রে চলতি হারের চেয়ে বেশী হারে লাভ করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে, দু চারটি প্রতিষ্ঠান এমনও থাকে, যারা কোন রকমে টি'কে আছে বলা চলে। হয়ত মালিক বৃদ্ধ, কাজে আর উৎসাহ নেই; কিংবা পরিচালনার কাজ অনভিজ্ঞ লোকের হাতে এসে পড়েছে; পুরোনো যন্ত্রপাতি নিয়ে কোন রকমে গতানুগতিক ভাবে কাজ চলেছে; বাজার দরে বিক্রী করা ছাড়া গত্যন্তর নাই; লাভ হয়ত খুব সামন্যই হয়, কিংবা হয়ত হয় না; হয়ত পুরো খরচই ওঠে না; তবে মুখ্য খরচটুকু ওঠে, এবং আনুষঙ্গিক খরচেরও খানিকটা ওঠে; এ অবস্থায় ব্যবসা তুলে দিলে লোকসান বেশী, কারণ তা হ'লে সমস্ত মূলধনটি এক সঙ্গে লোকসান হয়ে যাবে। সেইজন্যেই কারবার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই রকম প্রতিষ্ঠানেরও মূল্য নির্দ্ধারণে বিশেষ কোন প্রভাব নাই। আবার এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান থাকে যেগুলি সম্প্রতি কাজ সুরু করেছে। উৎসাহ যথেষ্ট; মূলধনেরও অভাব নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রতে এবং ব্যবসায়ী জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রতে সময় লাগে। তাড়াতাড়ি কি ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় সেই চেষ্টা চলেছে; এখন একটু বেশী পড়্‌তা পড়্‌ছে; কিন্তু সেটা আমলে আনা হচ্ছে না; বাড়্‌তি খরচা মূলধন খরচার সামিল বলে গণ্য করা হচ্ছে। পরে, যখন কারবার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, তখন যে পড়তা পড়্‌বে, তারই হিসাবে, কি ভাবে কত মাল তৈরী করা হবে তাই স্থির করা হচ্ছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, মূল্য-নির্দ্ধারণে এই সব প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান তৈরী-খরচার বিশেষ কোন প্রভাব নাই।

৩নং চিত্রে **'পক'** দ্বারা যে প্রতিষ্ঠানের মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচা বোঝান হচ্ছে, অধ্যাপক মার্শাল তার নাম দিয়েছেন 'Representative firm' বা প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সমগ্রভাবে বিবেচনা করলে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের ধারণা করা যায়, যেটিকে প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলা চলে। এটি একেবারে নূতনও নয়, আবার বেশী পুরাতনও নয়; অসামান্য সুযোগ সুবিধা কিছু নেই, আবার বিশেষ অসুবিধাও কিছু নেই; আয়তন এমন যে আধুনিক যন্ত্র-পাতি ব্যবহারের এবং আধুনিক নির্ম্মান-কৌশল প্রয়োগের যথোচিত সুযোগ পাওয়া যায়; পরিচালনার কাজে কোন অসামান্য প্রতিভার পরিচয় নেই বটে, কিন্তু নিপুণতা ও কর্ম্ম-তৎপরতার অভাবও নেই। অর্থাৎ নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি চেষ্টা যত্নে অবহেলা না ক'রলে, এবং

কোন আকস্মিক অসুবিধায় না পড়্‌লে, কালক্রমে যেরূপ হবার প্রত্যাশা করে, এটি সেইরকম প্রতিষ্ঠান। ৩নং চিত্রে 'পক' দ্বারা প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাত্রা-পিছু তৈরীখরচা বোঝানর তাৎপর্য্য এই যে, যদি বাজারে 'পক' দরে নিয়মিতভাবে 'ওক' পরিমান মাল কাট্‌তি হয়, তা হ'লে ঐ পরিমাণ মালের নিয়মিত যোগান আসবে।

যোগানের পরিমাণ ভেদে তৈরী-খরচার যে পরিবর্ত্তন ঘটে সেটি রেখা-চিত্রের সাহায্যে কি ভাবে প্রকাশ করা যায় তা আমরা দেখলাম। তিন শ্রেণীর পণ্যের যোগান-রেখা বিভিন্ন রকমের হবে, সে কথাও বোঝান হ'ল। যোগান-রেখা সম্বন্ধে আর একটি কথাও এই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, চাহিদা-রেখার মত যোগান-রেখাকেও কোন নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তের যোগানের যেন ফটো-চিত্র এই ভাবে কল্পনা কর'তে হবে। কারণ, অনেক সময়ে দুই বা ততোধিক পণ্য এক সঙ্গে তৈরী হয়; যেমন গ্যাস ও কোক কয়লা। এ রকম ক্ষেত্রে, একটির চাহিদার কোন পরিবর্ত্তন ঘট্‌লে অন্যটির যোগানে তার প্রভাব পড়ে। তখন আগে যে যে পরিমাণ যোগানের যে যে তৈরী-খরচা পড়ত, তা আর বজায় থাকে না। অর্থাৎ, তখন যোগান রেখা নতুন ক'রে টান্‌বার দরকার হয়।

(৪)

"চাহিদা ও যোগানের সূত্রের" ক্রিয়া

চাহিদা ও যোগানের যুগপৎ ক্রিয়ার ফলে কি ভাবে মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, সেটি এখন রেখা-চিত্রের সাহায্যে দেখান যায়—
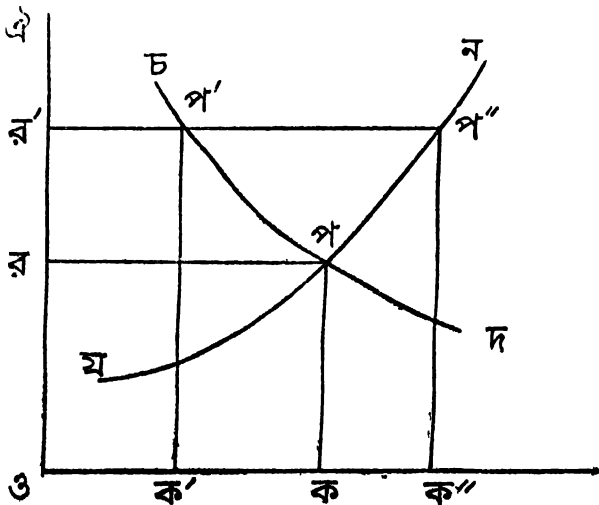
এখানে **'চদ'** হ'ল চাহিদা-রেখা এবং **'যন'** হ'ল যোগান-রেখা। দুটি রেখা একই ছকে এবং একই মাপের হিসাবে টানা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, **'প'** বিন্দুতে দুটি রেখা কাটাকাটি করেছে। তাতে এই বোঝাচ্ছে যে **'পক'** বা **'ওর'** হবে দীর্ঘকালীন দর। কারণ, এই দরে চাহিদার পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ, দুইই সমান; কেননা দুয়েরই মাপ হ'ল **'ওক'**। এই দর স্থিতিশীল হবে। অর্থাৎ, যদি কোন আকস্মিক কারণে দর চড়ে, কিংবা ক'মে যায়, তা হ'লে, যোগানের কিংবা চাহিদার চাপে, দর আবার পূর্ব্ব সংখ্যায় ফিরে আসতে বাধ্য। কেন এরকম হবে, সেটি এইভাবে দেখান যায়। ধরা যাক, কোন আগন্তুক কারণে দর **'ওর'** থেকে বেড়ে **'ওর´'** হ'ল। **র´** থেকে **'ওএ'**র সমান্তরালে একটি সরলরেখা টানলে, সেটি **'চদ'**কে কাট্‌ছে **প´**। বিন্দুতে এবং **'যন'**কে, **প´´** বিন্দুতে। এখন **'ওঐ'**র সমান্তরালে **প´** ও **প´´** থেকে দুটি সরল রেখা টেনে 'ওএ'র উপর যথাক্রমে **ক´** ও **ক´´** বিন্দুতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। **ওর´ = প´ক´ = প´´ক´´**। যেহেতু **প´** বিন্দুটি চাহিদা রেখার উপর অবস্থিত, সেইহেতু যখন দর হবে **ওর´** তখন চাহিদার পরিমাণ হবে **ওক´**। আবার যেহেতু **প´´** বিন্দুটি যোগান রেখার উপর অবস্থিত সেইহেতু, যখন দর হবে **ওর´** তখন যোগানের পরিমাণ হবে **ওক´´**। অর্থাৎ **ওর´** দরে যতটুকু কাটতি হবার সম্ভাবনা তার চেয়ে ঢের বেশী যোগান হবে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে এই যে যোগানদারে যোগানদারে রেষারেষি হ'তে থাক্‌বে; প্রত্যেকেই ক্রমান্বয়ে দর কমাতে থাক্‌বে যাতে বেশী খরিদ্দার পায়। এই চাপ ততক্ষণ চল্‌বে যতক্ষণ না দর **'পক'** সংখ্যায় ফিরে আসে। ঐ দরে চাহিদা ও যোগান সমান, অতএব কোন দিক্ দিয়েই দর বাড়াবার বা কমাবার চেষ্টা হবে না। দর যদি **'পক'** পরিমাণের চেয়ে ক'মে যায় তা হ'লে যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশী হবে, এবং চাহিদার চাপে আবার পূর্ব্বের পরিমাণে ফিরে আস্‌বে।

এই আলোচনা থেকে আরও একটি সিদ্ধান্ত এই করা যায় যে, যেহেতু **প** বিন্দুটি চাহিদা-রেখার উপরও অবস্থিত এবং যোগান রেখার উপরও অবস্থিত, সেইহেতু এই প্রমাণ হচ্ছে যে, মূল্য দ্বারা একদিকে খরিদ্দারদের প্রান্তিক উপকারের নির্দ্দেশ করা যায়, এবং অন্য দিকে যোগানদারদের তৈরী খরচার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায়। এই তৈরী খরচা, আহরণ-শিল্পে প্রত্যেক উৎপাদনকারীর প্রান্তিক তৈরী-খরচা; হস্ত-শিল্পে প্রত্যেক উৎপাদনকারীর মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচ, এবং যন্ত্র-শিল্পে প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচা। মনে রাখতে হবে যে, তৈরী-খরচা বল্‌তে আমরা বরাবর বুঝেছি যে, উৎপাদকের নিজস্ব প্রাপ্য অর্থাৎ চল্‌তি হারে লাভও, এর মধ্যে ধরা আছে।

চাহিদার পরিমাণ, যোগানের পরিমাণ ও মূল্য এই তিনটি পরস্পরের সঙ্গে কার্য্য-কারণ সূত্রে গাঁথা। একটির পরিবর্ত্তন ঘটালে তার প্রতিক্রিয়া অন্য দুটির উপর হবে।

এই সত্যের উপলব্ধির উপর সংরক্ষণ-শুল্ক-নীতি প্রতিষ্ঠিত। আমদানী পণ্যের উপর কর ধার্য্য করে তার দর বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে দেশে সে জিনিষের দর বাড়ে। তার ফলে দেশের ভিতর সেই জিনিষ বেশী পরিমাণে তৈরী হতে থাকে। এইভাবেই আমাদের দেশে বস্ত্র-শিল্প, লৌহ-শিল্প, শর্করা-শিল্প প্রভৃতি নানা শিল্পের প্রসার হয়েছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, সরকারী মহলে সব সময়ে উপরোক্ত সহজ সত্যটিকে যথোচিত কদর দেওয়া হয় না। তাঁরা খাদ্য-শস্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চান এবং সেই সঙ্গে অধিক শস্য ফলাও আন্দোলনেরও সাফল্য দেখ্‌তে চান। তা হয় না। জমির ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হ'লে চাষীকে আর একটু বেশী দরে ফসল বিক্রী করবার সুযোগ দিতে হবে। কারণ ফসলের পরিমাণ বাড়াতে গেলে প্রান্তিক তৈরী-খরচ বাড়্‌বে। দর যতক্ষণ না এই প্রান্তিক তৈরী খরচের সমান হচ্ছে ততক্ষণ বাড়্‌তি পরিমাণটুকু উৎপন্ন হ'তে পারে না। অন্য পক্ষে, এই দরটুকু যদি বাড়্‌তে দেওয়া হয় তা হ'লে, এখন যে অধিক শস্য ফলাও আন্দোলনে জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকার অপব্যয় হচ্ছে, সেটিও করতে হবে না। চাষী নিজের গরজেই অধিক শস্য ফলাবে। প্রভূত অর্থব্যয় করা সত্ত্বেও "অধিক শস্য ফলাও" আন্দোলন কি রকম ব্যর্থ হয়েছে তা ১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালের ফসলের পরিমাণ ও আবাদ করা জমির পরিমাণের হিসাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—

		ফসলের পরিমাণ	আবাদ করা জমির পরিমাণ
১৯৪৭	—	৩৭,৯০০,০০০ টন	১৪৭,০০০,০০০ একর
১৯৪৮	—	৩৭,৭০০,০০০ ,,	১৪১,০০০,০০০ ,,
১৯৪৯	—	৩৪,৭০০,০০০ ,,	১৩৭,০০০,০০০ ,,

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(১)

অল্পকালীন দর ও দীর্ঘ কালীন দর

আগের পরিচ্ছেদে দেখান হয়েছে যে, চাহিদা ও যোগান এই দুইটির সমবেত ক্রিয়ার ফলে মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এ দুটির গুরুত্ব সমান নয়। কতখানি সময় নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে, চাহিদা বা যোগান, কোন দিক্‌টার প্রভাব বেশী। এই প্রসঙ্গে মূল্যের প্রশ্নটিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। নীলামের দর—এ ক্ষেত্রে যোগানের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ; যোগান বাড়ান যায় না ; এবং সবটুকু বিক্রী হওয়া চাই। অতএব দর হবে ঐ পরিমাণের চাহিদা-মূল্যের সমান। টাট্‌কা দুধ, টাট্‌কা মাছ প্রভৃতি যে সব জিনিষ সঞ্চয় করে রাখা যায় না, সে সব জিনিষের দিনের দিন বাজার দর সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা চলে। এসব ক্ষেত্রে তৈরী খরচার প্রভাব নেই বল্‌লেই চলে। যেমন চাহিদা, সেইরকম দর হবে। চাহিদার তেজ হ'লে দর বাড়্‌বে ; চাহিদা মন্দা হ'লে দর কম্‌বে। শেয়ার-বাজারে শেয়ারের দিনের দিন দর সম্বন্ধে ঐ একই মন্তব্য করা চলে।

২। "প্রডিউস্‌ এক্‌স্‌চেঞ্জ" (Produce Exchange) বা ফসলের বাজারের দর—এই সব বাজারে গম, তুলা, তিসি পাট প্রভৃতি প্রধান প্রধান মরশুমী ফসলের পাইকারী কেনা বেচা হয়। এ সব জিনিষের ফসল ওঠবার সময় ঠিক হয়ে যায়, সে বছর কত পরিমাণ বাজারে যোগান আসবে। সে বছরের মধ্যে আর এ পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হবার উপায় নেই। অতএব সে বছরের গড়ের দর হবে, ঐ পরিমাণের চাহিদা-মূল্যের সমান। দৈনন্দিন বাজার দর এই দরের কাছাকাছি থাকবে। যদি সে বছর চাহিদার তেজ হয় তা হ'লে ঐ গড়ের দর সেই অনুপাতে বাড়্‌বে, এবং যোগানদারদের বেশী লাভ হবে। যদি চাহিদা মন্দা হয়, তা হ'লে লাভ কম হবে ; এবং অনেককে হয়ত তৈরী-খরচার চেয়ে কম দরে বেচতে হবে। কারণ, যোগান কমিয়ে বাড়িয়ে চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না। কিছুটা যে করা যায় না, তা নয়। প্রত্যেক বছরেই খানিকটা অংশ সঞ্চয় করা হয়। অতএব চাহিদার তেজ হ'লে আগের বছরের সঞ্চয় থেকে মেটাবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সঞ্চয়ের পরিমাণ মোট পরিমাণের তুলনায় সামান্য। অতএব কিছুদিন চাহিদার চাপ বজায় থাক্‌লে দর চড়া অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। এক দেশের বাজারে মালে টান ধরলে, অন্য দেশের বাজার থেকে আমদানী হ'তে থাকে। ফলে, যখন দর চড়্‌তে

থাকে তখন পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় বাজারগুলিতে অল্পবিস্তর এক সঙ্গে চড়্‌তে থাকে। আসলে বিভিন্ন বাজারগুলির মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে যে সব দেশগুলি জুড়ে একটিই বাজাব আছে বলা চলে। চাহিদায় মন্দা পড়্‌লে, সর্ব্বত্র একসঙ্গে অল্পবিস্তর দর কমতে থাকে। অবশ্য সঞ্চয় বাড়িয়ে যোগানের চাপ কিছুটা হাল্কা করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ কাজ বেশী দূর পর্য্যন্ত কবা চলে না। কারণ তাতে অনেকখানি মূলধন আট্‌কে রাখতে হয়; এবং গুদামজাত করবার ব্যবস্থা বাড়াতে হয়। তা ছাড়া, পরের বছরে দর বেশী পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত বোধ না হ'লে, কেউ সঞ্চয় করতে ভরসা পায় না। অতএব দেখা গেল, ফসলের বাজারে মূল্য নির্দ্ধারণ ব্যাপারে তৈরী-খরচার প্রভাব কম এবং চাহিদার প্রভাব বেশী। তবে এ বছরের দবের প্রতিক্রিয়া পরের বছরের যোগানের ওপর দেখা দেবে। দর বেশী হ'লে যোগান বাড়্‌বে। দর কম হ'লে যোগান কম্‌বে। তখন প্রান্তিক তৈরী-খরচার প্রভাব প্রকাশ পাবে।

৩। অল্প-কালীন দর—অর্থতত্ত্বের আলোচনায়, অল্পকালীন দব (Short period or Sub-normal price) এবং দীর্ঘ-কালীন দর (Long period or normal price), এই দুইটি কথা দুইটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়। অল্প-কালীন দর বল্‌তে যে সময়টুকু বিবেচনা করা হয় তার মধ্যে, চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘট্‌লে, তার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ক'রতে যে দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করবার প্রয়োজন হয়, সেগুলিকে পূরোপূরি কার্য্যকরী করবার সময় পাওয়া যায় না। অন্যপক্ষে, দীর্ঘ-কালীন দর বল্‌তে যতখানি সময় বিবেচনা করা হয় তাব মধ্যে ঐ ব্যবস্থাগুলি চূড়ান্তভাবে কার্যকরী করা যায়। অল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দরের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় সেটি, প্রধানতঃ যন্ত্র-শিল্প-জাত দ্রব্য সম্বন্ধেই প্রাসঙ্গিক।

কোন সামগ্রীর চাহিদা বাড়লে, প্রথম মুখেই দর বাড়ে না; মজুত থেকে বাড়্‌তি চাহিদা মেটাবার চেষ্টা হয়। যদি চাহিদার চাপ বজায় থাকে, তা হ'লে যোগান বাড়াবার চেষ্টা হয়। তখন কারখানাগুলিতে পূরো দমে কাজ চল্‌তে থাকে। তাতেও যদি চাহিদার অনুযায়ী যোগান না হয়, তখন বাড়্‌তি সময় খাটাবার ব্যবস্থা করতে হয়, এবং অপেক্ষাকৃত কম কাজের যন্ত্রপাতি ও লোকজনের সাহায্যে যোগান বাড়াবার চেষ্টা চলে। তার ফলে তৈরী-খরচা বাড়ে। অতএব দরও বাড়ে। অন্যপক্ষে, যদি চাহিদায় ভাঁটা পড়ে, তখনই তখনই যোগানের পরিমাণ কমান' যায় না। অতএব দর কম্‌তে থাকে। যতক্ষণ দর মুখ্য-খরচের ওপরে থাকে, ততক্ষণ যোগানের পরিমাণ বিশেষ কিছু কমে না। অবশ্য তার চেয়ে কমে গেলে, যোগান কম্‌তে থাক্‌বে। অতএব দেখা গেল, অল্পকালীন দর নির্ণয়ে চাহিদারই জোর বেশী; চাহিদা বাড়্‌লে দর বাড়্‌বে; চাহিদা ক'মলে দর কম্‌বে।

৪। দীর্ঘকালীন দর—চাহিদার তেজ হওয়ার ফলে যখন দর চড়্‌তে থাকে, তখন স্বভাবতঃই ঐ ব্যবসায়ে বাজার-চল্‌তি লাভের চেয়ে বেশী লাভ হ'তে থাকে। অতএব, যদি এই বর্দ্ধিত চাহিদা স্থায়ী হবার সম্ভাবনা দেখা যায়, তখন এই বেশী লাভের আকর্ষণে ঐ ব্যবসায়ে বেশী বেশী মূলধন নিযুক্ত হ'তে থাকে। চালু কারখানাগুলির প্রসার হ'তে থাকে, এবং নূতন নূতন কারখানার পত্তন হ'তে থাকে। কালক্রমে, স্থায়ীভাবে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। তখন সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা অনুযায়ী দর নির্দ্ধারিত হয়। যন্ত্র শিল্প-জাত দ্রব্যের এই দীর্ঘ-কালীন দর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আগের চেয়ে কম হবে। আহরণ-শিল্পে বেশী হবে; এবং হস্ত-শিল্পে সমান থাক্‌বে। তেম্‌নি চাহিদা স্থায়ীভাবে ক'মে গেলে, আহরণ-শিল্পে দীর্ঘ-কালীন দর ক'মে যাবে; হস্ত শিল্পে সমান থাক্‌বে; কিন্তু যন্ত্র-শিল্পে বাড়্‌বে। অতএব দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘ-কালীন দর নির্ণয়ে যোগানের প্রভাবই আসল। দর তৈরী খরচার সমান হবে। চাহিদা স্থায়ীভাবে বাড়্‌লে কিংবা কম্‌লে, দীর্ঘকালীন দর কিভাবে বদ্‌লাবে সেটি রেখা-চিত্রের সাহায্যে এইভাবে দেখান যায়।
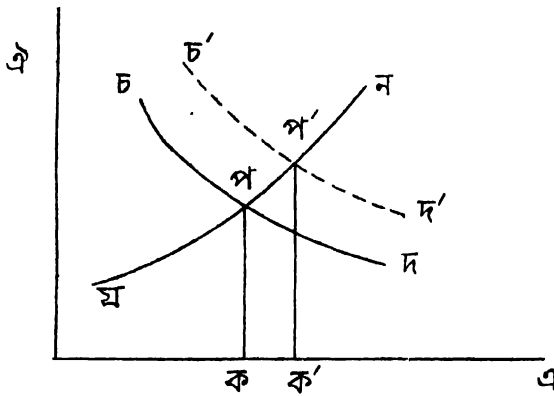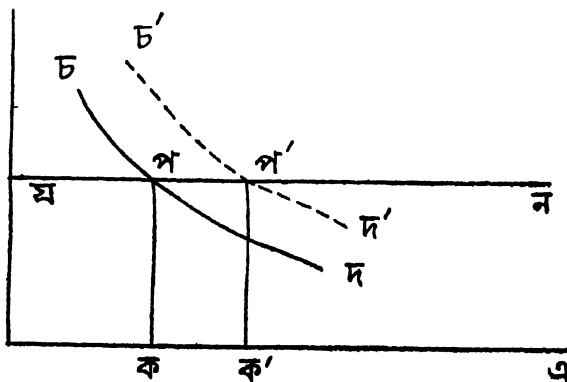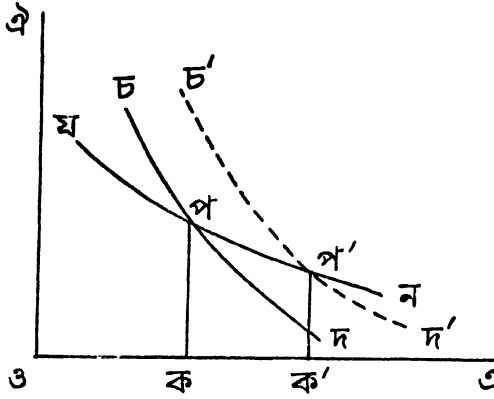
এখানে '**চদ**' দ্বারা আগেকার চাহিদা বোঝান' হচ্ছে ; এবং বৃদ্ধি পাবার পর চাহিদার যে অবস্থা হয়েছে সেটি **চ′দ′** দ্বারা দেখান হচ্ছে। **পক** হ'ল আগেকার দর ; **প′ক′**, নূতন দর।

অনুরূপভাবে চাহিদা ক'মলে দীর্ঘ-কালীন দরে কি রকম পরিবর্ত্তন ঘটে, সেটিও রেখা-চিত্রের দ্বারা দেখান যায়। সেখানে **চ′দ′**এর সংস্থান হবে '**চদ**'এর নীচে।

দীর্ঘ-কালীন দরের ধারণা এক হিসাবে অবাস্তব ব'লে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, কোন সময়ে, কোন সামগ্রী, তার দীর্ঘ-কালীন দরে বিক্রয় হচ্ছে, এ রকম দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। বাজারে সব সময়েই কোন না কোন আগন্তুক কারণ হাজির থাকে ; এবং তার ক্রিয়ার ফলে দীর্ঘ-কালীন দরের সঙ্গে বাজার দরের অল্প-বিস্তর পার্থক্য সব সময়েই থাকে। কিন্তু সেজন্য দীর্ঘ-কালীন দরের আলোচনার গুরুত্ব কিছু-মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। তার কারণ, প্রথমতঃ এই আলোচনার ফলেই মূল্য-নির্দ্ধারণের পেছনে যে মূলগত ও দীর্ঘ-মেয়াদী কারণগুলির ক্রিয়া চলেছে, সেগুলির সন্ধান পাওয়া যায় ; এবং দ্বিতীয়তঃ, দেশের বৈষয়িক জীবনের প্রকৃতি ও গতি, এই দীর্ঘ-কালীন দরের দিকেই নজর রেখে স্থির করা হয়। শিল্পপতিরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখেই বিভিন্ন ব্যবসায়ের পত্তন ও প্রসার করে। ফলে, দেশে যে সব জিনিষের প্রয়োজন বেশী সেই সব জিনিষের যোগান বাড়তে থাকে ; আর যে সব জিনিষের প্রয়োজন কম সে সব জিনিষ তৈরীর কাজে মূলধন ও শ্রম-শক্তি প্রয়োগ ক'মতে থাকে।

নবম পরিচ্ছেদ

(১)

যুক্ত চাহিদা : যুক্ত যোগান।
বিকল্প চাহিদা : বিকল্প যোগান।

যুক্ত-চাহিদা (Joint-Demand)—অনেক সময়ে দুই বা ততোধিক সামগ্রী এক-সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। তখন সেগুলির চাহিদাকে যুক্ত-চাহিদা বলে। যেমন, কালি ও কলম; ব্যাট ও বল; মোটর গাড়ী ও পেট্রোল ইত্যাদি। অনেক সময় একটি সামগ্রী তৈরী ক'রতে নানা রকমের উপাদান দরকার হয়, এবং নানা শ্রেণীর কারিগরের কাজ দরকার হয়। এ সব ক্ষেত্রেও, ঐ উপাদানগুলির এবং ঐ কাজগুলির চাহিদা হ'ল যুক্ত-চাহিদা। যেমন, বাড়ী তৈরী ক'রতে ইঁট, কাঠ, চুণ, সুরকি, সিমেণ্ট প্রভৃতি উপাদান এবং রাজমিস্ত্রী, ছুতোরমিস্ত্রী, রংএর মিস্ত্রী প্রভৃতির কাজ দরকার হয়। এই সব উপাদান ও কাজের চাহিদা যুক্ত-চাহিদা। বাড়ীর চাহিদা থেকেই এই সব জিনিষ ও কাজের চাহিদার উদ্ভব হয়েছে। অতএব এগুলির চাহিদাকে গৌণ-চাহিদা (Derived Demand) বলা চলে।

যুক্ত-চাহিদার জিনিষগুলির প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা চাহিদার হিসাব পাওয়া শক্ত। সেইজন্য, প্রত্যেকটি যে দরে বিক্রয় হয় সেই দর সেই জিনিষের প্রান্তিক উপকারের পরিমাণ নির্দ্দেশ করছে, এ কথা প্রমাণ করা যায় না। তবে, প্রায় ক্ষেত্রেই, যে জিনিষগুলি এক সঙ্গে ব্যবহার হয়, সে জিনিষগুলির আপেক্ষিক পরিমাণের ইতর-বিশেষ করা যায়। সন্দেশে ছানা ও চিনির ভাগ বদ্‌লান যায়; বাড়ী তৈরী ক'রতে বেশী পরিমাণে সিমেণ্ট ব্যবহারের দ্বারা গাঁথুনি শক্ত ক'রে ইঁটের খরচ কমান যায়, এবং বেশী পরিমাণে লোহা ব্যবহার ক'রে কাঠের খরচ কমান যায়; কারখানায় যন্ত্র-পাতি বাড়িয়ে লোক কমান যায়, এবং লোক বাড়িয়ে যন্ত্র-পাতি কমান যায়। যে সব ক্ষেত্রে এই রকমে আপেক্ষিক পরিমাণের ইতরবিশেষ করা যায়, সে সব ক্ষেত্রে যুক্ত-চাহিদার সামগ্রীগুলির প্রত্যেকটির চাহিদার আলাদা আলাদা হিসাব করা যায়। কারণ, আর সবগুলির পরিমাণ ঠিক রেখে, একটির পরিমাণ বাড়িয়ে কমিয়ে তার ফল পরীক্ষা করা যায়। তখন দেখা যায় যে, প্রত্যেকটির ব্যবহার তত দূর পর্য্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে গিয়ে প্রান্তিক উপকার কিংবা প্রান্তিক উৎপাদন, দরের সমান হয়। যদি যন্ত্র-পাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামের পরিমাণ ঠিক রেখে আর একজন লোক নিলে দেখা যায় যে, বাড়্‌তি খরচ হয় ৫৲ টাকা ও বাড়্‌তি

লাভ হয় ২০৲ টাকা, তখন আরও লোক নেওয়া হবে। আরও একজন নিলে যদি দেখা যায় যে, বাড়্তি খরচ হ'ল ৫৲ টাকা এবং বাড়তি লাভ ১৫৲ টাকা, তখন আরও লোক নেওয়া হবে। এইভাবে যতক্ষণ না বাড়তি লাভ ৫৲ টাকায় নামছে ততক্ষণ লোকের সংখ্যা বাড়ান চল্‌তে থাক্‌বে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, যুক্ত-চাহিদার ক্ষেত্রেও এ কথা ঠিক যে, প্রত্যেকটি সামগ্রীর দর তার প্রান্তিক উপকার বা প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্দেশ করে।

সাধারণতঃ, যুক্ত-চাহিদার সামগ্রীগুলির মধ্যে যদি একটির যোগান বাড়ে, অর্থাৎ দর কমে, তা হ'লে অন্যগুলির চাহিদা বাড়বে। যদি ইঁট সস্তা হয়ে যায়, তা হ'লে বাড়ী তৈরীর মোট খরচ কমবে; তার ফলে বাড়ী তৈরীর সংখ্যা বাড়বে; অতএব অন্যান্য উপাদানগুলির চাহিদা বাড়বে। সেই রকম, যুক্ত-চাহিদার সামগ্রীগুলির মধ্যে যদি একটির যোগান কমে, তা হ'লে অন্যগুলির চাহিদা ক'মবে।

কোন ক্ষেত্রে, যুক্ত চাহিদার সামগ্রীগুলির মধ্যে একটির দর বাড়লে কিংবা কম্‌লে, ঠিক কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হবে, এবং কতখানি হবে, তা নির্ভর করে, সেই সামগ্রীর চাহিদার বিশেষত্বের ওপর। দরজীর ব্যবসায়ে সেলাই করবার সুতো দরকার হয়। কিন্তু এই সুতোর দাম বিলক্ষণ বাড়লেও, বিশেষ কিছু কম ব্যবহার হবে ব'লে মনে হয় না। কারণ, সমগ্র খরচের তুলনায় সুতোর খরচা অত্যন্ত কম; অথচ সেটুকু দরকার হয় সেটুকু নইলে নয়। এ রকম ক্ষেত্রে বাড়তি খরচটুকু দরজীর লাভ বা পারিশ্রমিক থেকে যাবে, কিংবা অন্যদিকে খরচ কমিয়ে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হবে। অতএব, যদি কেউ সেলাইএর সুতোর ব্যবসায়ে এক-চেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে, তা হ'লে তার পক্ষে দর চড়িয়ে প্রভূত লাভ করবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনেক সময়ে শ্রমিকেরা বেশী মাইনের দাবী ক'রে ধর্ম্মঘট করে। কোন বিশেষ কাজের শ্রমিকেরা এই ধরণের দাবী আদায় ক'রতে পারবে কি না, তা নির্ভর করে কতকগুলি বিষয়ের ওপর। সেগুলি হচ্ছে—

১। যে পণ্য তৈরীর কাজে এই শ্রমিকদের সাহায্য দরকার হয়, সেই পণ্যের চাহিদা মন্থর-গতি হওয়া চাই; অর্থাৎ, সেই পণ্যের দাম কিছু বাড়ালে বিক্রীর পরিমাণ বিশেষ ক'মবে না, এ রকম হওয়া চাই। কারণ, তাদের বেশী মাহিনা দিলে মোট খরচ কিছু বাড়বে; অতএব পণ্যের দামও কিছু বাড়াতে হ'তে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে যদি বিক্রীর পরিমাণ অনেক ক'মে যায় তা হ'লে কম মাল তৈরী হবে; অতএব তাদের সকলকে আর দরকার হবে না; তার ফলে তাদের জোর ক'মে যাবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে যাবে।

২। তাদের সাহায্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় হওয়া চাই। তা না হ'লে তাদের বাদ দিয়ে কোন রকমে কাজ চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হবে, এবং তাদের দাবীর জোর থাক্‌বে না।

৩। তাদের মাইনে দিতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, সেটি মোট খরচের সামান্য অংশ হওয়া চাই। কারণ, তা হ'লে তাদের মাইনে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিলেও মোট খরচ বিশেষ বাড়বে না।

৪। ঐ ব্যবসায়ে অন্য যে সব বাবদ খরচ করতে হয় সেগুলিতে কিছু ব্যয় সঙ্কোচ করার সম্ভাবনা থাক্‌লে সুবিধা হয়। অন্য যে সব শ্রেণীর শ্রমিকদের সাহায্য দরকার হয় তাদের ওপর যদি একটু চাপ সয় তা হ'লে সেই দিকে খরচ কমিয়ে ধর্ম্মঘটীদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

৫। ঐ ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ যদি এমন হয় যে, লাভ একটু ক'মলে শিল্পপতিদের উৎসাহ বা উদ্যম মোটামুটি সমানই থাকে, তা হ'লে লাভ থেকে ধর্ম্মঘটীদের দাবী মেটান যায়।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে সবগুলি সুবিধাই থাকা চাই, তা নয়। তবে যে ক্ষেত্রে এই সুবিধা-গুলি যত বেশী থাকে, সে ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘটীদের পক্ষে দাবী আদায় করা তত সহজ হয়।

শ্রম-সঞ্চয়ী যন্ত্র ও বেকারের সংখ্যা—এই প্রসঙ্গে, দেশে শ্রম-সঞ্চয়ী যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ালে বেকারের সংখ্যা বাড়ে কি না, এ প্রশ্নেরও আলোচনা করা যেতে পারে। কম সুদে টাকা তোলার সুবিধা হ'লে শিল্প-পতিরা বেশী যন্ত্র-পাতি ব্যবহারের দিকে নজর দেয়। কোন কারখানায় আগে যে কাজ মানুষে ক'রত, এখন যদি সেই কাজ যন্ত্রের দ্বারা করার ব্যবস্থা হয়, তা হ'লে স্বভাবতঃই কতকগুলি লোকের চাকরী যায়। অতএব, দেশে যদি ব্যাপকভাবে যন্ত্রপাতির ব্যবহার সুরু হয় তা হ'লে, তার প্রথম ফল যে হবে বেকার-সংখ্যার বৃদ্ধি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এটা হ'ল একটা দিক্। কিন্তু এর আর একটা দিক্ আছে। যন্ত্র-পাতি বাড়ালে, সেই সব যন্ত্র-পাতি চালাবার জন্য লোকের প্রয়োজন হবে; এবং বেশী পরিমাণে যন্ত্রপাতি তৈরী করারও ব্যবস্থা ক'রতে হবে। এই সব কাজে কতকগুলি লোকের চাকরী হবে। তা ছাড়া, যন্ত্র-পাতির ব্যবহারে পণ্যের তৈরী খরচা কমবে, অতএব দামও কমবে। তখন সেই সব জিনিষ বেশী পরিমাণে বিক্রী হ'তে থাকবে, অতএব বেশী পরিমাণে তৈরীও ক'রতে হবে। উপরন্তু, বেশী মাল তৈরী হওয়ার দরুণ, দেশের লোকের আয় বাড়বে। তার ফলে সব জিনিষেরই চাহিদা বাড়বে। অতএব সব জিনিষই আগেকার চেয়ে বেশী পরিমাণে তৈরী ক'রতে হবে। তার ফলে অনেকের জীবিকার সংস্থান হবে। অতএব দেখা গেল, বেশী পরিমাণে যন্ত্র-পাতি ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন অনেক লোক বেকার হবে, তেমনি অন্য দিকে অনেক লোকের কাজও হবে। কোন্ দেশে কোন্ পাল্লাটি ভারী হবে তা নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। বাস্তবিক পক্ষে কি ঘটেছে বিচার ক'রলে দেখা যায় যে, বিলাতে এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশগুলি এবং উত্তর আমেরিকা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যন্ত্র-পাতির বহুল ব্যবহারে অভাবনীয় সুফল পাওয়া গেছে। ঐ সব দেশের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে; এবং জনসাধারণের জীবন ধারণের মান বহুগুণ উন্নীত হয়েছে। ভারত

সম্বন্ধে কিন্তু নিঃসন্দেহে এ রকম মন্তব্য করা চলে না। অবশ্য এমন কতকগুলি শিল্প আছে যেগুলিতে বড় বড় কারখানায় ভারী ভারী যন্ত্রের সাহায্যে কাজ না ক'রলে চলে না। এই ধরণের যে সব শিল্পের প্রতিষ্ঠা এখানে হয়েছে তার দ্বারা যে দেশের অনেক সম্পদ্-বৃদ্ধি হয়েছে, এবং অনেক লোকের জীবিকার উপায় হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লৌহ-শিল্প, খনির কাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, মোটর ও এয়ারোপ্লেন তৈরী, ইলেক্ট্রিকের যন্ত্রপাতি তৈরী, রসায়ণ-শিল্প সিমেণ্ট তৈরী, এলুমিনিয়ম শিল্প প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। কিন্তু যে সমস্ত হাল্কা শিল্প আগে গ্রামের লোকের হাতে ছিল, সেগুলিকে সহরে এনে যন্ত্র-শিল্পে পরিণত করায় দেশের আসলে কোন উপকার হয়েছে বলা যায় না; বরঞ্চ তার দরুণ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার উপায় নষ্ট হয়েছে। অন্য দেশের সমস্যা, আর আমাদের দেশের সমস্যা সমান নয়। আমাদের জন-সংখ্যা বিপুল। দেশের বৈষয়িক জীবনের কাঠামো এমন হওয়া চাই যে, এই কোটী কোটী লোকের সকলেই কিছু না কিছু উপার্জ্জন ক'রতে পারে। এই হাজার হাজার বছরের সংস্কারে জড়ানো পুরোণো জাতিটিকে একটি সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢেলে সুদূর ভবিষ্যতে কি করা যেতে পারে, তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করা কল্পনা বিলাসীরই শোভা পায়। যে করিৎ-কর্ম্মা লোক, সে এখনকার দুঃখ দৈন্যের যদি কিছু লাঘব ক'রতে পারে, এবং সামনের ২০।২৫ বৎসরের জন্য সামান্য কিছু বেশী স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী জমি তৈরী ক'রতে পারে, তা হ'লেই নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রবে। আমাদের দেশ গ্রাম-প্রধান। এখনও সাড়ে দশ কোটী কর্ম্মক্ষম লোকের মধ্যে মাত্র ১৮ লক্ষ লোক কল কারখানায় কাজ করে। অতএব দেশের কল্যাণ ক'রতে হ'লে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ক'রতে হবে। গ্রামে পাঁচ রকমের পয়সা রোজগার ক'রবার উপায় থাকলেই তবে সেটি সম্ভব। এখন গ্রামে অনেক লোকের কিছু কাজ নেই; বাধ্য হ'য়ে তারা আলস্যে দিন কাটায়। চাষীদেরও, বছরের অনেকখানি সময় কিছু কাজ থাকে না। এই বিপুল শ্রমশক্তির অপচয় নিবারণ করাটাই এখন প্রথমে দরকার। তার জন্য চাই গ্রাম-শিল্পের পুনরুজ্জীবন, এবং গ্রামে ছোট খাট নতুন শিল্পের পত্তন।

চরখার সুতোর চেয়ে কলের সুতো এত ভাল এবং এত কম খরচে তৈরী হয় যে চরখার বহুল প্রচলন করার চেষ্টা সফল হবার কথা নয়। কিন্তু তাঁতে কাপড় বুনতে কলের চেয়ে বিশেষ বেশী খরচ পড়ে না।* উপরন্তু, তাঁতে ঢের ভাল বোনা হয়, এবং তাঁতের কাপড় বেশী টেঁকসই হয়। তাঁত-শিল্পটিকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারলে বহু লোকের অন্ন সংস্থান হয়। তেল পেষাই আর একটি ব্যবসা, যেটি যন্ত্র শিল্পে পরিণত হওয়ায় অনেক লোক বেকার

* একটা কলের তাঁতে দৈনিক আন্দাজ ৪০ গজ কাপড় বোনা হ'তে পারে। সেই জায়গায় হাতে চালান তাঁতে দৈনিক ১০ গজ আন্দাজ হ'তে পারে। তবে হাতের তাঁতের চেয়ে কলের তাঁতের দাম অনেকগুণ বেশী। তা ছাড়া কলের তাঁতীকে যে মজুরী দিতে হয় তার একটা সামান্য অংশ পেলেই গ্রামের তাঁতী খুনী হয়।

হয়েছে, এবং গ্রামের দৈন্য বেড়েছে। ফলে পেষাই ক'রলে শতকরা আন্দাজ পাঁচ ভাগ বেশী তেল পাওয়া যায়। সেটা এমন কিছু বেশী নয়। গ্রামের কোলের মাঠ থেকে তৈল বীজ আসে। এই বীজ সহরে নিয়ে যেতে খরচা আছে। সেখান থেকে আবার নানা জায়গায় তেল সরবরাহ ক'রতেও খরচ আছে। গ্রামে পেষাই হ'লে এই খরচের অনেকখানি বাঁচে। উপরন্তু খোলটা সার হিসাবে ও গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সেদিক দিয়েও গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কতকগুলি তেল আছে যেগু'লি প্রধানতঃ অন্য শিল্পের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার হয়; যেমন, তিসির তেল, তুলোর বীজের তেল ইত্যাদি। এগুলি বড় বড় কারখানায় যন্ত্রের সাহায্যে পেষাই হওয়াই ভাল। কারণ, শিল্পের উপকরণ যথাসম্ভব সস্তা হওয়া দরকার। কিন্তু সর্ষের তেল, তিলের তেল, কি বাদাম তেলের ব্যবসায় গ্রামের কলুদের হাতেই থাকা উচিত। গ্রামাঞ্চলের আর একটি বড় ব্যবসায় হচ্ছে ঘিয়ের ব্যবসায়। বৎসরে ৫লক্ষ টনের ওপর ঘি উৎপন্ন হয়, এবং এর শতকরা ৭০ ভাগ বিক্রী হয়। এ ব্যবসায়ের যতই প্রসার হয় ততই মঙ্গল। কিছু কাল যাবৎ এ ব্যবসায়ের একটি বিপদ দেখা দিয়েছে। সেটি হচ্ছে বনস্পতি বা নকল ঘি। বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্র পাতি আমদানী ক'রে এই ব্যবসায়ের পত্তন করায়, দেশের কোন সত্যকার উপকার হয়েছে বলা চলে না। এই সামগ্রী প্রধানতঃ বাদাম তেল থেকে তৈরী হয়। বাদাম তেল নিজেই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য। বহু লোক রান্নায় বাদাম তেল ব্যবহার করে। এ অবস্থায় ঐ তেলকে একটি নূতন রূপ দেবার কোন অর্থ হয় না। অথচ এর কুফল হয়েছে এই, যে এতে করে খাঁটি ঘিয়ের বাজার নষ্ট হচ্ছে। এ কারবারের যত প্রসার হবে, তত ঘিয়ের ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে, এবং দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়বে। এই প্রসঙ্গে শর্করা শিল্পের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। গত ২০ বৎসর যাবৎ সরকারী সাহায্যে এই শিল্পটির পরিপুষ্টি সাধন করা হয়েছে। কিন্তু তাতে দেশের সত্যকারের উপকার হয়েছে বলা চলে না। একথা সত্য যে পুরোণো উপায়ে ধবধবে সাদা দানাদার চিনি তৈরী করা যায় না। কিন্তু তার জন্য, আমাদের এক দিকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কিনতে হয়েছে; এবং অন্য দিকে, আগে যে সমস্ত লোক মিছিচিনি ও মিছরী তৈরী ক'রে অন্ন সংস্থান ক'রত তাদের বেকার হ'তে হয়েছে। এখন আবার ধুয়ো উঠেছে যে গুড়ের কারবারে বড় বেশী আখ টেনে নিচ্ছে; অতএব, চিনির কলগুলির লাভ বজায় রাখবার জন্য, গুড়ের কারবার নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই রকম অনিষ্টকর নীতি যদি সরকারী মহলে প্রশ্রয় পায় তা হ'লে গ্রাম্যাঞ্চলের একটি বড় ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হবে। তাতে বেকার সংখ্যা বাড়বে, এবং দেশের লোক একটি সুলভ ও সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হবে। গুড় চিনির চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। বরঞ্চ অনেকে চিনির চেয়ে গুড় বেশী পছন্দ করে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিক্ থেকে গুড় চিনির চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট খাদ্য।

এই ধরণের আরও গুটিকতক শিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলিকে যন্ত্র-শিল্পে পরিণত করার ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েচে। আমাদের দেশে নির্ব্বিচারে যন্ত্র শিল্পের পত্তন ক'রতে দিলে দেশের উপকার হবে না। শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা এমন হওয়া চাই যে, কোন যন্ত্রশিল্প যেন গ্রাম শিল্পের ক্ষতি ক'রতে না পারে ; এবং গ্রামে যে জিনিষ তৈরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে সে জিনিষের জন্যে যেন সহরে বড় বড় কারখানার পত্তন করা না হয়। গ্রামগুলিকে যদি সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর ক'রে তোলা যায়, তা হ'লে শুধু আর্থিক সমস্যা নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানা রকমের সামাজিক সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়।

যুক্ত যোগান (Joint Supply)--অনেক সময় দুটো তিনটে জিনিষ এক সঙ্গে তৈরী হয় ; অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কোনটি আলাদা ক'রে তৈরী করা যায় না ; একটি তৈরী ক'রতে গেলেই অন্যগুলি সেই সঙ্গে তৈরী হ'য়ে যায়। যেমন গ্যাস ও কোক কয়লা। গ্যাস তৈরী ক'রতে হ'লে কয়লা পোড়াতে হয় ; যেটা পড়ে থাকে সেটা কোক কয়লা। এ রকম ক্ষেত্রে ঐ দুইটির যোগানকে বলে যুক্ত যোগান। ধান ও খড়, তেল ও খোল, তুলো ও তুলোর বীজ, মাখন ও মাঠা তোলা দুধ প্রভৃতি যুক্ত যোগানের অন্যান্য দৃষ্টান্ত।

যুক্ত যোগানের সামগ্রীগুলির প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা তৈরী খরচার হিসাব করা যায় না। মোট খরচের হিসাব হয় ; এবং এই মাত্র বলা চলে যে বিভিন্ন সামগ্রীগুলি এমন দরে বিক্রয় হওয়া চাই যে, মোট বিক্রীর টাকা মোট খরচের সমান হবে। কোন একটির দামের সঙ্গে তার নিজস্ব তৈরী খরচার কোন সম্পর্ক আছে এ রকম কিছু দেখান যায় না। অবশ্য এটুকু বলা চলে যে, কোন একটিকে বিক্রয়-যোগ্য করতে হলে যদি তার ওপর বাড়্তি কিছু খরচ করতে হয় তা'হলে তার দাম এই বাড়্তি খরচের চেয়ে কম হতে পারে না। যদি মাঠা তোলা দুধকে বিক্রয় করতে হলে তাকে 'কেসিন' গুঁড়া বা জমা দুধ আকারে বিক্রয় করতে হয়, 'তা হলে সেই কাজ করবার জন্য যে বাড়তি খরচ হবে, 'কেসিন গুঁড়া বা জমা দুধের দাম তার চেয়ে কম হতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে এই বাড়্তি খরচের চেয়ে কত বেশী দরে বিক্রয় হবে, তা নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে চাহিদার ওপর।

যেখানে যুক্ত যোগানের সামগ্রীগুলির আপেক্ষিক পরিমাণ অল্প-বিস্তর বদ্লান যায়, সেখানে প্রত্যেকটির দর তার প্রান্তিক তৈরী খরচার সমান হবে, এ কথা প্রমাণ করা যায়। দুধে কত ভাগ মাখন পাওয়া যাবে, তা কতকটা নির্ভর করে গরুকে কি খেতে দেওয়া হচ্ছে তার ওপর। ধরা যাক্ যে একটি গোয়ালার ২০টি গরু আছে, এবং সে পরীক্ষা করে দেখেছে যে যদি রোজ গরুগুলিকে ১০৲ টাকার বাড়তি ছোলা খাওয়ান যায়, তা হ'লে ২০৲ টাকা মূল্যের বাড়্তি মাখন পাওয়া যায়। এ অবস্থায় সে অবশ্যই ১০৲ টাকা বাড়্তি খরচ করবে। যদি আরও ১০৲ টাকার ছোলা খাওয়ালে আরও ১৫৲ টাকার বেশী মাখন পাওয়া

যায়, তা হলে সে, সে খরচও করবে। এই ভাবে সে ছোলা খাওয়ানর খরচ বাড়িয়ে চলবে, যতক্ষণ না বাড়্তি খরচ বাড়্তি লাভের সমান হয়। অতএব মাখনের দাম, আর মাখনের প্রান্তিক তৈরী খরচা সমান হবে।

সাধারণতঃ, যুক্ত-যোগানের সামগ্রীগুলির মধ্যে যদি একটির চাহিদা বাড়ে, তা হ'লে অন্যগুলির যোগান বাড়্বে, এবং দর কম্বে। যদি গ্যাসের চাহিদা বাড়ে তা হ'লে বেশী গ্যাস তৈরী করবার জন্য বেশী কয়লা পোড়াতে হবে। অতএব বেশী কোক তৈরী হবে। যেহেতু কোকের চাহিদার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি, সেহেতু বেশী পরিমাণ বিক্রী করবার জন্য দর কমাতে হবে। যেখানে আপেক্ষিক পরিমাণ বদলান যায়, সেখানে অবশ্য যেটির চাহিদা বেড়েচে শুধু সেইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করবার চেষ্টা হবে। কোন ক্ষেত্রেই এ চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না। যে ক্ষেত্রে যতটা সফল হবে, সে ক্ষেত্রে যুক্ত-যোগানের অন্যান্য সামগ্রীগুলির পরিমাণ তত কম বাড়্বে, এবং সেগুলির দরও তত কম কম্বে।

বিকল্প চাহিদা (Alternate Demand)

এক একটি সামগ্রীর নানা রকমের ব্যবহার আছে। যেমন চাল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়; আবার তা থেকে মদ তৈরী হয়; এবং ভাতের মাড় করে সুতোকলে ব্যবহার হয়। তেম্নি, চর্ব্বি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়, আবার তা থেকে সাবান তৈরী হয়, এবং বাতি তৈরী হয়। এগুলি একই জিনিষের বিকল্প চাহিদা। এই সমস্ত দিকের চাহিদাগুলি যোগ করলে তবে বাজারে সেই সামগ্রীর মোট চাহিদার হিসাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ মোট চাহিদাটি একটি মিশ্রিত চাহিদা (Composite Demand)। মোট যোগানটুকু বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এমন পরিমাণে ব্যবহার হয় যে, প্রত্যেক দিকের প্রান্তিক উপকার সমান হয়, এবং দর দিয়ে এই প্রান্তিক উপকারের মাপ পাওয়া যায়। বিকল্প চাহিদার সামগ্রীর যদি এক দিকের চাহিদা কমে কিংবা বাড়ে, তা হ'লে তার জন্য দরের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে, তার ফল, যারা ঐ সামগ্রী অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তাদের ওপর গিয়েও বর্ত্তাবে।

বিকল্প যোগান (Alternate Supply)

অনেক সময়ে একই ধরণের চাহিদা মেটাবার জন্য বিভিন্ন সামগ্রীর ব্যবহার হয়। যেমন, চিনির চাহিদা মেটান হয়, আখের চিনি ও বীট-পালমের চিনি এই দুরকম জিনিষ দিয়েই। তেম্নি বাড়ীর ছাদের জন্য 'গ্যাল্ভানাইস্ড' (Galvanised) লোহার চাদর এবং এ্যাজ্বেস্টোস (Asbestors) চাদর দুরকম জিনিষেরই ব্যবহার হয়। সহরের রাস্তায় যাতায়াতের জন্য ট্রাম এবং বাস, মাল আনা নেওয়ার জন্য রেল, ষ্টীমার ও মোটর লরী ইত্যাদি বিকল্প যোগানের অন্যান্য দৃষ্টান্ত। বিকল্প যোগানের সবগুলির পরিমাণ যোগ করলে তবে মোট

যোগানের হিসাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ, মোট যোগানটি একটি মিশ্রিত যোগান (Composite Supply)। বিকল্প যোগানের সামগ্রীগুলির কোন একটির দর বাড়লে কিংবা কমলে অন্যগুলিরও দর বাড়ে ও কমে।

বাজারে বিভিন্ন সামগ্রীর দরের মধ্যে কি ধরণের সব যোগাযোগ ও পরস্পর-নির্ভরতা থাকে, তা আমরা দেখলাম। এই আলোচনার সার্থকতা এই যে, এতে করে বুঝতে পারা যায়, বাজারে কোন জিনিষের দরের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে, কত দিক দিয়ে অনুসন্ধান করলে, তবে তার সঠিক কারণের খোঁজ পাওয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

একচেটিয়া কারবারে মূল্য নির্দ্ধারণ।

(১)

প্রান্তিক আদায় প্রান্তিক খরচের সমান হ'লে লাভ সবচেয়ে বেশী হয়।

অন্যান্য কারবারীর মত একচেটিয়া কারবারীও চায়, কিসে তার নীট লাভ সবচেয়ে বেশী হয়। যে ক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রতিযোগী যোগানদার থাকে, সে ক্ষেত্রে কেহই খুসীমত যে কোন দরে মাল বিক্রী ক'রতে পাবে না। সকলকেই মোটামুটি এক দরে বেচ্‌তে হয়। আমরা দেখেছি, দীর্ঘকালের হিসাব নিলে, এই দর তৈরী খরচার সমান হয়। কেহ যদি এই দরের চেয়ে বেশী দর আদায় করার চেষ্টা করে, তা হ'লে তার খরিদ্দারেরা অন্য জায়গা থেকে মাল নিতে আরম্ভ ক'রবে, এবং তার ব্যবসা নষ্ট হবে। একচেটিয়া কারবারীর এইখানে সুবিধা। সে বাজারে যোগান কমিয়ে, দর খুসী মত উঁচিয়ে রাখতে পারে।

দর যত বেশী রাখা যায় ততই যে নীট লাভ বেশী হয়, তা নয়। তার কারণ, কম দরে যে পরিমাণ বিক্রী হয়, বেশী দরে তা হয় না। বিক্রীর পরিমাণকে দর দিয়ে গুণ ক'রলে মোট আদায়ের হিসাব পাওয়া যায়। ঐ পরিমাণ তৈরী ক'রতে মোট খরচ যত পড়ে তার চেয়ে এই মোট আদায় যত বেশী, সেটি হ'ল ঐ পরিমাণের নীট লাভ। একচেটিয়া কারবারী হিসাব ক'রে দেখে, কি পরিমাণ তৈরী ক'রলে এবং বিক্রয় ক'রলে, এই নীট লাভ সবচেয়ে বেশী হয়। সে সেই পরিমাণ তৈরী করে, এবং তদনুরূপ দর ধার্য্য করে।

চাহিদার প্রকৃতি যদি এমন হয় যে, সামান্য দর কমালে বিক্রীর পরিমাণ অনেক বাড়ে, সে ক্ষেত্রে কম দর রেখে বেশী মাল বেচ্‌লে নীট লাভ বেশী হবার সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে, মাল বেশী তৈরী ক'রলে যদি মাত্রা-পিছু তৈরী-খরচা ক'ম্‌তে থাকে, তা হ'লে যোগান

বাড়ালে এবং দর কমালে নীট লাভ আরও বেশী হবার সম্ভাবনা। অন্যপক্ষে, যে ক্ষেত্রে চাহিদা মন্থরগতি, এবং সেই সঙ্গে বেশী পরিমাণ তৈরী ক'রতে হ'লে মাত্রা-পিছু তৈরী খরচা বাড়তে থাকে, সে ক্ষেত্রে যোগান কম রেখে বেশী দরে বিক্রী ক'রলে, তবে একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

ঠিক্ কতটুকু পর্য্যন্ত যোগান বাড়ালে, নীট লাভ সবচেয়ে বেশী হয়, তার হিসাব এইভাবে করা চলে। যোগানের পরিমাণ এক মাত্রা বাড়ালে যেমন বিক্রীর পরিমাণ কিছু বাড়বে, তেমনি আগেকার চেয়ে একটু কম দরে সবটুকু বেচ্‌তে হবে। এখনকার পরিমাণকে এখনকার দর দিয়ে গুণ ক'রলে এখনকার মোট আদায়ের হিসাব পাওয়া যায়। এই মোট আদায় আগেকার মোট আদায়ের চেয়ে যত বেশী, সেইটি হ'ল এই পরিমাণের **প্রান্তিক আদায় (marginal revenue)**। তেমনি এক মাত্রা যোগান বাড়ানর দরুণ যে বাড়তি খরচ হ'ল সেইটি এই পরিমাণের **প্রান্তিক খরচ (marginal cost)**। প্রান্তিক আদায় প্রান্তিক খরচের চেয়ে যত বেশী হ'ল, এক মাত্রা যোগান বাড়ান'র ফলে নীট লাভ ততখানি বেশী হ'ল। যতক্ষণ প্রান্তিক আদায় প্রান্তিক খরচের চেয়ে বেশী থাকবে, ততক্ষণ যোগানের পরিমাণ বাড়ান চল্‌তে থাকবে। যে অবস্থায় এই দুইটি সমান হ'বে, সেই অবস্থায় নীট লাভ সবচেয়ে বেশী হবে। অতএব একচেটিয়া কারবারী ঠিক্ সে পরিমাণ মালের যোগান দেবে।

প্রকৃতপক্ষে অবশ্য, এই ধরণের সূক্ষ্ম হিসাব করে কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ী দর স্থির করে না। করা যায়ও না। তার কারণ, কোন সামগ্রীর যোগান বা চাহিদার পূর্ণ পরিচয় কারও জানা থাকবার কথা নয়। অতএব দর স্থির করবার সময় কতকটা অভিজ্ঞতা এবং কতকটা আন্দাজের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গতি থাকে না। এইখানেই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শিল্পপতিদের কৃতিত্ব। তারা, যে দরে সর্ব্বাধিক নীট লাভ হবার কথা, তার খুব কাছাকাছি যেতে পারে।

(২)

একাধিক দরের সাহায্যে নীট লাভ বাড়ান যায়।

অনেক সময় একচেটিয়া কারবারী বিভিন্ন শ্রেণীর খরিদ্দারের জন্য বিভিন্ন দর ধার্য্য করে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাদের যতটা সয় তাদের কাছ থেকে ততটা আদায় করা। এতে করে নীট লাভের পরিমাণ বাড়ান যায়। প্রত্যেক খরিদ্দারের কাছ থেকে যদি, যার চেয়ে বেশী দাম হ'লে সে কিন্‌বে না, সেই দাম আদায় করা যেত, তা হ'লে নীট লাভ সবচেয়ে বেশী হ'ত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এতখানি বৈষম্য করা চলে না। তাতে বদ্‌নামেরও ভয় আছে। সেই জন্য, খরিদ্দারদের কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, এবং প্রত্যেক ভাগের জন্য আলাদা আলাদা দর ধার্য্য হয়। প্রধানতঃ তিন ধরণের বৈষম্য করা হয়—

১। ধনগত বৈষম্য—দৃষ্টান্ত স্বরূপ রেলের যাত্রীদের জন্য শ্রেণী ভেদের উল্লেখ করা যেতে পারে। বেশী সঙ্গতিপন্ন লোকদের কাছ থেকে যাতে বেশী দাম আদায় করা যায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই শ্রেণী বিভাগ করা হয়। অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের চাইতে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের কিছু বেশী আরাম ও সুবিধা দেবার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু তার জন্য যে অতিরিক্ত খরচা পড়ে, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ও প্রথম শ্রেণীর টিকিটের দামে যে পার্থক্য, তার অনুপাতে এই খরচ নগণ্য।

২। স্থানগত বৈষম্য—অনেক ক্ষেত্রে স্বদেশের সংরক্ষিত বাজারে দাম উঁচু রেখে, বিদেশে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে সেখানে নীচু দর রাখা হয়।

৩। ব্যবহার গত বৈষম্য—ইলেকট্রীক কোম্পানী আলো এবং পাখার জন্য বেশী দর নেয়; এবং রান্না করা বা যন্ত্রপাতি চালান'র জন্য অনেক কম দর নেয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

'স্পেকুলেশন' (Speculation = ফট্‌কা কারবার)

(১)

'স্পেকুলেশন' শব্দে একটি বিশেষ রকমের কেনা-বেচা বোঝায়।

'স্পেকুলেশন' সম্বন্ধে অনেকের মনে একটু বিকৃত ধারণা আছে। কেউ স্পেকুলেশনের বাজারে বড়মানুষ হয়েছে শুন্‌লে, তারা ধ'রে নেয় যে, সে নিশ্চয়ই একজন ধূর্ত্ত ও শঠপ্রকৃতির লোক; সে মাল কেনা-বেচার ভেতর দিয়ে, আইন বাঁচিয়ে, লোক ঠকান'র কৌশল জানে। এবং সেই ভাবেই সে পয়সা করেছে। কিন্তু এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে যে অসাধু উপায় নেওয়া হয় না, তা নয়। এবং এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয় ব'লেই স্পেকুলেশনের এত বদনাম। তা হ'লেও, এগুলি ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। স্পেকুলেশনের প্রয়োজন আছে বলেই, স্পেকুলেশনের বাজার গ'ড়ে উঠেছে। এ বাজার না থাক্‌লে দেশের শিল্প-বাণিজ্যে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটত।

'স্পেকুলেশন' কথাটায় একটি বিশেষ রকমের কেনা-বেচা বোঝায়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাজারে দর ওঠা-নামার সুযোগ নিয়ে, তাই থেকে লাভ করা। যোগান ও চাহিদার ধারা লক্ষ্য ক'রে, ভবিষ্যতে বাজার দর কি হবে, সেটি আগে থকে বোঝ্‌বার চেষ্টা করা হয়; এবং সেই অনুযায়ী কেনা-বেচা করা হয়। যে প্রত্যাশা করে যে বাজার দর চড়বে, সে কেনে; যাতে ক'রে, যখন দর চড়্‌বে তখন সেই চড়া দরে এই মাল বেচে সে লাভ ক'রতে পারে।

যে প্রত্যাশা করে যে দর ক'মবে, সে বিক্রী করে ; যাতে যখন দর ক'মবে তখন সেই কম দরে কিনে সে লাভ ক'রতে পারে। এই ধরণের কেনা-বেচার বিশেষত্ব এই যে, কেনা-বেচার চুক্তিটা হয় এখন, এবং দরও ঠিক হয় এখন ; কিন্তু মাল দেওয়া নেওয়ার এবং দাম নেওয়া দেওয়ার কাজটা, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য তোলা থাকে। সেই দিন হচ্ছে দুই পক্ষেরই চুক্তি সম্পাদনের দিন। এই জন্য এই বাজারকে Future's market (Future = ভবিষ্যৎকাল ; Market = বাজার) বলে। আমরা এর নাম দিতে পারি "আগাম বাজার"। ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে, প্রায় ক্ষেত্রেই, প্রকৃতপক্ষে কোন রকম মাল দেওয়া নেওয়া হয় না। ঐদিনের বাজার দরের সঙ্গে চুক্তির দর মিলিয়ে কার কত লাভ হবে কি লোকসান হবে, সেটি খতান হয় ; এবং এক পক্ষ আর এক পক্ষকে সেই টাকাটা দিয়ে দেয়। আগাম বাজারে, প্রায় ক্ষেত্রেই, এইভাবে চুক্তি মেটান' হয়। আগাম-বাজারে যখন একটা কেনা-বেচার চুক্তি হয়, তখন সব সময়েই যে একপক্ষ ভাবে দর চড়বে, এবং অন্য পক্ষ ভাবে দর ক'মবে, তা নয়। দু পক্ষই ভাবতে পারে, দর চড়বে ; কিংবা দু পক্ষই ভাবতে পারে, দর ক'মবে। কিন্তু, কতখানি বাড়বে কিংবা কতখানি ক'মবে, সেই বিষয়ে যদি তাদের আন্দাজের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তা হ'লেই তাদের মধ্যে কেনা-বেচা হ'তে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক্ যে, এখন গমের বাজার দর ২০৲ টাকা মণ। গমের আগাম-বাজারের অভিজ্ঞ ব্যাপারীদের প্রায় সকলেরই ধারণা যে বাজার এখন উঠতির মুখে। তাদের মধ্যে এক জনের ধারণা, যে এক সপ্তাহ বাদে, দর হবে ২০॥০ মণ। আর এক জনের ধারণা, ঐ দিনে দর হবে ২০।০ মণ। এখন এই দু জনের মধ্যে কেনা-বেচার চুক্তি হ'তে পারে। প্রথম লোকটি ২০॥০ আনার কম যে কোন দরে কিনতে রাজী, এবং ২০॥০ আনার বেশী যে কোন দরে বেচতে রাজী। তেমনি দ্বিতীয় লোকটি ২০।০ আনার কম যে কোন দরে কিনতে রাজী, এবং ২০।০ আনার বেশী যে কোন দরে বেচতে রাজী। অতএব ২০॥০ আনা ও ২০।০ আনার মধ্যে যে কোন দরে প্রথম লোকটি কিনতে রাজী, এবং দ্বিতীয় লোকটি বেচতে রাজী। অতএব এ দু জনের মধ্যে এখন এক হপ্তার মেয়াদে কেনা-বেচার চুক্তি হ'তে পারে।

যে সমস্ত পণ্যের আগাম কেনা-বেচা খুব বেশী পরিমাণে হ'য়ে থাকে, সেগুলি হচ্ছে পাট ও পাটের থান, তুলা, পশম, গম, তিসি, কফি, চিনি, রবার ইত্যাদি। এই সব সামগ্রীগুলির বিশেষত্ব এই যে, প্রথমতঃ এগুলি বহুস্থানে এবং বিপুল পরিমাণে ব্যবহার হয় ; এবং দ্বিতীয়তঃ, এগুলি সওদা করবার সময় মাল দেখে পরীক্ষা করে নেবার দরকার হয় না ; নাম বা মার্কা বা আপেক্ষিক গুণবাচক সংখ্যা উল্লেখ করে এগুলির গুণাগুণ জানা ও জানান যায়।

স্পেকুলেশন সবচেয়ে বেশী হয় শেয়ার বাজারে।

(২)

স্পেকুলেশনের সুফল

স্পেকুলেশনের ফলে জনসাধারণের একটি উপকার হয়—বাজার দরের হ্রাস বৃদ্ধি অনেকটা সংযত থাকে। অবশ্য যারা স্পেকুলেশন করে তারা যে সাধারণের উপকার করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজ করে, তা নয়। যেমন অন্য ব্যবসায়ে, তেম্‌নি এ ক্ষেত্রেও প্রত্যেকে ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশায় কেনা-বেচা করে। তবে এই ধরণের কেনা-বেচার রেওয়াজ থাকার দরুণ এর পরোক্ষ ফল এই হয় যে, বাজার দর বেশী রকম ওঠা-নামা করতে পায় না। এতে করে দেশের নানা দিক দিয়ে উপকার হয়। যদি কোন সামগ্রীর দর এক সময় অত্যন্ত কম হয় এবং অন্য সময়ে অত্যন্ত বেশী হয় তা হ'লে যখন দর অত্যন্ত কম থাকে তখন অনেকখানি পরিমাণ অতি তুচ্ছ কাজের জন্য ব্যবহার করে অপব্যয় করা হয়; এবং তার ফলে যখন যোগানে ঘাটতি পড়ে এবং দর অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন অতি গুরু প্রয়োজনের জন্যও অনেকে সঙ্গতির অভাবে ঐ সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে না। এতে দেশের ক্ষতি। যদি এক সময়ে গমের দর এত কমে যে জন্তু জানোয়ারকে খেতে দেওয়া হয়, এবং আর এক সময়ে এত চড়ে যে অনেকের দুবেলা খাওয়া জোটে না, তা হলে দেশের পক্ষে নিশ্চয়ই সেটা ভাল নয়। যে যোগান দেশে আছে তা থেকে সর্ব্বাধিক উপকার পেতে হলে প্রান্তিক উপকার বরাবর সমান থাকা দরকার। একটি মাঝারি দরে সবটুকু বিক্রয় হলেই এরূপ হওয়া সম্ভব। দর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে না পারলে, দেশের বণিক ও শিল্প-পতিদেরও কাজে অসুবিধা হয়। বণিককে আগে থেকে মাল কিনে মজুত রাখতে হয়। পরে যদি দর হঠাৎ বেশী রকম প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা হ'লে সে ভরসা ক'রে মাল মজুত ক'রতে পারে না। শিল্প-প্রতিষ্ঠানেও তেম্‌নি কাঁচা মালকে তৈরী মালে রূপান্তরিত করতে সময় লাগে। কাঁচা মালের দর সম্বন্ধে যদি অনিশ্চয়তা থাকে, তা হ'লে তৈরী মালের দীর্ঘ-মেয়াদী অর্ডার নেওয়া যায় না, বা তার জন্য 'টেণ্ডার'ও দেওয়া যায় না।

এই বিষয়ে ফাটকা-বাজার বণিক ও শিল্প-পতিদের যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রথমতঃ ফাটকা কেনা-বেচার ফলে দর বেশী রকম ওঠা-নাবা ক'রতে পায় না। এবং দ্বিতীয়তঃ ফাট্‌কা কারবারীরা দর ওঠা-নামার ঝুঁকি নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে, বণিক ও শিল্প-পতিদের নিজের নিজের আসল কাজে সমস্ত মন নিয়োগ ক'রবার সুযোগ দেয়।

ফাট্‌কা কেনা-বেচার প্রকৃতি আলোচনা ক'রলে বোঝা যায়, কেন এর ফলে, সর্ব্বাধিক দর ও সর্ব্বনিম্ন দরের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি কমে যায়। দর ওঠা-নামার কারণ দু' রকমের। এক, যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি; আর এক, চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি। এই হ্রাস-বৃদ্ধির

কি কারণ, কোথায় কখন ঘটছে, বা ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে নানা লোক নজর রাখে এবং প্রকাশ ও প্রচার করে। সরকারী দপ্তর এবং বে-সরকারী নানা প্রতিষ্ঠান এই সব তথ্যের দৈনিক বা সাময়িক বিবরণী ছাপায়। কোথায় কি রকম বৃষ্টি বা তুষারপাত হয়েছে, কোথায় কোন্ ফসল বোনা বা তোলা কতদূর এগিয়েছে, কোথায় কোন্ জিনিসের দর বাড়ছে বা কমছে, এবং অন্য জিনিসের দরের ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, কোথায় যুদ্ধ বা অনুরূপ কারণে নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, এই সব ধরণের খবরাখবর ঐ বিবরণীগুলিতে পাওয়া যায়। বিচক্ষণ ফাট্‌কা কারবারীরা এই সব খবর যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করে, এবং অন্যান্য সূত্রেও এই ধরণের খবরাখবর সংগ্রহ করে। এবং এই সব খবর বিচার করে, কেনা বেচার সিদ্ধান্ত করে। প্রায় ক্ষেত্রেই তারা ঠিকমত ধরতে পারে, দর কোন্ মুখে। ওদের মধ্যে যে যত সূক্ষ্মদর্শী, কতদূর বাড়বে কি কতদূর কমবে সে সম্বন্ধে, তার আন্দাজ তত ঠিক হয়।

যখন ভবিষ্যতে দর চড়বার কারণ ঘটে, তখন ফাট্‌কা কারবারীরা আগাম কিনতে থাকে, এবং এখনকার চলতি দরের চেয়ে বেশী দর দিতে রাজী হয়। তার ফলে এখনকার দরও চড়তে থাকে। কারণ, যাদের হাতে মাল আছে তারা যদি দেখে যে, কিছুদিন অপেক্ষা ক'রলেই বেশী দর পাওয়া যাবে, তখন তারা এখনকার দরও চড়িয়ে দেয়। ফলে আগেকার দরে যতখানি মাল বিক্রী হ'ত, তা আর হয় না, কিছু মাল মজুত থেকে যায়। ভবিষ্যতে যখন দর চড়বার কথা, তখন যোগানের ঘাটতি পূরণ করবার জন্য এই মজুত মাল কাজে লাগে। অতএব দর বেশী চড়তে পায় না।

যখন ভবিষ্যতে দর কমবার কারণ ঘটে, তখন ফাট্‌কা কারবারীরা আগাম বেচতে থাকে, এবং এখনকার চলতি দরের চেয়ে কম দর নিতে রাজী হয়। তার ফলে এখনকার দরও কমতে থাকে। কারণ, খরিদ্দারদের মধ্যে যারা কিছুদিন অপেক্ষা ক'রতে পারে তারা আর এখনকার বেশী দরে মাল কিনতে চাইবে না; এবং যোগানদাররাও মজুত মাল তাড়াতাড়ি কাটাবার চেষ্টা করবে, যাতে পরে লোকসান আরও বেশী না হয়। ফলে, এখনকার সমস্ত মাল বিক্রী হয়ে যাবে; ভবিষ্যতের জন্য কিছু মজুত থাকবে না। অতএব, ভবিষ্যতে দর খুব বেশী ক'মবে না।

আসলে, আগাম কেনা-বেচার ফলে বাজারের কালগত বিস্তৃতি হয়। বাজারের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অনেক সমগ্রীর বাজারের এলাকা খুব বড় হয়। এ হ'ল বাজারের স্থানগত বা দেশগত বিস্তৃতি। এই সমস্ত এলাকাটিতে যোগানদারদের ও খরিদ্দারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এ রকম হয় যে, সমস্ত বেচা-কেনা মোটামুটি একই দরে হয়। আগাম কেনাবেচার ফলে বর্তমানের যোগানদার ও খরিদ্দার এবং ভবিষ্যতের যোগানদার ও খরিদ্দারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা স্থাপিত হয়, এবং তার ফলে

এখনকার বাজার ও ভবিষ্যতের বাজার, এ দুইটি একটি বাজারে পরিণত হয়। এই সমস্ত সময়টা নিয়ে দর মোটামুটি সমান থাকে।

কতকগুলি সামগ্রীর আগাম কেনা-বেচার বাজার থাকাতে, অনেক সময়ে শিল্প-পতিদের বেশ সুবিধা হয়। তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল আগাম কিনে রাখতে পারে। কখন কখন, অনেকদিন ধরে, দফায় দফায়, কোন তৈরী মাল সরবরাহ করবার অর্ডার পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে কাঁচা মালের দর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে না পারলে, তৈরী মালের দর দেওয়া যায় না। হয়তো সরকারী সৈন্য বিভাগ থেকে টেণ্ডার চাওয়া হয়েছে যে, তিন মাস ধরে প্রত্যেক হপ্তায় হাজার মণ করে ময়দা সরবরাহ ক'রতে হবে। কোন ময়দার কলের পক্ষে দর দিতে হ'লে, বরাবর সুবিধা দরে গম কিনতে পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। অবশ্য, সমস্ত অর্ডারটির মাল সরবরাহ করবার জন্য যত গম দরকার, সবটুকু একসঙ্গে কিনে মজুত করা যায়। তা হ'লে পরে গমের দর চড়লে লোকসান দিয়ে ময়দা বেচতে হবে, এ ভয় আর থাকে না। কিন্তু তা ক'রতে হ'লে অনেকখানি মূলধন আটকে রাখতে হয়। সাধারণতঃ কোন ময়দার কলের পক্ষেই এ কাজ করা পোষায় না। তারা আগাম বাজারে নির্দ্দিষ্ট দরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গম কিনে লোকসানের ঝুঁকি থেকে নিজেদের মুক্ত করে। দর ওঠানামার সম্ভাবনা থাকবেই; এবং তার ঝুঁকি কাউকে না কাউকে নিতে হবেই। ফাটকা কারবারীরা যে ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি নেয়, সে ক্ষেত্রে শিল্প-পতিদের আর এই ঝুঁকি বহন ক'রতে হয় না।

(৩)

ক্ষতিকর স্পেকুলেশন

স্পেকুলেশনের দ্বারা দেশে বৈষয়িক জীবনের কি ধরণের সুবিধা হয়, তা আমরা দেখলাম। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে সুবিধা হয়, তা নয়। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে, উপকার না হ'য়ে, যথেষ্ট অপকার হয়। এবং দেশের কল্যাণের জন্য, এ সব ক্ষেত্রে স্পেকুলেশন বন্ধ করে দেবার উপযোগী কার্য্যকর উপায় অবলম্বন করা উচিৎ। ক্ষতিকর স্পেকুলেশন তিন রকমের—

১। যে ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ সাধারণ লোক স্পেকুলেশন করে। এদের, বাজার দরের গতি বুঝতে যে জ্ঞান ও বিচার-শক্তির দরকার, তার কিছুই নেই। এরা ফাট্‌কা বাজারে যায় ভাগ্য পরীক্ষা ক'রবার জন্য। ফাট্‌কা কেনা বেচার সঙ্গে জুয়া-খেলার যে একটা প্রভেদ আছে, সে বোধই তাদের নেই। অতএব অনেক ক্ষেত্রে, যখন বিক্রী করা উচিত, তখন তারা কেনে; এবং যখন কেনা উচিত, তখন তারা বিক্রী করে। তাতে বাজার দরের ওঠা নামা কমা দূরে থাকুক, আরও বাড়ে।

২। কম মূলধন নিয়ে স্পেকুলেশন করা। ফাট্‌কা কেনা-বেচার চুক্তি মত কাজ ক'রবার সময় এলে, যদি কোন পক্ষ মূলধনের স্বল্পতার দরুণ তা ক'রতে অসমর্থ হয়, তা হ'লে শুধু যে সেই লোক দেউলিয়া হয় তা নয়; তার সঙ্গে আরও অন্য লোকেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কারণ, ফাট্‌কা বাজারের ধারাই এ রকম যে, একজনের কথার উপর নির্ভর ক'রে আর একজন আর একটি চুক্তি করে; সেই চুক্তির উপর নির্ভর ক'রে আর একজন আর একটি চুক্তি ক'রে; এই রকম। অতএব, একজন চুক্তিমত কাজ ক'রতে অসমর্থ হ'লে, আরও অনেকে বিব্রত হ'য়ে পড়ে, এবং বাজারে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই বিপদ দূর করবার একটি কৌশল, কোন কোন ফাট্‌কা বাজারে চালু আছে। কোন আগাম কেনা বেচার চুক্তি হ'লেই, দু পক্ষকেই কিছু কিছু টাকা, বাজারের কর্তৃপক্ষের হাতে জমা রাখ্‌তে হয়। চুক্তিমত কাজ করবার সময় এলে, এই টাকা থেকে দেনা-পাওনা মেটান হয়*। যার জিত হ'ল সে নিজের টাকা তুলে নিলে, এবং অপর পক্ষের গচ্ছিত টাকা থেকে হিসাব মত পাওনা মিটিয়ে পেলে। যার হার হ'ল, তার টাকা নেই এই অজুহাতে দেনা শুধ্‌তে পারলে না, এ অবস্থা আর হ'তে পেলে না।

৩। স্পেকুলেশনের দ্বারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় তখন, যখন অভিজ্ঞ কারবারীরা ইচ্ছে ক'রে বাজারকে বিভ্রান্ত করে। খুব নামজাদা ফাট্‌কা কারবারীরা সময়ে সময়ে এই অপকর্ম্ম করে। বাজারে অনেক সময়ে এমন দু চার জ'ন লোক থাকে, যারা এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ও এত খবর রাখে যে, তাদের ভুল বড় একটা হয় না। স্বভাবতঃই অন্যান্য কারবারীরা তাদের কেনা-বেচার ওপর নজর রাখে, এবং সেই অনুযায়ী কেনা-বেচা করে। এই প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে, কখন কখন এ অতি-বিচক্ষণ লোকেরা বাজারকে ভুল পথের নির্দ্দেশ দেয়; এবং এইরূপ প্রতারণার দ্বারা নিজেরা বেশী লাভ করে। হয়ত তারা বেশ বুঝ্‌তে পারছে যে, অদূর ভবিষ্যতে যোগানে ঘাট্‌তি পড়্‌বে, এবং দর চড়্‌তে থাকবে। এ অবস্থায় তাদের আগাম কেনা উচিত। তা না ক'রে, তারা বাজারে রটিয়ে দিলে যে দর এবার কম্‌বে; কিংবা নিজেরা গোপনে একটি সিণ্ডিকেট তৈরী ক'রে খোলাখুলি ভাবে এবং সকলকে জানিয়ে খুব বেশী পরিমাণে আগাম বেচ্‌তে আরম্ভ ক'রলে। এর অনিবার্য্য ফল হবে যে, দর তাড়াতাড়ি পড়্‌তে থাক্‌বে। অন্যান্য কারবারীরা, যদি শুধু নিজেদের বিবেচনার ওপর নির্ভর ক'রত, তা হ'লে হয়ত ঠিক্‌ই ধ'র্‌তে পারত যে বাজার এখন উঠ্‌তির মুখে। কিন্তু এই সব নামজাদা লোকের বিক্রী করা দেখে তারা সহজেই বিভ্রান্ত হয়। তারা ভাবে, হয়ত এই সব লোকের হাতে কোন গোপন খবর আছে যা তারা জানে না। ফলে তারাও বেচ্‌তে থাকে, এবং দর আরও প'ড়্‌তে থাকে। এই সময়ে ঐ সিণ্ডিকেটের লোকগুলি অতি সঙ্গোপনে এবং নানা লোকের মারফতে এই কম দরে বিপুল পরিমাণে কিন্‌তে থাকে। দর

* বোম্বাইয়ের সোণা রূপার বাজারে সম্প্রতি (মে, ১৯৫২) এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

তখন অতি দ্রুত গতিতে বাড়্‌তে থাকে। ইতিমধ্যে প্রত্যাশিত ঘাট্‌তি দেখা দেয়, এবং দর তখন, আগে যতটা বাড়্‌বার সম্ভাবনা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী বাড়ে। যোগানের বেশীর ভাগটা তখন সিণ্ডিকেটের লোকগুলির হাতে এসে পড়েছে। অন্যান্য কারবারীরা, যারা বিক্রী করে ব'সে আছে, তারা এখন প্রভূত লোকসান দিয়ে এদের লাভের অঙ্ক বাড়াতে বাধ্য হয়। এই ব্যবহার চুরি বাট্‌পাড়ির চেয়ে কম ঘৃণ্য বলা যায় না। ভরসা এই যে, এ রকম অপকর্ম্ম কদাচ কখন হয়।

(৪)

ক্ষতিকর স্পেকুলেশন নিবারণের উপায়।

কি কি ধরণের স্পেকুলেশন দেশের অনিষ্ট ক'রে তা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু এইগুলি বন্ধ ক'রবার কোন কার্য্যকর উপায় আবিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন। আইনের দ্বারা এ কাজ ক'রবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাতে কোথাও বিশেষ সুফল হয়েছে, বলা চলে না। যদি নিয়ম ক'রে দেওয়া যায় যে, যে যে মাল তৈরী করে না সে সে মাল বেচ্‌তে পারে না, এবং যে যে মাল কাজে লাগায় না সে সে মাল কিন্‌তে পাবে না, তা হ'লে অবশ্য ক্ষতিকর স্পেকুলেশন বন্ধ হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিতকর স্পেকুলেশনও বন্ধ হয়। কারণ, স্পেকুলেশনের দ্বারা দরের হ্রাস বৃদ্ধি সংযত ক'রতে হ'লে, এই কাজ এমন লোকদের দ্বারা হওয়া চাই, যারা অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে কেবল ঐ কাজই ক'রবে। তবেই তারা সমস্ত প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ ক'রতে পারবে, এবং আগে থেকে দরের ওঠা-নামা বুঝতে যে অভিজ্ঞতা দরকার, সেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রতে পারবে। তা ছাড়া, বাজারে সব সময়ে বেশ কিছু পরিমাণ বেচা-কেনা না চল্‌লে, যখন কোন সময়ে একটা বড় রকমের সওদা হবে, তখন বাজারে বড় বেশী নাড়া পড়তে পারে। যদি ফাট্‌কা কারবারীর উদ্দেশ্য দিয়ে বিচার করবার ব্যবস্থা করা হয়, যে যদি কেউ জুয়া খেলার প্রবৃত্তি নিয়ে কিংবা অন্য লোককে ঠকাবার মতলবে কেনা বেচা করে, তা হ'লে তার শাস্তি হবে, তা হ'লেও কোন সুফল পাবার আশা করা যায় না। কারণ, কার মনে কি আছে, তা প্রমাণ করা যায় না। তা ছাড়া, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লোকে বেচা-কেনা করে ব্যক্তিগত লাভের জন্য; কেউ তলিয়ে দেখে না, এবং দেখবার চেষ্টাও করে না যে, তার কাজের ফলে কার কোথায় ইষ্ট বা অনিষ্ট হচ্ছে। মনে হয়, ক্ষতিকর স্পেকুলেশন নিবারণের একটি মাত্র উপায় আছে—যদি জনসাধারণ এর নিন্দা ক'রতে শেখে। যদি জনসাধারণ স্পেকুলেশনের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হয়, এবং কি কি ধরণের স্পেকুলেশন কি কি ভাবে দেশের ক্ষতি করে তা বুঝ্‌তে শেখে, তা হ'লে লোকে লোকনিন্দার ভয়ে ক্ষতিকর স্পেকুলেশন থেকে বিরত থাকৃতে পারে। যদি সরকারের পক্ষ থেকে, এবং বেসরকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠান থেকে জিনিষপত্রের দর ওঠা-নামা সম্বন্ধে খবরাখবরের ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা হয়, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়, তা হ'লে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা হ'তে পারে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

(১)

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য

আজ কাল প্রত্যেক দেশে অন্যান্য দেশ থেকে নানা রকম পণ্যাদি আমদানী করা হয়, এবং প্রত্যেক দেশ থেকে অন্যান্য দেশে নানা রকম পণ্যাদি রপ্তানী করা হয়। এই আদান প্রদানের কারণ কি? এতে দেশের কি উপকার হয়? এই সব পণ্যাদির কি ভাবে দাম দেওয়া হয়? এই সব বিষয় এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষত্ব—কেনা-বেচা হওয়ার মূল কারণ সব ক্ষেত্রেই সমান ;—তা সে এক দেশের লোকেদের মধ্যেই হ'ক, কি বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যেই হ'ক। সে কারণ কর্ম্ম-বিভাগ। প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধ্যমত নিজের রুচি, শিক্ষা ও সামর্থ্য অনুসারে কোন বিশেষ ধরণের কাজ বেছে নেয়, সেই কাজের সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন করে, ও ঐ অর্থের বিনিময়ে আবশ্যকমত নানা রকম সামগ্রী সংগ্রহ করে। আবার, একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, নানা কারণে, বিভিন্ন শিল্পের প্রসার হয় ; এবং ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নানা রকম দ্রব্যাদির আদান-প্রদান হ'তে থাকে। সেই রকম, এক একটি দেশের পক্ষে কোন কোন ধরণের জিনিষ তৈরী করা অপেক্ষাকৃত সহজ। অতএব সে দেশের লোকেরা সেই সব জিনিষ বেশী পরিমাণে তৈরী ক'রে অন্যান্য দেশে রপ্তানী ক'রতে থাকে। এবং তার বিনিময়ে, সে দেশে যে সব জিনিষ দুর্লভ বা তৈরী করা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য, সে সব জিনিষ অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী করতে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, এ দিক থেকে আন্তর্বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোন তফাৎ নেই। তবে, আর এক দিক্ থেকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি বিশেষত্ব আছে ; এবং এই বিশেষত্ব আছে বলেই, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনা দরকার। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ও বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রমিকদের ও মূলধন ইত্যাদির চলাচলে বিশেষ বাধা থাকে না। অতএব সর্ব্বত্র সুদের হার ও লাভের হার মোটামুটি সমান থাকে, এবং সমান যোগ্যতার লোকেরা মোটামুটি সমান হারে পারিশ্রমিক পায়। অতএব, একই দেশে যে সব জিনিষ তৈরী হয়, সে সব তিরী করতে যে পরিমাণ শ্রমশক্তি ও ও মূলধন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হয়, সেই অনুপাতে সেগুলির দর স্থির হয়। কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানী করা জিনিষ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না।

এক দেশের লোকেদের অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করায় অনেক বাধা থাকে। একে ত, কেহই সহজে নিজের দেশ ও আত্মীয় স্বজন ছেড়ে অন্য দেশে যেতে চায় না। তা ছাড়া

আজকাল প্রায় প্রত্যেক দেশেই জনাগম সম্বন্ধে নানা রকম কঠোর বিধি নিষেধ আছে। ফলে, বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বজায় থাকে। জাপানী কারিগরেরা হয়ত আমেরিকান কারিগরদের চেয়ে ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক্ থেকে কোন অংশে হীন নয়। তৎসত্বেও তাদের ঢের কম রোজগারে সন্তুষ্ট থাকৃতে হয়; কারণ তাদের পক্ষে আমেরিকায় গিয়ে কাজ করবার উপায় নেই। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, একই ধরণের কাজের জন্য পারিশ্রমিকের হারে এত পার্থক্য বেশীদিন বজায় থাকৃতে পারে না। মূলধনের চলাচল সম্বন্ধেও, দেখতে পাওয়া যায়, এতটা না হক্, যথেষ্ট বাধা থাকে। শিল্প-বাণিজ্যের জন্য দেশের ভেতর থেকে টাকা তোলা যত সহজ, অন্য দেশ থেকে তত নয়। আজকাল বিশেষতঃ, অনেক দেশে বিদেশী ব্যবসায় বাজেয়াপ্ত করার যে ধুয়ো উঠেছে তার দরুণ বিদেশে টাকা খাটান' সম্বন্ধে লোকের আকিঞ্চণ আগের চেয়েও কমে গেছে। এই জন্য যে দেশে সঞ্চয় কম সে দেশে সুদের হার বেশী, এবং যে দেশে সঞ্চয় বেশী সে দেশে সুদের হার যথেষ্ট কম, এ রকম অবস্থা বজায় থাকে। এমন কি, অভিজ্ঞ ও কর্ম্মকুশলী শিল্প পতিরাও নিজেদের দেশে যত কম লাভে সন্তুষ্ট থাকে, বিদেশে তার চেয়ে অনেক বেশী লাভের সম্ভাবনা না থাকৃলে দেশ ছেড়ে যেতে চায় না। এই সব কারণে, একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ভাবে কর্ম্ম-বিভাগ হয়, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঠিক্ সে ভাবে হয় না। একই দেশের মধ্যে যে অঞ্চলে যে জিনিষ সবচেয়ে কম শ্রমশক্তি ও মূলধন ইত্যাদির প্রয়োগে তৈরী হয় সে অঞ্চলে সেই জিনিষই বেশী ক'রে তৈরী হ'তে থাকে। কিন্তু দেশগত কর্ম্ম-বিভাগের ক্ষেত্রে যে দেশে যে জিনিষের আপেক্ষিক তৈরী-খরচ কম সেই জিনিষ রপ্তানী হয়, এবং যে জিনিষের আপেক্ষিক তৈরী-খরচ বেশী সেই জিনিষ আমদানী হয়। বিলাতের লোকেরা আমাদের চেয়ে কম পরিশ্রমে কয়লা তোলে ও সূতী কাপড় তৈরী করে। তৎসত্ত্বেও আজকাল সেখানে এ দেশ থেকে কয়লা ও সূতীবস্ত্র আমদানী করা হচ্ছে। তার কারণ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য অনেক জিনিষ তৈরী করাতে বিলাতের লোকেদের যোগ্যতা, আমাদের তুলনায় আরও অনেক পরিমাণে বেশী। অতএব, কয়লা ও সূতীবস্ত্র যা দরকার, সবটুকু দেশে তৈরী না করে, বিলাতের লোকেরা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বিনিময়ে খানিকটা আমদানী করে। তাতে তাদের শ্রমশক্তি ও মূলধন ইত্যাদির বেশী সদ্ব্যবহার হয়।

(২)

আপেক্ষিক তৈরী খরচের সূত্র (Law of Comparative Cost)

আপেক্ষিক তৈরী খরচের তারতম্য না থাকৃলে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য হয় না। বিদেশের তুলনায় দেশে যে জিনিষের আপেক্ষিক তৈরী-খরচ কম সেই জিনিষ রপ্তানী হয়; এবং যে জিনিষের বেশী, সেই জিনিষ আমদানী হয়। তাতে দুই দেশেরই লাভ হয়।

সূত্রটির তাৎপর্য্য বোঝবার জন্য একটি কল্পিত দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলে সুবিধা হয়। মনে করা হচ্ছে যে, দুটি দেশ আছে—ভারত ও বর্ম্মা। এই দুটি দেশের কোনটিই আজ পর্য্যন্ত কোন বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা করে নি। দেশের লোকের যা কিছু দরকার, দেশের বাজারেই তারা সে সব পায়; এবং দেশে যা কিছু তৈরী হয়, তা দেশের বাজারেই বিক্রয় হয়। দুটো দেশেতেই কেনা বেচা হয়, প্রতিশ্রুতি-বিহীন কাগজী মুদ্রার (Inconvertible paper-money) সাহায্য। তার মানে, ভারতীয় টাকা ও বর্ম্মী টাকা দুইই কাগজের তৈরী টাকা এবং দুইটি দেশের কোনটিতেই টাকার বদলে কোন নির্দ্দিষ্ট হারে সোণা বা রূপা দেবার ব্যবস্থা নেই। এবং কোন নির্দ্দিষ্ট হারে এক দেশের টাকার বদলে অন্য দেশের টাকা পাবারও কোন ব্যবস্থা নেই। দুই দেশেতেই চাউল ও কাপড় তৈরী হয়।

ভারতে—

১/ মণ চাউলের দাম—	৫৲	টাকা	(ভারতীয়)
১ গজ কাপড়ের দাম	১৲	ঐ	ঐ

বর্ম্মায়—

১/ মণ চাউলের দাম—	১০৲	টাকা	(বর্ম্মী)
১ গজ কাপড়ের দাম—	৪৲	ঐ	ঐ

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে দামের উল্লেখ করা হয়েছে, উহা স্থিতি-শীল বা দীর্ঘ-মেয়াদী দাম। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, দাম = তৈরী খরচ।

দেখা যাচ্ছে যে—

$$\frac{\text{১ গজ কাপড়ের তৈরী খরচ}}{\text{১/ মণ চাউলের তৈরী খরচ}} = \text{ভারতে} \quad \frac{১}{৫} \quad ; \quad \text{ও}$$

$$\text{বর্ম্মায়} \quad \frac{২}{৫}$$

অর্থাৎ আপেক্ষিক তৈরী খরচের তারতম্য রয়েছে। ভারতে কাপড়ের আপেক্ষিক তৈরী খরচ কম; আর বর্ম্মায় চাউলের আপেক্ষিক তৈরী খরচ কম। অতএব আপেক্ষিক তৈরী খরচের সূত্র অনুসারে ভারত ও বর্ম্মার মধ্যে পণ্য বিনিময় হবে। ভারত থেকে বর্ম্মায় কাপড় যাবে, এবং বর্ম্মা থেকে ভারতে চাউল আসবে। এতে দুই দেশেরই কেন লাভ হবে তা এই ভাবে দেখান যায়—

একজন ভারতীয় ব্যাপারী ১০০০৲ টাকার কাপড়, অর্থাৎ ১০০০ গজ কাপড় নিয়ে বর্ম্মায় গেল। সেখানে সেই কাপড় বিক্রি ক'রে ৪০০০৲ (বর্ম্মী টাকা) পেলে। সেই টাকায় সেখানে ৪০০ মণ চাউল কিনে দেশে নিয়ে এল। দেশে সেই চাউল বিক্রী করে ২০০০৲ টাকা পেলে, অর্থাৎ, নীট ১০০০৲ টাকা লাভ ক'রলে। ঠিক্ এই ভাবে যদি

একজন বর্ম্মার লোক চাউল কিনে ভারতে নিয়ে এসে বিক্রী করে, এবং সেই টাকায় কাপড় কিনে নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রী করে, তা হ'লে তারও এই রকম লাভ হবে। এই ভাবে যদি ব্যবসা চ'লতে থাকে তা হ'লে সমগ্রভাবে দুটি দেশের কি উপকার হবে দেখা যাক্। ব্যবসা সুরু হবার আগে ঐ দুটি দেশে যে যে পরিমাণ চাউল ও কাপড় তৈরী হ'ত, এবং তাতে যা খরচা প'ড়ত, তার অঙ্কগুলি এই রকম—

	তৈরীর পরিমাণ	খরচ	
ভারতে—			
	চাউল—১,০০,০০০ মণ	৫,০০,০০০৲	(ভারতীয় টাকা)
	কাপড়—১,০০,০০০ গজ	১,০০,০০০৲	(ঐ ঐ)
		মোট—৬,০০,০০০৲	(ঐ ঐ)
বর্ম্মায়—			
	চাউল—১০,০০০ মণ	১,০০,০০০৲	(বর্ম্মী টাকা)
	কাপড়—১০,০০০ গজ	৪০,০০০৲	(ঐ ঐ)
		মোট—১,৪০,০০০৲	(ঐ ঐ)

যদি বর্ম্মার সমস্ত কাপড়ের প্রয়োজন ভারত থেকে মেটান' হয়, তা হ'লে ভারতে বাড়তি ১০,০০০ গজ কাপড় তৈরী ক'রতে হবে। তাতে খরচ প'ড়বে ১০,০০০৲ টাকা অর্থাৎ, ২০০০ মণ চাউলের তৈরী খরচের সমান। ঐ পরিমাণ চাউল কম তৈরী ক'রে, সেই টাকায় কাপড় তৈরী ক'রতে হবে। অতএব, ভারতে মোট মাল তৈরী হবে—

চাউল— ৯৮,০০০ মণ	৪,৯০,০০০৲	(ভারতীয় টাকা)
কাপড়—১,১০,০০০ গজ	১,১০,০০০৲	(ঐ ঐ)
	মোট—৬,০০,০০০	(ঐ ঐ)

বর্ম্মায় কাপড় তৈরী করার খরচ বাঁচবে ৪০,০০০৲ টাকা। ঐ টাকা দিয়ে চাল তৈরী ক'রলে, মোট মাল তৈরী হবে—

চাউল— ১৪,০০০ মণ ১,৪০,০০০৲ (বর্ম্মী টাকা)

অর্থাৎ, আগে দুই দেশ মিলিয়ে যে খরচে

চাউল—১,১০,০০০ মণ, ও

কাপড়—১,১০,০০০ গজ, তৈরী হ'ত,

এখন, সেই খরচে তৈরী হচ্ছে—

চাউল—১,১২,০০০ মণ, ও

কাপড়—১,১০,০০০ গজ

তার মানে, দেশগত কর্ম্ম-বিভাগ করার দরুণ ৪,০০০ মণ চাউল বেশী পাওয়া গেল। ব্যবসা ক'রলে এই বাড়তি সম্পদ্‌টুকু দুই দেশের মধ্যে ভাগ হয়, এবং দুই দেশই লাভবান্ হয়। ভারতে ১গজ কাপড়ের খরচে /৮ সের চাল তৈরী হয়। অতএব ১গজ কাপড়ের বিনিময়ে অন্ততঃ /৮ সের চাউল না পেলে ভারতের পোষায় না। অন্যপক্ষে বর্ম্মায়, ১গজ কাপড়ের খরচে ।৬ সের চাউল তৈরী হয়। অতএব ১ গজ কাপড়ের বিনিময়ে ।৬ সের পর্য্যন্ত চাউল দেওয়া পোষায়। অতএব দর এই দুই অঙ্কের মাঝামাঝি কোন অঙ্কে স্থির হবে। ঠিক্ কত হবে, তা নির্ভর ক'রবে, কোন্ দেশের আকিঞ্চণ কত বেশী, তার উপর।

উপরে যে সব হিসাব দেওয়া হ'ল তাতে, ব্যবসায় ক'রতে হ'লে মাল আনা নেওয়ার এবং অন্যান্য যে সব আনুষঙ্গিক খরচ ক'রতে হয়, সেগুলি ধরা হয় নি। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য, সেগুলি উপেক্ষা ক'রলে চলে না। এই সব খরচগুলি তৈরী খরচের মধ্যে ধ'রে যদি দেখা যায় যে আপেক্ষিক তৈরী খরচে তারতম্য রয়েছে, তা হ'লেই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হ'তে পারে ; নচেৎ নয়।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। উপরের হিসাবে ধ'রে নেওয়া হয়েছে যে চাউল বা কাপড় তৈরীর পরিমাণ কম বেশী ক'রলে মাত্রা পিছু তৈরী খরচ সমান থাকে। তা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। বর্ম্মায় যেমন কাপড় তৈরী ক'মতে থাক্‌বে, কাপড় তৈরীর প্রান্তিক খরচ ক'মতে পারে। এবং সেই সঙ্গে, যেমন চাউল তৈরী বাড়ান' হবে, চাউলের প্রান্তিক তৈরী খরচ বাড়বে। অন্যপক্ষে, ভারতে কাপড় তৈরীর পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের প্রান্তিক তৈরী খরচ বাড়তে পারে, এবং কম চাউল তৈরী করার দরুণ চাউলের প্রান্তিক তৈরী খরচ ক'মবে। ফলে, দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়ের যত প্রসার হ'তে থাক্‌বে, আপেক্ষিক তৈরী খরচার তারতম্য তত ক'মতে থাক্‌বে। যখন আর তারতম্য থাক্‌বেনা. তখন ব্যবসায়ের প্রসারও আর হবে না। হয়ত, বর্ম্মায় কিছু কাপড় বরাবরই তৈরী হ'তে থাক্‌বে, এবং কিছু কাপড় ভারত থেকে আমদানী করা হবে, এবং তার বদলে চাউল রপ্তানী করা হবে।

বহু পণ্যের আদান প্রদান—উপরের দৃষ্টান্তে দেখান' হয়েছে যে চাউল এবং বস্ত্র, মাত্র এই দুইটি পণ্যের আদান প্রদান হচ্ছে। বাস্তব ক্ষেত্রে নানাবিধ পণ্য আমদানী হয়, এবং নানাবিধ পণ্য রপ্তানী হয়। কি কি পণ্য আমদানী হবে, এবং কি কি পণ্য রপ্তানী হবে, এবং কোন্‌টি কত পরিমাণে হবে, এ সবই নির্ভর করে, প্রত্যেকটির আপেক্ষিক তৈরী খরচের ওপর। যেটির আপেক্ষিক তৈরী খরচ যত কম, সেইটি তত আগে রপ্তানী করবার চেষ্টা হবে ; এবং যেটির আপেক্ষিক তৈরী খরচ যত বেশী, সেইটি তত আগে আমদানী করবার চেষ্টা হবে। এবং আপেক্ষিক তৈরী খরচা যতক্ষণ না সমান হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আদান-প্রদানের পরিমাণ বেড়ে চ'ল্‌বে।

বহির্বাণিজ্যে মূল্যের আদান-প্রদান—যেমন দেশের মধ্যে যে সব জিনিষের কেনা-বেচা হয় সেগুলি আসলে পণ্যের বা কাজের আদান-প্রদান হ'লেও, অর্থের সাহায্যে করা হয়, বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্যের আদান- প্রদানেও সেই রকম অর্থের সাহায্য নেওয়া হয়। রপ্তানী মালের বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায়, এবং আমদানী মাল অর্থের বিনিময়ে কিনতে হয়। তবে বহির্বাণিজ্যে একটি বাড়্তি ব্যবস্থা দরকার হয়। যেহেতু এক দেশের অর্থ অন্য দেশে চলে না, সেইহেতু এক দেশের অর্থের বিনিময়ে অন্য দেশের অর্থ সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা দরকার হয়। আগে প্রায় সকল দেশেই, গভর্ণমেণ্ট বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে, অর্থের বিনিময়ে, নির্দ্দিষ্ট হারে সোণা পাওয়া যেত। অতএব সোণার হিসাবে, সকল দেশের অর্থের বিনিময়-হার বাঁধা ছিল। এই হার, সোণা আমদানী রপ্তানী করবার খরচের চেয়ে বেশী এদিক্ ওদিক্ হ'তে পার্‌ত না। আজকাল সর্ব্বত্রই কাগজের মুদ্রা চালু হয়েছে, এবং কোথাও এই অর্থের বিনিময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট হারে সোণা দেবার ব্যবস্থা নেই। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দেশের অর্থের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট বিনিময়-হারও নেই। তবে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিব মাবফৎ, এবং আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) সাহায্যে সাময়িকভাবে নির্দ্দিষ্ট হারে বিদেশী অর্থ পাবার ব্যবস্থা আছে।

অনেকগুলি দেশের মধ্যে পণ্যের আদান-প্রদান—উপরের দৃষ্টান্তে ধ'রে নেওয়া হয়েছে যে মাত্র দুটি দেশের মধ্যে পণ্য-বিনিময় হচ্ছে। বাস্তব ক্ষেত্রে, প্রত্যেক দেশের সঙ্গে অনেকগুলি দেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক থাকে। সকল ক্ষেত্রেই পণ্যের আদান-প্রদানের আসল কারণ আপেক্ষিক তৈরী-খরচের তারতম্য। যে দেশে যে জিনিষের আপেক্ষিক তৈরী-খরচ কম সেই জিনিষ রপ্তানী হয়, এবং যে জিনিষেব আপেক্ষিক তৈরী-খরচ বেশী, সেই জিনিষ আমদানী হয়। আজকাল অবশ্য বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে প্রায় সর্ব্বত্রই নানা রকম সরকারী বাধা, নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। সেইজন্য স্বাভাবিক ধারায় বাণিজ্য হ'তে পায় না। বাধা নিষেধ না থাক্‌লে আপেক্ষিক তৈরী-খরচার সূত্র অনুসারেই ঠিক্ হয়, কোন্ দেশ থেকে, কোথায়, কি জিনিষ, কি কি পরিমাণে রপ্তানী হবে।

রপ্তানী মাল বেচে যে দাম পাওয়া যায়, তাই দিয়েই আমদানী মাল কিন্‌তে হয়। অতএব রপ্তানী মালের মোট দাম আমদানী মালের মোট দামের সমান হ'তে বাধ্য। অবশ্য সাময়িকভাবে ইতর বিশেষ থাক্‌তে পারে। তখন বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ঘাট্‌তি কিংবা বাড়্তির জের টেনে চলা হয়। বিদেশ থেকে ঋণ নিলেও, উত্তমর্ণ দেশ থেকে আমদানীর চেয়ে রপ্তানী বেশী হ'তে থাকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমদানী রপ্তানীর হিসাব মেলা চাই। যেমন কোন ব্যক্তির পক্ষে বরাবর আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করা চলে না,

তেমনি কোন দেশের পক্ষেও বরাবর রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বেশী করা চলে না। আমদানীর ঋণ যেমন রপ্তানী মাল দিয়ে শোধ করা হয়, তেমনি ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, জাহাজী কোম্পানী প্রভৃতির কাজ দিয়েও কতকটা শোধ করা হয়। এগুলিকে বলা যেতে পারে, অদৃশ্য রপ্তানী (invisible exports)

মোট আমদানীর সঙ্গে মোট রপ্তানীব হিসাব মেলা চাই। কিন্তু প্রত্যেক দেশের সঙ্গে আমদানী রপ্তানীব হিসাব মেলা চাই, তা নয়। অনেক সময়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তিন-কোনা কি চার-কোনা বাণিজ্য হয়। ভারত থেকে সিংহলে চাউল সরবরাহ করা হ'ল। সিংহল, ভারতকে তার বদলে কিছু না দিয়ে, বিলাতে চা রপ্তানী ক রল। বিলাত থেকে সিংহলে কিছু না গিয়ে, ভারতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ হ'ল। অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে ঘুরপথে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা মেটান' হয়।

কোন দেশের রপ্তানী মালেব চাহিদা বাড়্‌লে সে দেশের সুবিধা হয়; কারণ তাতে বেশী দাম পাওয়া যায়, অর্থাৎ বেশী পরিমাণ বিদেশী জিনিষ পাওয়া যায়। তেমনি, রপ্তানীর মালের চাহিদা কমলে দেশের ক্ষতি। গম, যব, তুলা, তিসি, পাট, পশম প্রভৃতি কৃষি-জাত দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ সামান্য কমলেই দর অনেকখানি ক'মে যায়। অতএব যে সব দেশ এই ধরণের দুটি একটি কৃষি-জাত দ্রব্যের রপ্তানীব উপর বেশী মাত্রায় নির্ভর করে, সময়ে সময়ে সে সব দেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত কষ্টে পড়ে। বাণিজ্য-চক্রের নিম্নগতির সময় এই সব দেশের কষ্ট সবচেয়ে বেশী হয়। অন্যপক্ষে, যে সব দেশ প্রধানতঃ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করে, সে সব দেশে তত কষ্ট হয় না। তার কারণ, শিল্পজাত দ্রব্যের দর সে অনুপাতে অনেকটা বজায় থাকে। বিশেষতঃ, শিল্পপ্রধান দেশগুলি নানা রকমের সামগ্রী রপ্তানী করে। সব-গুলির চাহিদা সমানভাবে কমে না। সেইজন্য দেশে তত বেশী কষ্ট হয় না।

বিভিন্ন দেশের পক্ষে বিভিন্ন পণ্য সরবরাহে বিশেষ যোগ্যতার কারণ—

১। প্রকৃতি-দত্ত সুযোগ—চা, কফি, রবার প্রভৃতি সকল দেশে জন্মায় না; তার জন্য বিশেষ উপযোগী জল-বায়ু দরকার। বিভিন্ন ধাতু, কয়লা, অভ্র প্রভৃতি খনিজ পদার্থ সকল দেশের মাটিতে পাওয়া যায় না। যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকেই সকলকে নিতে হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান আছে ব'লেই সকল দেশের লোক সকল রকমের জিনিষ ব্যবহারের সুযোগ পায়।

২। **জন-সংখ্যার তারতম্য**—কোন কোন দেশ জন-বিরল। সে সব জায়গায় জমির অভাব হয় না; যেমন অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেনটাইন ইত্যাদি। এই সব দেশে পশুচারণের কাজ এবং যন্ত্রের সাহায্যে গম ইত্যাদি ফসল উৎপাদন সহজ। সেইজন্য এই সব দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে গম ও পশম, মাংস, চর্ব্বি, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানী হয়। অন্য পক্ষে, জন-বহুল দেশে লোকের মজুরী কম; অতএব যে সব মাল তৈরী ক'রতে মানুষের যত্ন ও পরিশ্রম

বেশী লাগে, সেই সব মাল সেই সব দেশ থেকে বেশী রপ্তানী হয়; যেমন, জাপান থেকে রেশম ও ভারত থেকে পাট।

অতীতের সঞ্চয়—পূর্ব্ব পুরুষদের চেষ্টা ও সৌভাগ্যের ফলে কোন কোন দেশে রাস্তা ঘাট, রেলপথ, পোতাশ্রয়, বড় বড় জাহাজ; বড় বড় কল কারখানা, নানা রকমের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হ'য়ে আছে, এবং হচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে নানাবিধ শিল্প-কার্য্যে অভিজ্ঞ সুদক্ষ কারিগরও যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায় এবং তৈরী হয়। অতএব এই সব দেশের নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করায় সুবিধা হয়। বিলাতের লোকেদের যদি খাদ্যের জন্য দেশের জমির উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভর ক'রতে হ'ত, তা হ'লে অর্দ্ধেক লোকের খাওয়া জুট্‌ত না। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যবস্থা আছে বলেই তারা নানাবিধ শিল্পজাত সামগ্রীর বিনিময়ে জনবিরল দেশগুলি থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যাদি সংগ্রহ ক'রতে পারে। ফলে, সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও, বিলাতের লোকেরা বেশ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন ক'রতে পারে।

শিল্প-প্রধান দেশগুলির মধ্যেও শিল্পজাত দ্রব্যের আদান প্রদান হয়। প্রত্যেকটি দেশে প্রত্যেক রকম শিল্পের সমান উন্নতি হয় না। বস্ত্র শিল্প, রসায়ন শিল্প, কাচশিল্প, ঘড়ি তৈরী যন্ত্রপাতি তৈরী, জাহাজ তৈরী প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পের মধ্যে একদেশে একটি, অন্য দেশে আরেকটির সমধিক উন্নতি হয়েছে। যে দেশ যে শিল্পে বেশী অগ্রসর, সে দেশ থেকে সেই শিল্পজাত সামগ্রী সর্ব্বত্রই রপ্তানী হয়, কারণ সেই দেশে সেই সামগ্রীর আপেক্ষিক তৈরী খরচ সবচেয়ে কম।

(৩)

বিদেশী অর্থ (Foreign Exchange) **ও তাহার মুল্য—বিদেশী অর্থের বাজার—** একদেশের অর্থ অন্য দেশে চলে না। সেইজন্য, ভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে দেনা পাওনা মেটাতে হ'লে, সে দেশের অর্থ কিনতে হয়, কিংবা বেচ্‌তে হয়। বিদেশী অর্থ কেনা-বেচার বাজার আছে। প্রধানতঃ ব্যাঙ্কগুলি এই বাজারের ব্যাপারী। অন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও আছে; যারা শুধু এই কাজই করে। অনেকে আবার, বিদেশী অর্থ কেনা-বেচার দালালী ক'রে জীবিকা উপার্জ্জন করে। অন্যান্য সামগ্রীর মত, বিদেশী অর্থেরও দাম নির্ভর করে, চাহিদা ও যোগানের ওপর। চাহিদার অনুপাতে যখন যোগান বেশী হয়, তখন দর কমে; আর যখন যোগান কম হয়, তখন দর বাড়ে। রপ্তানী মালের দাম বাবদ, এবং অন্য নানা কারণে ভিন্ন দেশের লোকের কাছে অর্থ পাওনা হয়। তেমনি, আমদানী মালের দাম বাবদ এবং অন্য নানা কারণে ভিন্ন দেশে অর্থ পাঠাতে হয়। বিল অফ্-এক্সচেঞ্জ এর পরিচয় ২য় খণ্ডে ২য় পরিচ্ছেদে আগেই দেওয়া হয়েছে। বিলখানি নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিদেশী দেনদারের কাছে নিয়ে

গেলেই, ঐ বিলে লিখিত পরিমাণ ঐ দেশের অর্থ পাওয়া যায়। অতএব বিলখানি ঐ পরিমাণ অর্থ হিসাবে গণ্য হয়। দাবীদার বিলখানি বাজারে বেচে নিজের দেশের অর্থ সংগ্রহ ক'রতে চায়। এই ভাবে বাজারে বিদেশী অর্থের যোগান আসে। তেমনি যারা বিদেশী পাওনাদারদের পাওনা মেটাবার জন্য অর্থ পাঠাতে চায়, তারা দেশের অর্থ দিয়ে বিদেশী অর্থ কেন্‌বার জন্য বাজারে আসে। বেশীর ভাগ ব্যাঙ্কের একটি কাজ হচ্ছে, বিদেশী অর্থের এই সমস্ত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করা। এরা বিল কেনে, এবং নিজেরা অন্য দেশের ব্যাঙ্কের ওপর বিল কেটে, সেই বিল (Bank bills) বিক্রী করে। বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যোগাযোগ থাকে। এক দেশের ব্যাঙ্কের অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কে একাউণ্ট (Account) থাকে। অতএব, দেশের টাকা নিয়ে, তার বদলে অন্য দেশের ব্যাঙ্কের ওপর বিল দেওয়া হয়। ঐ দেশের পাওনাদারকে সেই বিল পাঠিয়ে দিয়ে দেনা শোধ করা যায়। বিল বিক্রী ক'রলে বিদেশের 'একাউণ্ট' থেকে টাকা বেরিয়ে যায়; আর দেশের তহবিলে তার সমান মূল্যের টাকা জমে। আবার যখন বিল কেনা হয়, তখন দেশের তহবিল থেকে টাকা বেরিয়ে যায়; আর বিদেশের ব্যাঙ্কে সেই বিল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঐ ব্যাঙ্ক, সেই বিলের টাকা আদায় ক'রে, এ ব্যাঙ্কের একাউণ্টে জমা তোলে। মেয়াদী-বিলের, যতদিন বাদে টাকা আদায় দেবার কথা, ততদিনের 'ডিস্‌কাউণ্ট' (Discount — ব্যাজ) বাদ দিয়ে দাম দেওয়া হয়। সেইজন্য 'বিল-অফ্‌-এক্স্‌চেঞ্জ' কেনা-বেচাকে 'ডিস্‌কাউণ্ট' করা বলে। যে সব ব্যাঙ্ক 'এক্স্‌চেঞ্জ'র কাজ করে তাদের রীতি এই যে, তারা রোজের রোজ জানিয়ে দেয় কোন্ দেশের অর্থ কি দরে কিন্‌তে রাজী, ও বেচ্‌তে রাজী। ব্যাঙ্কগুলিও পরস্পরের মধ্যে দেশ-বিদেশের অর্থ কেনাবেচা করে থাকে। এক দেশের তহবিল হাল্কা হ'য়ে গেলে, যে দেশের তহবিল থেকে টাকা তুলে নিলে সুবিধে হয় সেই দেশের ওপর 'বিল' কেটে, সেই বিল 'ডিস্‌কাউণ্ট' ক'রে, এ দেশের তহবিল ভারী ক'রে নেয়। যখন যে দেশের টাকার দর কমে তখন সে দেশের টাকা কিন্‌লে লাভ বেশী হবার সম্ভাবনা। তেম্‌নি, যখন যে দেশের টাকার বাজারে সুদের হার বেশী তখন সে দেশে টাকা পাঠিয়ে, সেই টাকা খাটিয়ে বেশী লাভ করা যায়। ব্যাঙ্কগুলি এই সব দিকে নজর রেখে, বিভিন্ন দেশে টাকা চালাচালি করে।

বিদেশের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব—বিদেশে যে সব বাবদ্ টাকা পাঠানর প্রয়োজন হয়, সেগুলি হচ্ছে—

১। (ক) আমদানী পণ্যের মূল্য।

(খ) বিদেশী বীমা কোম্পানীর 'প্রেমিয়াম'; বিদেশী জাহাজের ভাড়া; এবং এই ধরণের আরও নানা রকমের উপকারের মূল্য।

(গ) বিদেশী লোকেদের যে সব টাকা এ দেশের ব্যবসা বানিজ্যে খাট্‌ছে, তার সুদ ও লাভ।

২। (ক) এ দেশ থেকে বিদেশী লোকদের ঋণ হিসাবে যে টাকা দেওয়া হয়।

(খ) বিদেশ থেকে আগে যে ঋণ নেওয়া হয়েছে, তার পরিশোধের জন্য যে টাকা পাঠাতে হয়।

৩। দান।

৪। (ক) দেশ-ভ্রমণ বা অন্য উদ্দেশ্যে যারা বিদেশে যায় তাদের খরচ।

(খ) যারা বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস ক'ববার জন্য চ'লে যায়, তারা যাবার সময় যে টাকা নিয়ে যায়।

বিদেশ থেকে যে সব বাবদ্ টাকা পাওনা হয়, তারও এই ধরণের ফর্দ্দ করা যায়।

যদি দেনার পরিমাণ ও পাওনার পরিমাণ সমান হয়, তা হ'লে বিদেশী অর্থের বাজারে বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জ' কেনা-বেচার ভেতর দিয়ে দেনা পাওনা মিটে যায়। যদি দেনা বেশী হয় তা হ'লে সোণা রপ্তানী ক'রে ঘাট্‌তি মেটাবার প্রয়োজন হয়। সোণার আদর সর্ব্বত্র। অতএব সোণা নিতে কোন দেশই নারাজ হয় না। যদি সোণা দুষ্প্রাপ্য হয়, কিংবা সোণা রপ্তানী করায় বাধা থাকে, তা হ'লে, হয় বিদেশ থেকে ঋণ নিতে হয়; না হয় দেশের টাকার মূল্য কমাতে হয়; না হয় আমদানী কমাবার ও রপ্তানী বাড়াবার ব্যবস্থা ক'রতে হয়।

স্বর্ণ-মান ও সোণা চলাচলের সূচনা (Gold points)—আগে বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশগুলিতে স্বর্ণমান চালু ছিল। অর্থাৎ, সোণার হিসাবে মানমুদ্রার দাম স্থির ছিল, এবং এমন সরকারী ব্যবস্থা ছিল যে ঐ নির্দ্দিষ্ট দরে লোকে যে কোন পরিমাণে, সোণার বদলে মুদ্রা, এবং মুদ্রার বদলে সোণা সংগ্রহ ক'রতে পার্‌ত। সোণা আমদানী রপ্তানী সম্বন্ধেও কোন বাধা ছিল না। যে দরে বিদেশী অর্থ কেনা বেচা ক'রলে একই পরিমাণ সোণা আদান প্রদানের সামিল হয় সেই দরকে স্থির দর' (Par value) বা "টাকশালের দর" বলা চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সে সময় বিলাতে ১০০০ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ঠিক যে পরিমাণ সোণা পাওয়া যেত, আমেরিকায় তার জন্য ৪৮৬৬ ডলার দিতে হ'ত। অতএব ডলারের স্থির দর ছিল £১০০০ = $৪৮৬৬; অর্থাৎ, £১ = $৪.৮৬৬। বাজারে ডলারের দর এই অঙ্কের বিশেষ এদিক ওদিক হ'তে পার্‌ত না। কারণ, সব সময়েই, বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জ কেনাবেচা না ক'রে সোণা আমদানী বা রপ্তানীর দ্বারা দেনা পাওনা মেটান' সম্ভব ছিল। অবশ্য, এক দেশ থেকে আর এক দেশে সোণা নিয়ে যেতে জাহাজ ভাড়া ও বীমা বাবদ্ কিছু খরচ হয়; এবং কিছু সময় লাগে ব'লে, ঐ সময়ের সুদও খরচের মধ্যে ধ'রতে হয়। অতএব, স্থির দরের

কিছু কম বেশী দরে বিদেশী অর্থ কেনা-বেচা ক'রলেও পোষাত। কিন্তু সোণা আমদানী বা রপ্তানী ক'রতে যে খরচ, তার চেয়ে কম বেশী কখনও হ'তে পার্‌ত না। যদি ধরা যায় যে £১ মূল্যের সোণা আমেরিকা থেকে আমদানী ক'রতে কি আমেরিকায় রপ্তানী ক'রতে খরচ হয় $'০২, তা হলে বিলাতে যতক্ষণ এক পাউণ্ডের বদলে $৪'৮৬৬—$'০২ অর্থাৎ $৪'৮৪৬ পাওয়া যায়, ততক্ষণ ডলার কেনা পোষায়। কিন্তু ডলারের দর যদি তার চেয়েও বেশী হয়, অর্থাৎ এক পাউণ্ড দিয়ে যদি ৪'৮৪৬ ডলারের চেয়ে কম নিতে হয়, তার চেয়ে আমেরিকায় সোণা পাঠিয়ে সেই সোণা দিয়ে ডলার কিনে ধার শোধ ক'রলে সস্তা প'ড়বে। অতএব তাই হ'তে থাক্‌বে। তার মানে ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের দর যখন ৪'৮৪৬ ডলার পর্য্যন্ত নাম্‌বে তখন বিলাত থেকে সোণা রপ্তানী হ'তে থাক্‌বে, এবং দর তার চেয়ে আর নাম্‌তে পার্‌বে না। তেমনি পাউণ্ডের দর ৪'৮৬৬+'০২ অর্থাৎ ৪'৮৮৬ ডলারের চেয়ে বাড়্‌তে পারে না। ঐ অঙ্কে পৌঁছলে সোণা আমদানী হ'তে থাক্‌বে। বিদেশী অর্থের দর যে অঙ্ক দুটিতে পৌঁছলে সোণা চলাচল আরম্ভ হয় সে দুটিকে সোণা চলাচলের সূচনা (Gold points) এই আখ্যা দেওয়া চলে। স্বর্ণমাণ বজায় থাক্‌লে বিদেশী অর্থের দর এই দুই অঙ্কের বাইরে যেতে পারে না।

দেনা পাওনার গরমিল শোধ্‌রাবার উপায়—

১। দেনা বেশী হ'লে, বিদেশী অর্থের যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশী হবে; অতএব দর বাড়্‌তে থাক্‌বে। তখন রপ্তানী মাল বিদেশে আগেকার চেয়ে কম দামে বিক্রী করা পোষাবে; কারণ, দেশী অর্থের হিসাবে আগেকার সমান দাম পেতে হ'লে, আগেকার চেয়ে কম বিদেশী অর্থ সংগ্রহ ক'রলেই চলবে। অতএব, রপ্তানী বাড়্‌তে থাক্‌বে। অন্যপক্ষে, অনুরূপ কারণে আমদানী ক'মবে। রপ্তানী বেশী হওয়া মানে পাওনা বেশী হওয়া। আমদানী কমা মানে দেনা কমা। এইভাবে দেনা-পাওনার মধ্যে সমতা ফিরে আস্‌বে। পাওনা বেশী হ'লে বিদেশী অর্থের দর ক'ম্‌বে। তার ফলে রপ্তানী ক'ম্‌বে, আর আমদানী বাড়্‌বে।

২। যদি দেনা-পাওনার গরমিল হওয়ার গুরুতর কারণ ঘ'টে থাকে, তা হ'লে কেবল মাত্র উপরোক্ত উপায়ে আবশ্যক প্রতিকার হয় না; এবং সোণা রপ্তানী বা আমদানী হ'তে থাকে। যে দেশের দেনা বেশী, সে দেশ থেকে সোণা রপ্তানী হ'তে থাকে। যে দেশের পাওনা বেশী সে দেশে সোণা আস্‌তে থাকে। এবং তার ফলে নিম্নলিখিত কারণে আপনা আপনি দেনা পাওনার মধ্যে সমতা ফিরে আস্‌তে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ, দেশের টাকার হিসাবে সোণার দাম স্থির রাখা। সেই জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সোণা মজুত রাখা হয়, এবং এ রকম ব্যবস্থা করা হয় যাতে, যে কেউ সোণা

কিন্‌তে এলে কিংবা বেচ্‌তে এলে, তাকে নির্দ্দিষ্ট দরে সোণা বিক্রী করা হয়, কিংবা তার কাছ থেকে নির্দ্দিষ্ট দরে সোণা ক্রয় করা হয়। যেখানে স্বর্ণমান বজায় থাকে সেখানে ব্যাঙ্কের হাতে যে পরিমাণ সোণা থাকে, তার ওপর নির্ভর করে, বাজারে কত পরিমাণ অর্থ চালু থাকবে। সোণার পরিমাণ কম বেশী হ'লে, সেই অনুপাতে অর্থের পরিমাণও কমে বা বাড়ে। বেশীর ভাগ জায়গায় আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা থাকে যে, যত টাকার নোট বাজারে ছাড়া হবে তার এত ভাগ মূল্যের সোণা হাতে রাখতে হবে। আমেরিকাতে আবার, ডিপজিট সম্বন্ধেও এই রকম বাধ্য-বাধকতা আছে। বিলাতে, একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ওপর যত পাউণ্ডের নোট ছাড়া হ'ত, ঠিক্ তত পাউণ্ড মূল্যের সোণা রাখতে হ'ত। ডিপজিট সম্বন্ধে আইনের বাঁধা ধরা না থাকলেও, ও দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বহুকাল ধ'রে যে রীতি চালু আছে তার ফ.ল 'রিসার্ভ' (Reserve) বা মজুত জমার পরিমাণের সঙ্গে 'ডিপজিট দায়ের' পরিমাণের একটি মোটামুটি সুনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ সব সময় বজায় রাখা হয়। এই মজুত জমা প্রধানতঃ 'ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে' 'ডিপজিট' হিসাবে রাখা হয়। সেখানে আবার, 'ডিপজিটের' পরিমাণের সঙ্গে মজুত সোণার পরিমাণের একটা মোটামুটি সুনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ বজায় রেখে চলা হ'ত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দেশে নোটের প্রচলনই বেশী হ'ক কি চেকের প্রচলনই বেশী হ'ক্, সর্ব্বত্রই সোণা রপ্তানী হ'লে অর্থের পরিমাণ কমে, এবং সোণা আমদানী হ'লে অর্থের পরিমাণ বাড়ে।

বাজারে টাকার যোগান ক'মলে জিনিষ পত্রের দর ক'মতে থাকবে। তার ফলে রপ্তানী বাড়বে ও আমদানী ক'মবে। অন্যপক্ষে, বাজারে টাকার যোগান বাড়্‌লে, জিনিষ পত্রের দর বাড়তে থাকবে। তখন রপ্তানী ক'মবে, এবং আমদানী বাড়বে। এইভাবে, স্বর্ণমান বজায় থাকলে, আমদানী রপ্তানীর মধ্যে আপনা আপনি সমতা ফিরে আসে।

৩। সাধারণতঃ, বেশী সোণা বেরিয়ে যাবার আগেই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এমন ব্যবস্থা নেয়, যাতে ক'রে বাজারে টাকার যোগান যথোচিত পরিমাণে কমে, এবং তার ফলে সোণা রপ্তানী বন্ধ হয়, অর্থাৎ, বহির্বাণিজ্যে পাওনার তুলনায় দেনা বেশী হওয়া বন্ধ হয়। ব্যাঙ্ক-অফ্ ইংলণ্ড এই উদ্দেশ্যে দুরকম উপায় অবলম্বন করে—

(ক) 'ব্যাঙ্ক-রেট' (Bank rate) চড়িয়ে দেওয়া—যে হারে ব্যাঙ্ক-অফ-ইংলণ্ড বিল 'ডিসকাউণ্ট' করে তার নাম 'ব্যাঙ্ক-রেট'। ব্যাঙ্কে রেট চড়লে সর্ব্বত্রই সুদের হার চড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন ধার নেওয়ার পরিমাণ কমে, এবং তার ফলে বাজারে টাকার যোগান কমে।

(খ) সরকারী ঋণ-পত্র বিক্রী (Open Market Operation)– ব্যাঙ্ক-অফ-ইংলণ্ডের হাতে সব সময়েই যথেষ্ট পরিমাণ সরকারী ঋণ-পত্র (Government securities) মজুত থাকে। এইগুলি বাজারে বিক্রী করতে আরম্ভ করলে, যারা কেনে, তারা কোন না কোন

ব্যাঙ্কের চেক্ দিয়ে তার দাম দেয়। তখন ব্যাঙ্ক-অফ-ইংলণ্ডের কাছে ঐ সব ব্যাঙ্কের মজুত জমা কমে যায়। ফলে, তারা সেই অনুপাতে বাজারে ধার দেওয়া কমাতে বাধ্য হয়। এইভাবে বাজারে টাকার যোগান কমে।

৪। বিদেশের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাবে ঘাটতি হতে থাকলে, কি ভাবে বাজারে টাকার যোগান কমিয়ে তার প্রতিকার করা যায়, তা বোঝা গেল। কিন্তু এই উপায় সময়-সাপেক্ষ, এবং এতে দেশের বহু লোককে দুঃখ কষ্ট পেতে হয়। কারণ, টাকার যোগান কমে যাওয়া মানে, অনেকে প্রয়োজনমত ধার পায় না, এবং সকলকে আগেকার চেয়ে বেশী হারে সুদ দিতে হয়। তাতে, শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা পড়ে, মূলধন নিয়োগ কম হতে থাকে' দর কমে যাওয়ার ভয়ে, লোকে বেশী মাল তৈরী করতে বা মজুত করতে ভরসা পায় না, কোন কোন কারবার ফেল হয়ে যায়, এবং বহু লোক বেকার হয়। এই অবস্থা অনেক দিন চল্‌তে পারে। তার পর, কাঁচা মালের দাম, মজুরী প্রভৃতি যখন বেশ ক'মে যায়, তখন কম খরচায় মাল তৈরী হ'তে থাকে, রপ্তানী বাড়্‌তে থাকে, এবং আবার ক্রমশঃ বিভিন্ন কারবারের প্রসার হতে থাকে।

এত সময় নষ্ট না করে, এবং এত দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে না গিয়ে আর একটি উপায় অবলম্বন করা যায়। সেটি হচ্ছে 'ডিভ্যালুয়েশন' (Devaluation) অর্থাৎ সোণার হিসাবে দেশের টাকার দাম কমান। ১৯৪৯ সালে বিলাতে, ভারতে এবং অন্য অনেক দেশে এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। আমেরিকায় সোণার দর প্রতি আউন্স ৩৫ ডলার। এই হিসাব মত বিলাতী পাউণ্ডের দর ছিল £১=$৪'০৩। ১৯৪৯ সালে সেই দর কমিয়ে করা হয়েছে £১=$২'৮০। এই উপায়ে কম সময়ের মধ্যেই ঘাটতির প্রতিকার হয়, অথচ দেশের আর্থিক জীবনের বিপর্য্যয় ঘটে না। আগে যে বিলাতী মাল আমেরিকায় $৪'০৩ দামে বেচলে £১ পাওয়া যেত, এখন সেই মাল $২'৮ দামে বেচলেই £১ পাওয়া যায়। অতএব রপ্তানী মালের দর কমিয়ে বাজারের প্রসার করা যায়, এবং অনুরূপ কারণে আমদানীর পরিমাণও কমে। এই উপায়ে স্থায়ী ফল পেতে হলে, যাতে রপ্তানী-যোগ্য পণ্যের তৈরী খরচা বিশেষ না বাড়ে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। ডিভ্যালুয়েশন করায় আসল কাজ এই হয় যে, বিদেশের তুলনায় দেশের জিনিষপত্রের দাম কমে যায়। পরে যদি বেশী টেক্স চাপিয়ে কিংবা শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়ে, রপ্তানী পণ্যের তৈরী-খরচ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তা হ'লে ডিভ্যালুয়েশন করার উপকার বজায় থাকে না। বার বার ডিভ্যালুয়েশন করা যায় না। তাতে দেশের টাকার ওপর লোকের অশ্রদ্ধা হয়ে যেতে পারে। তখন আর সে টাকার ক্রয়শক্তি কিছুতেই বজায় রাখা যায় না।

৫। মুদ্রা-সঙ্কোচ বা 'ডিভ্যালুশেয়ন এই দুইটি ব্যবস্থার কোনটিই যদি না নেওয়া হয়, তা হ'লে অগত্যা স্বর্ণমাণ পরিত্যাগ করতে হয়, এবং বিদেশী অর্থের মূল্য বাজারে চাহিদা

ও যোগানের ওপর সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে হয়। এ অবস্থাতেও অনেক ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চেষ্টা করে যাতে বিদেশী অর্থের দাম বেশী ওঠা-নামা না করতে পারে, এবং সেই উদ্দেশ্যে যখন দর বেশী চড়তে থাকে তখন একটি নির্দ্দিষ্ট দরে সোণা ও ব্যাঙ্ক-বিল বেচতে থাকে। তবে তখন আর এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন বাধ্য-বাধকতা থাকে না; এবং যদি বেশী দিন ধরে দর চড়ার দিকে চাপ বজায় থাকে, তা হ'লে দর চড়তে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

স্বর্ণমাণ বজায় না থাক্‌লে, আসলে কোন দরকেই স্থির-দর বলা চলে না। তবে যদি দেখা যায় যে বেশ কিছু দিন ধরে বিদেশী অর্থের চাহিদা ও যোগান মোটামুটি সমান যাচ্ছে তা' হ'লে তখনকার দরকে স্থির-দর বলা চলে। যদি দেখা যায় যে বেশ কিছুদিন ধ'রে ক্রমাগত সোণা রপ্তানী হচ্ছে কিংবা বিদেশীদের কাছে স্বল্প-মেয়াদী ঋণের পরিমাণ বেড়ে চ'লেছে, তখন বুঝতে হবে যে বিদেশী অর্থের দাম যা হওয়া উচিত তাব চেয়ে কম রয়েছে, এবং অচিরেই ঐ দাম বাড়তির মুখে চল্‌বে। অন্যপক্ষে যদি দেখা যায় যে বেশ কিছুদিন ধরে সোণা আমদানী হচ্ছে বা বিদেশীদের এ দেশের লোকদের কাছে স্বল্পমেয়াদী ঋণের পরিমাণ বেড়ে চলেছে, তা হলে বুঝতে হবে যে বিদেশী অর্থের দাম স্থির-দরের চেয়ে বেশী রয়েছে, এবং দর কম্‌তির মুখে চল্‌বে।

সমান ক্রয়শক্তির হিসাবে স্থির দর—(Purchasing Power Parity) যদি ক্রয়শক্তির অনুপাতে বিদেশী অর্থের দর স্থির হয়, তা হলে সেই দর স্থায়ী হবার সম্ভাবনা থাকে। এখানে, ক্রয়শক্তি তুলনা করবার উদ্দেশ্যে, লোকে সাধারণতঃ যে সব জিনিষ কেন্‌বার জন্য এবং যে সব কাজ পাবার জন্য আয়ের বেশীর ভাগটা খরচ করে, সেই সবের একটা তালিকা করতে হবে; এবং সেগুলির আপেক্ষিক গুরুত্বের দিকে নজর রেখে প্রত্যেকটির একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নিতে হবে, এবং সমস্তটায় কত খরচ পড়ে দেখতে হবে। এই যোগফল দুই দেশেই সমান হওয়া চাই। তার মানে যদি দেখা যায় যে বিলাতে এই যোগফল হয় ১০ পাউণ্ড ও আমেরিকায় ২৮ ডলার তা হ'লে ডলারের দাম £১০=$২৮, অর্থাৎ £১=$২·৮ এই অঙ্কে স্থির রাখা উচিত। যদি মুদ্রাস্ফীতির দরুণ বিলাতে পাউণ্ডের ক্রয়শক্তি কমে যায় তা হলে সেই অনুপাতে ডলারের দামও চড়াতে হবে। কারণ, তা না হলে বিলাতের লোকেরা দেখবে যে দেশে ১ পাউণ্ড খরচ করে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, ১ পাউণ্ড মূল্যের ডলার দিয়ে আমেরিকায় তার চেয়ে বেশী পাওয়া যায়। অতএব আমেরিকা থেকে বেশী পরিমাণে আমদানী হতে থাক্‌বে, এবং অনুরূপ কারণে বিলাত থেকে রপ্তানী কম্‌বে। তার মানে পাওনার চেয়ে দেনা বেশী হবে। এই বাড়তি দেনা শোধবার জন্য তখন সোণা রপ্তানী করতে হবে, এবং ক্রমশঃ দেশের সরকারী ঋণপত্র, শিল্প-প্রতিষ্ঠানাদির মালিকানী স্বত্ব প্রভৃতিও বিক্রী করতে হবে। এর প্রতিকার হচ্ছে ডলারের দাম চড়িয়ে

দিয়ে দেনা পাওনার সমতা প্রতিষ্ঠা করা। সমান ক্রয়শক্তি হিসাবে যদি ডলারের দর স্থির হয়, তবেই দেনা পাওনা সমান হতে পারে।

চতুর্থ খণ্ড

দেশের সমগ্র আয়ের শ্রেণীগত বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

আয়-নির্দ্ধারণ-সমস্যার প্রকৃতি

আমরা প্রথম খণ্ডে দেখেছি যে বিত্তসৃষ্টির কাজে চার শ্রেণীর লোকেদের দান আছে; যথা—

১। যারা বিভিন্ন রকমের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম যোগায়।

২। যারা পরিচালনাব কাজ করে, এবং লোকসানের ঝুঁকি নেয়;

৩। যারা মূলধনের মালিক; এবং

৪। যারা আবাদী জমি, খনি, জলাশয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক।

এদের সহযোগিতার ফলে যে পণ্য উৎপন্ন হয়, তাব বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে এই চার শ্রেণীর লোকেরা প্রত্যেকে তাদের প্রাপ্য প্রতিদান পায়। শ্রমিক পায় মাহিনা এবং মজুরী; মূলধনের মালিক পায় সুদ; জমিদার পায় খাজনা; এবং যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে যারা লোকসানের ঝুঁকি নেয়, তাদের লাভ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভাগ-বাটোয়ারা কি ভাবে হয়? কে কতটুকু পায়, এবং কেনই বা ততটুকু পায়? সেই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন সহজেই ওঠে। যেভাবে বখরা হয়, তাতে কি দেশের সর্ব্বাধিক মঙ্গল হয়? না, তাতে বেশীর ভাগ লোক তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়, এবং মুষ্টিমেয় লোক তাদের ন্যায্য পাওনার চেয়ে অনেক বেশী আদায় ক'রতে সমর্থ হয়?

কার কতটুকু প্রাপ্য, এই প্রশ্নের একটি উত্তর সহজেই মনে আসে যে, যার দান যে পরিমাণে তার পাওনাও সেই পরিমাণে হবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, উৎপন্ন সামগ্রীটিকে পরীক্ষা ক'রে বোঝা যায় না, তার কত অংশ কোন্ কারণটির ক্রিয়ার ফল। পণ্য-প্রস্তুতির কাজে সব কয়টি কারণের ক্রিয়া একযোগে চলে; সেই কাজের মধ্যে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়, এবং উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে, কোনটিরই পৃথক সত্তা বজায় থাকে না। মাঠের ফসল যখন তোলা হয়, তখন তার সমস্ত অংশই সমান ধরণের। খানিকটা নিয়ে বলা যায় না যে, এইটুকু বিশেষ ক'রে প্রকৃতির দান; আর খানিকটা বিশেষ ক'রে মূলধনের ফল; আর খানিকটা পরিশ্রমের ফল; ইত্যাদি। অতএব এই পথে উক্ত সমস্যার সমাধান হয় না।

(২)

'চাহিদা ও যোগানের সূত্র' প্রয়োগে এ সমস্যার সমাধান হয় না।

কি ভাবে প্রত্যেকের পাওনা ঠিক হয়, এই প্রশ্নের আর একটি উত্তর দেওয়া চলে যে, যে ভাবে পণ্য-মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, এও সেইভাবে হয় ; অর্থাৎ, 'চাহিদা ও যোগানের সূত্র' অনুসারে হয়। আয়-নির্দ্ধারণের প্রশ্নটিকে একটু তলিয়ে বিচার ক'রলে বোঝা যায় যে, এই প্রশ্ন ও পণ্য-মূল্য নির্দ্ধারণের প্রশ্নের মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য আছে। মজুরী হচ্ছে আসলে পরিশ্রমের মূল্য। এখানে শ্রমিক হ'ল বিক্রেতা, এবং ব্যবসায়ী ক্রেতা। টাকার সুদ হচ্ছে, সাময়িকভাবে টাকা ব্যবহার ক'রতে পাওয়ার মূল্য ; এখানে যে টাকা ধার দেয় সে বিক্রেতা, এবং যে টাকা ধার নেয় সে ক্রেতা। তেমনি, খাজনা হ'ল জমি ব্যবহার করবার অধিকার পাওয়ার মূল্য। লাভের বেলাতেও, এই সাদৃশ্য বুঝ্তে যে বিশেষ কষ্ট-কল্পনার দরকার হয়, তা নয়। এ ক্ষেত্রে দেশকে ক্রেতার আসনে বসাতে হবে। দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, সেখানে নানা রকম ব্যবসায় গ'ড়ে তোলা ও চালান'র প্রয়োজন আছে। ব্যবসায়ীদের চেষ্টা ও যত্নের ফলেই এই কাজ হ'তে পারে। তাদের কাছ থেকে এই চেষ্টা ও যত্ন পেতে হ'লে, তার মূল্য-স্বরূপ তাদের লাভ ক'রতে দিতে হবে।

অতএব 'চাহিদা ও যোগানের' সূত্রের প্রয়োগ দ্বারা আয় নির্দ্ধারণ সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা অসঙ্গত নয়। এই সূত্রের ক্রিয়া কি ভাবে হয় সে আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে করা হয়েছে। প্রথমে পৃথকভাবে চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, এবং পরে এদের সমবেত ক্রিয়ার ফলে কি ভাবে মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, তা দেখান' হয়েছে। পণ্যের চাহিদার কারণ, পণ্যের তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা ; খরিদ্দার উপকার পাবার আশাতেই জিনিষ কেনে। পরিশ্রম, মূলধন ইত্যাদির চাহিদার কারণও তেমনি, পণ্য উৎপাদনের কাজে ঐগুলির সাহায্য করবার ক্ষমতা ; ঐ সাহায্য পাবার আশাতেই ব্যবসায়ী ঐগুলির বিনিময়ে মজুরী, সুদ ইত্যাদি দিতে রাজী হয়। ভোগ্য সামগ্রী ব্যবহারের একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, এর পরিমাণ যত বাড়ে, এর প্রান্তিক উপকার তত কমে। সেই জন্যই আমরা 'চাহিদার সূত্রে' দেখ্তে পাই যে, দর কম হ'লে চাহিদার পরিমাণ বেশী হয়, এবং দর বেশী হ'লে চাহিদার পরিমাণ কম হয়। উৎপাদন-সহায়গুলির ক্ষেত্রেও এই একই চাহিদা-সূত্র খাটে। কারণ, এগুলির কোন একটির ব্যবহার যত বাড়ান' যায়, তার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা তত ক'মতে থাকে। যদি কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, কারখানার বাড়ী, জায়গা, যন্ত্রপাতি, পরিচালনার ব্যবস্থা প্রভৃতি সব কিছু সমান রেখে, কেবলমাত্র কারিগরের সংখ্যা বাড়ান' হ'তে থাকে, তা' হ'লে প্রত্যেকবারেই কিছু ক'রে বাড়্তি মাল তৈরী হবে বটে ; কিন্তু প্রত্যেকবারের বাড়্তি মালের পরিমাণ তার আগের বারের বাড়্তি মালের

পরিমাণের চেয়ে কম হবে। এই বাড়্‌তি মাল তৈরীর ফলে যে বাড়্‌তি আয় হবে, মজুরীর হার তার চেয়ে বেশী হ'তে পারে না। অতএব মজুরীর হার বেশী হ'লে কম লোক নেওয়া হবে; মজুরীর হার যেমন ক'মবে, লোকের সংখ্যাও তেম্‌নি বাড়্‌বে। পণ্যের চাহিদার মত, কোন উৎপাদন-সহায়ের চাহিদা জানাতে হ'লে, একটি চাহিদা-রেখা টেনে সে কাজ করা যায়। এই রেখার সাধারণ রূপ পণ্যের চাহিদা রেখার মতই হবে। অর্থাৎ, এ থেকে দেখা যাবে যে, মজুরী কম হ'লে বেশী সংখ্যায় লোক নেওয়া হবে, এবং বেশী হ'লে কম সংখ্যায় নেওয়া হবে। তেমনি সুদ বা খাজনার হার কম হ'লে, বেশী টাকা খাটান' হবে এবং বেশী জমি ও অন্য প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগান' হবে; বেশী হ'লে, টাকা ও জমি ইত্যাদির ব্যবহার ক'মবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, চাহিদার দিকটায় এ দুটি সমস্যার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। কিন্তু যখন যোগানের দিক্‌টা বিবেচনা করা যায়, তখন আর এতখানি সাদৃশ্য দেখা যায় না। কৃষি বা শিল্পজাত যে কোন পণ্যের যোগান সম্বন্ধে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, বাজার দর যদি তৈরী-খরচার চেয়ে কম হয়, তা হ'লে বাজারে ঐ জিনিষের যোগান ক্রমশঃ লুপ্ত হবে। উৎপাদন-সহায়গুলির সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রলে, আবাদী জমি, খনি প্রভৃতি দেশ থেকে উবে যায় না। দেশের বেশীর ভাগ লোক বছরের পর বছর অর্দ্ধাহারে থাক্‌লেও দেশের লোকসংখ্যা বজায় থাকে। সুদ দেওয়া বন্ধ ক'রলেও সঞ্চয় একেবারে বন্ধ হয় না। তারপর, কোন পণ্যের যোগানে ঘাট্‌তি প'ড়্‌লে দর চ'ড়্‌তে থাকে; এবং তার ফলে বেশী মাল তৈরী করবার চেষ্টা হয়, এবং কিছু কালের মধ্যেই বাজারে বাড়্‌তি যোগান আসতে আরম্ভ করে। কিন্তু উৎপাদন-সহায়গুলির ক্ষেত্রে দামের সঙ্গে যোগানের এরকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায় না। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির দান; প্রয়োজন বাড়্‌লে দামই বাড়ে, যোগান বাড়ে না। দেশে, কাজের লোকের সংখ্যা, মাহিনা বাড়ালেই বাড়ে না। যুদ্ধের সময় যুবা বয়সের বহু সংখ্যক বাড়তি লোকের দরকার হয়— যুদ্ধ করবার জন্যও বটে, এবং তার চেয়েও বেশী, যুদ্ধোপকরণ তৈরী করবার জন্য। সে সময় মাহিনা যথেষ্ট বাড়িয়েও অভাব মেটান যায় না। যারা বেকার ছিল, তাদের অবশ্য কাজ জোটে। কিন্তু বাড়্‌তি লোক পাওয়া যায় না। দেশে বেশী সংখ্যায় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র, প্রভৃতি পেতে হ'লে শুধু তাদের রোজগার বাড়িয়ে দিলে কোন ফল হয় না। অন্য নানা রকম উপায় নেওয়া দরকার; এবং এই সমস্ত উপায়ের ফল পেতে হ'লে বহু বৎসর অপেক্ষা ক'রতে হয়। অপর পক্ষে, ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা পড়্‌লে দেশে কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যা ক'মে যায় না; শুধু বেকারের সংখ্যা বাড়ে। ধার দেবার মত টাকার যোগানের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, এই যোগান বাড়াতে হ'লে যে, সব সময় সুদের হার বাড়াতে হয়, তা নয়। কারণ, ব্যাঙ্কগুলি শুধু খাতায় কলমে ডিপজিটের পরিমাণ বাড়িয়ে এই টাকার পরিমাণ কিছুটা বাড়াতে পারে;

লোকে স্বেচ্ছায় বেশী ক'রে সঞ্চয় না ক'রলে এই টাকার যোগান বাড়ে না, তা নয়। আসলে উৎপাদন সহায়গুলির যোগান, মূল্য ছাড়া আরও অনেক কারণের ওপর নির্ভর করে; এবং অনেক ক্ষেত্রে এই কারণগুলির গুরুত্বও যথেষ্ট। অতএব, এই কারণগুলি সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞান না থাকলে উৎপাদন সহায়গুলির যোগানের প্রকৃতি ঠিকমত বোঝা যায় না। প্রধানতঃ এই কারণেই আয় নির্দ্ধারণের সমস্যাটি কেবলমাত্র 'চাহিদা ও যোগানের সূত্রের' প্রযোগ দ্বারা সমাধান করা যায় না। মজুরী, সুদ, লাভ ও খাজনার পরিমাণ কি ভাবে ঠিক্ হয় বুঝতে হ'লে, প্রত্যেকটি পৃথকভাবে পর্য্যালোচনা করা দরকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

জমিদারীর আয়—খাজনা ও ভাড়া।

বেশীর ভাগ দেশেই জমি, খনি, জলাশয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়। অতএব, মালিক ছাড়া অন্য কেউ যদি এগুলি ব্যবহার ক'রতে চায়, তা হ'লে তাকে মালিকের অনুমতি নিতে হয়। এই অনুমতির মূল্যস্বরূপ, মালিক বছরে বছরে কি মাসে মাসে খাজনা বা ভাড়া আদায় করে। এই খাজনার পরিমাণ কি ভাবে স্থির হয়, সেইটি হচ্ছে এখন আমাদের আলোচনার বিষয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে যে, জমিদার ও প্রজার মধ্যে দর কষাকষি ক'রে এই পরিমাণ স্থির হয়। কিন্তু তাতে সমস্যা মেটে না। জমিদার কেন এই পরিমাণের চেয়ে বেশী আদায় ক'রতে পারে না, এবং প্রজাই বা কেন এতখানি দিতে রাজী হয়, এ প্রশ্ন থেকেই যায়। এই প্রশ্নের মীমাংসার সন্ধান পেতে হ'লে, জমি ইত্যাদির প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

খাজনার প্রশ্নের গুরুত্ব* চাষের জমির সম্বন্ধেই সবচেয়ে বেশী। অতএব, চাষের জমির খাজনা সম্বন্ধেই আগে আলোচনা করা হবে।

---

* আধুনিক কালের বিলাতি বইগুলিতে জমির খাজনা সম্বন্ধে আলোচনা আগের চেয়ে অনেক কম থাকে। কারণ, বিলাতের বৈষয়িক জীবনে চাষের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। মাত্র শতকরা ৫ জন চাষের কাজ করে। আমাদের দেশে কিন্তু, শতকরা ৬৪ জন চাষের কাজে নিযুক্ত। অতএব আমাদের দেশের বৈষয়িক জীবনে খাজনার প্রশ্নের গুরুত্ব যথেষ্ট।

(২)

চাষের জমি থেকে ব্যয়াতিরিক্ত আয় ও তাহার কারণ।

চাষের কাজে তিনটি প্রাকৃতিক বাধা আছে :—

১। জমির পরিমাণ যে দেশে যতটুকু আছে, তার চেয়ে বেশী পাবার উপায় নাই। এই পরিমাণ প্রকৃতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ; মানুষের চেষ্টায় বাড়ান' যায় না। অবশ্য, একেবারে যে যায় না, তা নয়। হল্যাণ্ডবাসীরা সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে কিছুটা পরিমাণ জমি বাড়াতে সমর্থ হয়েছে। তবে এই ধরণের কাজ এত ব্যয়সাপেক্ষ, এবং তার ফলও এত অকিঞ্চিৎকর যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

২। সব জমি থেকে সমান কাজ পাওয়া যায় না। কোন কোন জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা এত বেশী যে, সামান্য খরচে প্রচুর ফসল ফলান' যায়। অন্য জমিতে একই পরিমাণ খরচ ক'রলে, এবং একই রকম চেষ্টা ও যত্ন সহকারে চাষ ক'রলেও তার চেয়ে কম ফসল পাওয়া যায়। অন্য জমিতে আবার তারও চেয়ে কম ফসল পাওয়া যায় ; এই রকম। আবার এমন জমিও আছে, যাতে চাষ করা মোটেই পোষায় না ; অর্থাৎ ফলন এত কম হয় যে চাষের খরচ উঠে না।

৩। একই জমিতে বেশী বেশী মূলধন ও শ্রমশক্তি প্রয়োগ ক'রে বেশী বেশী ফসল তোল্‌বার চেষ্টা ক'রলে, প্রান্তিক ফলন ক্রমশঃ ক'মতে থাকে ; তার মানে, মণকরা তৈরী খরচ ক্রমশঃ বাড়্‌তে থাকে।

এখন দেখা যাক, জমির এই সমস্ত বিশেষত্ব থাকার ফল কি। এই আলোচনায় আমরা জমিদার-প্রজাসম্বন্ধ উপেক্ষা ক'রছি। আমরা ধ'রে নিচ্ছি যে জমি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ইহা সাধারণের সম্পত্তি ; এবং যে কোন লোক ইচ্ছামত ব্যবহার ক'রতে পায়।

সব জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা সমান নয় ; কোনটার বেশী, কোনটার কম। এখানে জমির নিজস্ব, অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত উর্ব্বরতার কথা হচ্ছে ; সার প্রয়োগ দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে যে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ান হয়, তার কথা নয়। এখন ধরা যাক্, কোন দেশে যত জমি আছে সবগুলি এই প্রাকৃতিক গুণানুসারে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সবচেয়ে ভাল জমিগুলি ১ম শ্রেণীর ; তার চেয়ে নিরেশগুলি ২য় শ্রেণীর ; তারও চেয়ে নিরেশগুলি ৩য় শ্রেণীর ; এই রকম। দেশের প্রত্যেকখানি জমি এই চারিটি শ্রেণীর কোন না কোনটিতে ফেলা যায়। আর একই শ্রেণীর অন্তর্গত জমিগুলির মধ্যে কোন রকম গুণগত তারতম্য নেই। অবশ্য বাস্তবের সঙ্গে খপে খাওয়াতে হ'লে এ ধরণের ভাগ করা চলে না। তার জন্য আরও অনেক বেশী শ্রেণীর ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য যদি অল্পসংখ্যক শ্রেণীর কল্পনা করা যায়, তা হ'লে বিচারের দিক থেকে কোন ত্রুটি হয় না।

চাষের কাজে যে খরচ ক'রতে হয় তার খানিকটা যায়, যে সব শ্রমিক নিযুক্ত করা যায় তাদের মজুরীতে; আর খানিকটা যায়, সার বীজ প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রতে, এবং বিভিন্ন রকম কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করবার ব্যবস্থা ক'রতে। এছাড়া, আনা নেওয়া, বিক্রীর ব্যবস্থা করা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক খরচ আছে। এর উপর, চাষীর চেষ্টা ও উৎসাহের মূল্য হিসাবে তার একটি ন্যায্য প্রাপ্য আছে, যা না পেলে সে চাষের কাজে টি'কে থাকবে না। এই সব খরচের সমষ্টি হ'ল চাষের মোট খরচ। এখন ধরা যাক এই মোট খরচের এক এক মাত্রা হ'ল ১০৲ দশ টাকা; এবং এই এক মাত্রা খরচ যদি ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর এক এক বিঘা জমির ওপর করা যায় তা হ'লে ফসল পাওয়া যায়, যথাক্রমে ২০/ মণ, ১৬/ মণ, ১২/ মণ ও ১০/ মণ। একই জমিতে যদি খরচের মাত্রা বাড়ান' যায় তা হ'লে প্রান্তিক ফলন ক্রমশঃ কমতে থাকবে। ধরা যাক যে বিভিন্ন শ্রেণীর জমি থেকে যে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় সেগুলি এই রকম *—

	১ম মাত্রা	২য় মাত্রা	৩য় মাত্রা	৪র্থ মাত্রা	৫ম মাত্রা
১ম শ্রেণী	২০	১৬	১২	১০	৮
২য় ঐ	১৬	১২	১০	৮	
৩য় ঐ	১২	১০	৮		

যদি দেশে লোকসংখ্যা কম হয়, এবং প্রথম শ্রেণীর কতকগুলি জমিতে বিঘাকরা এক মাত্রা খরচ ক'রে যে ফসল পাওয়া যায়, তাইতেই দেশের প্রয়োজন মেটে, তা হ'লে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কেউ চাষ ক'রবে না। কারণ যতক্ষণ একমাত্রা খরচ ক'রে ফসলের যোগান ২০/ মণ বাড়ান' যাবে, ততক্ষণ ১৬/ মণ পাবার জন্য সে খরচ কেউ ক'রবে না। এরকম অবস্থায়, যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে কেবল ধানের চাষ হচ্ছে, তা হ'লে ধানের দর হবে ১০৲ টাকায় ২০/ মণ, অর্থাৎ টাকায় ২/ মণ। লোকসংখ্যা বাড়্‌তে বাড়্‌তে যখন ধানের চাহিদা এত বাড়্‌বে যে শুধু প্রথম শ্রেণীর জমিগুলিতে একমাত্রা ক'রে খরচ ক'রে প্রয়োজন মেটান যাবে না, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে হাত প'ড়বে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর জমিগুলিতে বেশী মাত্রায়

* ১৬, ১২, ১০ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি একাধিক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। এর কোন বিশেষ তাৎপর্য্য নাই। কেবল, আলোচনার সময় হিসাব করার সুবিধার জন্য এরকম করা হয়েছে।

একই জমিতে একাধিক মাত্রা খরচ ক'রলে' প্রথম থেকেই প্রান্তিক ফসল ক'মছে, এরকম দেখান হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রথমটায় তা নাও হ'তে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই কয়েক মাত্রা পরে তা হবেই। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথম থেকেই ক্ষীয়মান ফলনের সূত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, এরকম দেখান' হয়েছে।

খরচ করে বেশী ফসল তোলবার চেষ্টা হবে। সে কাজ ক'রতে হ'লে, খরচ প'ড়বে ১৬/ মণে ১০৲ টাকা। অতএব যখন চাহিদার অনুপাতে যোগানে এতটা ঘাট্‌তি প'ড়বে যে দর চ'ড়তে চ'ড়তে টাকায় ১৬/ মণে এসে দাঁড়াবে, তখনই দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির চাষ আরম্ভ হবে, এবং প্রথম শ্রেণীর জমিতে দ্বিতীয় মাত্রা খরচ করা হবে। এ অবস্থায় ২য় শ্রেণীর জমি হ'ল 'প্রান্তিক জমি,' অর্থাৎ যে জমির চাষ ক'রলে খরচ ওঠে বটে, কিন্তু কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না, এবং যে জমির চেয়ে নিরেশ জমিতে চাষ করা পোষায় না। অন্যপক্ষে, প্রথম শ্রেণীর জমি থেকে ৪/ মণ উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া যাবে; কারণ ১৬/ মণ ফসলেই প্রথম মাত্রা খরচ উঠে আসে; অথচ, ফসল পাওয়া যায় ২০/ মণ। এই যে ব্যয়াতিরিক্ত উদ্বৃত্ত ফসলটুকু, এর জন্য মানুষের কোন কৃতিত্ব নেই। এটুকু একান্তভাবে প্রকৃতির দান, স্বাভাবিক উর্ব্বরতায় প্রান্তিক জমির চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর জমির যে শ্রেষ্ঠত্ব, সেইটিই আসলে এর কারণ।

ক্রমশঃ, প্রজা বৃদ্ধি ও শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ফসলের চাহিদা আরও বাড়তে থাকবে, এবং একে একে সমস্ত ২য় শ্রেণীর জমিগুলির চাষ আরম্ভ হয়ে যাবে। তার পরেও যখন চাহিদা আরও বাড়তে থাকবে, তখন যোগানে ঘাট্‌তি পড়বে, এবং দর চ'ড়তে থাকবে। এই দর চ'ড়তে চ'ড়তে যখন টাকায় ১২/ মণ হবে, তখন আবার যোগানের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব হবে। কারণ, তখন ৩য় শ্রেণীর জমি চাষ করা পোষাবে, এবং ১ম শ্রেণীর জমিতে ৩য় মাত্রা ও ২য় শ্রেণীর জমিতে ২য় মাত্রা খরচ করা পোষাবে। তখন, ৩য় শ্রেণীর জমি হবে প্রান্তিক জমি, এবং প্রথম শ্রেণীর জমি থেকে উদ্বৃত্ত আয় হবে ৮/+৪/=১২/ মণ, ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি থেকে উদ্বৃত্ত আয় হবে ৪/ মণ। ক্রমে, চাহিদা আরও বাড়তে থাকলে ৪র্থ শ্রেণীর জমি হবে প্রান্তিক জমি। সমস্ত ৪র্থ শ্রেণীর জমির চাষ আরম্ভ হ'য়ে যাবার পরও যখন ফসলের চাহিদা আরও বাড়বে, তখন অগত্যা নিকৃষ্ট জমিতেও খরচের মাত্রা বাড়িয়ে ফসলের যোগান বাড়াতে হবে। যখন দর হবে টাকায় ৮/ মণ, তখন ৪র্থ শ্রেণীর জমিতে দ্বিতীয় মাত্রা খরচ করা হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য শ্রেষ্ঠতর জমিগুলিতেও খরচের মাত্রা বাড়ান হবে। এ অবস্থায় ৪র্থ শ্রেণীর জমি থেকেও কিছু উদ্বৃত্ত আয় হবে; কারণ প্রথম মাত্রা খরচে ১০/ মণ ফসল পাওয়া যাবে, অথচ ৮/ মণ ফসলেই খরচ উঠে আসবে। এখানে উদ্বৃত্ত আয়ের কারণ, প্রান্তিক জমির চেয়ে এই জমির শ্রেষ্ঠত্ব, এ কথা বলা চলে না। এখানে কারণ হচ্ছে, জমির দুষ্প্রাপ্যতা।

কোন্ জমি থেকে কত উদ্বৃত্ত আয় হবে তা' সেই জমি কোথায় অবস্থিত তার উপরও নির্ভর করে। দুখানি জমির যদি স্বাভাবিক উর্ব্বরতা একই রকম হয়, কিন্তু একটি কোন বহতা নদীর ধারে অবস্থিত কিংবা কোন বড় সহরের কাছে অবস্থিত

হয়, এবং অন্যটির সে সুবিধা না থাকে, তা হ'লে জল-সেচ করার কাজে কিংবা বীজ সার প্রভৃতি কেনার কাজে এবং মাঠের ফসল বাজারে পৌঁছে দেওয়ার কাজে, দ্বিতীয় জমিতে যত খরচ প'ড়বে, প্রথম জমিতে তার চেয়ে কম প'ড়বে। তার ফলে, একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের জন্য দ্বিতীয় জমিতে যে মোট খরচ প'ড়বে, প্রথম জমিতে তার চেয়ে কম প'ড়বে; অর্থাৎ এক মাত্রা খরচে দ্বিতীয় জমি থেকে যত ফসল পাওয়া যাবে, প্রথম জমি থেকে তার চেয়ে বেশী পাওয়া যাবে। উদ্বৃত্ত আয়ের এই অংশটুকুর কারণ হচ্ছে, প্রথম জমিটির অবস্থানগত আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব। দেশের জমিগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করবার সময় যেমন স্বাভাবিক উর্ব্বরতার বিচার ক'রতে হবে, তেমনি অবস্থানের সুবিধারও বিচার করতে হবে। এই দুইরকমের বিচার ক'রে প্রত্যেক জমির উপযুক্ত শ্রেণী নির্দ্ধারণ ক'রতে হবে, এবং তার পর কোন্‌টি থেকে কত উদ্বৃত্ত আয় হয়, তার হিসাব নিতে হবে।

অতএব, দেখা গেল যে জমির উদ্বৃত্ত আয়ের তিনটি কারণ আছে-

১। প্রান্তিক জমির তুলনায় উর্ব্বরতা-গত আপক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব;

২। প্রান্তিক জমির তুলনায় অবস্থান-গত আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব;

৩। জমির দুর্ল্লভতা।

(৩)

রিকার্ডোর সিদ্ধান্ত।

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর (Ricardo—১৯শ শতাব্দির একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্) সিদ্ধান্ত সুপরিচিত। তাঁর মতে জমি থেকে যে ব্যয়াতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আয় হয়, সেইটিই জমিদার প্রজার কাছ থেকে খাজনা হিসাবে আদায় করে। যুক্তিটি এই রকম—

জমির ষোল আনা মালিকানী স্বত্ব একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের হাতে। তারা জমিদার। তারা নিজেরা চাষ করে না। চাষীদের যা জমি দরকার, তারা জমিদারদের কাছ থেকে বন্দোবস্ত ক'রে নেয়। এই বন্দোবস্ত করায় অবাধ প্রতিযোগিতা আছে— জমিদারদের মধ্যেও আছে, প্রজাদের মধ্যেও আছে। জমিদাররা জমি বিলি ক'রতে চায়, এবং যথাসম্ভব বেশী খাজনা আদায় করবার চেষ্টা করে। প্রজারাও কত ভাল জমি কত কম খাজনায় পেতে পারে, তারই চেষ্টা করে। এরকম অবস্থায় জমির সমস্ত বা প্রায় সমস্ত উদ্বৃত্ত আয়টুকু জমিদার খাজনা হিসাবে আদায় করতে সমর্থ হয়। যদি ধরা যায় যে ফসলের দর টাকায় ১৴ মণ, তা হ'লে ৪র্থ শ্রেণীর জমি হবে প্রান্তিক জমি। এই জমির ফসল থেকে খরচা ওঠে বটে, কিন্তু খাজনা দেবার মত কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। অতএব এ জমি

থেকে জমিদার কোন খাজনা পেতে পারে না। খাজনা চাইলে প্রজা মিল্‌বে না। এরকম বিনা-খাজনার জমি অবশ্য, এখনকার ঘনবসতি-পূর্ণ দেশগুলিতে কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু এক কালে পাওয়া যেত। বাংলা দেশে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মহা-দুর্ভিক্ষের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) ফলে এত লোকক্ষয় হয়েছিল যে বহু জমির চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শোণা যায় যে তখন প্রজা পাবার জন্য জমিদারে জমিদারে এত রেষারেষি আরম্ভ হয়েছিল যে অনেক সময়ে লাঠালাঠি পর্য্যন্ত হ'ত। জমিদারেরা সেই সময়ে অনেক জমিতে বিনা খাজনায় প্রজা বসাতে আরম্ভ করেছিল এই ভরসায় যে, ভবিষ্যতে যখন জন-সংখ্যার বৃদ্ধি হবে ও ফসলের চাহিদা বাড়বে, তখন ঐ সব জমিতে চাষ করা পোষাবে, এবং ক্রমে ঐ সব জমি থেকে খাজনা আদায় করাও সম্ভব হবে। আধুনিক কালে যখন সুন্দরবনে বন কেটে বসতি স্থাপন আরম্ভ হয়েছিল, তখন জমিদারেরা অনেক জায়গায়, প্রথম ২০।২৫ বৎসর মোটে খাজনা দিতে হবে না, কিংবা নামমাত্র খাজনা দিতে হবে, এই সর্ত্তে জমি বিলি করেছিল। যখন চতুর্থ শ্রেণীর জমি হ'ল প্রান্তিক বা বিনা-খাজনার জমি তখন প্রথম শ্রেণীর জমিতে চাষ করবার জন্য ৪ মাত্রা খরচ করা হবে; এবং ফসল পাওয়া যাবে, ২০/+১৬/+১২৲+১০/ অর্থাৎ মোট ৫৮/ মণ। কিন্তু ৪ × ১০/০ মণ অর্থাৎ ৪০/ মণ ফসল পেলেই মোট খরচ উঠে আসে। অতএব উদ্বৃত্ত আয় হবে ১৮ মণ। ১৮ মণের দাম ১৮ টাকা। একখানি প্রথম শ্রেণীর জমির জন্য যদি কোন চাষী ১০৲ টাকা খাজনা দিতে চায়, অমনি আর একজন স্বচ্ছন্দে ১২৲ টাকা হাঁকবে। কারণ তাতেও তার ৬৲ টাকা বাড়তি লাভ থাকবে। আর একজন তার চেয়ে বেশী দিতে চাইবে, আর একজন তারও চেয়ে বেশী দিতে চাইবে। এইভাবে যতক্ষণ না একজন ১৮৲ টাকা দিতে চায় ততক্ষণ চাষীদের মধ্যে রেষারেষি চ'ল্‌বে। কিন্তু ১৮৲ টাকার বেশী কেউ দিতে চাইবে না; কারণ তা দেওয়ার চেয়ে চতুর্থ শ্রেণীর বিনা খাজনার জমি নেওয়া সুবিধা হবে। অতএব ১৮৲ টাকাই খাজনা সাব্যস্ত হবে। অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির খাজনা হবে ৮৲ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ২৲ টাকা।

(৪)

জমির খাজনার সঙ্গে ফসলের দামের সম্পর্ক

এ রকম মনে করা স্বাভাবিক যে, জমির জন্য চাষীকে খাজনা দিতে হয় ব'লে ফসল ফলানর খরচ ঐ পরিমাণে বেশী হয়, এবং সেইজন্য ফসলের দামও ততখানি চড়া হয়; যদি খাজনা দিতে না হ'ত, তা হ'লে দামও ততখানি কম হ'ত। এ ধারণা কিন্তু ভুল। খাজনা দিতে হয় ব'লে দাম চড়া নয়; দাম চড়া ব'লেই খাজনা দিতে হয়। রিকার্ডোর কথায়, "Corn is not high because a rent is paid, but a rent is paid because corn is high;

and it has been justly observed that no reduction would take place in the price of corn, although landlords should forego the whole of their rent" অর্থাৎ, খাজনা দিতে হয় ব'লে ফসলের দাম চড়া নয়, ফসলের দাম চড়া ব'লেই খাজনা দিতে হয়; এবং এ মন্তব্য ঠিকই করা হয়েছে যে জমিদারেরা কিছুমাত্র খাজনা না নিলেও ফসলের দাম একটুও ক'মৃত না।" এ কথা যে ঠিক্ তা, আগে খাজনার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে, তা থেকে সহজেই বোঝা যায়। যদি ফসলের চাহিদা এত কম হ'ত যে, শুধু প্রথম শ্রেণীর জমিগুলিতে এক মাত্রা ক'রে খরচ ক'রলেই সব প্রয়োজন মেটান' যেত, তা হ'লে কোন জমি থেকেই খাজনা আদায় করা যেত না; এবং ফসলের দাম চাষের খরচের সমান হ'ত। কিন্তু চাহিদা বেশী হওয়াতে এইটুকু যোগানে কুলায় না। ফলে দর বাড়ে, এবং অপেক্ষাকৃত বেশী খরচে যোগান বাড়াতে হয়; কারণ যোগান বাড়াতে হ'লে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি চাষ ক'রতে হয় এবং উৎকৃষ্ট জমিতে বেশী মাত্রায় খরচ ক'রে ফলন বাড়াতে হয়; দুটি কাজেতেই মণকরা তৈরী খরচা বেশী পড়ে। দর বেশী হওয়াতে এই খরচ করা পোষায়, এবং এই দর বেশী হওয়ার কারণেই উচ্চ শ্রেণীর জমি থেকে উদ্বৃত্ত আয় হ'তে থাকে। খাজনা, এই উদ্বৃত্ত আয় ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব আগের কথা দর; খাজনা তার ফল। ফসলের দামের সঙ্গে জমির খাজনার কার্য্য কারণ সম্বন্ধটা এই ভাবে দেখান' যায়—

কোন্ জমির খাজনা কত তা' নির্ভর করে, কোন্ জমি প্রান্তিক জমি তার উপর; বা উচ্চ শ্রেণীর জমিতে খরচের প্রান্তিক মাত্রা কোন্‌টি, তার উপর। প্রান্ত যত এগিয়ে যাবে, খাজনাও তত বেশী হবে। প্রান্ত যত পেছিয়ে থাক্‌বে খাজনা তত কম হবে। এই প্রান্ত আবার নির্ভর করে দরের উপর। দর যত বেশী হবে, প্রান্ত তত এগিয়ে যাবে; দর যত কম হবে, প্রান্ত তত পেছিয়ে থাক্‌বে। অতএব খাজনা নির্ভর করে দরের ওপর। দর হ'ল কারণ; খাজনা তার পরিণাম।

'চাহিদা ও যোগানের সূত্র' অনুসারে দর ঠিক্ হয়।

দর	ঠিক্ করে ⟶	প্রান্তের অবস্থান
প্রান্তের অবস্থান	ঠিক করে ⟶	উদ্বৃত্তের পরিমাণ।

এই উদ্বৃত্ত আয় = খাজনা।

জমিদারেরা যদি খাজনা আদায় না করে তা হ'লে তার একমাত্র ফল এই হবে যে জমির উদ্বৃত্ত আয়টুকু চাষীদের ভোগে যাবে। দাম কিছুমাত্র ক'মবে না। কারণ, দাম ক'মলে, যোগানের শেষের খানিকটা অংশের তৈরী-খরচা উঠ্‌বে না, এবং তার ফলে সে অংশটুকু তৈরী হবে না। তখন যোগানে টান ধ'রবে, এবং দর আবার চ'ড়তে থাক্‌বে।

(৫)

রিকার্ডোর সিদ্ধান্তের দুটি বিরুদ্ধ সমালোচনা।

ফসলের দরের সঙ্গে জমির খাজনার সম্পর্ক সম্বন্ধে রিকার্ডোর উপরোক্ত সিদ্ধান্তের দুটি বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়েছে—

১। জমিদাররা যদি খাজনা ছেড়ে দেয়, তা হ'লেও চাষীরা ফসলের দর কমাবে না, এ কথা ঠিক্ বটে। কিন্তু,এই খাজনা যদি সরকারের হাতে আসে, তা হ'লে দেশের সমস্ত ফসলটুকু গড়্পড়তা যে খরচ তৈরী হয়েছে, সরকার সেই দরে দেশের লোককে সেই ফসল সরবরাহ দিতে পারে। এই দরের চেয়ে যে চাষীর খরচ কম, তার কাছ থেকে উদ্বৃত্ত আয়-টুকু নিয়ে, যে চাষীর খরচ বেশী তাকে সেই টাকা থেকে খেসারৎ দেওয়া যেতে পারে। অতএব সমগ্রভাবে দেশে ফসলের যোগান বিবেচনা ক'রলে দেখা যায় যে, খাজনা তৈরী-খরচের একটি অঙ্গ, খাজনা দিতে হয় ব'লেই দর বেশী, এবং খাজনা আদায় করবার অধিকার যদি জমিদারদের না থাক্ত তা হ'লে দেশের লোক কম দরে ফসল কিন্তে পারত। এ যুক্তির মধ্যে ত্রুটি আছে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে যুক্তিটি ভাল ভাবে বোঝবার চেষ্টা ক'রলেই ত্রুটি ধরা পড়বে। ধরা যাক্ যে দেশে সবসমেত ৩ লক্ষ মণ ধান তৈরী হচ্ছে। এর মধ্যে—

১ লক্ষ মণের	তৈরী খরচা	মণকরা	৯৲ টাকা	
১ ঐ	ঐ	ঐ	১০৲ ঐ;	এবং
১ ঐ	ঐ	ঐ	১১৲ ঐ।	

প্রান্তিক তৈরী খরচা ১১৲ টাকা মণ হওয়াতে বাজার দর হবে মণকরা ১১৲ টাকা। অথচ, গড়্পড়তা তৈরী খরচ হচ্ছে ১০৲ টাকা মণ। এখন প্রস্তাবটি হ'ল এই যে, সরকার এই গড়পড়তা তৈরী খরচায়, অর্থাৎ ১০৲ টাকা মণে, ধানের দর বেঁধে দেবে, এবং প্রথম ১ লক্ষ মণে যে মণকরা ১৲ উদ্বৃত্ত আয় হবে সেইটি আদায় ক'রে, শেষের ১ লক্ষ মণে যে মণকরা ১৲ টাকা লোকসান হবে, তার ক্ষতিপূরণ ক'রে দেবে। ৩ লক্ষ মণের মোট তৈরী খরচা ৩০ লক্ষ টাকা, ১০৲ টাকা দরে বিক্রী ক'রলে মোট আদায়ও হবে ৩০ লক্ষ টাকা। চাষীদের কারও কোন লোকসান হ'ল না; অথচ

* Ricardo's statement is not strictly accurate If the landlords would forego their rents, not to their tenants but to the state, the state could as it were, pool all the land of the conntry, and sell the corn raised on the worst lands below its cost of production, campensating itself from the surplus of product over outlay on the best lands, i. e. rent as a whole enters into cost of production as a whole, prices as a whole would be lower if no rent were paid" 'Economies for the Generel Reader' by Henry clay 2ed. p. 360.

দেশের লোক ১০৲ টাকা দরে ধান কিনতে পেলে। এ যুক্তির মধ্যে গলদ হ'ল এই যে, যেখানে খোলা বাজারে, ১১৲ টাকা মণ দরে চাহিদার পরিমাণ থাকে ৩ লক্ষ মণের, সেখানে যদি দর কমিয়ে ১০৲ টাকায় নামান হয় তা হ'লে চাহিদার পরিমাণ ৩ লক্ষ মণের বেশী হ'তে বাধ্য। অতএব চাহিদার অনুপাতে যোগানে ঘাট্‌তি পড়বে, এবং তার ফলে দর চ'ড়তে থাকবে। অবশ্য দর বেঁধে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রত্যেক খরিদ্দারের কেনার পরিমাণও বেঁধে দেওয়া হয়, ত হ'লে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তা হ'লে বাজার দর কথাটা আর এ প্রসঙ্গে ব্যবহার করা চলা ন.।

২। *জমিতে মাত্র এক রকম ফসলের চাষ হয় না। নানা রকম ফসলের চাষ হয় ; তা ছাড়া অন্য কাজেও জমি ব্যবহার করা হয়। সেইজন্য, কোন একটি বিশেষ ফসলের কথা বিবেচনা ক'রলে দেখা যায় যে, চাষের প্রসার প্রান্তিক অর্থাৎ বিনা খাজনার জমি পর্য্যন্ত পৌঁছতে পায় না ; তার আগেই আর একটি সীমায় এসে ঠেকে যায়। এই সীমা হচ্ছে 'বদ্‌লি ব্যবহারের সীমা' (margin of transference)। এখানে, জমি যদি অন্য ফসলের জন্য বা অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় তা' হ'লে উদ্বৃত্ত আয় বেশী হয়। অতএব এই উদ্বৃত্ত আয়ের সমপরিমাণ খাজনা না দিলে, এই জমি প্রথমোক্ত ফসলের জন্য পাওয়া যাবে না। যখন এই অতিরিক্ত খাজনা দিয়ে, ঐ জমি প্রথমোক্ত ফসলের জন্য চাষ করা হয়, তখন আর এ কথা বলা চলে না যে, খাজনা তৈরীখরচার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এ ক্ষেত্রে বেশী খাজনা দিতে হয় ব'লেই, দাম বেশী হয়। এই যুক্তি কতদূর বিচারসহ, এখন দেখা যাক।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলে যুক্তিটি বোঝবার ও বিচার করবার সুবিধা হবে। ধরা যাক্ যে, গমের চাষের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণীর জমি থেকে এক এক মাত্রা খরচের ফলে কি কি পরিমাণ গম পাওয়া যায় তার পরিচয় নীচে দেওয়া হ'ল—

	১ম মাত্রা খরচ	২য় মাত্রা খরচ	৩য় মাত্রা খরচ	৪র্থ মাত্রা খরচ
১ম শ্রেণী	২০/ মণ	১৬/ মণ	১২/ মণ	১০/ মণ
২য় শ্রেণী	১৬/ মণ	১২/ মণ	১০/ মণ	
৩য় শ্রেণী	১২/ মণ	১০/ মণ		
৪র্থ শ্রেণী	১০/ মণ			

*"Land on the margin of cultivation pays no rent ; land on the margin of transference does pay rent. This rent enters into the cost of particular agricultural products ; it is not a Surplus over the cost of cultivation, but is itself part of the cost of cultivation, governing, not governed by price." Introduction to Economics" by 'Cairncross" 1st ed, p, 222.

বাজারে গমের চাহিদা এরকম যে, কেবলমাত্র ১ম শ্রেণীর জমিতে দুই মাত্রা ও ২য় শ্রেণীর জমিতে এক মাত্রা খরচ ক'রে যে পরিমাণ উৎপন্ন করা যায় তাতে চাহিদা মেটে না। অতএব গমের দর টাকায় ১'৬/ মণের চেয়ে বেশী হবে, এবং চাহিদা যত বাড়্বে, দরও তত বাড়্বে। গমের চাষ ছাড়া, জমির যদি আর কোন ব্যবহার না থাক্ত, তা হ'লে দর যখন টাকায় ১'২/ মণ পর্য্যন্ত উঠ্ত, তখন ৩য় শ্রেণীর জমিতে চাষ আরম্ভ হ'ত; গমের যোগান বাড়্ত; এবং দর চড়া বন্ধ হ'ত। এ অবস্থায় ৩য় শ্রেণীর জমি হ'ত প্রান্তিক বা বিনা-খাজনার জমি। কিন্তু আসলে, ৩য় শ্রেণীর জমি বিনা খাজনায় পাওয়া যায় না। কারণ, ঐ জমির অন্য আরও লাভজনক ব্যবহার আছে। হয়ত, যারা দুধের ব্যবসা করে তারা, ঐ জমি গো-চারণের জন্য ব্যবহার ক'রে, ১০৲ টাকা খরচ ক'রে মোট ১২৲ টাকা উশুল করে; অর্থাৎ ২৲ টাকা উদ্বৃত্ত আয় পায়। অতএব তারা, ঐ জমির জন্য ২৲ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা দিতে রাজী। এতএব, ঐ জমি গমের চাষের জন্য পেতে হ'লে, ২৲ টাকা খাজনা দিতে হবে। অতএব গমের দর টাকায় ১/ মণ পর্য্যন্ত উঠ্লে তবে, ৩য় শ্রেণীর জমিতে গমের চাষ হবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তা' হ'লে যে, খাজনা দিতে হয় ব'লেই গমের দর এতখানি উঠেছে। তার মানে, খাজনা দেওয়ার প্রথা যদি না থাক্ত তা হ'লে দর এতখানি উঠ্ত না।

কিন্তু, সে কথা কি ঠিক্? যদি জমিদাররা খাজনা ছেড়ে দেয়, তা হ'লে জমি থেকে যা কিছু উদ্বৃত্ত আয় হবে, তা চাষীর থেকে যাবে। চাষীর তখন চেষ্টা হবে, কিসে এই উদ্বৃত্ত আয় বেশী হয়। এ অবস্থায় যখন গমের দর টাকায় ১'২ মণ/ হবে, তখন ৩য় শ্রেণীর জমিতে গমের চাষ ক'রলে খরচ উঠ্বে, কিন্তু উদ্বৃত্ত আর কিছু হবে না। অন্যপক্ষে ঐ জমি দুধের ব্যবসায়ে ব্যবহার ক'রলে, খরচ পুষিয়ে ২৲ টাকা উদ্বৃত্ত আয় হবে। সেক্ষেত্রে চাষী ঐ জমি গমের চাষে লাগাবে, তা হ'তে পারে না। যতক্ষণ না গমের দর টাকায় ১/ মণ হচ্ছে ততক্ষণ ৩য় শ্রেণীর জমিতে গমের চাষ হবে না। অতএব, খাজনা দিতে হয় ব'লে গমের দর বেশী, এ কথা ভুল। আসলে, গমের চাহিদার চেয়ে দুধের চাহিদার জোর বেশী হওয়াতেই, ৩য় শ্রেণীর জমিগুলি গমের চাষে ব্যবহার না হ'য়ে, দুধের ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয়েছে। খাজনা দেওয়া না দেওয়ার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই।

রিকার্ডোর মন্তব্যের এই ভ্রান্ত সমালোচনার উৎপত্তি হয়েছে আসলে, জমির শ্রেণী-বিভাগের ত্রুটি থেকে। খাজনার প্রকৃতি সম্বন্ধে রিকার্ডোর সিদ্ধান্তটি বোঝবার জন্য, জমির যে কল্পিত শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে, তাতে মাত্র একটি খাদ্যশস্যের কথাই বিবেচনা করা হয়েছে। কোন্ জমি কত ভাল কি কত মন্দ, তা কেবল ঐ শস্যের ফলনের হিসাব দিয়েই বিচার করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে জমির একটি মাত্র ব্যবহার নয়। অতএব বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হ'লে এই রকম মনে করা দরকার যে প্রত্যেকখানি জমি যে কাজের জন্য সবচেয়ে উপযোগী, সেই কাজে লাগান' হবে। জমির শ্রেণী বিভাগ করবার সময়

হিসাব ক'রতে হবে যে, সবচেয়ে লাভজনক কাজে লাগালে কোন্ জমিতে কত উদ্বৃত্ত আয় হয়; এবং যে জমিতে যত বেশী উদ্বৃত্ত আয় হবে, সেই জমিকে তত উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক'রতে হবে। তা না হ'লে শ্রেণী-বিভাগ নিতান্তই অবাস্তব হ'য়ে পড়ে। যে জমি পাটের জন্য উৎকৃষ্ট, সে জমি তুলার জন্য নিকৃষ্ট; এবং যে জমি তুলার জন্য উৎকৃষ্ট, সে জমি পাটের জন্য নিকৃষ্ট। যে জমি নারিকেল বা সুপারীর বাগানের জন্য উৎকৃষ্ট, সে জমি চা বাগানের জন্য নিকৃষ্ট; আবার যে জমি চা বাগানের জন্য উৎকৃষ্ট, সে জমি নারিকেল বাগানের জন্য নিকৃষ্ট। কলিকাতার উপকণ্ঠের চাষের জমিগুলির খাজনা যে এত বেশী তার কারণ শুধু বাজারে ফসল পৌঁছে দেবার সুবিধা আছে, তা নয়। যদি ঐ সব জমিতে ধানের চাষ করা হ'ত তা হ'লে এত খাজনা দেওয়া সম্ভব হ'ত না। এখানে তাজা ফুল, টাট্কা শাক সব্জি, ডিম প্রভৃতি মূল্যবান ফসল তৈরী ক'রে সহজে এবং ভাল দামে বিক্রী করা যায় ব'লেই এ সব জমির উদ্বৃত্ত আয় এত বেশী হয়। অতএব জমির শ্রেণী বিভাগ করবার সময়, প্রত্যেকখানি জমি থেকে, একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খরচের বদলে কত টাকা উশুল করা যায়, তারই হিসাব নিতে হবে; এবং যে জমি থেকে যত বেশী উশুল পাওয়া যাবে সে জমিকে তত উচ্চ শ্রেণীতে ফেল্‌তে হবে। এই রকম ক'র্‌লে, রিকার্ডোর মন্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ থাক্‌বে না।

(৬)

বাড়ী-ভাড়া, খনির খাজনা ও জলকর।

বাড়ী-ভাড়া—বাড়ীর মালিক ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে যে ভাড়া আদায় করে তার সবটুকু এক ধরণের আয় নয়। এর একটি অংশ আসলে মূলধন নিয়োগের আয়, অর্থাৎ বাড়ী তৈরী ক'রতে যে টাকা খরচ হয়েছে, তার সুদ। অন্য অংশটি, যে জমির ওপর বাড়ীটি তৈরী হয়েছে সেই জমির খাজনা। বাড়ীভাড়ার এই অংশটুকু কোন্ বাড়ীর কত হবে, তা নির্ভর করে, প্রধানতঃ জমির অবস্থানগত সুবিধার উপর। জমির অন্য গুণাগুণের যে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তা নয়। নিউইয়র্ক সহরের জমি এত শক্ত, যে খুব উঁচু বাড়ীর ভার সয়। অন্য সহরের তুলনায়, নিউ ইয়র্ক সহরের বাড়ী তৈরীর জমির খাজনা বেশী হবার এ একটা কারণ। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই বাড়ী তৈরী করবার জমির আপেক্ষিক মর্য্যাদা নির্ভর করে, তার অবস্থানগত সুবিধার উপর। ঠিক একই ধরণের বাড়ী, যদি একখানা বড় বাজারে হাবড়ার পুলের মোড়ে থাকে, আর একখানা ব্যবসাকেন্দ্র থেকে দূরে কোন অখ্যাত গলির মধ্যে থাকে, তা হ'লে প্রথম বাড়ীখানার ভাড়া অন্যটির চেয়ে অনেক বেশী হবে। এর কারণ, প্রথম বাড়ীটি, দোকান, অফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি চালাবার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং

তাই থেকে অনেক রোজগার করা যেতে পারে। অন্য বাড়াটির সে সুবিধা অনেক কম, কিংবা মোটেই নেই। এই যে অবস্থানগত আপেক্ষিক সুবিধার জন্য উদ্বৃত্ত আয়, এর সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর আবাদী জমির উদ্বৃত্ত আয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য রয়েছে। এই উদ্বৃত্ত আয়ের জন্য বাড়ীর মালিকের কোন ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নেই। বাড়ীর চাহিদা বাড়লে, সাধারণভাবে বাড়ীর যোগান বাড়ান' যায়। কিন্তু হাবড়ার পুলের মোড়ের বাড়ীর চাহিদা বাড়লে, অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় তার যোগান বাড়ান যায় না।

খনির খাজনা—চাষের জমির সঙ্গে খনির একটা বড় প্রভেদ আছে। চাষ ক'রলে, চাষের জমির উৎপাদন-ক্ষমতা নষ্ট হয় না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে চাষীর অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতার ফলে জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয়। কিন্তু ঠিকমত চাষ ক'রলে, জমির উৎপাদন ক্ষমতা চিরকাল বজায় রাখা যায়। খনি সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। প্রত্যেক খনিতে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খনিজ পদার্থ থাকে। সেটুকু তুলে নেওয়া হয়ে গেলে, সে খনির আর কোন মূল্য থাকে না। অতএব, খনি ব্যবহারের জন্য জমিদার যে খাজনা আদায় করে, তার একটি অংশ হ'চ্ছে খনিজ পদার্থের মূল্য। সেইজন্য, প্রায় ক্ষেত্রে, খনির লীজে এই রকম সর্ত্ত থাকে যে, যত মাল তোলা হবে তারই হিসাবে খাজনার পরিমাণ স্থির হবে।

খনির খাজনার অন্য অংশটুকু প্রকৃত খাজনা, অর্থাৎ আপেক্ষিক প্রাকৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য। সব খনিতে কাজের সুবিধা সমান নয়। রেলপথ, নদীপথ বা সমুদ্রপথে মাল পাঠান'র সুবিধা, কাছে পিঠে সস্তায় যথেষ্ট সংখ্যায় মজুর বা কারিগর পাওয়ার সুবিধা খনির এক এক স্তরে অনেকখানি ক'রে মাল থাকার সুবিধা, সামান্য কিছু দূর খনন করেই স্তরগুলির নাগাল পাওয়ার সুবিধা, প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিভিন্ন খনির মধ্যে প্রভেদ আছে। এই সমস্ত দিক্ দিয়ে, প্রান্তিক খনির চেয়ে যে খনির আপেক্ষিক সুবিধা যত বেশী, সেই খনির খনকরা খরচও পড়ে তত কম; এবং সেইজন্য সেই খনির খাজনাও দিতে হয় তত বেশী।

যে সব জায়গা থেকে ব্যবসার জন্য পাথর কাটা হয়, সে সব জায়গার খাজনাও খনির খাজনার অনুরূপ।

জলকর—যে জলাশয়ে মাছের যোগান অফুরন্ত নয়, অর্থাৎ মাছ তুলে নিতে নিতে মাছ ফুরিয়ে যায়, বা যথেষ্ট ক'মে যায়, সে জলাশয়ের জন্য জমিদারকে যে আদায় দিতে হয়, তার এক অংশ আসলে মাছের মূল্য। অন্য অংশটি প্রকৃত খাজনা, অর্থাৎ প্রান্তিক জলাশয়ের তুলনায়, ব্যয়াতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আয়। যে জলাশয়ে মাছের যোগান অফুরন্ত, সে জলাশয়ের জন্য যা দিতে হয় তার সবটুকু প্রকৃত খাজনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

স্বাভাবিক খাজনা ও ব্যবহারিক খাজনা।

প্রাকৃতিক কারণে জমি থেকে যে উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায়, রিকার্ডোর সিদ্ধান্ত অনুসারে, সেইটাই খাজনা হিসাবে জমিদারদের আদায় করবার কথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তা হয় না; কোন কোন জায়গায় এর চেয়ে অল্পবিস্তর কম নেওয়া হয়, এবং কোন কোন জায়গায় অল্পবিস্তর বেশী নেওয়া হয়। এ রকম হবার কারণ হচ্ছে এই যে, যে সমস্ত অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রিকার্ডোর সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করা হয়, সেগুলির বাস্তবের সঙ্গে পুরোপুরি মিল নেই। যেমন,—

(১) ধ'রে নেওয়া হয়েছে যে, জমির মালিকানী স্বত্বের ষোল আনা অংশই জমিদারের হাতে। কিন্তু, আমাদের দেশের ভূমি-ব্যবস্থা বিবেচনা ক'রলে দেখা যায়, এ কথা সত্য নয়। বাংলা দেশের জমিদার, জমির মালিকানী স্বত্বের একটি নগণ্য অংশের অধিকারী। যারা পত্তনিস্বত্ব, মৌরসী মোকরারী স্বত্ব, দখলী স্বত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন স্বত্বের অধিকারী, তারা নামে প্রজা হ'লেও, আসলে মালিকানী স্বত্বের অনেকখানি তাদের। পত্তনিদার, তার জমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার অধিকারী; তার একমাত্র বাধ্য-বাধকতা এই যে, জমিদারকে একটি নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়ে যেতে হবে; এ খাজনার পরিমাণ কখনও বাড়ান' যায় না: এবং পত্তনিদার তার জমি, যে ভাবে খুসী ব্যবহার ক'রতে পারে। মৌরসী মোকরারী প্রজার স্বত্বও এর চেয়ে বিশেষ কম নয়। যে প্রজার দখলী স্বত্ব আছে, তার অধিকারও সামান্য নয়। কোন্ অবস্থায় কতটুকু খাজনা বাড়ান' যাবে তা আইন দিয়ে বাঁধা আছে। তাকে যখন খুসী উৎখাত করাও যায় না। কি অবস্থায় তাকে উৎখাত করা যাবে, তাও আইন দিয়ে নির্দ্দিষ্ট করা আছে। এই সব প্রজাদের যা খাজনা দিতে হয়, তা কোন ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক খাজনার সমান নয়। কিন্তু তাতে রিকার্ডোর সিদ্ধান্ত ভুল প্রতিপন্ন হচ্ছে না। খাজনার মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে রিকার্ডো যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা সর্ব্বাংশেই সত্য। যার হাতে মালিকানী স্বত্ব, এই খাজনাও সে পাবে। অতএব যেখানে এই মালিকানী স্বত্ব দুই পক্ষের মধ্যে ভাগ হয়েছে, স্বভাবতঃই এই খাজনাও সেই অনুপাতে দুই পক্ষের মধ্যে ভাগ হবে। সেইজন্যই জমিদার স্বাভাবিক খাজনার পুরোটা কোথাও আদায় ক'রতে পায় না।

২। আর একটি কথা ধ'রে নেওয়া হয়েছে এই যে, জমিদার চাষের কাজে কোন অংশ গ্রহণ করে না। সে জন্য যা কিছু খরচ ও ব্যবস্থা করা দরকার তার সবটুকুই চাষী করে। বিলাতের কৃষি-ব্যবস্থা বিবেচনা ক'রলে দেখা যায়, এ কথা সত্য নয়। সেখানে চাষের কাজে যে সমস্ত ব্যয় বহুল ও দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবস্থা ক'রতে হয়, সেগুলি জমিদারেরাই করে। যেমন চাষীর সপরিবারে থাক্‌বার জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করা, জমিতে বেড়া দেওয়া এবং জলসেচ ও জলনিকাশের জন্য পয়নালা তৈরী করা, ট্রাক্‌টর প্রভৃতি দামী কৃষি-যন্ত্র সরবরাহ করা ইত্যাদি। অতএব এ ক্ষেত্রে যে জমিদার স্বাভাবিক খাজনার চেয়ে অনেক বেশী খাজনা আদায় ক'রবে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কারণ, এই খাজনার একটা বড় অংশ হচ্ছে আসলে মূলধনের সুদ।

৩। জমি বন্দোবস্ত দেবার সময় জমিদারের পক্ষ থেকে অবশ্য, যতটা সম্ভব বেশী খাজনা আদায় করবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তা ব'লে যে অন্য সব কিছু উপেক্ষা করা হয়, তা নয়। পুরাতন প্রজার সঙ্গে একটা বাধ্য বাধকতা জন্মে যায়। অতএব, সামান্য একটু বেশী খাজনার লোভে, তাকে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় একজন উটকো প্রজা বসান' হ'ল, এরকম সচরাচর হয় না। চাষীদের মধ্যেও যে, জমি নিয়ে খুব বেশী কাড়াকাড়ি হয়, তা নয়। চাষীদের যার যেখানে পুরুষানুক্রমে বাস, সে সেই অঞ্চলেই জমি নিতে চায়। বিশেষ সুবিধা না পেলে কেউ সাধারণতঃ বাড়ী ঘর এবং আত্মীয় স্বজন ছেড়ে দূরে যেতে চায় না। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বরাবর যে হারে খাজনা নেওয়ার রেওয়াজ চ'লে আসছে, সহজে তার ব্যতিক্রম করা যায় না। জমিদারেরা নিন্দার ভয়ে খাজনা বাড়াতে ইতস্ততঃ করে, এবং চাষীরাও এরকম চেষ্টাকে জুলুম ব'লে মনে করে। আরও একটি কথা বিবেচনা করবার আছে। এক একটি জমার সব অংশ সমান গুণের নয়। খানিকটা সরেশ জমি, খানিকটা অপেক্ষাকৃত নিরেশ জমি, এরকম অনেক ক্ষেত্রেই হয়। অথচ সবটার গড়পড়তা এক হারে খাজনা ঠিক হয়। তা ছাড়া, প্রত্যেকখানি জমি থেকে ঠিক্ কতটুকু উদ্বৃত্ত আয় হ'তে পারে তা সকলে জানবে, বা সকলের পক্ষে জানা সম্ভব, এ কথাও ঠিক্ নয়। প্রত্যেক বছর যে সমান ফসল পাওয়া যায় তাও নয়। অতএব কোন্ জমির জন্য কত খাজনা দেওয়া পোষায়, এ সম্বন্ধে, জমিদার ও প্রজা দুই পক্ষকেই অনেকটা আন্দাজের ওপর ও গড়ের হিসাবের ওপর নির্ভর ক'রতে হয়। এই সমস্ত নানা কারণে দেখতে পাওয়া যায় যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক খাজনার সমপরিমাণ খাজনা আদায় করা হয় না।

(২)

জমির খাজনার হ্রাস-বৃদ্ধি

ক। কৃষির উন্নতির ফল—নূতন নূতন যন্ত্রপাতি, নূতন নূতন সার, বা ভাল বীজ প্রভৃতির ব্যবহারে কিংবা কোন নূতন কৌশল প্রয়োগে যখন আগেকার চেয়ে কম খরচে

বেশী ফসল ফলান' হ'তে থাকে, তখন জমির খাজনা কমে। কারণ আগেকার খরচে, আগেকার চেয়ে বেশী ফসল পাওয়া যায়; তার ফলে দর কমে, এবং আগেকার প্রান্তিক জমিতে চাষ করা বন্ধ হয়। তার চেয়ে সরেশ যে জমি থেকে আগে উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যেত, এখন সেইটি প্রান্তিক জমি হবে; এবং তার চেয়ে ভাল জমিগুলির উদ্বৃত্ত আয়ের পরিমাণ আগেকার চেয়ে ক'মবে। কোন কোন সময় এমন হয় যে, নূতন আবিষ্কারের প্রয়োগে সব জমিতে সমান সুবিধা হয় না। হয়ত খুব সস্তা দরে নূতন একটি রাসায়নিক সার পাওয়া যেতে লাগ্‌ল। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, সেই সার প্রয়োগ ক'রে অপেক্ষাকৃত নিরেশ জমিতে যতখানি সুবিধা পাওয়া যায়, সরেশ জমিতে ততটা পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় নিরেশ জমির খাজনা যে অনুপাতে ক'মবে, সরেশ জমির খাজনা তার চেয়ে বেশী অনুপাতে ক'মবে।

খ। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির ফল—দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হ'লে, শিল্প-জাত দ্রব্যাদির বিনিময়ে বিদেশ থেকে সস্তায় যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল আমদানী করা যেতে পারে। সেরকম হলে দেশে জমির খাজনা ক'মবে। বিলাতে এইভাবে যদি খাদ্য শস্য ইত্যাদি আমদানী করা না যেত তা হ'লে জমির খাজনা অনেক বেশী হ'ত।

গ। জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফল—জনসংখ্যা বাড়্‌লে ফসলের চাহিদা বাড়বে। কাজে-কাজেই যোগান বাড়াবার চেষ্টা হবে, এবং তার জন্য আগে যে সব জমিতে চাষ করা হ'ত না সেই সব জমিতে চাষ করা হবে, এবং অন্য সব জমি থেকে বেশী ফসল তোল্‌বার চেষ্টা হবে। তাতে প্রান্তিক তৈরী খরচ বাড়্‌বে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দরও বাড়বে। তার ফলে জমির খাজনা বাড়বে।

ঘ। **চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির ফল**—সহর থেকে আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত করবার জন্য যদি ভাল ভাল রাস্তা, এবং রেল, ট্রাম, বাস প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়, তা হ'লে সহরের জমির খাজনা কমে। কারণ, তখন অনেক লোকের আর জীবিকা উপার্জ্জন করবার জন্য সহরে থাক্‌বার দরকার হবে না; গ্রাম থেকে যাতায়াত ক'রলেই চ'ল্‌বে। তাতে সহরে বাড়ী তৈরীর জমির চাহিদা ক'মবে, এবং ফলে খাজনাও ক'মবে। যে সব অঞ্চলে দোকান, বাজার, আফিস প্রভৃতি চালান' হয়, সেখানকার জমির খাজনা নাও ক'মতে পারে। কিন্তু যে সব অঞ্চলে বসবাসের জন্য লোকে বাড়ী-ভাড়া নেয়, সে সব অঞ্চলে জমির খাজনা নিশ্চয়ই ক'মবে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য, আশেপাশের ঐ সব গ্রামাঞ্চলে জমির খাজনা কিছু বাড়্‌বে। কিন্তু সহরের তুলনায় ঐ এলাকা অনেক বড় হওয়াতে, সহরে যে অনুপাতে খাজনা ক'মবে, ওখানে তার চেয়ে অনেক কম অনুপাতে খাজনা বাড়্‌বে।

জমির দাম—জমির দাম নির্ভর করে, প্রথমতঃ খাজনার ওপর; এবং দ্বিতীয়তঃ, টাকার বাজার-চল্‌তি সুদের ওপর। যে জমি থেকে যত বেশী খাজনা আদায় হয়, সে জমির দামও

সেই অনুপাতে তত বেশী হয়। অন্যদিকে, টাকার বাজার দর যত কম হয়, জমির দাম তত বেশী হয়। কারণ যে লোক জমি কিন্‌তে যাচ্ছে সে হিসাব ক'রে দেখে, ঐ টাকা সুদে খাটালে কত পাওয়া যায়। যদি সরকারী ঋণপত্র কিনে, বা খুব ভাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে, শতকরা পাঁচ টাকা সুদ পাওয়া যায়, তা হ'লে যে জমি থেকে বছরে পাঁচ টাকা খাজনা পাওয়া যায়, তার দাম হবে ১০০৲ টাকা। কারণ দুই ক্ষেত্রেই ১০০৲ টাকা খাটিয়ে ৫৲ টাকা আয় হচ্ছে। যদি সুদের হার চার টাকায় নামে, তা হ'লে ঐ জমির জন্য ১২৫৲ টাকা দেওয়া পোষায়, কারণ, শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে ১২৫৲ টাকার সুদ হয় ৫৲ টাকা। জমির দামের সঙ্গে খাজনা এবং সুদের হারের সম্বন্ধ এই ভাবে লেখা যায়—

$$\text{জমির দাম} = \frac{\text{খাজনা} \times ১০০}{\text{সুদের হার}}$$

(৩)

জমির খাজনা, রাজস্ব হিসাবে আদায় ক'রে নেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি।

দেশের রাজকার্য্য চালান'র জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের একটি ভাগ আসে, সরকারী সম্পত্তির আয় ও সরকারী ব্যবসায়ের লাভ থেকে। আর, বেশীর ভাগটা তোলা হয়, দেশের লোকের ওপর কর বসিয়ে। কর ধার্য্য করবার সময় যে সব নীতির দিকে নজর রাখা উচিত, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, করভারের চাপে যেন দেশের ধনোৎপাদন ব্যাহত না হয়, কিংবা, যদিও হয়, যেন যথাসম্ভব কম হয়। এই দিক্ থেকে বিবেচনা ক'রলে দেখা যায় যে, কর চাপানর পক্ষে জমির খাজনার উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী। লোকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায়, তার থেকে কিছু কেটে নিলে তার পরিশ্রম করবার উৎসাহ কমতে পারে। ধনী টাকা খাটিয়ে যে সুদ পায়, তার থেকে কিছু কেটে নিলে ধন সঞ্চয় বাধা পেতে পারে, ব্যবসায়ীকে তার ন্যায্য লাভ থেকে বঞ্চিত ক'রলে, তার চেষ্টা ও উদ্যম নষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু জমির খাজনা সরকারী তহবিলে টেনে নিলে জমির পরিমাণও কমে না, জমির উৎপাদন শক্তিও ক্ষুণ্ণ হয় না। জমির যে উদ্বৃত্ত আয় জমিদার খাজনা হিসাবে আদায় করে, সেটি তার ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল নয়। অতএব এটি তার ব্যক্তিগত আয়ের অন্তর্গত রাখার সপক্ষে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নেই। এই উদ্বৃত্ত জন-সাধারণের প্রাপ্য; অতএব এই উদ্বৃত্ত সরকারের হাতে যাওয়া উচিত। অবশ্য, এখানে খাজনা ব'লতে আমরা স্বাভাবিক খাজনাই বুঝেছি। ব্যবহারিক খাজনার যে অংশ আসলে নিযুক্ত মূলধনের সুদ, সে অংশ সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য প্রযুজ্য নয়।

করধার্য্যের পক্ষে জমির খাজনার এই উপযোগিতার দরুণ কেউ কেউ প্রস্তাব করেন যে, সরকার কর্ত্তৃক দেশের সমস্ত জমিদারীর আয়, রাজস্ব বাবদ্ আদায় ক'রে নেওয়া উচিত।

কিন্তু এরকম কিছু ক'রতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে অবিচার হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমতঃ, ব্যবহারিক খাজনার ঠিক কতটুকু অংশ স্বাভাবিক খাজনা, তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত অসম্ভব। তা ছাড়া, বেশীর ভাগ জমিই একাধিক বার হাত ফেরৎ হয়েছে। প্রত্যেকবারেই নূতন মালিক খাজনার অনুপাতে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনেছে। এখন তাকে তার জমির আয় থেকে বঞ্চিত ক'রলে অবিচার করা হয়। একজন বার্ষিক ৫০৲ টাকা খাজনার একখানা জমি যদি ১০০০৲ টাকা দিয়ে কিনে থাকে, তা হ'লে তাকে সেই আয় থেকে বঞ্চিত করা হবে; এবং আর একজন ৫০৲ টাকার সুদের একখানা সরকারী ঋণপত্র যদি ১০০০৲ টাকা দিয়ে কিনে থাকে, তা হ'লে তার আয় বজায় থাকবে, এরকম ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত হ'তে পারে না। তবে এক কাজ করা চলে। যদি দেশের সমস্ত জমি, সরকার মালিকদের ন্যায্য খেসারত দিয়ে নিয়ে নেয়, তা হ'লে ভবিষ্যতের সমস্ত উদ্বৃত্ত আয় সরকারের থেকে যাবে। তবে সে কাজ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। রিসার্ভ ব্যাঙ্কের একটি হিসাবে প্রকাশ (মার্চ্চ, ১৯৫০) যে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশের সমস্ত জমি খেসারত দিয়ে নিতে হ'লে ৪১৪ কোটি টাকার দরকার। একসঙ্গে এত টাকা সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষেও সহজ নয়। আরও এক কাজ করা চলে। যদি এখনই সমস্ত জমির খেসারতের পরিমাণ স্থির ক'রে দিয়ে, একটি আইন পাস করা হয় যে, সরকার ভবিষ্যতে যখন ইচ্ছা এই নির্দ্দিষ্ট খেসারত দিয়ে যে কোন জমি নিয়ে নিতে পারবে, তা হ'লে সুযোগ মত যখন বাজার থেকে কম সুদে টাকা তোলা যাবে তখন সেইভাবে টাকা সংগ্রহ ক'রে, ধীরে ধীরে জমিগুলি নেওয়া যেতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরিশ্রমের উপার্জ্জন

(১)

মজুরী ও মাহিনা

দেশের বেশীর ভাগ লোক নানা রকম শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। সকলেই যে চাকরী করে, তা নয়। মুটে, রিক্সা-টানা কুলি, জুতা-শেলাইয়ের মুচি প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে, ধোপা, নাপিত, দর্জ্জি, দপ্তরী, ফটোগ্রাফার, কমিশন-এজেণ্ট, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ও রকমারী যোগ্যতার লোক পরিশ্রমের দ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করে। অনেক ক্ষেত্রে, রোজগারের সবটুকু, পারিশ্রমিক হিসাবে গণ্য করা যায় না। যে চাষী নিজের জমি চাষ করে, তার আয়ের বেশীর ভাগ অংশ পারিশ্রমিক হ'লেও খানিকটা আসলে জমির স্বাভাবিক খাজনা। যে দর্জ্জির নিজের দোকান আছে, এবং যে নিজের টাকায় কাপড় কিনে রাখে ও অর্ডারমত পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করে দেয়, তার আয়ের খানিকটা অংশ আসলে মূলধনের সুদ ও ব্যবসায়ের লাভ। যারা চাকরী করে, তাদের মজুরী বা মাহিনার সবটুকুই পারিশ্রমিক বলে গণ্য করা যায়।

পারিশ্রমিকের পরিমাণ কি ভাবে স্থির হয় সেইটি এখন আমাদের আলোচনার বিষয়। যারা চাকরী করে তাদের পাওনা কি ভাবে ঠিক্ হয় আলোচনা করলেই, সাধারণ ভাবে যে যে কারণের বশে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পারিশ্রমিকের পরিমাণ স্থির হয়, সেগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব মুখ্যতঃ মজুরী ও মাহিনা নিয়েই আলোচনা হবে।

(২)

মজুরীর হিসাব—সময়ের মাপ ও কাজের মাপ।

প্রধানতঃ দুরকম হিসাবে মজুরী দেওয়া হয়। এক হচ্ছে সময়ের মাপে,—অর্থাৎ এত ক'রে রোজ, বা এত ক'রে হপ্তা, বা এত ক'রে মাস, এই রকম। আর এক হচ্ছে কাজের মাপে,—অর্থাৎ যে কাজ ক'রতে দেওয়া হয়েছে, তার একটা মাত্রা ঠিক্ ক'রে, প্রত্যেক মাত্রার জন্য কত ক'রে মজুরী দেওয়া হবে ঠিক্ হয়; এবং পরে যত মাত্রা কাজ হ'ল, সেই অনুসারে মজুরী দেওয়া হয়। যেমন দর্জ্জির কাজে, প্রত্যেকটা শার্ট কাটা ও সেলাইএর জন্য কত দিতে হবে তার ফুরণ হয়, এবং যতগুলি শার্ট তৈরী হয় সেই অনুসারে মজুরী স্থির হয়। তেমনি মাটি কাটায়, এক ঘন

ফুটের জন্য কত দিতে হবে ঠিক্ হয়; এবং দিনের শেষে কত ঘন ফুট কাটা হ'ল হিসাব ক'রে, সেই অনুযায়ী মজুরী দেওয়া হয়। পাথর কাটার কাজে, কয়লার খনিতে চা বাগানে এবং অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ে, আমাদের দেশে কাজের মাপে মজুরী দেওয়ার প্রচলন আছে। শ্রমিকেরা সাধারণতঃ সময়ের হিসাব পছন্দ করে; কারণ, এ ব্যবস্থায়, কাজ কম থাক্‌লে, কিংবা নিজেরাই কাজে ঢিলে দিলে, মজুরীতে হাত পড়ে না। অন্যপক্ষে, মালিকেরা সাধারণতঃ কাজের হিসাব পছন্দ করে; কারণ প্রথমতঃ, কতখানি কাজের জন্য কতখানি মজুরী দিতে হ'ল ঠিক্‌মত জানা থাক্‌লে, মালের পড়্‌তা কষার সুবিধা হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ এ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কাছ থেকে বেশী কাজ পাবার জন্য তাদের ওপর চাপ দেবার দরকার হয় না; তারা নিজেদের গরজেই বেশী খাটে; অতএব তাদের ওপর খবরদারি করবার খরচ অনেক কম পড়ে। এ ব্যবস্থায় আরও এক দিক্ দিয়ে মালিকদের সুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য, মাগ্যি ভাতা, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতির জন্য একটা মোটা টাকা খরচ ক'রতে হয়। জ'নাপিছু যত বেশী কাজ পাওয়া যায়, তত কম লোকে কাজ চলে; অতএব এই সব আনুষঙ্গিক খরচে তত সাশ্রয় হয়।

অনেক ক্ষেত্রে কাজের মাপে মজুরী দেওয়া সম্ভব হয় না; বা হ'লেও, তাতে মালিকের সুবিধা হয় না। সূক্ষ্ম কর্ম্ম-বিভাগ থাক্‌লে এত রকমের কাজ এক সঙ্গে চলে যে, কাজের কোন সুবিধাজনক মাপ নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া, যে সব ক্ষেত্রে কারিগরের দক্ষতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার উপর মালের গুণাগুণ নির্ভর করে, এবং উঁচুদরের কাজ না হ'লে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায় না, সে সব ক্ষেত্রে শ্রমিককে তাড়াহুড়ো ক'রে কাজ করবার প্রলোভন দিলে মালিকেরই লোকসান। অতএব এ সব ক্ষেত্রে সময়ের মাপে মজুরী দেওয়া হয়, এবং শ্রমিকদের ওপর খবরদারি করবার জন্য লোক নিযুক্ত ক'রে তারা যাতে ফাঁকি না দেয় তার ব্যবস্থা করা হয়।

যে সব ক্ষেত্রে কাজের মাপে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব, সে সব ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা চালু থাক্‌লে, শুধু যে মালিকদের সুবিধা হয় তা নয়; দেশের সমগ্র ভাবে মঙ্গল হয়। কারণ লোকে সাধারণতঃ বেশী উপার্জ্জনের সম্ভাবনা না থাকলে বেশী খাট্‌তে রাজী হয় না; এবং ক্ষতি হবার ভয় না থাক্‌লে, ফাকি দিতেও নিবৃত্ত হয় না। দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর

* এই প্রসঙ্গে Manchester City Councilএর অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা যেতে পারে। উহার Transport Committee'র এক বিবরণীতে এই মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে—A bus, painted by a firm of outside contractors cost the city £ 41-18-6 d ; to get the same work done in the city's own depot' where the profit motive is absent, cost £ 74-9-6d. And so it goes throughout the list of jobs.........The security of job associated with local government service had unfortunately had a marked detrimental effect on output......Too many employees had deliberately imposed on this security, spcially by wasting time in many small ways" Capital of 18-1-51 P. 87

করে উৎপন্ন ভোগ্য বস্তুর পরিমাণের উপর। এই পরিমাণ আবার, নির্ভর করে, দেশের লোক কতখানি পরিশ্রম ক'রেছে, তার উপর। অতএব, পারিশ্রমিক দেবার এমন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা উচিৎ, যার ফলে প্রত্যেকে যথাসাধ্য পরিশ্রম ক'রতে প্রলুব্ধ হয়। সোভিয়েট রাশিয়াতে চাষের জমি, খনি, কল কারখানা প্রভৃতিতে ব্যক্তিগত মালিকানী স্বত্ব স্বীকৃত হয় না। অতএব সেখানে শ্রমিকের স্বার্থ ও মালিকের স্বার্থের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন ওঠে না। সেখানে প্রথমটায় কম্যুনিজমের মূল নীতি অনুসারে সকলের সমান পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা হ'য়েছিল। কিন্তু তাতে দেশের মঙ্গল হয় নি। তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে ১৯২৪ সালে ষষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে স্থির হয় যে, মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা এমন করা দরকার যার ফলে শ্রমিকেরা বেশী কাজ দিতে উৎসাহ বোধ করতে পারে। এই সিদ্ধান্তের ফলে নানা ক্ষেত্রে কাজের মাপে পারিশ্রমিক দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, এবং শ্রমিকদের উপার্জ্জনের পরিমাণে ক্রমবর্দ্ধমান তারতম্য দেখা যেতে থাকে। পরে ১৯৩১ সালে, ষ্ট্যালিনের এক বক্তৃতায় এ বিষয়ে আরও জোর দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়েছে যে বেশী কাজের লোককে বেশী পারিশ্রমিক না দিলে কাজে উৎসাহ হয় না, এবং কেউ দক্ষতা অর্জ্জন করবার চেষ্টাও করে না। অতএব কাজের মাপে পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত দরকার।* এর পরে সোভিয়েট রাশিয়াতে এই ব্যবস্থায় পারিশ্রমিক দেওয়ার রীতি ব্যাপকভাবে চালু হয়।

আমাদের দেশে বড় বড় কারখানায় সচরাচর শ্রমিকদের কাছ থেকে জনাপিছু যা কাজ পাওয়া যায় তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। আরও ভাবনার কথা এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আগে যা কাজ পাওয়া যেত, এখন তার চেয়েও কম পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৩৫ সালে কয়লার খনি থেকে গড়ে প্রত্যেক সপ্তাহে জনাপিছু ২৫ টন কয়লা উঠত; ১৯৪৭ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১'১৬ টন ("চীফ্ ইন্‌স্‌পেক্টর অফ্ মাইন্‌স্"এর দেওয়া হিসাব)। ১৯৩৯ ৪০ সালে টাটার কারখানায় জনাপিছু ইস্পাৎ উৎপন্ন হ'ত ২৪'৩৬ টন; ১৯৪৮-৪৯ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬'৩ টন (১৯৪৯ সালের অংশীদারদের বার্ষিক সভায় সভাপতি জে-আর-ডি টাটার উক্তি)। ১৯৪৯ সালে "নিখিল ভারত শিল্পপতি সংঘের (All India organisation of Industrial Employers) বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রী এস্-পি-জৈন তাঁর ভাষণে বলেন যে, পাটকলগুলিতে যত মাল তৈরী হয় তাতে এখনকার অর্দ্ধেক সংখ্যক লোক লাগবার কথা; এবং বস্ত্র শিল্পে ১৯৪৩-৪৪ সালে মোট ৬৫০,০০০ জন শ্রমিক ৪৮০

* In order to increase the personal intensity of labour, an extensive application of stimulative forms of wages is necessary.

Social Economic Movements by Harry w. Laidler p. 442

Even under Socialism, payment must be measured by the work accomplished, not by the recipient's needs".

Social Economic Movements by Harry w. Laidler p. 442

কোটি গজ কাপড় তৈরী ক'রেছিল, আর এখন তার চেয়ে কিছু বেশী সংখ্যক শ্রমিক মোটে ৪২০ কোটি গজ তৈরী করে। বিলাতের কাপড়ের কলগুলিতে প্রত্যেক ১০০০ টাকুতে ৪ জন ক'রে লোক লাগে; আর আমাদের দেশে সেই জায়গায় ১৪ জন লাগে। পশ্চিম বাংলার তিনটি কাগজের কলের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালে এক টন কাগজ তৈরী ক'রতে যতগুলি লোক লাগত, এখন তার চেয়ে শতকরা ২৭ জন বেশী লাগে। (এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের ১৯৫০ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি স্যর পি বেস্থলের ভাষণ)। আমাদের দেশের পাটকলগুলিতে প্রত্যেকটি তাঁতের জন্য একটি ক'রে লোক লাগে। ডাণ্ডীতে (Dundee) চার পাঁচখানা তাঁতের জন্য একজন ক'রে লোক লাগে।

কাজের সঙ্গে পারিশ্রমিকের একটা বাঁধাধরা সম্বন্ধ স্থাপন ক'রতে পারলে এ সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। জাপানে লণ্ঠন, ছাতা, বুরুশ, কাচের বাসন, ছুরি, কাঁচি, জুতা, রেশমী কাপড়, তুলোর ও রেশমী সুতো মেশান কাপড়, ক্রেপ প্রভৃতি নানা জিনিষ তৈরীর ব্যবসায়ে কাজের হিসাবে মজুরী দেওয়া হ'য়ে থাকে (Japan's Economic Position by John E Orchard, p. 64)। জাপান যে এত সস্তায় মাল দিতে পারে, তার এ একটা কারণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তি—কে কি চায়।

কাজে ভর্ত্তি হবার সময় শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের অর্থাৎ নিয়োগকারীর, একটা বোঝা পড়া হয় যে, কি কাজ ক'রতে হবে, এবং তার পাওনাই বা কি হবে। শ্রমিক সকল দিক্ থেকে বিচার ক'রে দেখে যে, কোথায় কোন কাজ নিলে তার মোট সুবিধা সবচেয়ে বেশী হবে; সে সেই কাজ নেয়। অন্যপক্ষে, মালিক হিসাব করে, কার কাছ থেকে সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যাবে; সে সেই লোককে ভর্ত্তি করে।

শ্রমিক চায় সর্ব্বাধিক নীট সুবিধা—আর্থিক আয় ও আসল আয়—শ্রমিক যে শুধু টাকার দিক্‌টাতেই দৃষ্টি রাখে, তা নয়। সে প্রত্যেক কাজের আনুষঙ্গিক সুবিধা অসুবিধাগুলিও বিচার ক'রে দেখে; এবং তার পর সাব্যস্ত করে, কোন্ কাজে কত টাকা পারিশ্রমিক পেলে তার পোষায়। অনেক ক্ষেত্রে যে, বিভিন্ন কাজে পারিশ্রমিকের তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়, তার আসল কারণ এইখানে। যে কাজ বরাবর নিয়মিতভাবে পাওয়া

যায়, সে কাজে কম মজুরীতে পোষায়। সেইজন্য সেই সব কাজে সাধারণতঃ চলতি মজুরীর হারও কম। কিন্তু যে কাজে তা হয় না, সে কাজের মজুরীর হার অপেক্ষাকৃত বেশী হ'তে বাধ্য; যেমন ইঁট তৈরীর কাজ, যা শুধু শুকনোর সময়েই করা চলে। বিলাতে জাহাজ তৈরীর কাজে মজুরীর হার বেশী হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, এ ব্যবসায়ে মাঝে মাঝে এত মন্দা পড়ে যে, অনেক শ্রমিককে বহুকাল ধ'রে বেকার ব'সে থাকতে হয়। অতএব যখন কাজ ভাল চলে, তখন বেশ উঁচু হারে মজুরী না পেলে, পোষায় না। যে সব জায়গায় নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র সস্তায় পাওয়া যায়, সে সব জায়গায় মজুরীর হারও অপেক্ষাকৃত কম। অনেক জায়গায়, বাড়ীর কাজ করবার জন্য কম মাহিনায় লোক পাওয়া যায়; তার কারণ, মাহিনা ছাড়া অমনি খেতে ও থাকতে পাওয়া যায়, এবং অন্য পাঁচ রকম পাওনাও থাকে। বিলাতে বা আমেরিকাতে কিন্তু, বাড়ীর চাকরের মাহিনা অত্যন্ত বেশী; তার কারণ, এই সব গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ লোকের আত্মমর্য্যাদাবোধ এত বেশী যে, তারা পরের ব্যক্তিগত সেবা করাটা হীন কাজ বলে মনে করে। পরিবারের সকলের যদি রোজগার করবার সুযোগ থাকে, তা হ'লে মজুরীর হার কম হ'লেও স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়। তাই দেখা যায়, যে সব জায়গায় বলিষ্ঠ পুরুষের উপযোগী কাজও পাওয়া যায়, এবং কাছাকাছি, স্ত্রীলোক ও বড় বড় ছেলেমেয়ের উপযোগী হাল্কা কাজও পাওয়া যায়, সে সব জায়গায় চলতি মজুরীর হার অপেক্ষাকৃত কম।

এ প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন মালিকের সদ্ব্যবহার; পেন্সন বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা; চিকিৎসার ব্যবস্থা; কাজের সময় অঙ্গহানি বা প্রাণহানি হবার সম্ভাবনা; পদোন্নতির সুযোগ; সামাজিক মর্য্যাদা ইত্যাদি। শ্রমিকেরা, অল্পবিস্তর এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা ক'রে, তবে ঠিক্ করে, কোন্ কাজ ছেড়ে কোন্ কাজ নেবে। অর্থাৎ, শ্রমিকের কাছে কোন্ কাজের আকর্ষণ কত বেশী তা নির্ভর করে, শুধু আর্থিক পাওনার উপর নয়, নীট সুবিধার উপর।

মালিক চায় সস্তায় কাজ - মালিকের চেষ্টা থাকে, কিসে মজুরী খরচ সবচেয়ে কম পড়ে। শুধু মজুরীর হার কমিয়ে তার কোন স্বার্থ সিদ্ধি হয় না। উঁচুদরের কাজ এবং বেশী পরিমাণে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, মালিক বেশী হারে মজুরী দিতে মোটেই কুন্ঠিত নয়। অন্যপক্ষে, নিরেশ কাজ বা কম কাজ পেলে মজুরীর হার কম হ'লেও মালিকের সুবিধা হয় না। আমেরিকায় সম্প্রতি এমন সব কাগজের কল হয়েছে, যেখানে একজন লোকে যে পরিমাণ কাগজ তৈরী ক'রতে পারে, এখানে সেই পরিমাণ তৈরী ক'রতে ৫০ জন লাগে। অতএব আমেরিকায় মজুরীর হার যদি সময়ের হিসাবে এখানকার বিশগুণও হয়, তৎসত্ত্বেও সেখানকার মজুরী খরচ এখানকার চেয়ে অনেক কম পড়ে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)

পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্দ্ধারণ।
শ্রমশক্তি নিয়োগের প্রান্তিক সার্থকতার সিদ্ধান্ত।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করেন। সিদ্ধান্তটি এই যে, কোনও কারবারে যে কয়জন লোক নিযুক্ত আছে, তাদের সংখ্যা আরও একজন বাড়ান' হ'লে কারবারের নীট লাভ যে পরিমাণ বাড়ে, তাদের প্রত্যেককে পারিশ্রমিকও সেই পরিমাণ দেওয়া হয়। অর্থাৎ কারবারের সাফল্যে শ্রমিকের প্রান্তিক দান যতটুকু, তাদের মজুরী বা মাহিনাও হয় ততটুকু। নিখুঁত হিসাবের জন্য আরও দুটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক; যথা, (১) শ্রমিক যে সময়ে কাজ করে সেই সময়েই তাকে টাকা দিতে হয়, কিন্তু তার কাজের ফলে যে লাভ হয়, মালিকের হাতে সেই লাভ আসতে কিছু সময় লাগে; অতএব বাড়্‌তি লাভ থেকে এই সময়ের ব্যাজ বাদ দিলে তবে মজুরীর সঠিক অঙ্ক পাওয়া যায়; (২) একটি বাড়তি লোক নিলে কত বাড়্‌তি লাভ হবে, তা আগে থেকে হিসাব করা যায় না; মালিক এ বিষয়ে নিজের আন্দাজের উপর নির্ভর করে, এবং যতখানি বাড়্‌তি লাভ প্রত্যাশা করে ততখানি পর্য্যন্ত মজুরী দিতে প্রস্তুত থাকে। অতএব, সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি সঠিক ভাবে লিখতে গেলে এই রকম দাঁড়ায় যে—শ্রমিকের সংখ্যা একজন বাড়লে যে বাড়তি লাভ হবে প্রত্যাশা করা যায়, তা থেকে ব্যাজ বাদ দিলে যত হয়, পারিশ্রমিকের পরিমাণও তত হয়। সংক্ষেপে লিখতে গেলে, 'পারিশ্রমিকের পরিমাণ, শ্রমিকের প্রত্যাশিত প্রান্তিক দান থেকে ব্যাজ বাদ দিলে যত হয়, তত" (wages are the discounted marginal product of labour)।

এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে যে যুক্তি আছে, এখন তারই আলোচনা হবে।

প্রথম কথা, এখানে ধ'রে নেওয়া হয়েছে যে, বৈষয়িক জীবনে সাধারণ ভাবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বজায় আছে। অর্থাৎ যেমন চাকরী নেবার লোক অনেক আছে, তেমনি চাকরী দেবার লোকও যথেষ্ট আছে; এবং প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে ও বিনা বাধায় নিজের নিজের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা ক'রছে। বিচার ক'রে দেখলে বোঝা যায় যে, এ রকম অবস্থায় মালিকেরা প্রত্যেকে বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য, ঠিক ততগুলি ক'রে শ্রমিক নিযুক্ত ক'রবে, যাতে শ্রমিকের প্রান্তিক দানের পরিমাণ আর মজুরীর পরিমাণ সমান হয়। মালিকের কাছে শ্রমিকের কদর উৎপাদন-সহায় হিসাবে। অতএব সে যতক্ষণ দেখবে যে, আর একজন

লোক নিলে যা বাড়তি খরচ পড়ে, বাড়তি লাভ তার চেয়ে বেশী হয়, ততক্ষণ সে লোকের সংখ্যা বাড়িয়ে চ'লবে। অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় লোক বাড়িয়ে মালিকের কোন সুবিধা হয় না। কারণ, উৎপাদন ব্যবস্থার যে কোন অঙ্গই হউক না কেন, তার পরিমাণ যত বাড়ান' যায়, তার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা তত ক'মতে থাকে। শ্রমিকের বেলাতেও তাই। শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে মালিকের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে, বিচার ক'রলেই, এ রকম কেন হয় তা বোঝা যায়। এ উদ্দেশ্য দুটি। এক হচ্ছে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার কিছুটা কমিয়ে, সেই জায়গায় বেশী সংখ্যায় লোক নিয়ে, তাদের দিয়ে কাজ চালান।' উৎপাদনব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গগুলির আনুপাতিক পরিমাণ, এইভাবে কতক দূর পর্য্যন্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই কম বেশী করা যায়। যেমন, নল-কূপ থেকে পাম্প দিয়ে জল তোলার কাজ, লোক দিয়েও হয়, আবার ষ্টীম-এঞ্জিন বা ইলেক্ট্রো-মোটর দিয়েও হয়। কল্‌কাতার রাস্তা পরিষ্কার করার কাজের জন্য হাতে-ঠেলা গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা রাখাও চলে. আবার মোটর লরী ও রাস্তা ঝাঁট দেবার যন্ত্রের ব্যবস্থা ক'রে, খুব কম লোক রাখ্‌লেও চলে। যন্ত্র-পাতির ব্যবহার বাড়াতে হ'লে, বেশী টাকা খাটান' দরকার। অতএব, যেখানে সুদের হার কম, এবং মজুরীর হার বেশী, সেখানে লোক নেওয়া হবে কম, এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে বেশী। আবার যেখানে মূলধনের যোগান কম, এবং লোক পাওয়া যায় সস্তায়, সেখানে মানুষ দিয়েই বেশীর ভাগ কাজ করা হবে, এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার যথাসম্ভব কম রাখা হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, কোন না কোন বিশেষ অনুপাতে মূলধন ও শ্রমশক্তির সংযোগ ক'রতে পারলে, তবে সবচেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়। এর থেকে যত বেশী ব্যতিক্রম হবে, ততই কাজের অসুবিধা বাড়্‌বে। সেইজন্য, যন্ত্রপাতি ক'মিয়ে শ্রমিক-সংখ্যা যত বাড়ান' যায়, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা তত ক'মতে থাকে। শ্রমিক সংখ্যা বাড়াবার অন্য আর একটি উদ্দেশ্য হ'তে পারে। উৎপাদন-সহায়গুলির আনুপাতিক পরিমাণ কম-বেশী না ক'রে, সবশুদ্ধ কারবারের আয়তন বাড়ান' যেতে পারে; অর্থাৎ শ্রমিক-সংখ্যা বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গগুলিও উপযুক্ত পরিমাণে বাড়ান' হ'তে পারে। কিন্তু তার ফলে উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ বাড়্‌বে; এবং চাহিদার অবস্থার যদি কিছু বদল না হয়, তা হ'লে ঐ সামগ্রীর দর ক'মতে থাক্‌বে। তার মানেই, ব্যবসায়ের সাফল্যে শ্রমিকের প্রান্তিক দান ক্রমশঃ ক'মতে থাকবে। যতক্ষণ ঐ প্রান্তিক দানের পরিমাণ, মজুরীর পরিমাণের চেয়ে বেশী থাক্‌বে, ততক্ষণ শ্রমিক-সংখ্যা বাড়ালে মালিকের নীট লাভ বাড়্‌তে থাক্‌বে। অতএব ততক্ষণ সে শ্রমিক সংখ্যা বাড়িয়ে চ'লবে। অন্যপক্ষে, সে এত লোক কখনই নেবে না, যাতে ক'রে শ্রমিকের প্রান্তিক দানের পরিমাণ মজুরীর চেয়ে ক'মে যায়। কারণ, তখন লোক কমালে তার নীট লাভ বাড়্‌বে। অতএব দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে, শেষ পর্য্যন্ত মজুরীর পরিমাণ শ্রমিকের প্রান্তিক দানের পরিমাণের সমান হবে।

এমন হ'তে পারে যে, মজুরীর হার কম থাকার দরুণ, মালিক বেশী লোক নেবার চেষ্টা ক'র্‌ছে কিন্তু পাচ্ছে না। কারণ হয়ত, ঐ কাজের উপযুক্ত কোন লোক বেকার ব'সে নেই, কিংবা যারা আছে তারা অত কম মজুরীতে কাজ নিতে রাজী নয়। কারণ যাই হ'ক, এর ফল হবে এই যে, মজুরী বাড়িয়ে লোক সংগ্রহের চেষ্টা চ'ল্‌তে থাক্‌বে। তখন মালিকদের মধ্যে রেষারেষি আরম্ভ হবে। প্রত্যেকেই আস্তে আস্তে মজুরী বাড়াতে থাক্‌বে, যাতে তার কোন লোক যেন কাজ ছেড়ে অন্যত্র না যায়, এবং বাড়তি লোক যেন কাজ নিতে তার কাছে আসে। এইভাবে মজুরীর চল্‌তি হার ক্রমাগত বাড়তে থাক্‌বে, যতদিন না শ্রমিকের প্রান্তিক দানের সমান হয়।

তবে এখানে একটা কথা আছে। আমরা ধ'রে নিচ্ছি যে, মালিকেরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ক'রছে। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু, এ রকম বড় হয় না। মালিকদের মধ্যে প্রায়ই একটা বোঝাপড়া থাকে, এবং তারা একজোটে মজুরীর হার দাবিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করে। যেখানে সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ নেই, সেখানেও একটা শ্রেণীগত সমস্বার্থবোধ থাকে, সেইজন্য তারা মজুরীর চল্‌তি হার বেড়ে যেতে পারে, এরকম কাজ ক'রতে ইতস্ততঃ করে।

কিন্তু তাতেও, "শ্রমিকের প্রান্তিক দানের সিদ্ধান্ত" ভুল হবার কথা নয়। শ্রমিকদের যদি জোর থাকে, তা হ'লে তারা এই পরিমাণ মজুরী আদায় ক'রে নিতে পারে। এতে মালিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় না। শ্রমিকেরা যদি নিজেদের কদর সম্বন্ধে সচেতন থাকে, এবং তার চেয়ে কম মজুরীতে কাজ ক'রতে নারাজ হয় তা হ'লে মালিকেরা নিজেদের স্বার্থেই সেই পরিমাণ মজুরী দিতে রাজী হবে।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, মালিকদের সঙ্গে সমানে সমানে দর কষাকষি করবার শক্তি শ্রমিকদের নেই। তারা বড় দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলতার কারণ কি এবং এর প্রতিকারই বা কি, সে সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(১)

শ্রমিকের দুর্ব্বলতা—শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রয়োজন

শ্রমিক শ্রম-শক্তির বিক্রেতা। মালিক সেই শ্রমশক্তির ক্রেতা। কিন্তু শ্রম-শক্তি, সাধারণ কৃষি বা শিল্পজাত পণ্যের মত সামগ্রী নয়। এর এমনই কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যার ফলে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার শক্তি নিতান্ত কম হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার সহজ সম্বন্ধ সম্ভব নয়।

প্রথমতঃ, শ্রম শক্তি মজুত ক'রে রাখা যায় না। শ্রমিক একদিন বেকার বসে থাকলে, তার পরদিন সে দুদিনের কাজ দিতে পারে না। অতএব, মালিকের সর্ত্তে রাজী না হ'লে, মালিকের যা লোকসান, শ্রমিকের লোকসান তার চেয়ে অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের কাজ করবার যোগ্যতা, অনেকাংশে তার নিজের আয়ত্তের বাহিরে। তার শরীর ও মন কি ভাবে গড়া হয়েছে, সে কি আব-হাওয়ায় মানুষ হয়েছে, তাকে কি বৃত্তি শেখান' হয়েছে এবং কি ভাবে শেখান' হয়েছে, এই সবের ওপরই আসলে তার যোগ্যতা নির্ভর করে। এই বিষয়ে যদি তার অভিভাবকেরা অবহেলা ক'রে থাকেন, কিংবা অবিবেচনার কাজ ক'রে থাকেন, তা হ'লে শ্রমিককে সে দুর্ভাগ্যের বোঝা সারা জীবন বইতে হয়। তৃতীয়তঃ, কোথাও বেশী পারিশ্রমিক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, শ্রমিক সে সম্ভাবনার সুযোগ সব সময়ে নিতে পারে না। শ্রম-শক্তি পাঠিয়ে দেওয়া যায় না। শ্রমিককে নিজে সেখানে যেতে হয়। আত্মীয় স্বজন ছেড়ে দূর দেশে যাওয়া, এবং অজানা জায়গায় গিয়ে স্বচ্ছন্দে বসবাস করবার ব্যবস্থা করাতে, অনেক সময় নানা রকম অসুবিধা হয়। সেইজন্য, হাতের কাছের কাজ সম্বন্ধে বেশী দর কষাকষি করবার সামর্থ্য, শ্রমিকের প্রায়ই থাকে না।

এ ছাড়া, শ্রমিকের যেটি প্রধান দুর্ব্বলতা, সেটি হচ্ছে তার দৈন্য। মালিক কিছুদিন কারবার বন্ধ ক'রে রাখলেও, তার খাওয়া পরা আটকায় না। কিন্তু, শ্রমিকের দু চার দিন বেকার ব'সে থাকলেই তার অবশ্যম্ভাবী ফল হয়, উপবাস। তার ওপর, মালিক এক আধ জন লোক নেয় না; অনেক লোক তার কাছে কাজ করে। অতএব, দু চার জন লোক কম-বেশী হ'লে, তার বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু শ্রমিকের কাজ পেতেই হবে; তা না হ'লে তার চলে না। সাধারণ শ্রমিকের আরও একটি অসুবিধা এই যে, তার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা এত কম যে, সে ধ'রতে পারে না, চাপ দিলে কতখানি পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে মালিক রাজী হ'তে পারে। শ্রমিক তার নিজের মূল্য জানে না। বেশী পারিশ্রমিক

পাবার জন্য পীড়াপীড়ী করবার আকিঞ্চনও তার কম। ধনী লোকেদেরই আরও ধনী হবার নেশায় পেয়ে বসে। সাধারণ লোকেরা যে, যে ধরণের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত সেইটুকু বজায় রাখবার মত নিয়মিত রোজগার হ'লেই সে সন্তুষ্ট। তার বেশী পাবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত, সে বড় হয় না।

(২)

ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক-সঙ্ঘ

শ্রমিক-সঙ্ঘ গঠনের দ্বারা এই শেষোক্ত অসুবিধাগুলির অনেকাংশে প্রতিকার হয়েছে। এক একটি শিল্পের শ্রমিকেরা একজোট হ'য়ে এক একটি সঙ্ঘ গঠন করে। তখন তারা কেহই আর পৃথক্‌ভাবে মালিকের সঙ্গে কাজের সর্ত্তাবলী নিয়ে কথাবার্ত্তা চালায় না। তারা একজন মুখপাত্র ঠিক করে; এবং এই মুখপাত্র সকলের হ'য়ে মালিকের সঙ্গে, পারিশ্রমিকের পরিমাণ ও কাজের অন্যান্য সর্ত্ত সম্বন্ধে লেখাপড়া করে। অর্থাৎ মালিকের সঙ্গে শ্রমিকেরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা চুক্তি না ক'রে সমষ্টিগতভাবে একটি চুক্তি করে। মুখপাত্রটি প্রায়ই একজন লেখাপড়া জানা বিচক্ষণ ও কর্ম্মকুশল লোক দেখে করা হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে, এই লোকটি মাহিনা করা লোক হয়, যাতে ক'রে সে তার সমস্ত সময় ও মনোযোগ শ্রমিক-সঙ্ঘের কাজে দিতে পারে। স্বভাবতঃই, এ রকম লোক মালিকের কাছ থেকে শ্রমিকদের জন্য যথাসম্ভব সুবিধা আদায় করতে পারে। এই রকম ভাবে চুক্তি হ'লে, পারিশ্রমিকের পরিমাণ শ্রমিকের প্রান্তিক দানের পরিমাণের সমান হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কারণ মালিকের পক্ষে, এই পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে নারাজ হওয়ার আসলে কোন কারণ নেই। অতএব, শ্রমিকদের মুখপাত্রটি যদি বিচক্ষণ লোক হয় এবং এই পরিমাণ পারিশ্রমিকের দাবী করে, তা হ'লে সে দাবী অগ্রাহ্য করার মানে কারবার বন্ধ রাখা। মালিকের তাতে কোন লাভ নেই। শ্রমিকদের অস্ত্র হচ্ছে, ধর্ম্মঘট। মালিক যদি তাদের দাবী না মানে, কিংবা চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করে, তা হলে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করে, অর্থাৎ, একজোটে কাজ বন্ধ করে। শ্রমিক সঙ্ঘ আগে থেকেই ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। তারা সঙ্ঘের লোকেদের কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে চাঁদা তুলে একটি তহবিল গ'ড়ে রাখে। যখন কোন কারখানায় ধর্ম্মঘট ক'রতে হয় তখন ধর্ম্মঘট যতদিন চলে ততদিন এই তহবিল থেকে ধর্ম্মঘটীদের ভরণ-পোষণ করা হয়। শ্রমিক যতক্ষণ একলা, ততক্ষণ সে মালিকের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। কারণ, সে জোর ক'রে কিছু দাবি ক'রতে পারে না, পাছে তাকে বাদ দিয়ে অন্য লোক নেওয়া হ'য়ে যায়। যখন সকলে একতাবদ্ধ হয়, তখন তারা মালিকের সঙ্গে সমানে সমানে দর কষাকষি করতে পারে। শ্রমিকের যেমন মালিককে না হ'লে চলে না, মালিকেরও তেমনি শ্রমিকদের না হ'লে চলে

না। অতএব শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'লে তাদের কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী, মালিক উপেক্ষা করতে পারে না।

তবে, সঙ্ঘবদ্ধ হ'লেই যে যা খুসী করা যায়, তা নয়। মালিক সব সময়েই খতিয়ে দেখ্‌বে যেন পারিশ্রমিকের পরিমাণ শ্রমিকের প্রান্তিক দানের পরিমাণের চেয়ে বেশী না হয়। শ্রমিকেরা বেশী দাবী ক'রলে মালিক লোক নেওয়া কমিয়ে দেবে, যাতে ক'রে পারিশ্রমিকের পরিমাণের সঙ্গে শ্রমিকের প্রান্তিক দানের পরিমাণের সাম্য বজায় থাকে। তার ফলে যত লোক কাজ করতে চায় তাদের সকলের কাজ না জুটতে পারে। তা যদি হয়, তা হ'লে হয় তাদের দাবী কমাতে হবে, না হয় তাদের দলে ভাঙ্গন ধরবে; এবং কেউ কেউ স্বতন্ত্র-ভাবে কম পারিশ্রমিকে কাজ নেবার চেষ্টা করবে। অবশ্য শ্রমিকের সংখ্যা না কমিয়েও, শ্রমিকের প্রান্তিক দানের পরিমাণ যে কিছুটা বাড়ান যায় না, তা নয়। হয়ত পরিচালনার কাজেই গাফিলতি আছে, এবং সেই জন্যই কারবারে যতটা লাভ হওয়া উচিত, তা হচ্ছে না। এ অবস্থায় শ্রমিকদের চাপে প'ড়ে, মালিক যদি সেই দিকে নজর দেয়, তা হ'লে সংখ্যা না কমিয়েও, শ্রমিকদের বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া পোষাতে পারে। কারণ, সুদক্ষ পরিচালনার ফলে শ্রমিকদের প্রান্তিক দান সে পর্য্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। বেশী পরিমাণে ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারাও এ কাজ করা যেতে পারে। কারণ, তাতে জনাপিছু কাজ পাওয়া যাবে বেশী, এবং তা হ'লে বেশী পারিশ্রমিক দেওয়াও পোষাবে। তবে, কম সুদে টাকা তুল্‌তে না পার্‌লে, শিল্পপতিরা এ পথ নেবে না। অনেক সময়ে, শ্রমিকদের নিজেদেরও এ দিকে অনেক কিছু করবার থাকে। তারা যদি কর্ম্মস্থানের নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে প্রত্যেকে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে, তা হ'লে তাদের প্রান্তিক দানের পরিমাণ বাড়বে, এবং তখন মালিকদের পক্ষে বেশী পারিশ্রমিক দিতে নারাজ হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে না। শ্রমিক-সঙ্ঘের নেতৃত্ব যদি ধীরবুদ্ধি ও দূরদর্শী লোকদের হাতে থাকে তা হ'লে, এক দিকে যেমন মালিকদের জুলুমের হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করা যেতে পারে, অন্যদিকে তেম্‌নি তাদের মধ্যে কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়ে এবং তাদের যোগ্যতা বাড়িয়ে তাদের যাতে স্থায়ী উন্নতি হ'তে পারে তার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে, দেশের আয়ের ভাগ সম্বন্ধে একটি সাধারণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যে দেশে, জনসংখ্যার অনুপাতে, প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও মূলধনের যোগান বেশী, এবং সুদক্ষ শিল্পপতির সংখ্যাও যথেষ্ট, সে দেশে শ্রমিকদের রোজগার বেশী হবে; যেমন আমেরিকায়। অন্যপক্ষে, যে দেশে অন্যগুলির অনুপাতে জনসংখ্যা বেশী, সে দেশে শ্রমিকের রোজগার কম হবে। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বেশী; এবং প্রাকৃতিক সম্পদ্ যথেষ্ট থাকলেও সেগুলি উচিতমত কাজে লাগাবার মত মূলধনও নেই, যথেষ্ট সংখ্যায় সুদক্ষ শিল্পপতিও নেই। কাজে কাজেই, শ্রমিকদের প্রান্তিক দানের পরিমাণ কম, অতএব রোজগারও কম। টাকার

সুদ সম্বন্ধেও এই একই মন্তব্য করা চলে। যেখানে মূলধনের আনুপাতিক যোগান কম, সেখানে সুদের হার বেশী ; যেখানে বেশী, সেখানে সুদের হার কম।

(৩)

শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান ও পারিশ্রমিকের হার।

শ্রমিকের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে আগে আলোচনা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখেছি যে, এই দুর্ব্বলতার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, শ্রমিকেরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কাজের চেষ্টা করাতে, কেউই বেশী পারিশ্রমিকের জন্য জোর ক'রতে পারে না, পাছে তাকে বাদ দিয়ে অন্য লোককে নেওয়া হয়। যেখানে শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পারে, সেখানে এ দুর্ব্বলতার প্রতিকার হয়। কিন্তু যেখানে শ্রমিক সঙ্ঘ গড়া হয় নি, সেখানে শ্রমিকেরা যে একেবারে অসহায়, তা নয়। প্রায় ক্ষেত্রেই, শ্রমিকেরা যে ধরণের খাওয়া পরায় অভ্যস্ত সেটুকু বজায় রাখবার মত পারিশ্রমিক না পেলে, তারা কাজ নিতে রাজী হয় না। এ বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত থাকে যে, যদি কোন মালিক সে পারিশ্রমিক দিতে রাজী না হয়, তা হ'লে তাদের মধ্যে কেউই তার কাছে কাজ নেবে না। অতএব প্রত্যেকেই অন্ততঃ সেটুকু পর্য্যন্ত আদায় করবার জন্য জোর ক'রতে পারে। অবশ্য, কোন্ শ্রেণীর শ্রমিকের অভ্যস্ত খরচের পরিমাণ কতটুকু, সেটা একেবারে আনা পাই মিলিয়ে নির্দ্দিষ্ট করা যায় না ; এবং তার উপর একটুও চাপ সয় না, তাও নয়। তা হ'লেও মোটামুটি এই পরিমাণ কোন্ ক্ষেত্রে কত, তা বেশ স্পষ্টভাবেই জানা থাকে, এবং মালিকেরা যদি পারিশ্রমিকের হার তার থেকে নামিয়ে আন্‌বার চেষ্টা করে, তা হ'লে, শ্রমিকদের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ না থাক্‌লেও সে চেষ্টা বাধা পায়।

কেউ কেউ মনে করেন যে, পারিশ্রমিকের সঙ্গে শ্রমিকের জীবন-যাত্রার মানের আরও ঘনিষ্ঠ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, বিভিন্ন দেশের চল্‌তি পারিশ্রমিকের হার তুলনা ক'রলে দেখা যায় যে, যে দেশে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান যত উঁচু সে দেশে তাদের রোজগারও তত বেশী। যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় এই মান সবচেয়ে উঁচু ; সেখানকার পারিশ্রমিকের হারও সবচেয়ে বেশী। বিলাতে এই মান একটু নীচু ; সেখানকার পারিশ্রমিকের হারও সেই অনুপাতে একটু নীচু। ফ্রান্সে ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই মান আরও নীচু, শ্রমিকের রোজগারও আরও কম। পূর্ব্ব ইউরোপে দুইই আরও নীচু। ভারত বা চীনে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু ; শ্রমিকদের রোজগারও অত্যন্ত কম। অতএব বেশ বোঝা যাচ্ছে, জীবনযাত্রার মানই হচ্ছে রোজগার কম বেশী হওয়ার আসল কারণ। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। খাওয়া পরার চা'ল বাড়ালেই আপনা আপনি রোজগার বাড়াবে, এ একটা যুক্তিই নয়।

আসলে, আমেরিকায় জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও মূলধনের যোগান অত্যন্ত বেশী, এবং ওখানকার শিল্পপতিরাও অত্যন্ত বিচক্ষণ ও কর্ম্মকুশল; এবং সেই কারণে শ্রমিকের প্রান্তিক দান বেশী হওয়ার দরুণই, পারিশ্রমিকের হার অত বেশী। বিলাতেও প্রাকৃতিক সম্পদ্ যথেষ্ট; বিশেষতঃ, আজকালকার যন্ত্রযুগে যে দুটি উপাদানের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, অর্থাৎ লোহ এবং কয়লা, সে দুটির কোন অভাব নাই। তার ওপর বিলাতের শ্রমিকদের কারিগরী দক্ষতা অতুলনীয়, এবং মূলধনের যোগানও খুব বেশী। অতএব সেখানে যে পারিশ্রমিকের হার বেশী হবে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ্ বেশী থাকলেও, জনসংখ্যার অনুপাতে, অন্যান্য দিক দিয়ে দেশের দৈন্য এত বেশী, যে শ্রমিকের প্রান্তিক দান অত্যন্ত কম; কাজেকাজেই রোজগারও অত্যন্ত কম। পারিশ্রমিকের হার শ্রমিকের প্রান্তিক দান ছাড়িয়ে যেতে পারে না। শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন কিংবা উন্নত জীবনযাত্রার মানের দ্বারা এই মাত্র হ'তে পারে যে মালিকদের সেই পর্য্যন্ত শ্রম-মূল্য দিতে বাধ্য করা যেতে পারে।

তবে, এখানে একটা কথা বল্বার আছে। শ্রমিকেরা যদি ভাল খেতে পায়, স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাক্তে পায়, এবং শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জ্জনের সুযোগ পায়, তা হ'লে তাদের কর্ম্ম-ক্ষমতা ও কর্ম্ম-দক্ষতা বাড়ে; অর্থাৎ, তাদের প্রান্তিক দান বাড়ে। তখন তাদের বেশী পারিশ্রমিক দেওয়াও পোষায়। অতএব দেখা যাচ্ছে এক হিসাবে এ কথা সত্য যে জীবনযাত্রার মান উন্নত ক'রতে পারলে শ্রমিকের রোজগার বাড়ে। হেন্‌রী ফোর্ড (Henry Ford) এ কথাটা বুঝতেন। তিনি যথেষ্ট বেশী মাহিনা দিতেন। তাঁর নিয়ম ছিল, যে একেবারে আনকোরা, কিছু জানে না এমন লোক নেওয়া হ'লেও, প্রথম থেকেই তাকে চল্‌তি হারে (দৈনিক ৫ ডলার) মাহিনা দেওয়া হ'ত। তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, প্রথমটায় লোকসান গেলেও কিছুকালের মধ্যেই ঐ লোক এত কাজ দিত যে তাকে ৫ ডলার দেওয়া সার্থক হ'ত। তবে, এ সম্বন্ধে একটি বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন আছে। শ্রমিকের হাতে বেশী পয়সা দিলেই যে সব সময়ে তার যোগ্যতা বাড়ে, তা নয়। বাড়তি আয় যদি, মদ, জুয়া প্রভৃতি বদ্‌খেয়ালিতে যায়, তা হ'লে এতে উপকারের বদলে অপকারই হয়। রোজ বাড়ালে যদি কামাই বাড়ে তা হ'লেও কোন উপকার হয় না। তার চেয়ে যদি শ্রমিকের মজুরী বাড়িয়ে না দিয়ে, তাদের বিনা পয়সায় একটা ভাল টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়, বিনা ভাড়ায় বা নামমাত্র ভাড়ায় স্বাস্থ্যকর বাসস্থান দেওয়া হয়, হাসপাতাল, স্কুল, খেল্‌বার মাঠ প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা হয় এবং কারিগরী দক্ষতা বাড়াবার সুযোগ দেওয়া হয়, তা হ'লে অনেক ক্ষেত্রে বেশী সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পারিশ্রমিক সম্বন্ধে আগেকার দুটি মত।

(১)

মাত্র জীবনধারণের উপযোগী আয়ের সিদ্ধান্ত

এই মতের উৎপত্তি হয়, প্রজা-বৃদ্ধি সমস্যা সম্বন্ধে ম্যালথাসের অভিমত থেকে। ম্যালথাস দেখিয়েছিলেন যে, সকল দেশেই জন-সংখ্যা এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে, খাবার জিনিষের যোগান তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না; এবং ক্রমশঃ এমন অবস্থা ঘটে যে দেশে উৎকট খাদ্যাভাব উপস্থিত হয়। তখন দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মহামারী প্রভৃতি দুর্ভোগের ফলে জন-সংখ্যার চাপ কমে, এবং কিছুদিনের জন্য আবার লোকের স্বস্তি ফিরে আসে। অতএব জনসাধারণের আয় সম্বন্ধে বেশী দিনের হিসাব দিতে গেলে বল্‌তে হয় যে, মাত্র জীবনধারণের জন্য যতটুকু দরকার এই আয় ততটুকু (Subsistence Theory of Wages)। কোন বিশেষ কারণের জন্য সাময়িকভাবে এই আয় বেশী হ'তে পারে। কিন্তু তার ফলে, জনসংখ্যা বাড়্‌তে বাধ্য; এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে এই যে আয় ক'মবে। অন্যপক্ষে, জীবন-ধারণের জন্য যতটুকু রোজগার প্রয়োজন, তার চেয়ে ক'মে গেলে, সে অবস্থা বেশীদিন চল্‌তে পারে না। কারণ জনসংখ্যা বজায় থাক্‌বে না, এবং লোক ক'মে যাওয়াতে মাথা-পিছু আয় বাড়্‌তে থাক্‌বে। অতএব স্থায়ী অবস্থা হচ্ছে এই যে, জীবন ধারণের জন্য যতটুকু দরকার শ্রমিকের রোজগার ঠিক ততটুকুই হবে।

ম্যালথাসের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আগেই আলোচনা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখেছি যে, যে সব দেশের সাধারণ লোক অশিক্ষিত ও গতানুগতিক ভাবে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, সে সব দেশে বেশী দিন জীবনযাত্রার মান উন্নত থাকে না। দেশের সম্পদ বাড়্‌লে জন-সংখ্যা এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে, এই বাড়্‌তি সম্পদ তাতেই খেয়ে যায়, এবং মাত্র জীবন-ধারণের উপযোগীর বেশী বরাদ্দ, সাধারণ লোকের ভাগ্যে স্থায়ী হয় না। অতএব এই সব দেশের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সত্য। ভারত, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশ এই পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু, যে সব দেশ যন্ত্র-শিল্পে উন্নত, এবং যেখানকার সাধারণ লোক শিক্ষিত ও আধুনিকভাবাপন্ন, সে সব দেশ সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত খাটেনা। কারণ, এ সব দেশে সচ্ছল অবস্থার সঙ্গে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির এ রকম কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। বরঞ্চ দেখা যায়, যে দেশের জীবনযাত্রার মান যত উন্নত সে দেশের জনসংখ্যা তত কম হারে বাড়ে। অবশ্য, ফ্রান্সের মত

দু একটি দেশ ছাড়া, এ সব দেশেও জনসংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু দেশের আয় তার চেয়ে বেশী হারে বেড়েছে। ফলে, গত শতাধিক বৎসর ধরে ঐ সব দেশে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান ক্রমান্বয়ে বেড়ে এসেছে। ভবিষ্যতেও যদি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক জ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা গত শতাধিক বৎসরের উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকে, তা হ'লে জনসাধারণের আয় বাড়্‌তেই থাকৃবে, ক'মবে না।

(২)

মজুরীর জন্য নির্দ্দিষ্ট সঞ্চিত ধনের সিদ্ধান্ত।

জ'ন ষ্টুয়ার্ট মিল সাহেব (J. S Mill) এই সিদ্ধান্তের সমর্থক ছিলেন। সিদ্ধান্তটি (Wages Fund Theory) এই যে, দেশে যা কিছু মজুরী দেওয়া হয তা দেশের সঞ্চিত ধন থেকে দেওয়া হয়। এই সঞ্চিত ধনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট, অতএব মোট মজুরীর পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট। অতএব শ্রমিকেরা মাথাপিছু গড়ে কত মজুরী পাবে তা নির্ভর করে, দেশের সঞ্চিত ধনের অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা কত, তার উপর। শ্রমিকের সংখ্যা যত কম হবে, মজুরী তত বেশী হবে; যত বেশী হবে, মজুরী তত কম হবে। আর'ও কথা এই যে, যদি কোন বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিক বেশী মজুরীর দাবী করে, তা হ'লে অন্য কোন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরী না কমালে, এই দাবী মেটান' যায় না; কারণ মোট মজুরীর পরিমাণ বাড়ান যায় না। অতএব বেশী মজুরীর দাবী করাটা গর্হিত কাজ; তাতে এক শ্রেণীর শ্রমিকদের বঞ্চিত ক'রে অন্য শ্রেণীর শ্রমিকদের লাভ হয়।

সিদ্ধান্তটির সপক্ষে এই যুক্তি দেখান হয়েছে যে, শ্রমিক যে সময়ে কাজ করে, সেই সময়েই তাকে মজুরী দিতে হয; অথচ, তার সাহায্যে যে ধনোৎপাদনের কাজ চলে, সে কাজ শেষ হ'তে সময় লাগে। অতএব উৎপন্ন পণ্য বিক্রী ক'রে সেই টাকা থেকে মজুরী দেওয়া যায় না। দেশে যে সঞ্চিত ধন আছে তাই থেকে সব মজুরী দিতে হয়। সুতরাং মোট মজুরীর পরিমাণ, এই সঞ্চিত ধনের পরিমাণ দিয়ে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই পরিমাণ, লোকের আয় ও তাদের খরচের অভ্যাসের উপর নির্ভর করে; অতএব তাড়াতাড়ি বাড়ান' যায় না। সুতরাং মোট মজুরীর পরিমাণও তাড়াতাড়ি বাড়ান' যায় না।

নানাভাবে এই যুক্তির ত্রুটি দেখান' যায়। প্রথমতঃ, সঞ্চিত ধন ব'লতে যদি মজুত টাকা বোঝায়, তা হ'লে এই টাকার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট, এ কথা মেনে নিলেও, এই সমস্ত টাকাটা মজুরী দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়, সে কথা সত্য নয়। অন্য নানা রকম কাজে এই টাকা ব্যবহার করা হয; এবং এর অনেকখানি অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় সঞ্চয়কারীর হাতে প'ড়ে থাকে। অতএব প্রয়োজন হ'লে, মজুরী দেবার জন্য

দেশের মজুত টাকা থেকে একটু বেশী পরিমাণ সংগ্রহ করা যায় না, তা নয়। একটু বেশী সুদ দিলেই অন্য ব্যবহার থেকে বাড়্তি টাকা টেনে নেওয়া যায়, এবং যে টাকা খাটাচ্চে না, তাকে টাকা খাটাতে প্রলুব্ধ করা যায়। তা ছাড়া, সব সময়েই বিদেশ থেকে সেখানকার মজুত টাকা ধার করা যায়। আজকাল আবার, প্রায় সব দেশেই কাগজের টাকা চলে। অতএব টাকার যোগান বাড়ান' শক্ত নয়। সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজন মত বাড়তি টাকা ছাপিয়ে দিতে পারে। ব্যাঙ্কগুলিও নোট বা ডিপজিট আকারে বাড়্তি ক্রয়শক্তি তৈরী ক'র্তে পারে। অতএব টাকার যোগানের অভাবে মজুরী বাড়ান' যায় না, এ কথা সত্য নয়। মালিকের যদি বেশী মজুরী দেওয়া পোষায়, তা হ'লে টাকার জন্য আট্কায় না।

শ্রমিকদের যে মজুরী দেওয়া হয় সেটিকে টাকা হিসাবে না দেখে, সেই টাকা দিয়ে শ্রমিক যে সব দ্রব্যাদি কেনে সেই সবের সমষ্টি হিসাবে দেখা চলে। যে কোন সময়েই এ কথা বলা চলে যে, দেশের এই সব দ্রব্যদির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট; কারণ এগুলি অতীতের কর্ম্মচেষ্টার ফল। মজুরীর টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেই এগুলির যোগান রাতারাতি বাড়তে পারে না। এই হিসাবে, সঞ্চিত ধনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট, এবং মোট মজুরীর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট, এ মন্তব্য যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু আসলে, এরকম ভাবাটা ভুল হবে। কারণ, অনবরতই পণ্য-প্রস্তুতির কাজ চ'ল্ছে, এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই নানা সামগ্রীর নূতন যোগান এসে পৌঁছচ্চে। দেশের ব্যবহার যোগ্য দ্রব্যাদির যোগানকে একটি বদ্ধ জলাশয়ের মত কল্পনা না ক'রে, একটি স্রোতস্বতী নদীর মত কল্পনা করাই সমীচীন; এবং এই স্রোতের বেগ চেষ্টা ক'রলে বাড়ান' যায়। শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়ে যদি তাদের কাছ থেকে কাজ বেশী পাওয়া যায়, তা হ'লে ক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির যোগানও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। তার মানে, মজুরীর পরিমাণ যে শুধু টাকার অঙ্কে বাড়ে, তা নয়; জিনিষের হিসাবেও বাড়ে।

আলোচ্য সিদ্ধান্তটি ত্রুটিপূর্ণ হ'লেও, এতে একটি কথার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যে কথাটি উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। শ্রমিকের পারিশ্রমিক তার প্রান্তিক দানের উপর নির্ভর করে, এ কথা ঠিক্। কিন্তু, এই প্রান্তিক দান, দেশের মূলধনের যোগানের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। রেলপথ ও রাস্তাঘাট, মালবাহী জাহাজ, বড় বড় কারখানা ও প্রচুর পরিমাণে ভাল ভাল যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সাহায্য পেলেই তবে শ্রমিকের পরিশ্রমের সার্থকতা বাড়ে। এই সমস্ত আয়োজন দেশের সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। অতএব যে দেশে মূলধনের যোগান যত বেশী, সে দেশে শ্রমিকের পাওনাও তত বেশী হ'য়ে থাকে। যারা শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি চায় তাদের এদিকে সব সময় নজর রাখা দরকার যেন দেশে সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি হ্রা

কমে, এবং মূলধনী সামগ্রী তৈরীর পথে কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। কারণ, তা হ'লে তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারে না।

নবম পরিচ্ছেদ

পারিশ্রমিকের তারতম্য

দেশভেদে পারিশ্রমিকের তারতম্য—এ রকম প্রায়ই দেখা যায় যে, একই কাজের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হারে মজুরী দেওয়া হচ্ছে। যদি এক দেশের শ্রমিকদের অন্য দেশে গিয়ে কাজ নেওয়ায় কোন অন্তরায় না থাকত, তা হ'লে এরকম হ'তে পারত না। কারণ, তা হ'লে কম মজুরীর দেশের শ্রমিকেরা বেশী মজুরীর দেশে গিয়ে কাজ নিতে থাকৃত। তার ফলে, ঐ দেশে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়্‌তে থাকৃত এবং মজুরীর হার ক'মতে থাকৃত। অন্যপক্ষে, আগের দেশটিতে শ্রমিকের সংখ্যা ক'মতে থাকৃত, এবং মজুরীর হার বাড়্‌তে থাকৃত। এইভাবে কালক্রমে সব দেশেই মজুরীর হার সমান হ'য়ে যেত। কিন্তু তা হয় না। তার কারণ, নানা রকম সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে, এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়ে বসবাস ক'রতে চায় না, বা ক'রতে পায় না। সামান্য কিছু সংখ্যা অবশ্য যায়। কিন্তু সে নগণ্য। অতএব প্রত্যেক দেশের মজুরীর হার নির্ভর করে, সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ কতটুকু, এবং এই সম্পদ্ কাজে লাগাবার ব্যবস্থা আছে কি রকম, তার উপর। যে দেশে এই সম্পদ্ বেশী আর লোকসংখ্যা কম, সে দেশে মজুরীর হার বেশী। যে দেশে এই সম্পদ কম, এবং তার অনুপাতে লোকসংখ্যা বেশী, সে দেশে মজুরীর হার কম। তাই যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায় বা অষ্ট্রেলিয়ায় মজুরীর হার এত বেশী; এবং এশিয়ার দেশগুলিতে মজুরীর হার এত কম। সেই রকম, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের শ্রমিকদের কারিগরী দক্ষতা আমেরিকার শ্রমিকদের চেয়ে কিছু মাত্র কম না হলেও, ঐ সব দেশের মজুরীর হার, আমেরিকার চেয়ে অনেক কম।

কাজ-ভেদে পারিশ্রমিকের তারতম্য—সব রকম কাজের পারিশ্রমিক সমান নয়। যে কাজে যত বেশী পরিশ্রম ক'রতে হয়, এবং যে কাজ যত বেশী অপ্রীতিকর, সে কাজের পারিশ্রমিকও তত বেশী হবার কথা। অন্যপক্ষে, যে কাজে যত কম পরিশ্রম ক'রতে হয়, এবং যে কাজে যত বেশী আরাম ও মর্য্যাদা আছে, সে কাজের পারিশ্রমিকও তত কম হবার কথা। কারণ, তা না হ'লে, শেষোক্ত কাজগুলিতে লোকের ভিড় বাড়বে, এবং পূর্ব্বোক্ত কাজগুলিতে লোকের ভিড় ক'মবে। শ্রমিকের সংখ্যা বাড়লে, "শ্রমশক্তি-নিয়োগের প্রান্তিক

ফলের সিদ্ধান্ত” অনুসারে পারিশ্রমিক ক’মবে, এবং যে কাজে শ্রমিকের সংখ্যা ক’মবে সেখানে পারিশ্রমিক বাড়বে। অতএব যে কাজ শ্রমিকের যত পছন্দসই হবে, সে কাজের পারিশ্রমিক তত কম হবার কথা।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয় না। বরঞ্চ, যে সব কাজে আরাম ও মর্য্যাদা বেশী সেই সব কাজেই আয়ও বেশী; যেমন, কারবার পরিচালনায়, ওকালতি, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতিতে। অন্যপক্ষে, অতিশয় শ্রমসাধ্য ও অপ্রীতিকর কাজে আয় কম; যেমন, কিষাণ, মুটে, কয়লা বা পাথর কাটা কুলি ইত্যাদি। এরূপ হবার কারণ এই যে, জন্মগত গুণাগুণের কথা বাদ দিলেও, যে কেউ ইচ্ছামত নীচু দরের কাজ ছেড়ে উঁচুদরের কাজে ঢুকতে পায় না। সে পথে নানা রকম আর্থিক ও সামাজিক বাধা আছে। সমাজ এমনভাবেই গড়া যে, তার মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট কতকগুলি স্তর আছে। এক স্তরের লোকের পক্ষে অন্য স্তরে উঠ্‌তে গেলে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হ’তে হয়; এবং অসাধারণ গুণসম্পন্ন না হ’লে, কিংবা বিশেষ সুযোগ না পেলে, এ কাজ কেউ ক’রতে পারে না।

দেশের বেশীর ভাগ লোক শুধু গতর খাটিয়ে খায়। কুলি, মজুর কিষাণ প্রভৃতি এই স্তরের। এদের অন্য লোকে নিযুক্ত করে, এবং তাদের নির্দ্দেশ মত এরা কাজ করে। এদের কাজে বুদ্ধির বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। খুব কম বয়স থেকেই, অর্থাৎ শরীর তৈরী হ’য়ে গেলেই এরা এদের পুরো রোজগার ক’রতে আরম্ভ করে।

এর উঁচু স্তরে আছে তাঁতী, ছুতোর, কামার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি, এবং যারা কল কারখানায় বা অন্যভাবে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করে। এরাও প্রধানতঃ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা রোজগার করে। কিন্তু এদের কাজে কিছু বুদ্ধি খাটাতে হয়; এবং এ সব কাজ শিখতে সময় ও সুযোগ দরকার হয়। আগেকার স্তরের কিছু কিছু লোকের হয়ত এসব কাজের উপযুক্ত বুদ্ধি আছে। কিন্তু তাদের পক্ষে এ সব কাজ শেখবার সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ সব কাজ প্রায় ক্ষেত্রেই সুদক্ষ কারিগরের কাছে হাতে কলমে শিখতে হয়। সাধারণতঃ, নিজের আত্মীয় স্বজন না হ’লে, কিংবা অন্ততঃ যে সমাজে মেলা-মেশা করে সে সমাজের লোক না হ’লে, কেউ কাউকে কাজ শেখাতে চায় না, কিংবা কোন সুবিধা করে দিতে চায় না। তা ছাড়া, প্রায় ক্ষেত্রেই এ সব কাজে নিজের সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি থাকা দরকার হয়।

এক স্তরের অন্তর্গত হলেও, এক রকম কাজে যদি লোকের অভাবে পারিশ্রমিকের হার বাড়তে থাকে, তা হ’লে যে তখনি তখনি অন্য কাজ থেকে লোক এসে এই ঘাটতি পূরণ করে, তা নয়। যদি রাজমিস্ত্রীর চাহিদা বাড়ে এবং তাঁতীর কাজে মন্দা পড়ে, তা হ’লে বেশী পারিশ্রমিকের টানে তাঁতীরা রাজমিস্ত্রীর কাজে ভর্ত্তি হবে, তা হয় না। যে, যে কাজ অনেক দিন ধরে ক’রছে, সে কাজ ছেড়ে একটা নূতন কাজ শেখবার উৎসাহ তার হয় না; এবং

হলেও অন্ততঃ প্রথম কিছুদিন তার কোন আর্থিক সুবিধাও হয় না। তবে কম বয়সের ছেলেরা যারা নূতন কাজ শিখছে, তাদের বেশী সংখ্যায় বেশী রোজগারের কাজে লাগান হয়। এই ভাবে ধীরে ধীরে, কম রোজগারের কাজে শ্রমিকের সংখ্যা কমে, এবং বেশী রোজগারের কাজে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে; এবং অনেক দিনের হিসাব নিলে দেখা যায় যে মোটামুটি সব রকম কাজেই সমান পরিশ্রমের সমান মজুরী দেওয়া হয়। আমাদের দেশে আরও একটি বাধা আছে। এখানে জাতিগত পেশার সংস্কার এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। সেইজন্য এখানে বিভিন্ন পেশার মধ্যে শ্রমিক-সংখ্যার সামঞ্জস্য ঘট্‌তে অন্য দেশের চেয়ে বেশী সময় লাগে।

ছোট খাট দোকানদার, দালাল, অফিসের কেরাণী, কম লেখা-পড়া জানা শিক্ষক প্রভৃতি আর এক স্তরে পড়ে। এদের কাজে প্রধানতঃ মানসিক পরিশ্রম ক'রতে হয়। তবে এ পরিশ্রম বাঁধাধরা; এতে বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। যে সব পরিবারে লেখা-পড়ার চর্চ্চা আছে তাদের ছেলেরা এই সব কাজই পছন্দ করে। এদের সংখ্যা বেশী, এবং রোজগার কম; এতই কম যে, অনেক ক্ষেত্রে এরা কল কারখানায় কাজ নিলে যথেষ্ট বেশী রোজগার ক'রতে পারে। কিন্তু পারতপক্ষে কেউ তা ক'রতে চায় না; কারণ হাতের কাজে এরা অপমান বোধ করে। শিক্ষিত সমাজে যতদিন না হাতের কাজের মর্য্যাদা বাড়ে, ততদিন শিক্ষিত যুবকদের বেকার সমস্যা সমাধান হ'তে পারে না।

সবচেয়ে বেশী রোজগারের স্তর হচ্ছে, বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ও সরকারী আফিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, এবং উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির। এদের কাজও মানসিক পরিশ্রমের কাজ। তার ওপর, এ সব কাজে উঁচু দরের বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিচক্ষণতা দরকার। আর দরকার টাকার। বেশ সচ্ছল অবস্থার পরিবারে জন্মাবার সৌভাগ্য না হ'লে, এ সব কাজের সুযোগ পাওয়া শক্ত। ওকালতি ডাক্তারী প্রভৃতি পেশায় অনেক দিন ধ'রে ব্যয়সাধ্য বিদ্যা অর্জ্জন ক'রতে হয়, এবং যতদিন না পসার জমে ততদিন অপেক্ষা করবার মত সঙ্গতি দরকার হয়। এ কথা অবশ্য সত্য যে, গরীবের ঘরের অত্যন্ত মেধাবী ও দৃঢ়চরিত্র ছেলে, পরে নামজাদা উকিল বা ডাক্তার হয়েছে, এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু এগুলি নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ, সঙ্গতিপন্ন পরিবারের ছেলেরাই এ সব সুযোগ পায়। সেই কারণে, এই সব কর্ম্মক্ষেত্রে সংখ্যা বেশী বাড়্‌তে পায় না, এবং তার ফলে উঁচু রোজগারও বজায় থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ

(১)

কারবারের লাভ।

কারও কারও মতে ব্যবসায়ীরা যে লাভ করে, তাতে তাদের কোন ন্যায্য দাবী নেই। অর্থাৎ, সমাজের কোন উপকার সাধন ক'রে, তার প্রতিদান স্বরূপ এই টাকা তারা পায় না। জনসাধারণের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে, উচিত দামের চেয়ে বেশী দামে মাল বেচে, তারা এই টাকা আদায় করে। অতএব লাভ নেওয়া যদি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, তা হ'লে সমাজের উপকার বই অপকার হয় না। এই অভিমত কতদূর সঙ্গত স্থির ক'রতে হ'লে, লাভ ব'ল্‌তে কি বোঝায়, তার আলোচনা করা দরকার। খুঁটিয়ে বিচার ক'রলে দেখা যায় যে, লাভ হিসাবে মালিকের হাতে যে টাকা যায়, তার সবটুকু ঠিক্ এক ধরণের আয় নয়। একে ছয়টি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে চারিটির সম্বন্ধে কোন ন্যায্য অপত্তি করা চলে না। কিন্তু আর দুইটি সমর্থন-যোগ্য নয়।

১। এর একটি ভাগ আসলে টাকার সুদ। মোট আদায় থেকে মোট খরচ বাদ দিয়ে লাভের হিসাব হয়। ধার করা টাকার সুদ এই খরচের মধ্যে ধরা হয়। কিন্তু একলা লোকের কারবারে, মালিকের যে টাকা কারবারে খাটে, তার সুদ আলাদা ক'রে হিসাব করা হয় না। জয়েণ্ট ষ্টক্ কারবারে 'ডিবেঞ্চারের' সুদ খরচের হিসাবে ধরা হয়; কিন্তু 'অর্ডিনারী শেয়ারের টাকার জন্য আলাদা ক'রে কোন সুদ দেওয়া হয় না। অন্য লোককে টাকা ধার দিয়ে সুদ নিলে কোন দোষ হয় না; অথচ নিজের টাকা নিজের কারবারে খাটিয়ে সুদ নেওয়া চ'লবে না, এ রকম হ'তে পারে না। অতএব লাভের যে অংশটুকু সুদ, তার সম্বন্ধে কোন সঙ্গত আপত্তি করা চলে না।

২। লাভের আর একটি অংশ আসলে পরিশ্রমের মূল্য। বড় বড় কারবারে, বিশেষতঃ 'জয়েণ্ট ষ্টক্' কারবারে পরিচালনা করার কাজ মাহিনা-করা কর্ম্মচারীদের হাতে থাকে। ডিরেক্টরদের 'ফি' এর হিসাবও খরচের মধ্যে ধরা হয়। কিন্তু ছোট ও মাঝারী অনেক কারবারে মালিকেরা যে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে, তার পারিশ্রমিক খরচের মধ্যে ধরা হয় না। এটি যে তাদের প্রাপ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অতএব লাভের এই অংশটি সম্বন্ধেও কোন আপত্তি হ'তে পারে না।

৩। লাভের আর একটি অংশ অনিশ্চিতের ঝুঁকি নেওয়ার মূল্য। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আজকাল অল্প-বিস্তর অনিশ্চিতের ঝুঁকি নিতে হয়।

চাষের ফসল, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে নষ্ট হ'তে পারে। তুলা, পাট, গম, যব, তিসি, তামাক, চা প্রভৃতি যে সব ফসল প্রধানতঃ বিক্রয়ের জন্য চাষ করা হয়, বাজার দর ওঠানামার উপর সেগুলির লাভ লোকসান নির্ভর করে। এই দরের ওপর চাষীর কোন হাত নেই। শিল্প-জগতে অনিশ্চিতের ঝুঁকি আরও বেশী। আধুনিক যন্ত্র যুগে কল কারখানা গ'ড়তে অনেক সময় লাগে; অনেক টাকাও ফেল্‌তে হয়। তারপর, যখন মাল তৈরী হ'তে আরম্ভ হ'ল, তখন হয়ত দেখা গেল যে, বাজারে চাহিদা বা যোগানে এতখানি বদল হ'য়ে গেছে যে, লোকসান দিয়ে মাল বেচা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এরকম অবস্থা অনেক দিন ধ'রে চ'লতে পারে। মূলধনের বেশীর ভাগটা খুইয়ে কারবার গুটিয়ে নিতে হ'ল, এরকম দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পকৌশলের সাহায্য নিতে হ'লে, এই ঝুঁকি কাউকে না কাউকে নিতেই হবে। না নিলে, এত সস্তায় এত রকমারী জিনিষ পাওয়া যেত না। লোকে যে এই ঝুঁকি নেয় তার কারণ হচ্ছে এই যে. যেমন লোকসানের ভয় আছে, তেমনি লাভেরও আশা আছে; এবং অনেক ক্ষেত্রে এতখানি লাভ হয় যে লোকসানের ঝুঁকি নেওয়া পোষায়। যে ক্ষেত্রে লাভ হয় সে ক্ষেত্রে যদি কারবারী লোকেদের সেই লাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তা হ'লে তারা লোকসানের ঝুঁকি নিতে রাজী হবে না; ফলে, দেশের ক্ষতি হবে। যে ব্যবসায়ে লোকসানের সম্ভাবনা যত বেশী, সে ব্যবসায়ে তত বেশী লাভ করতে দিতে হবে। কেনা-বেচার কাজেও অনিশ্চিতের ঝুঁকি কম নয়। বিশেষতঃ যে সব ক্ষেত্রে অর্ডার দিয়ে বিদেশ থেকে মাল আনাতে হয়, কিংবা অনেক আগে থেকে মাল কিনে মজুত ক'রতে হয়, সে সব ক্ষেত্রে লোকসানের সম্ভাবনা যথেষ্ট। পশমী বস্ত্রের ব্যবসায়ীদের শীত পড়বার ছয় সাত মাস আগে থেকে মালের অর্ডার দিতে হয়, এবং অর্ডার দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কি দরে এই মাল কিন্‌বে তাও স্থির হ'য়ে যায়। পরে, শীতের সময়, হয় ভাল ক'রে শীত না পড়ার দরুণ, কিংবা অন্য জায়গা থেকে অনেক মাল এসে পড়ার দরুণ, মালের দর অপ্রত্যাশিত ভাবে কম হ'তে পারে। ব্যাপারীরা লোকসানের এই ঝুঁকি নেয় এই কারণে যে, দর বেশী হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, এবং তা যদি হয় তা হ'লে তারা বেশ মোটা লাভ ক'রতে পারবে। ব্যাপারীরা যদি এই ঝুঁকি না নিত, তা হ'লে মিলগুলি ভরসা ক'রে আগে থেকে মাল তৈরী ক'রতে পারত না, এবং খরিদ্দাররাও তাদের প্রয়োজন মত মাল পেত না।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, দেশের প্রয়োজন মত মাল সরবরাহ হ'তে হ'লে ব্যবসায়ীদের লাভ করবার সুযোগ থাকা দরকার। অর্থাৎ, শ্রমিকের পারিশ্রমিক বা মূলধনের সুদের মত, অনিশ্চিতের ঝুঁকি নেওয়ার মূল্যও মালের

তৈরী-খরচার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তবে, এই বাবদ্ লাভের পরিমাণ ঠিক্ কতটুকু হ'লে চলে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া শক্ত। কেউ কেউ মনে করেন যে, সমস্ত লাভ লোকসান খতিয়ে গড়ে যদি চল্‌তি হারে সুদটুকু পোষায়, তা হ'লেই যথেষ্ট। তার মানে, দেশের কোন একটি ব্যবসায়ে যত লোক লাভ করেছে তাদের সমস্ত লাভের যোগফল থেকে, যত লোক লোকসান দিয়েছে তাদের সমস্ত লোকসান বাদ দিলে যা দাঁড়ায়, সেইটি যদি, সব সমেত যত টাকা খাটান' হয়েছে, সমস্তটার ওপর চল্‌তি হারে যা সুদ হয়, তার সমান হয়, তা হ'লেই লোকে এই ব্যবসায়ে টাকা ফেল্‌তে রাজী হয়। এ সিদ্ধান্ত ঠিক্ ব'লে মনে হয় না। কারণ, যখন লোকসান হয় তখন, শুধু যে কিছু আয় হ'ল না তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে মূলধনের একটা বড় অংশ খোয়া যায়। গড়ে মাত্র সুদটুকু পাবার ভরসায় কেউ এ ঝুঁকি নিতে রাজী হবে, তা ব'লে মনে হয় না। তবে এর আর একটা দিক আছে। স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করা, এবং নিজের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারার একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে। তা ছাড়া, অনেক লোকের অল্পবিস্তর জুয়া খেলার মনোবৃত্তি আছে। অর্থাৎ, বেশী লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাক্‌লেই, লোকে সে দিকে ঝুঁকে পড়ে; লোক-সানের সম্ভবনাটা যে অনেক বেশী, সে দিকে তত নজর দেয় না। কোন্ ক্ষেত্রে কত লোক হিসেবী মনোভাব নিয়ে কাজ ক'রবে, এবং কত লোক জুয়া খেলার মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ ক'রবে, তা হিসেব করবার কোন জানা উপায় নেই। তবে এটুকু নিঃসংশয়ে বলা চলে যে গড়ে মাত্র সুদটুকু পাবার প্রত্যাশায় কেউ কারবারে টাকা ফেল্‌তে রাজী হয় না।

৪। লাভের আর একটি অংশের উৎপত্তি হয়, পরিচালনার কাজে বিশেষ কৃতিত্বের ফলে। দেশের এক একটি ব্যবসায়ে অনেকগুলি ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান থাকে। সব গুলিতে লাভ সমান হয় না। যেটিতে, মাত্র টিঁকে থাক্‌বার মত লাভ হয়, সেটিকে প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান বলা চলে। অন্যগুলির মধ্যে, যেটি যত দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা হয় সেটিতে লাভও এর চেয়ে তত বেশী হয়। পরিচালকেরা সকলে সমান গুণী নয়। বুদ্ধি, বিচার-শক্তি ও কর্ম্ম-তৎপরতায় তাদের মধ্যে তারতম্য থাকে; এবং তারই ফলে লাভও কম বেশী হয়। উঁচুদরের যোগ্যতার পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়, নূতন ধরণের জিনিষ তৈরী করায়, এবং চলতি কাজে নূতন কৌশল ও নূতন যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করায়। রেয়ন (Rayon, কৃত্রিম রেশম), বুনা (Buna, কৃত্রিম রবার), প্লাষ্টিক (Plastics), ভেণ্টাইল ফ্যাব্রিক্‌স্ (Ventile fabries) প্রভৃতি নূতন নূতন পণ্য, পরিচালকদেরই কৃতিত্বের নিদর্শন। এ ছাড়া, চল্‌তি কাজেও, সুদক্ষ পরিচালকেরা নানা ভাবে খরচ কমাতে ও আয় বাড়াতে সমর্থ হয়। নূতন নূতন কৌশল প্রয়োগ করা, নূতন আবিষ্কার বা যন্ত্রপাতি কাজে লাগান' প্রভৃতি নানা দিক্ দিয়ে, প্রতিনিয়তই ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলেছে। যারা যত আগে এবং যত বেশী ক'রে এই সব উপায় কাজে লাগাতে পারে, তারা তত

লাভবান্ হয়। কালক্রমে যখন বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানেই কোন একটি নূতন উপায় অবলম্বন করা হয়, তখন আর সেই বাবদ বাড়্তি লাভ বজায় থাকে না। কিন্তু প্রথমটা এবং কিছুদিন ধ'রে, বেশী লাভ করার সম্ভাবনা থাকে ব'লেই, নানা দিক্ দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টা চলে। যদি এই লাভের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়, তা'হলে উন্নতির ধারা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিচার ক'রে দেখলে বোঝা যায় যে, এই বাড়তি লাভের সঙ্গে জমির খাজনার একটা সাদৃশ্য আছে। জমির খাজনা, প্রান্তিক জমির চেয়ে এই জমির স্বাভাবিক গুণাধিক্যের উপর নির্ভর করে। তেমনি লাভের এই অংশটুকু, প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের অধিকতর স্বাভাবিক গুণপণার উপর নির্ভর করে। অতএব, জমির খাজনার মত এই লাভ সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে যে, এই লাভ আদায় করা হয় ব'লেই যে পণ্যের দাম বেশী হয়, তা নয়; পণ্যের দাম বেশী হওয়ার দরুণই এই লাভ আদায় করা যায়। তবে, জমির খাজনা সম্বন্ধে যে আরও একটি মন্তব্য করা চলে যে, এই খাজনা সরকার যদি বাজেয়াপ্ত ক'রে নেয়, তা হ'লে দেশের কোন ক্ষতি হয় না, সে মন্তব্য লাভের এই অংশ সম্বন্ধে খাটে না। কারণ জমির খাজনা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ উদ্বৃত্ত; লাভ তা নয়। পরিচালকের উঁচু দরের গুণ থাক্লেই যে সেই গুণ কাজে লাগান' হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বেশী লাভের আশা না থাকলে, পরিচালক যথাসাধ্য চেষ্টা না ক'রতে পারে। তা হ'লে দেশের উন্নতির গতি মন্দীভূত হ'তে পারে।

৫। কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত কারণে, সাময়িকভাবে অত্যধিক লাভ হয়। যেমন, বিদেশে বড় রকমের যুদ্ধ বাঁধলে, আমদানী মালের যোগানে ঘাটতি পড়ে। তখন যাদের ঘরে ঐ সব মাল বেশী পরিমাণে মজুদ আছে, কিংবা যারা ঐ সব মাল কিছু কিছু তৈরী করে, তারা পড়্তা-খরচের চেয়ে অনেক বেশী দরে ঐ সব মাল বেচতে সমর্থ হয়। এই অতিরিক্ত লাভের জন্য তাদের কোন কৃতিত্ব নেই। অতএব, এতে তাদের কোন ন্যায্য দাবীও নেই। যদি, অতিরিক্ত আয়-কর চাপিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে তাদের এই অতিরিক্ত লাভ বাজেয়াপ্ত ক'রে নেওয়া হয়, তা হ'লে তাদের ওপর কোন অবিচার করা হয় না; এবং দেশেরও কোন ক্ষতি হয় না।

৬। খুব বেশী বেশী লাভ যে সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেগুলি অধিকাংশই একচেটিয়া অধিকারের ফল। অল্পবিস্তর একচেটিয়া সুযোগ, অনেক কারবারেই থাকে। 'পেটেন্ট' বা 'কপি-রাইট' এর অধিকার থাক্লে, বাজার ধ'রতে পারলে, যতদিন না এই সুবিধার মেয়াদ ফুরোয়, ততদিন মোটা লাভ করা যায়। তবে, এ লাভ ক'রতে দেওয়া দরকার; না হ'লে, নূতন আবিষ্কার করায় উৎসাহ থাকবে না। বড় বড় কারবারীরা অনেক সময়ে প্রভূত ব্যয়ে, নানা রকম চটক্দার বিজ্ঞাপনের সাহায্যে খরিদ্দারদের মনে এমন ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে যেন,

তাদের মাল অন্যান্য অনুরূপ মালের চেয়ে অনেক ভাল। তখন তাদের কাছ থেকে অত্যধিক দাম আদায় করা সহজ হয় ; ফলে লাভও খুব বেশী হয়। কোন কোন দোকানে, খুব দামী ঠাট ও বড়মানুষী আদব কায়দার সাহায্যে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয় এবং সমস্ত জিনিষের দাম এত বেশী ক'রে ধরা হয় যে, যে সব লোক পয়সার জাঁক দেখাতে ভালবাসে তারা বেছে বেছে সেই সব দোকানে বাজার ক'রতে আসে। এইভাবে ক্ষুদ্রচেতা লোকেদের মনের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ধূর্ত্ত দোকানদার অত্যধিক লাভ ক'রতে সমর্থ হয়। পুরাতন কারবারের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হ'লে, অনেক সময়ে তারা এই সুনামের সুযোগ নিতে ছাড়ে না। দর চড়িয়ে দিলে গ্রাহক অসন্তুষ্ট হয় না ; বরঞ্চ ভাবে যে নিশ্চয়ই মাল ভাল, সেই জন্যই দর বেশী। ফলে বেশী লাভ করা সম্ভব হয়। কখন কখন সরকারী নীতির ফলে একচেটিয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন আমাদের দেশে চিনি ও কাপড়ের আমদানী বন্ধ ক'রে দেওয়ার দরুণ চিনির কলে ও কাপড়ের কলে অনেক দিন ধ'রে অত্যধিক লাভ হচ্ছে। সরকারী তরফ থেকে দর বেঁধে দিয়ে অতিলাভ নিবারণ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। লাভের মধ্যে, কালো বাজারের সৃষ্টি হয়, এবং বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্ম্মচারী দুর্নীতি-পরায়ণ হ'য়ে ওঠে।

যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল তার কোনটাতেই অতিলাভ সমর্থনযোগ্য নয় ; অর্থাৎ, এই লাভে ব্যবসায়ীর কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী নেই, এবং এই লাভ করেতে না দিলে জনসাধারণের কোন অপকার হয় না। অতএব এই লাভ নিবারণ করবার বা বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা উচিৎ।

একচেটিয়া কারবার সম্বন্ধে আগেই বিশদ্ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখেছি যে কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া অধিকারের প্রশ্রয় দেওয়া দরকার। সে সব ক্ষেত্রে, সাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য দর বেঁধে দেওয়া বা লাভের হার বেঁধে দেওয়া দরকার, কিংবা সমস্ত ব্যবসায়টি সরকারের হাতে নিয়ে নেওয়া দরকার। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান একজোট হ'য়ে একচেটিয়া সঙ্ঘ তৈরী করে, সে কথাও আগে আলোচনা করা হয়েছে। প্রধানতঃ, গ্রাহকদের কাছ থেকে চড়া দাম আদায় করবার উদ্দেশ্যেই এ রকম করা হয়। নানা রকম নিন্দনীয় উপায়ের সাহায্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়, সে আলোচনাও আগে হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই যে, জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে, এগুলিকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ, এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে দমন করা উচিৎ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকৃতে পারে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

টাকার সুদ

(১)

সুদ সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়

টাকা ধার দিলে তার জন্য সুদ পাওয়া যায়। যাদের ধার দেবার মত টাকা থাকে, তারা সেই টাকা ধার দিয়ে নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা ক'রতে পারে। সুদের হার নির্দ্দিষ্ট হয়, বৎসরে শতকরা কত দিতে হবে সেই হিসাবে। অর্থাৎ ৫৲ টাকা হারে ধার নেওয়া মানে, ১০০৲ টাকা ধার নিলে ১ বৎসর পরে সুদে আসলে ১০৫৲ টাকা ফেরত দিতে হবে।

সুদ সম্বন্ধে দুটি বিষয় জান্‌বার আছে। প্রথম, উত্তমর্ণ সুদ চায় কেন এবং অধমর্ণ সুদ দিতে রাজী হয় কেন। দ্বিতীয়, যে হারে ঋণ-দান ও ঋণ-গ্রহণ করা হয়, সে হার কি ভাবে স্থির হয়।

প্রথম প্রশ্নটির আবার দুটি দিক আছে; একটি ঋণের যোগান, এবং অন্যটি ঋণের চাহিদা। সুদের হার যদি এমন হয় যাতে, ঋণের যোগানের পরিমাণের সঙ্গে ঋণেব চাহিদার পরিমাণের সমতা স্থাপিত হয়, তবেই সেই হাব টাকার বাজারে বেশীদিন বলবৎ থাকৃতে পারে।

(২)

ঋণের যোগান।

ধার দিতে হ'লে হাতে মজুত টাকা থাকা চাই। তার মানে সঞ্চয় চাই; অর্থাৎ আয়ের চেয়ে ব্যয় কম করা চাই। ব্যাঙ্ক, ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট (Investment Trust) ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী (Insurance Company) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে যে ধার পাওয়া যায় তাও আসলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে আসে। কি কি অবস্থা সঞ্চয়ের পক্ষে অনুকূল, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রথম খণ্ডে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা না থাকলে, লোকের সঞ্চয় করবার প্রবৃত্তি হ'তে পারে না। সরকারের দ্বারা যদি সঞ্চিত ধন বাজেয়াপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে তা হ'লেও সঞ্চয়ের আকিঞ্চন থাকতে পারে না। টাকার ক্রয়শক্তি যদি বেশী রকম কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তা হ'লে লোকে সঞ্চয় করতে ভরসা পায় না। দেশে ব্যঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রসার ও কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে টাকা খাটাবার সুযোগ যত বাড়ে, সঞ্চয়ের উৎসাহও তত বাড়ে। দেশের লোক মোটামুটি সচ্ছল অবস্থায় না থাকলে সে দেশে সঞ্চয় বিশেষ কিছু হতে পারে না। যারা যত ধনী তাদের পক্ষে

সঞ্চয় করা তত সহজ। সামান্য আয় থেকে সঞ্চয় ক'রতে গেলে কিছুটা সংযম দরকার। আয় বেশী হ'লে সঞ্চয় করায় ক্লেশ নেই; সব রকমের ভোগবাসনা তৃপ্তি করেও উদ্বৃত্ত পড়ে থাকে; এবং সেটা আপনা আপনিই জমতে থাকে। যে দেশ যত সমৃদ্ধ, সে দেশে সঞ্চয় তত বেশী। এবং একই দেশের মধ্যে যে সম্প্রদায় যত ধনী তাদের সঞ্চয় হয় তত বেশী। অত্যন্ত গরীব দেশেও যে কিছু কিছু সঞ্চয় হয়, তার কারণ দেশের আয় সকলেব মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হয় না। দেশের বেশীর ভাগ লোকের অবস্থা নিতান্ত দীন হলেও মুষ্টিমেয় লোক যথেষ্ট ধনী থাকে, এবং তারা অনায়াসেই আয়ের একটি মোটা অংশ সঞ্চয় ক'রতে পারে।

এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে এই যে, কতকগুলি লোক খরচ কমাতে আরম্ভ ক'রলেই যে সঙ্গে সঙ্গে দেশের সঞ্চয়েব পরিমাণ বাড়্‌তে থাকে, তা নয়। কারণ যেটা এক জনের খরচ, সেটা আর একজনের আয়। যে লোক বরাবর বছরে ছ' জোড়া ক'রে কাপড় কেনে, সে যদি খরচ কমাবার জন্য তিন জোড়ায় চালাবার চেষ্টা করে, তা হ'লে কাপড়অলাদের আয় ক'মবে। তার ফলে তাদের সঞ্চয় ক'মবে। অর্থাৎ, কতকগুলি লোক খরচ কমাতে আরম্ভ ক'রলে, তার আশু ফল হয় এই যে, অন্য কতকগুলি লোকের সঞ্চয় ক'মে যায়। তাতে দেশের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ক'মেও যেতে পারে। বাড়্‌তি সঞ্চয়ের টাকা দেশের শিল্প বাণিজ্যে খাটান' চাই, যাতে সেই টাকা অন্য লোকের হাতে আয় হিসাবে আসে। তবেই সঞ্চয়ের সার্থকতা। ব্যক্তিগত কৃপণতা বৃদ্ধি পেলে, দেশেব উপকার না হ'য়ে অপকার হ'তে পারে।

সুদ বাড়্‌লে কি সঞ্চয় বাড়ে? কেউ কেউ সুদকে 'সঞ্চয়ের মূল্য' এই আখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে পণ্যমূল্যের সঙ্গে পণ্যের যোগানের যে সম্বন্ধ, সুদের সঙ্গে সঞ্চয়েব পরিমাণেরও সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ, সুদ ক'মলে সঞ্চয় কমে, সুদ বাড়্‌লে সঞ্চয় বাড়ে। সঞ্চয় করা মানে, আয়ের খানিকটা অংশ খরচ ক'রতে নিবৃত্ত থাকা; অর্থাৎ, সদ্যভোগের সুখ থেকে নিজেকে কতকটা বঞ্চিত করা। ভোগেচ্ছা-দমনে কষ্ট আছে; কারণ, ভবিষ্যৎকে বর্তমানের চেয়ে কম কদর দেওয়াই লোকের স্বভাব। সঞ্চিত অর্থ ধার দিয়ে সুদ হিসাবে কিছু বাড়্‌তি অর্থ পাওয়া যায় ব'লেই লোকে এই কষ্টস্বীকার ক'রতে রাজী হয়। আয়ের যত বেশী অংশ সঞ্চয় করা যায়, তত বেশী আত্মনিগ্রহ করতে হয়। অতএব সুদের হারও তত বেশী হওয়া দরকার। সুদের হার এমন হওয়া চাই যে, সঞ্চয়ের শেষ অংশটুকু সঞ্চয় করা সার্থক ব'লে মনে হবে। অর্থাৎ, সুদের হার হচ্ছে প্রান্তিক সংযমের মাপ। (Interest measures marginal abstinence)

সুদের হারের সঙ্গে সংযমের পরিমাণের এতখানি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এ কথা সত্য ব'লে মনে হয় না। অন্ততঃ তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরঞ্চ, বাস্তবক্ষেত্রে যে সমস্ত উদ্দেশ্য নিয়ে লোকে সঞ্চয় করে, সেগুলি বিচার ক'রলে দেখা যায় যে, সুদের হারের

গুরুত্ব খুব বেশী নয়। অনেকে সঞ্চয় করে, বুড়ো বয়সের সংস্থান করবার জন্য; যাতে, যখন নিয়মিত রোজগার বন্ধ হ'য়ে যাবে, তখন কষ্ট পেতে না হয়। এ ক্ষেত্রে, সঞ্চিত অর্থের সুদ থেকে খরচ চালাবার উদ্দেশ্য থাকলে, সুদের হার যত বেশী হবে, সঞ্চয়ের পরিমাণ তত কম হ'লে চ'লবে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে, সুদের হার যত বেশী হয়, প্রিমিয়ম (premcium) তত কম দিতে হয়; তার মানে সঞ্চয়ের পরিমাণ তত কম হয়। অনেকে, হঠাৎ বিপদে আপদে প'ড়লে যাতে সামলাতে পারা যায়, সেই জন্য কিছু টাকা জমিয়ে রাখে। অনেকে আবার, ভবিষ্যতে বাড়ী করা, কিংবা ঐ ধরণের অন্য কিছু বড় রকমের খরচ করবার উদ্দেশ্যে টাকা জমায়। এই সব ক্ষেত্রে, কত টাকা জমান' হবে ঠিক্ করবার সময়, সুদের হার কত সে কথা কেউ বড় একটা চিন্তা করে না। আসলে, লোকের সঞ্চয় সাধারণতঃ নির্ভর করে আয়ের ওপর ও খরচের অভ্যাসের ওপর। খরচের অভ্যাস চট্ ক'রে বদলান' যায় না। আয় ক'মে গেলে সঞ্চয় ক'মে যায়। আয় বেশী ক'মলে ধার হ'তে থাকে, এবং বেশ কিছু দিন বাদে এবং অনেক কষ্ট ক'রে তবে খরচ কমান' যায়। তেমনি আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়তে থাকে। অনেক দিন ধ'রে নিয়মিতভাবে বেশী আয় হ'তে থাকলে, তবে লোকে চা'ল বাড়ায়। এই কারণে দেখা যায়, যখন দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ভাল চলে তখন সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে; আর মন্দার সময় ক'মতে থাকে। তবে, সুদ বাড়লে সঞ্চয় বাড়বার একটা কারণ আছে। সাধারণতঃ, অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরাই টাকা ধার দেয়। অতএব সুদের হার বাড়লে দেশের আয়ের একটু বেশী অংশ এই ধনী লোকেদের ভাগে পড়ে। কাজে কাজেই, এর প্রায় সবটাই জ'মতে থাকে। এখানে সংযম বা আত্ম-নিগ্রহের কোন প্রশ্ন ওঠে না। বেশী সঞ্চয় যা হ'তে থাকে, তা বিনা আয়াসেই হয়। সুদের হার যদি খুব বেশী বাড়ে, অর্থাৎ শতকরা ৮৲ টাকা কি ১০৲ টাকা এই রকম হয়, তা হ'লে কম আয়ের লোকেরাও চেষ্টা ক'রে কিছুটা খরচ কমিয়ে বেশী সঞ্চয় ক'রবে, এ কথা অবশ্য ঠিক্। তেমনি সুদের হার যদি খুব কম হয়, অর্থাৎ শতকরা ১৲ টাকা কি ৷৷০ আনা এই রকম হয়, তা হ'লে সঞ্চয় কিছুটা ক'মে যাওয়াই সম্ভব। কিন্তু, সাধারণতঃ যে হার বাজারে চলে, তার থেকে যদি কিছু এদিক্ ওদিক্ হয়, তাতে সঞ্চয়ের পরিমাণে কোন বিশেষ তারতম্য হয় না।

এতক্ষণ সঞ্চয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। কিন্তু, সঞ্চয়ের পরিমাণ আর ঋণের যোগান এক কথা নয়। হাতে জমান টাকা থাক্লেই যে, লোকে সেই টাকা অন্য লোককে ধার দিতে রাজী হয়, তা নয়। লোকে নিজের টাকা নিজের আয়ত্তে রাখাই পছন্দ করে। অদূর ভবিষ্যতে ঐ টাকা খরচ করবার প্রয়োজন না হ'লেও, হাতছাড়া ক'রতে চায় না। যদি হাতছাড়া করেও, তখন চেষ্টা থাকে যিলে যথাসম্ভব কম সময় ঐ টাকা বাইরে থাকে, এবং ইচ্ছা ক'রলে, যথাসম্ভব কম খরচে ও কম বেগ পেয়ে ঐ টাকা আদায় করা

যেতে পারে। কীন্‌স্‌ সাহেব মানুষের এই প্রবৃত্তির নাম দিয়েছেন "Liquidity preference" অর্থাৎ, "টাকা আল্‌গা রাখার পছন্দ" বা "টাকা আট্‌কে রাখ'র অনিচ্ছা।" সুদের প্রলোভন দরকার হয়, এই অনিচ্ছার বাধা অতিক্রম করবার জন্য। সঞ্চয়ের যত বেশী অংশ হাতছাড়া ক'রতে হয়, এই অনিচ্ছার তীব্রতাও তত বাড়তে থাকে। অতএব সুদের হারও তত বাড়ান'র দরকার হয়। এইখানে, সুদের হারের সঙ্গে ঋণের যোগানের কি সম্বন্ধ, তার সন্ধান পাওয়া যায়। সুদের হার যত কম থাকে, ঋণের যোগানও তত কম থাকে। সুদের হার যেমন বাড়তে থাকে, ঋণের যোগানও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। সুদের হার হচ্ছে টাকা আল্‌গা রাখার পছন্দের প্রান্তিক পরিমাণের মাপ।

সুদের হার যে, সব ক্ষেত্রে সমান হয় না, তারও প্রধান কারণ এই যে, যত বেশী দিনের মেয়াদে টাকা ধার দিতে হয়, এবং অধমর্ণ টাকা ফেরৎ দিতে বেগ দিলে সে টাকা আদায় ক'রতে যত বেশী খরচ ও অসুবিধা হবার সম্ভাবনা, উত্তমর্ণের টাকা হাতছাড়া করবার অনিচ্ছাও তত প্রবল হয়। সেইজন্য সে অনিচ্ছা অতিক্রম ক'রতে তত বেশী হারে সুদ দেওয়া দরকার হয়। তাই দেখা যায়, ব্যাঙ্কের 'কারেণ্ট একাউণ্টে' (Current Account —চল্‌তি হিসাব) লোকে বিনা সুদে বা নামমাত্র সুদে টাকা রাখে। কিন্তু, 'ফিক্সড্‌ ডিপজিট' (Fixed deposit = মেয়াদী জমা) পেতে হ'লে ব্যাঙ্ককে বেশী হারে সুদ দিতে হয়; এবং জমার মেয়াদ যত বেশী হয়, সুদের হারও তত বেশী হয়। আবার, ব্যাঙ্ক যখন টাকা ধার দেয় তখন 'Call loans' বা দাবীমাত্র পরিশোধ্য ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার শতকরা ॥• কিংবা তার চেয়েও কম হয়। সাধারণতঃ, যারা শেয়ার-বাজারে কেনা বেচা করে, তারাই এ ধরণের ঋণ নেয়। সরকারী ঋণ পত্র বা অনুরূপ কাগজের জামিনে এই সব ঋণ দেওয়া হয়। এই সব কাগজ খুব সহজে শেয়ার বাজারে বিক্রয় করা যায়। সেইজন্য টাকা মারা যাবার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। মাল বিক্রীর 'বিল' (Bill) বা দাবীপত্রের জামিনে যে সব টাকা ধার দেওয়া হয়, তারও সুদ যথেষ্ট কম। কারণ এ সব ঋণের মেয়াদ দু তিন মাসের বেশী হয় না; বিলের টাকা সহজেই আদায় হয়; এবং দরকার হ'লে, ঋণের মেয়াদ ফুরোবার আগেই 'বিল' বিক্রী ক'রে টাকা তুলে নেওয়া যায়। জমি, বাড়ী প্রভৃতি বন্ধক রেখে যে টাকা ধার দেওয়া হয়, তার সুদ বেশী। কারণ, এ সব ঋণ অনেক দিনের মেয়াদে দিতে হয়; এবং যদি এই জমি বা বাড়ী বিক্রয় ক'রে টাকা আদায় ক'রতে হয়, তা হ'লে মামলা মোকদ্দমায় অনেক খরচ ক'রতে হয়, এবং অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়।

সুদের তারতম্যের অন্য কারণও থাকে। একটা নামজাদা বড় কোম্পানী যে সুদে 'ডিবেঞ্চার' (Debenture) বেচতে পারে, ছোট কোম্পানী তা পারে না। কারণ, ছোট কোম্পানীর ডিবেঞ্চার কিন্‌লে টাকাটা আটকে যায়। কিন্তু বড় কোম্পানীর ডিবেঞ্চার শেয়ার-বাজারে বেচা-কেনা হয়। অতএব ইচ্ছে ক'রলেই টাকা তুলে নেওয়া যায়। যারা

জিনিষপত্র বন্ধক রেখে সামান্য সামান্য টাকা ধার দেয়, তারা খুব বেশী সুদ নেয়। তার একটা কারণ এই যে, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত লোক বা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের লোকেরাই এই ধরণের ধার নেয়। তাদের ঠকান' সহজ। আর, আর একটা কারণ এই যে, এই ধরণের কারবারে, বন্ধকী জিনিষের হেপাজৎ করা, এবং সুদ কষা, হিসাব রাখা, দফায় দফায় শোধ নেওয়া প্রভৃতি কাজে যথেষ্ট সময় দিতে হয় ও পরিশ্রম ক'রতে হয়। সুদের খানিকটা অংশ আসলে এই কাজের মজুরী। সুদের হার ও ঋণের সর্ত্ত, কতকটা বিশ্বাসের উপরও নির্ভর করে। লোকে, যত সহজ সর্ত্তে ও যত কম সুদে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের এবং পরিচিত লোকদের ধার দিতে রাজী হয়, অপরিচিত লোক বা দূরের লোককে তা দেয় না। সহরের ধনী, গ্রামের চাষীকে সহজে ধার দেয় না। তাকে প্রধানতঃ গ্রামের মহাজনের ওপরই নির্ভর ক'রতে হয়। আসলে, টাকার বাজারকে ঠিক একলপ্তা একটা বাজার বলা যায় না। বিভিন্ন এলাকার এবং বিভিন্ন রকম ঋণের জন্য অল্পবিস্তর এক একটি স্বতন্ত্র বাজার আছে দেখা যায়। অর্থাৎ, এক বাজারের যোগানের ঘাটতি, অন্য বাজার থেকে টাকা এনে সহজে মেটান যায় না। টাকার চলাচলে কিছু কিছু বাধা থাকে। যারা হুণ্ডির কাজ করে, তারা জমি বন্ধকীর কাজ ক'রতে চায় না, বা ক'রতে ভরসা পায় না। যারা জমি-বন্ধকীর কাজ করে, তারা হুণ্ডির কাজ জানে না। যারা সোণা রূপা প্রভৃতি বাঁধা রেখে টাকা ধার দেয়, তারা অন্য কাজে নামতে চায় না। আবার, চাষীর প্রয়োজন যারা মেটায়, অর্থাৎ গ্রামের মহাজন, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (Co-operative Bank), ল্যাণ্ডমর্টগেজ ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Bank) প্রভৃতি, তারা অন্য কাজে হাত দেয় না। অবশ্য বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকে। এবং রিসার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের মধ্যে যোগাযোগও আছে। কিন্তু কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকেই। এবং এ একটা কারণ, যে জন্য সুদের তারতম্য থাকে।

(৩)

ঋণের চাহিদা

একটা সময় ছিল যখন ঋণের চাহিদা আসৃত, প্রধানতঃ বিপন্ন লোকেদের কাছ থেকে, যারা অপ্রত্যাশিত কোন কারণে ধার ক'রতে বাধ্য হ'ত। এইজন্য দেখতে পাওয়া যায়, সেকালে প্রায় সকল দেশেই সুদ নেওয়াটা একটা গর্হিত কাজ ব'লে গণ্য হ'ত। আর ঋণ নিত, অমিতব্যয়ী বা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোকেরা, যাদের কাছে সদ্যভোগের আকর্ষণ এত বেশী যে তারা ভবিষ্যতে যে আয় হবে, সেটা এখনই খরচ ক'রে ফেলতে চায়; তাতে যে ভবিষ্যতে কষ্ট পেতে হবে, সে চৈতন্য তাদের থাকে না। এ ছাড়া, রাজা রাজড়ারা, যুদ্ধ বিগ্রহ করবার জন্য বড় বড় ধনীদের কাছ থেকে ঋণ নিত। এই সব ঋণের কোনটাই

দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির কাজে লাগত না। বরঞ্চ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এতে সম্পদের অপচয় হ'ত।

এখনকার কালেও এই ধরণের ঋণ নেওয়া হয়। এবং যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য সরকারী ঋণের পরিমাণ, আজকাল আগেকার চেয়ে অনেক বেশী ত' কম নয়। কিন্তু, প্রধানতঃ যে-উদ্দেশ্যে আজকাল ঋণ নেওয়া হয় সেটি হচ্ছে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি। ঋণের টাকা এই সব কাজে মূলধন হিসাবে খাটান' হয়।

মূলধনের টাকা কি কি উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়, এবং তার ফলে কি সব ধরণের উপকার পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এই উপকার পাওয়া যায় ব'লেই লোকে সুদ দিতে রাজী হয়।

উপকারটা আসলে সময় পাওয়ার উপকার। দোকানদার বেশী মাল মজুত ক'রতে পারলে লাভ বেশী ক'রতে পারে। হাতে টাকা না থাকলে, সে ধারের টাকা দিয়ে এই কাজ করে। পরে, অর্থাৎ মাল বিক্রী হ'যে গেলে, তার হাতে যথেষ্ট টাকা আসে। কিন্তু তার দরকার, এখন। এই যে টাকাটা আগে হাতে পাওয়া, এইটেই আসলে ঋণ করায় উপকার। এর জন্য তার লাভ বেশী হয়; অতএব এই বাড়্তি লাভের খানিকটা অংশ সুদ হিসাবে উত্তমর্ণকে দেওয়া পোষায়। যন্ত্র-পাতির সাহায্যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাল তৈরী ক'রলে, কম খরচে বেশী দামের মাল তৈরী হয়। কিন্তু এতে সময় লাগে। মাল বিক্রী করার টাকা থেকে এ সব কাজের খরচ মেটান যায় না। কারণ সে টাকা আসবে, পরে। কিন্তু খরচ ক'রতে হবে, এখনই। অতএব এই সব কাজের জন্য টাকা ধার করা মানে, আসলে সময় কেনা। সুদ হচ্ছে, এই সময়ের দাম। খাল কেটে চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যায়। তাতে ফসল বেশী হয়। কিন্তু সে বাড়্তি ফসল আসবে, পরে। এবং তাও এক বৎসরে নয়; অনেক কাল ধ'রে প্রত্যেক বৎসরেই বাড়্তি ফসল পাওয়া যাবে। খাল কাটার খরচটা কিন্তু আগে থাকতেই ক'রতে হবে। যদি এই উদ্দেশ্যে ধার করা হয়, তা হ'লে উপকারটা আসলে সময় পাওয়ার উপকার। সমস্ত টাকাটাই বাড়্তি ফসলের দাম থেকে দফায় দফায় শোধ দেওয়া যাবে; উপরন্তু কিছু সুদও দেওয়া পোষাবে। যারা ধার ক'রে বাড়ী তৈরী করে, তাদের কথাও এই একই। যদি টাকা জমিয়ে ক'রতে হয়, তা' হ'লে হয়ত দশ বৎসর অপেক্ষা ক'রতে হয়। ধার পাওয়া গেলে এই সময়টা বেঁচে যায়। এই উপকারের জন্য লোকে সুদ দিতে রাজী হয়। আজকাল, বাড়ী, মোটর-গাড়ী, মোটর-বাস, 'রিফ্রিজারেটর' (Refrigerator) সেলাইএর কল প্রভৃতি নানা জিনিষ 'Hire-purchase system' বা দফায় দফায় দাম দেওয়ার সর্ত্তে বিক্রয় হয়। তাতে নগদ দামের চেয়ে কিছু বেশী পড়ে। এ সব

জিনিষের ব্যবহার একদিনে ফুরোয় না ; ব্যবহার শেষ ক'রতে অনেক দিন লাগে। দফায় দফায় যে টাকা দিতে হয়, তার একটা অংশ দাম বাবদ, ও আর একটা অংশ সুদ বাবদ্, অর্থাৎ দেরীতে দাম দিতে পাওয়ার মূল্য বাবদ্।

ঋণের চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করে সুদের ওপর। সুদের হার বেশী হ'লে লোকে কম ঋণ নেয়। এই হার যত ক'মতে থাকে, ঋণের পরিমাণও তত বাড়্তে থাকে। কারণ, যে অভাব দূর করবার জন্য লোকে ঋণ নেয়, তার তীব্রতা বরাবর সমান থাকে না। কিছু ঋণ নেবার পর এই তীব্রতা কিছু হ্রাস পায়। এবং ঋণের পরিমাণ যত বাড়্তে থাকে, অভাববোধও তত ক্ষীণ হ'তে থাকে ; অতএব আরও ঋণ নেওয়ার আকিঞ্চণও তত ক'মতে থাকে। বাজারে ঋণের যোগান যত বেশী থাকে, তত কম সুদে টাকা ছাড়্তে হয়। অন্যথায়, সব টাকাটুকু খাটাবার সুযোগ পাওয়া যায় না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আজকাল ঋণ নেওয়া হয়, প্রধানতঃ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন হিসাবে খাটাবার জন্য। যত বেশী মূলধন প্রয়োগ করা যায়, উপকারও তত বেশী পাওয়া যায়, অর্থাৎ লাভও তত বেশী হয়। কিন্তু সমান অনুপাতে নয়। মূলধনের পরিমাণ যেমন বাড়ান' হ'তে থাকে, তার প্রান্তিক সার্থকতা তেমনি ক'মতে থাকে। সুদের হার যতক্ষণ এই প্রান্তিক সার্থকতার কম থাক্বে, ততক্ষণ মূলধনের প্রয়োগ বাড়ান' হ'তে থাক্বে। যখন সমান হবে, তখন আর বেশী মূলধন প্রয়োগ করা পোষাবে না। অতএব সব সময়েই সুদের হারের সঙ্গে মূলধনের প্রান্তিক সার্থকতার সমতা আন্বার চেষ্টা চল্বে। সুদ বেশী হ'লে, মূলধন কম প্রয়োগ করা হবে ; অর্থাৎ ঋণ কম নেওয়া হবে। সুদ যত ক'মতে থাক্বে, ঋণের চাহিদার পরিমাণও তত বাড়্তে থাক্বে।

(৪)

সুদের হার

সুদের হার কি ভাবে স্থির হয়? ঋণের যোগান সম্বন্ধে আলোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচি যে সুদের হার কম থাক্লে ঋণের যোগান কম থাকে, এবং সুদের হার যত বেশী হয় এই যোগানও তত বেশী হয়। ঋণের চাহিদার ক্ষেত্রে আমরা দেখিছি যে, সুদের হার বেশী হ'লে লোকে কম ঋণ নেয় ; এবং যত ক'মতে থাকে, ঋণের চাহিদার পরিমাণও তত বাড়্তে থাকে। যদি সুদের হার এত কম থাকে যে ঋণের যোগানের চেয়ে ঋণের চাহিদার পরিমাণ বেশী হয়, তা হ'লে ঋণ নেবার জন্য লোকেদের মধ্যে রেষারেষি চ'লবে, এবং তার ফলে সুদের হার

চ'ড়তে থাকবে। যদি সুদের হার এত বেশী হয় যে চাহিদার চেয়ে যোগান বেশী হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে সব টাকাটা খাটাবার সুযোগ পাওয়া যাবে না। তখন যারা টাকা খাটাতে চায় তারা সুদের হার কমাতে থাকবে। সুদের হার যখন এমন সংখ্যায় এসে পৌঁছবে যেখানে, যতটুকু যোগান, ঠিক ততটুকুই চাহিদা থাকে, তখন সুদ বাড়াবার দিকেও চাপ থাকে না, কমাবার দিকেও চাপ থাকে না। অতএব দীর্ঘকালের হিসাবে, এই সংখ্যাতেই সুদের হার স্থির থাকবে।

মূলধন নিয়োগের সুযোগ সুবিধা বরাবর সমান থাকে না। যখন বদল হয়, তখন ঋণের চাহিদার ধারাও বদল হয়। অর্থাৎ, আগে যে সুদে যত টাকা ঋণ নেওয়া হ'ত, এখন সেই সুদে তার চেয়ে বেশী বা কম নেওয়া হ'তে থাকবে। মূলধন নিয়োগের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ, মূলধনের প্রান্তিক সার্থকতা বৃদ্ধি পাওয়া। নানা কারণে এই প্রান্তিক সার্থকতা বৃদ্ধি পেতে পারে। একটি কারণ, নূতন আবিষ্কার, যেমন, ষ্টীম এঞ্জিন, অয়েল-এঞ্জিন, পেট্রোল এঞ্জিন, ইলেক্ট্রো মোটর, রেলগাড়ী, ষ্টীমার, মোটর গাড়ী, এয়ারোপ্লেন, টেলিফোন, বেতার-যন্ত্র ইত্যাদি। প্রত্যেকটি আবিষ্কারের ফলে মূলধন নিয়োগের সুযোগ বেড়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঋণের চাহিদা বেড়েচে। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব দুর্ঘটনার ফলে যদি দেশে ব্যাপক বিত্ত-হানি ঘটে, ত হ'লে যথাসম্ভব কম সময়ে ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা চলতে থাকবে। অতএব সে ক্ষেত্রেও মূলধনের প্রান্তিক সার্থকতা বৃদ্ধি পায়। কখন কখন, কিছুদিন বাজার ভাল যাওয়ার ফলে ব্যবসায়ী-মহলে একটা বিশ্বাস জন্মায় যে জিনিষপত্রের দাম ক্রমশঃই বেড়ে চ'লবে, এবং কারবার যত বাড়ান' যাবে লাভও তত বেশী হ'তে থাকবে। তখন তারা বেশী বেশী মাল তৈরী করবার জন্য ও মজুত করবার জন্য বেশী বেশী টাকা ধার ক'রতে থাকে। এতেও, সাময়িকভাবে সুদের হার বাড়ে। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, যে দেশে লোকসংখ্যা বাড়চে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হচ্ছে সে দেশে মূলধনের প্রান্তিক সার্থকতা বাড়তে থাকে। অন্যপক্ষে, যে দেশে জন-সংখ্যা স্থির আছে বা কমছে, বা ব্যবসা বাণিজ্যে নানা রকম বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, সে দেশে মূলধনের প্রান্তিক সার্থকতা কমতে থাকে।

ঋণের যোগানের ধারাও বরাবর সমান থাকে না। কারণ, লোকের ধার দেবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কতকটা দেশের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যখন ব্যবসা বাণিজ্য ভাল চলে, অনেক কারবারে বেশী বেশী লাভ হ'তে থাকে এবং শেয়ার বাজারে বেচা-কেনা ভাল চলে, তখন লোকের টাকা ধার দেবার সাহস বাড়ে। ফলে, ঋণের যোগান বাড়ে; অর্থাৎ আগে যে যে সুদে যে যে পরিমাণ টাকা ধার পাওয়া যেত, এখন সেই সেই সুদে তার চেয়ে বেশী ধার পাওয়া যেতে থাকে। অন্যপক্ষে যখন বাজার মন্দা যায়, বিশেষতঃ যখন দেশে অর্থ-

সঙ্কট (crisis) উপস্থিত হয়, এবং চারিদিকে কারবার 'ফেল' হ'তে থাকে তখন লোকের ধার দেওয়ার ভরসা কমে ; অর্থাৎ ঋণের যোগান কমে। অনেক সময়ে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দেশের গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা ঋণের যোগান বাড়ায় ; কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে দেশের ব্যাঙ্কগুলি একযোগে মুক্তহস্তে ঋণ দিয়ে সাময়িক ভাবে ঋণের যোগান বাড়ায়। সময়ে সময়ে ঋণের যোগান অন্য কারণেও কমে। আজকাল আমাদের দেশে সরকারী কর্ম্মকর্তারা অনেকে আক্ষেপ করেন যে দেশের শিল্প-গঠনে ও শিল্প-প্রসারে দেশের লোক উপযুক্ত পরিমাণে টাকা খাটাতে বিমুখ হয়েছে। বড় বড় শিল্প-পতিদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে এরকম অবস্থার কারণ এই যে, কারবারের উপর অত্যধিক কর চাপান' হয়েছে, নানা রকম শিল্প-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্তে আনার নীতি ঘোষণা করায় লোকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হয়েছে, এবং নানা রকম সরকারী বিধি নিষেধের ফলে আজকাল কারবার করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আর একটি কুফল এই হয়েছে যে, একটি প্রকাণ্ড কালো-বাজার গ'ড়ে উঠেছে। অসাধু ধনী ব্যক্তিরা আজকাল ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা না খাটিয়ে যত বেশী পরিমাণে সম্ভব কাঁচা টাকা হাতে রাখতে চায় · যাতে সুযোগ পেলেই কালো বাজারে কেনা-বেচা করে, বেশী বেশী লাভ ক'রতে পারে।

(৫)

সুদের প্রয়োজন

সুদ দেওয়া নেওয়ার প্রথা থাকার কি কোন প্রয়োজন আছে ? অর্থাৎ এতে কি দেশের কোন উপকার হয় ? প্রশ্নটিকে দু দিক থেকে বিচার করা যায়। একটি যারা সুদ দেয়, তাদের দিক্ থেকে ; আর একটি, যারা সুদ নেয়, তাদের দিক থেকে।

ঋণের জন্য যদি সুদ দিতে না হ'ত, তা হলে দেশের মূলধনের অপচয় নিবারণ করা সম্ভব হ'ত না। দেশে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যতটুকু, লোকে তার চেয়ে অনেক বেশী ঋণ নিতে চায়। যদি সুদ দিতে না হ'ত, তা হ'লে অনেক ক্ষেত্রে এমন ঘটত যে, যাদের দরকার অত্যন্ত বেশী তাদের ঋণ জুট্‌ল না, অথচ যাদের দরকার সামান্য, তারা ঋণ পেলে। এতে দেশের ক্ষতি। কারবারী লোকেরা যখন ঋণ নেয়, তখন তারা খতিয়ে দেখে যে ঋণ নেওয়া পোষায় কি না ; অর্থাৎ ঋণের টাকা কারবারে খাটিয়ে যে বাড়তি লাভ হবার সম্ভাবনা, তা থেকে ঋণের সুদ দিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে কি না। যে ক্ষেত্রে যত বেশী বাড়তি লাভ হবার সম্ভাবনা, সে ক্ষেত্রে তত বেশী সুদে টাকা ধার নেওয়া পোষায়। যে ব্যবসায়ে যত বেশী লাভ হয়, বুঝ্‌তে হবে, সেই ব্যবসায়ে চাহিদার অনুপাতে যোগান তত কম ; অতএব সেই ব্যবসায়ের তত বেশী প্রসার হওয়া দরকার ; অর্থাৎ সেই ব্যবসায়ে তত আগে নূতন মূলধন নিয়োগ করা দরকার। সুদ দেওয়ার

ব্যবস্থা থাকলে ঠিক্ এই কাজই হয়। এতে দেশের সঞ্চিত অর্থের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার হয়। এই কাজের জন্য সুদ দেওয়ার ব্যবস্থার উপযোগিতা এত বেশী যে, যদি সোস্যালিষ্ট নীতি অনুসারে দেশের বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন অঙ্গ রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা হয়, তা হ'লেও, কোন্ উদ্দেশ্যে দেশের সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করা আগে দরকার, এবং কতখানি দরকার, বিচার করবার জন্য, সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক হবে।

সুদ যারা নেয়, তাদের এই টাকা পাওয়াটা কি সমর্থন করা যায়? এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা শক্ত। এর সপক্ষে একমাত্র যুক্তি এই যে, সুদের লোভ না থাকলে লোকে সঞ্চয় ক'রবে না। লোক কি কি উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করে, সে বিষয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে সঞ্চয়ের অনেকখানি অংশের সঙ্গে সুদের কোন সম্পর্ক নেই; অর্থাৎ, সুদ পাবার সম্ভাবনা না থাকলেও এই সঞ্চয় করা হ'ত। সঞ্চয়ের প্রান্তিক অংশ টুকু মাত্র সুদের উপর নির্ভর করে। অথচ সমস্তটার উপরই লোকে সুদ আদায় করে। অতএব এই আয়ের বেশীর ভাগটা জমির খাজনার মত উদ্বৃত্ত আয়, অর্থাৎ চেষ্টা-নিরপেক্ষ আয়। আবার, এই আয়ের প্রায় সবটুকুই দেশের মুষ্টিমেয় ধনী লোকদের ভাগ্যে জোটে। অতএব এরূপ মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, কাহাকেও সুদ নিতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এরকম ক'রলে অসুবিধা হবে এই, যে লোকে ধার দিতে চাইবে না। সঞ্চয় বিশেষ আট্‌কাবে না। কিন্তু লোকে সঞ্চয়ের টাকা নিজের কাছে রাখ্‌বে; কিংবা ব্যাঙ্কে 'কারেণ্ট একাউণ্টে (current account) রাখ্‌বে। দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্যে এ টাকা খাটাবার সুযোগ পাওয়া যাবে না। লোকের টাকা হাতছাড়া করার অনিচ্ছা অতিক্রম করবার জন্য, সুদের প্রয়োজন আছে। এই অনিচ্ছা অতিক্রম করবার অন্য কোন ব্যবস্থা যতদিন আবিষ্কার করা না হচ্ছে, ততদিন সঞ্চয়কারীকে সুদ নেবার অধিকার দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

পঞ্চম খণ্ড

দেশের বৈষয়িক জীবনে রাষ্ট্রের স্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

বাণিজ্য-চক্র

দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বরাবর সমান যায় না। কিছুদিন বেশ ভাল চলে। তারপর মন্দা পড়ে। তারপর আবার সুদিন আসে। এইভাবে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে। যখন সুদিন আসে তখন সমস্ত কারবারে বেশী বেশী লাভ হ'তে থাকে; জিনিষ পত্রের দাম বাড়তে থাকে, নূতন নূতন কারবারের পত্তন হ'তে থাকে, ও পুরোনো কারবারের প্রসার হ'তে থাকে, আর বেকারের সংখ্যা উত্তরোত্তর ক'মতে থাকে। কিন্তু এ ধারা বরাবর বজায় থাকে না। যে কোন কারণেই হ'ক্, একটা চরম অবস্থায় পৌঁছিবার পর গতি উল্টে যায়। তখন ব্যবসায়ে লাভ কম্‌তে থাকে; দুটো একটা কারবার 'ফেল' হ'তে থাকে; জিনিষপত্রের দাম ক'মতে থাকে, ও বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু এ অবস্থাও বরাবর চলে না। একটা চরম অবস্থায় পৌঁছবার পর এমন একটা কিছু ঘটে, যার দরুণ আবার গতি উল্টে যায়, এবং উন্নতির পথে যাত্রা সুরু হয়। এই যে নিয়মিত উত্থান পতন, এর নাম দেওয়া হয়েছে 'Trade Cycle' বা বাণিজ্যচক্র। বাণিজ্যচক্রের বিশেষত্ব এই যে, উন্নতির সময় প্রায় সব কারবারের এক সঙ্গে উন্নতি হ'তে থাকে। আবার, অবনতির সময় প্রায় সব কারবারের একসঙ্গে অবনতি হ'তে থাকে। শুধু তাই নয়। যখন সুদিন পড়ে, তখন বিভিন্ন দেশে মোটামুটি একই সময়ে পড়ে; আবার যখন দুর্দ্দিন আসে, তখন বিভিন্ন দেশে মোটামুটি একই সময়ে আসে।

কেন এ রকম হয়? কেন বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন কারবারে অল্পবিস্তর একই সময়ে উন্নতি বা অবনতি হ'তে থাকে? আর কেনই বা, উন্নতির পর অবনতি, ও অবনতির পর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী ভাবে আসে?

এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত ন'ন। যে সমস্ত মত চালু আছে, এখন সংক্ষেপে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হবে।

অত্যাধিক যোগান (Over-production)

চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণই হ'ক, কি তৈরীখরচা ক'মে যাওয়ার দরুণই হ'ক, যখন কোন ভোগ্য সামগ্রীর বিক্রী বাড়ে, তখন ঐ সামগ্রী তৈরী করবার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনী সামগ্রী দরকার হয়, সাধারণতঃ সেই সব সামগ্রীর যোগান প্রয়োজনের

চেয়ে বেশী অনুপাতে বাড়ান' হ'য়ে থাকে। কারণ, আজকালকার নির্ম্মাণ-কৌশলই এ রকম যে, কোন জিনিষ তৈরী করায় অনেকগুলি স্বতন্ত্র ধাপ থাকে, এবং সবসমেত অনেকখানি সময় লাগে। সেই জন্য, যেমন যেমন চাহিদা বাড়ছে, ঠিক্ তার সঙ্গে তাল রেখে অল্প অল্প পরিমাণে যোগান বাড়ান' যায় না। বাড়াতে হ'লেই, একসঙ্গে অনেকখানি বাড়াতে হয়। আর, তার চেয়ে বড় কথা এই যে, কোথাও চাহিদায় কোন পরিবর্ত্তন ঘট্‌লে, সেখান থেকে যত পেছনের ধাপে যাওয়া যায়, সেখানে এই পরির্ত্তন তত বেশী গুণ হ'য়ে প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যাক্ যে, একটি কারখানায় যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়, প্রতি বৎসর তার শতকরা দশ ভাগ (১০%) বদ্‌লাতে হয়। এখন যদি, চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ, এই কারখানার ১০% প্রসার ক'রতে হয়, তা হলে যে সব কারখানায় ঐ সব যন্ত্রপাতি তৈরী হয় তাদেব ১০০% প্রসারের প্রয়োজন হয়। তার মানে ভোগ্য-সামগ্রীর যোগান যে হারে বাড়ান' হ'ল, তার দশগুণ বেশী হারে মূলধনী সামগ্রীর যোগান বাড়ান' হ'ল। অনুরূপ ভাবে, যখন ভোগ্য-সামগ্রীর চাহিদা কিছু কমে, তখন তার ধাক্কা বহুগুণ হ'য়ে মূলধনী সামগ্রীর কারবারগুলির ওপর এসে পড়ে। এ ছাড়া, উঠতি বাজারের সময়, যে সব কারবারে ভারী ও দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রপাতিব ব্যবহার হয় সেগুলিব প্রসার বড় বেশী রকম হ'য়ে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে অল্প অল্প পরিমাণে প্রসার করা সম্ভব নয়। অতএব যখনই ক'রতে হয়, একসঙ্গে অনেকখানি ক'বতে হয়। একবার এই সমস্ত যন্ত্র-পাতি ব'সে গেলে, পূরোদমে মাল তৈরীর কাজ চল্‌তে থাকে। কারণ, কম মাল তৈরী ক'রলে, মোট খরচেব বিশেষ কিছু সাশ্রয় হয় না। সেই কারণে, যখন বাজার পড়তে থাকে, তখন যোগান কমিয়ে বাজারের ধাত্ ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা বিশেষ হয না। ফলে, মন্দার অবস্থা বহুকাল ধ'রে চলে।

বাজার যখন উঠতে থাকে কি পড়তে থাকে, তখন বিভিন্ন কারবারে এবং বিভিন্ন শিল্প-প্রধান দেশগুলিতে কেন একই সঙ্গে হ'তে থাকে, এ প্রশ্নের উত্তরে দুরকম কারণের উল্লেখ করা হয় ;—

১। বিভিন্ন কারবার এবং বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল—একটা কারবারের যেটা কাঁচা মাল, অন্য কারবারের সেটা তৈরী মাল। অতএব এক কারবারের বিক্রী বাড়্‌লে, অন্যান্য কারবারেও বিক্রী বাড়্‌তে থাকে। তা ছাড়া, কোন একটি কারবারে ভাল সময় পড়লে, সেই কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের উপার্জ্জন বাড়ে। তারা তখন নানা রকম সামগ্রী বেশী ক'রে কিন্‌তে থাকে। ফলে, এই উন্নতির ধারা, বৈষয়িক জীবনের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপ ভাবে, যখন একটা ব্যবসায়ে মন্দা পড়ে তখন অন্যান্য জিনিষেরও বাজার গুটিয়ে আসে। বিভিন্ন দেশের মধ্যেও সম্পর্ক এই রকমের। রপ্তানির মালের বিক্রী বাড়্‌লে, আমদানী করবার সামর্থ্য বাড়ে। রপ্তানি কম'লে, আমদানীও

সঙ্গে সঙ্গে কম'তে বাধ্য। আবার আমদানী রপ্তানীর পরিমাণের ওপর দেশের অন্য অনেক ব্যবসায়ের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে।

২। অন্য কারণটি মানসিক। ব্যবসায়-জগতের কোন ক্ষেত্রে আশা বা আশঙ্কার মনোভাব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলে, সেই ভাব সমস্ত ব্যবসায়ীদের মনে বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তারা সকলেই একই ভাবে প্রণোদিত হ'য়ে কাজ ক'রতে আরম্ভ করে। কোন বিশেষ কারণে, যখন দুটি একটি কারবারে বেশী লাভ হ'তে থাকে, তখন সেই কারবারের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট লোকেরা স্বভাবতঃই, ভবিষ্যতে আরও বেশী লাভের আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, এবং নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেশী ঝুঁকি নিয়ে কারবার বাড়াতে থাকে। এই আশার মনোভাব সংক্রামক। অন্য ব্যবসায়ীরাও তখন মনে ক'রতে থাকে যে ব্যবসায় জগতের সর্ব্বত্র সুসময় আগতপ্রায়। তারা উৎসাহভরে বেশী ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসার প্রসার ক'রতে থাকে। বাজারে বেচা-কেনা ক্রমশঃই বাড়্‌তে থাকে, এবং জিনিষপত্রের দর চড়্‌তে থাকে। কিন্তু তাতে ব্যবসায়ীরা কোন উদ্বেগ অনুভব করে না। বরঞ্চ ভাবে যে দর আরও চড়্‌বে, এবং সেই আশায় আরও কর্ম্ম-তৎপর হ'তে থাকে। তারপর এমন একটা কিছু ঘটে যার ফলে এই অগ্রগতি থামা খেয়ে যায়। হয়ত কোন ব্যবসায়ে এত বেশী মাল তৈরী হচ্ছে যে লাভ রেখে সমস্তটুকু বিক্রী করা অসম্ভব, এবং সেই কারণে মাল হাতে জ'মে যাচ্ছে। কিংবা হয়ত, কোন বড় কারবারী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছে, এবং বাজারের দখল রাখ্‌বার জন্য দর কমিয়েছে। কিংবা হয়ত কোন বড় প্রতিষ্ঠান নিতান্ত আকস্মিক কারণে দেউলিয়া হয়েছে। এই ধরণের কোন কারণের ফলে, প্রথমটায় কতকগুলি লোকের মন উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে। ক্রমশঃ এই মনোভাব ছড়িয়ে প'ড়তে থাকে, এবং কিছুকালের মধ্যেই বাজারের সর্ব্বত্র একটা আশঙ্কার মনোভাব পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেককেই "সময় থাকৃতে সাবধান হই" এই চিন্তায় পেয়ে বসে। তখন হাতের মাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিক্রী ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা চলে; এবং নূতন মাল তৈরী বা মজুত করবার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হ'তে থাকে। বাজার ক্রমশঃই নিস্তেজ হ'তে থাকে। দর প'ড়তে থাকে; এবং ব্যাপক ভাবে লোক ছাঁটাই চ'ল্‌তে থাকে। এই ভাব বেশ কিছু কাল চলতে পারে। পরে, ক্রমশঃ মজুত মাল যখন যথেষ্ট ক'মে যায়, এবং দুটো একটা মালে টান ধ'রতে থাকে,-কিংবা হয়ত কোন নূতন আবিষ্কার কাজে লাগাবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন বাজারের কোন একটি অংশে আবার আশার লক্ষণ দেখা দেয়। তখন ক্রমশঃ আবার উন্নতির পথে যাত্রা সুরু হয়।

* পিগু (Pigou) সাহেব এই কারণটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

অত্যল্প চাহিদা (*Under consumption)

দেশে যত ভোগ্য সামগ্রী তৈরী হয়, তার সবটুকু উচিত দামে বিক্রী হবার মত জনসাধারণের হাতে পয়সা থাকে না। তার কারণ, দেশের আয়ের বড় বেশী অংশ মুষ্টিমেয় ধনী লোকদের হাতে গিয়ে পড়ে। তারা অবশ্য নিজেদের ভোগের জন্য যত খুসী খরচ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের হাতে যথেষ্ট টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। তারা এই টাকা সঞ্চয় না ক'রে পারে না; এবং এর বেশীর ভাগটা নানা কারবারে মূলধন হিসাবে খাটান' হয়। ফলে, ভোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ আরও বাড়্তে থাকে; কিন্তু তা কেনবার পয়সা জনসাধারণের হাতে আসে না। সেইজন্য চাহিদায় ঘাট্তি উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। যতদিন না সুদ, লাভ ও খাজনার হার কমিয়ে মজুরী ও মাহিনার হার বাড়ান' যায় ততদিন এ অবস্থার স্থায়ী প্রতিকার হ'তে পারে না।

এই মত সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা চলে যে এক এক সময়ে যে বাজারের উত্তরোত্তর উন্নতি হ'তে থাকে, সেটা কেন হয়, তার কোন সদুত্তর এই মতের মধ্যে পাওয়া যায় না। উপরন্তু, এই মতে বাজার মন্দা যাবার যে কারণের উল্লেখ করা হয়েছে, সেইটিই যদি একমাত্র কারণ হ'ত, তা হ'লে ভোগ্য সামগ্রীর দরই সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে তাড়াতাড়ি প'ড়্তে থাক্‌ত। আসলে কিন্তু দেখা যায়, মন্দার সময়, যন্ত্রপাতির ব্যবসায়, কি জাহাজ, রেলপথ কয়লার খনি প্রভৃতি ব্যবসায়ই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অত্যধিক বা অত্যল্প ঋণের যোগান।

বাণিজ্য-চক্রের সমস্যা আসলে, ব্যাঙ্কগুলি থেকে কখন কত পরিমাণে ঋণ দেওয়া হবে, সেইটি ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যা। †লোকে যা রোজগার করে তার খানিকটা অংশ, যে পারে, সঞ্চয় করে; অর্থাৎ, হয় নিজের কাছে রাখে, না হয় ব্যাঙ্কে জমা দেয়। বাকিটা জিনিষপত্র কিন্‌তে খরচ হয়। জমান' টাকারও একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ অন্য লোকেদের ধার দেওয়া হয়, এবং সে টাকাও শেষ পর্য্যন্ত জিনিষপত্র কেনার কাজেই খরচ হয়। এই সমগ্র টাকাটা মোট খরিদ্দারদের খরচ। অর্থাৎ এই টাকাটা, যত মাল তৈরী হয় তার চাহিদা। মোট চাহিদা = সমস্ত মালের মোট দাম। যতদিন এই মোট চাহিদার কোন ইতর বিশেষ না হয়, ততদিন বাজারের সহজ অবস্থা বজায় থাকে। এর ব্যতিক্রম হ'লে বাজারে নাড়া পড়ে।

ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা পড়ে, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা ধার দেওয়া যায়। যে ধার চায় তার নামে খাতায় কলমে 'ডিপজিট' (deposit) তুলে এই ধার দেওয়া হয়। এই

---

*হব্‌সন্ সাহেব (Hobson) এই মতের পক্ষপাতী।

†হ্বা ট্রি (Hawtrey) সাহেবের মত।

ডিপজিটের বলে লোকে চেক্ কাটতে পারে, এবং সেইভাবে মালপত্র কিন্‌তে পাবে ও দেনা শোধ করতে পারে। এই টাকার পেছনে কোন সঞ্চয় নেই ; অর্থাৎ এই টাকা কারও উপার্জ্জনের টাকা নয়। এ টাকা ব্যাঙ্কের সৃষ্টি করা বাড়তি টাকা। এবং এ টাকা যখন বাজারে ছাড়া হয় তখন মোট চাহিদা সেই পরিমাণে বাড়ে।

সুদের একটা হার আছে, যে হার বলবৎ থাক্‌লে, দেশে যতটুকু সঞ্চয় হয় ঠিক্ ততটুকু ঋণের চাহিদা হয় ; বেশীও নয়, কমও নয়। এই হার বজায় রাখ্‌তে পার্‌লে, বাজারের সহজ অবস্থাও বজায় থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি সব সময়েই বেশী ধার দেবার জন্য উগ্রীব হ'য়ে থাকে, এবং সুযোগ পেলেই উপরোক্ত হারের চেয়ে কম হারে ধার দিয়ে বেশী টাকা খাটাবার চেষ্টা করে। কম সুদে. টাকা পেলে ব্যাপারীদের বেশী মাল মজুত করবার সামর্থ্য হয়। তারা তখন বিভিন্ন কারখানায় বেশী মালের অর্ডার দিতে থাকে। কারখানাগুলিতে তখন বেশী মাল তৈরী করবার চেষ্টা চলে, এবং ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনমত টাকা ধার ক'রে এই বাড়তি খরচা মেটান' হয়। ক্রমশঃ এই সব বাড়তি টাকা, মাহিনা, মজুরী, খাজনা, লাভ প্রভৃতি আকারে সাধারণ লোকের হাতে এসে পড়ে। তারা জিনিষপত্র কেনার কাজে এই টাকা খরচ করে। ফলে, জিনিষপত্রের দাম বাড়তে থাকে। তার ফলে, আরও মালের অর্ডার পড়ে, আরও মাল তৈরী হ'তে থাকে, আরও ধার দেওয়া হ'তে থাকে, এবং আরও দর বাড়তে থাকে।

যদি দুটি একটি ব্যাঙ্ক নগদ্ মজুতের (Cash Reserve) অনুপাতে বড় বেশী ধার দেয়, তা হ'লে তারা অসুবিধায় পড়ে ; কারণ, 'ক্লিয়ারিং' এর (Clearing House, যেখানে ব্যাঙ্কগুলির পরস্পরের মধ্যে দৈনিক হিসাব নিকাশ হয়), পাওনা শোধ ক'রতে ক্রমশঃ হাত খালি হ'য়ে যেতে থাকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে রকম বড় হয় না। সব ব্যাঙ্কগুলি পরস্পরের সঙ্গে তাল রেখে একসঙ্গে ধার বাড়াতে থাকে। তাতে ক্লিয়ারিংএ কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। সেইজন্য ধার দেওয়ার পরিমাণ ক্রমশঃই বেড়ে চলে। কিন্তু তার পর এমন একটা অবস্থা আসে, যখন ব্যাঙ্কে যে সমস্ত লোক নগদ্ টাকা তুলতে আসে তাদের চাহিদা মেটান' দুষ্কর হ'য়ে ওঠে। তখন ব্যাঙ্কগুলি সাবধান হ'তে আরম্ভ করে। সুদের হার চড়িয়ে দেয় ; অধমর্ণদের ধার শোধ করবার জন্য পীড়াপীড়ি করে ; এবং নূতন ধার দিতে ইতস্ততঃ করে। তার ফলে ব্যাপারীরা ষ্টক্ (Stock) খালি ক'রতে আরম্ভ করে ও 'অর্ডার' কমিয়ে দেয়। কারখানাগুলিতেও কাজে ঢিলে পড়ে, ও লোক ছাঁটাই হ'তে থাকে। চতুর্দ্দিকে লোকের রোজগার ক'মতে থাকে, বাজার ক্রমশঃই নিস্তেজ হ'তে থাকে, এবং বেকারের সংখ্যা বাড়্‌তে থাকে। এইরকম অবস্থা বেশ কিছুকাল চল্‌তে পারে। তার পরে, আবার যখন ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা জ'মে যায়, এবং ভরসা ফিরে আসে, তখন আবার খোলা হাতে ধার দেওয়া আরম্ভ হয়, এবং বাজার উঠ্‌তি মুখে চল্‌তে সুরু করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত, বাজারের এই অত্যধিক ওঠা-নামার প্রতিকার করা। যখন ঋণ দেওয়ার পরিমাণ বড় বেশী বাড়ে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের সুদের হার চড়িয়ে, এবং খোলা হাতে সরকারী ঋণপত্র এবং অনুরূপ কাগজ বিক্রী করে, বাজারে টাকার যোগান কমাতে পারে। তেম্‌নি বাজারে ঋণের যোগানে টান প'ড়লে, সুদের হার কমিয়ে এবং খোলা হাতে ঋণপত্র ইত্যাদি কিনে বাজারে টাকার যোগান বাড়াতে পারে। সময় মত এই ব্যবস্থা নিলে বাজারের ওঠা-নামা কোন দিকেই বেশী দূর এগোতে পারে না।

আজকাল প্রায় সকলেই এ কথা মানেন যে, বাজার দর যখন অত্যধিক চ'ড়তে থাকে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপরোক্তভাবে হস্তক্ষেপের ফলে অবস্থার প্রতিকার হ'তে পারে। কিন্তু বাজার যখন নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপের ফলে বিশেষ কিছু যে সুবিধা হ'তে পারে, তা অনেকে মানেন না।

অত্যধিক বা অত্যল্প পরিমাণে নূতন মূলধন নিয়োগ।

কীন্‌স (Keynes) সাহেবের এই মত; এবং আজকাল অনেকেই এই মত সমর্থন করেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, কীন্‌স্ সাহেব ইংলণ্ড বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পপ্রধান দেশগুলির সমস্যার উপরই বিশেষ ক'রে মনোযোগ দিয়েছিলেন। এই দেশগুলির দুটি বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, এই দেশগুলিতে প্রতি বৎসর খুব বেশী পরিমাণে নূতন মূলধন কল কারখানায় নিয়োগ করা হয়; এবং মূলধনী সামগ্রী তৈরী করবার বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজের উপর অনেকের জীবিকা নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, এই সব দেশে ব্যাঙ্কের প্রাধান্য খুব বেশী; অর্থাৎ লোকে বেশীর ভাগ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখে, এবং বেশীর ভাগ দেনা পাওনা চেকের সাহায্যে মেটান' হয়।

কোন্ বৎসরে কত নূতন মূলধন নিয়োগ করা হবে, তা শিল্পপতিদের মতিগতির উপর নির্ভর করে। এক বৎসরের সঙ্গে অন্য বৎসরের তুলনা ক'রলে দেখা যায় যে এর পরিমাণে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে। নানা কারণে এ রকম হয়। নূতন মূলধন নিয়োগ, এখুনি না ক'রলে নয়, এরকম কদাচিৎ কখন হয়। সেইজন্য শিল্পপতিরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, এবং যখন লাভের আশা যথেষ্ট বেশী বলে মনে হয়, তখনই এ কাজে হাত দেয়। তারপর, ভারী ভারী যন্ত্রপাতি তৈরী, নূতন রেলপথ খোলা, জাহাজ নির্ম্মাণ, নূতন আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে কোন অভিনব শিল্পের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজে অনেক সময় লাগে ও অনেক খরচ পড়ে। সেইজন্য শেষ পর্য্যন্ত লাভ হবে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুবই শক্ত। এই সব কারণে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, বাজার যখন উঠছে তখন এই সব কারবারে নূতন মূলধন বেশী বেশী পরিমাণে নিয়োগ করা হয়; এবং বাজার যখন পড়ছে তখন ক্রমশঃই ক'মতে থাকে। বাজার মন্দার সময় এই সব কারবারেই বেকার-সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে।

সঞ্চয় (Savings) শব্দটি, কীন্‌স্ সাহেব একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। উপার্জ্জনের টাকা থেকে সদ্যভোগ্য দ্রব্যাদি কেনবার পর যা অবশিষ্ট থাকে, সেই সমস্ত টাকাটাকে, কীন্‌স্ সাহেব 'সঞ্চয়' ব'লে ধরেছেন। এ অর্থে, সঞ্চয়ের পরিমাণ, আর নিয়োগ করা নূতন মূলধনের পরিমাণ সব সময়েই সমান হবে। কারণ, যা কিছু মাল উৎপন্ন হয়, সেগুলি বিক্রী ক'রে যে টাকা পাওয়া যায়, সেই টাকা বিভিন্ন লোকের হাতে উপার্জ্জন হিসাবে পৌঁছায়। অতএব,—

সমগ্র উপার্জ্জন = সমগ্র পণ্যের মূল্য।

আবার, উৎপন্ন পণ্যের দুটি ভাগ। একটি সদ্যভোগ্য, অন্যটি মূলধনী বা গৌণ-ভোগ্য। এই মূলধনী সামগ্রীর মূল্য ব'লতে আসলে নূতন নিয়োগ করা মূলধনকেই বোঝায়। অতএব দাঁড়াল এই যে,—

সমগ্র উপার্জ্জন = সদ্যভোগ্য দ্রব্যাদি + সঞ্চয়, অন্যদিকে সমগ্র উপার্জ্জন = সদ্যভোগ্য দ্রব্যাদি + নূতন নিয়োগ করা মূলধন।

অতএব,

সঞ্চয়—নূতন নিয়োগ করা মূলধন।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই সাম্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? লোকের সঞ্চয়ের অভ্যাসের বিশেষ কিছু বদল হয় না। অথচ নিয়োগ করা নূতন মূলধনের পরিমাণের যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। তা হ'লে এ দুটির মধ্যে সাম্য কি ক'রে বজায় থাকে? এ প্রশ্নের যে উত্তর সহজে মনে আসে, সেটি হচ্ছে এই যে, সুদের হার বাড়িয়ে কমিয়ে এ দুটির মধ্যে সমতা বজায় রাখা হয়। মূলধনের চাহিদা কম হ'লে, সুদের হার কমিয়ে শিল্পপতিদের বেশী মূলধন নিয়োগ করবার প্রলোভন দেওয়া হয়; এবং মূলধনের চাহিদা বেশী হ'লে, সুদের হার বাড়িয়ে চাহিদার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আসলে তা হয় না। এত সহজ ভাবে যদি এই সাম্য রক্ষিত হ'ত, তা হ'লে বাজারের এত বেশী ওঠা-নামা হ'তে পারত না; অর্থাৎ, বাণিজ্য-চক্রের অস্তিত্ব থাকৃত না।

কীন্‌স্ সাহেবের সিদ্ধান্ত এই যে, উপার্জ্জনের উপর প্রতিক্রিয়ার ফলে এই সাম্য বজায় থাকে। বাড়তি মূলধন নিয়োগ ক'রলে দেশের উপার্জ্জন বাড়ে। এই বাড়তি উপার্জ্জন থেকে যে অংশ সঞ্চয় হয়, সেই বাড়্‌তি সঞ্চয়, বাড়্‌তি মূলধনের সঙ্গে ভ'জে যায়। অন্যদিকে, কম মূলধন নিয়োগ ক'রলে, দেশের উপার্জ্জন কমে। অতএব সঞ্চয়ও কমে। এই সঞ্চয়ের ঘাট্‌তি, মূলধন নিয়োগের ঘাটতির সঙ্গে ভ'জে যায়।

যে পরিমাণ বাড়তি মূলধন নিয়োগ করা হয়, দেশের উপার্জ্জন তার কয়েকগুণ বেশী বাড়ে। কারণ একটা কারবারের প্রসারের ফলে অন্য অনেক কারবারের প্রসার হ'তে থাকে। মনে করা যাক, কোন দেশে একটি নূতন রেলপথ খোলবার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে

টাকা ধার ক'রে কাজ আরম্ভ হ'ল। ফলে, অনেক লোকের চাকুরী হ'ল, এবং লোহা, কাঠ, ইঁট, সিমেণ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন কারবারের বিক্রী বাড়তে লাগল। ফলে, তাদের আয় বাড়তে লাগল, এবং সেই আয় নানা লোকের হাতে উপার্জ্জন হিসাবে পৌঁছাতে লাগল। তারা আবার সেই বাড়তি আয়ের সাহায্যে নানা রকমের ব্যবহারের জিনিষ বেশী বেশী পরিমাণে কিন্‌তে লাগল। তার ফলে এই সব ব্যবসায়ের প্রসার হ'তে থাক্‌বে, এবং দেশের উপার্জ্জন আরও বাড়তে থাক্‌বে। এই ধারা কি অনির্দ্দিষ্ট কাল ধ'রে চল্‌বে? কীন্‌স্‌ সাহেব বলেছেন, তা নয়। যেমন উপার্জ্জন বাড়চে, সঙ্গে সঙ্গে লোকের অভ্যাস অনুযায়ী তার একটি অংশ সঞ্চয় হচ্ছে। এই সঞ্চয়ের পবিমাণ যখন বাড়তি মূলধনের সমান হবে, তখন বাজার আবার একটি নূতন ধাপে স্থিতিশীল হবে। বাড়তি উপার্জ্জন, বাড়তি মূলধনের যতগুণ বেশী হয়, কীন্‌স্ সাহেব তার নাম দিয়েছেন 'Multiplier' বা গুণক-সংখ্যা। কোন্ দেশের গুণক-সংখ্যা কত হবে, তা নির্ভর করে সেই দেশের শিল্পোন্নতি ও সঞ্চয়ের অভ্যাসের উপর। কোন দেশের গুণক সংখ্যা যদি '৩' হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে যে সে দেশে ১০০০ পাউণ্ড বাড়তি মূলধন নিয়োগ কর্‌লে, বাড়তি উপার্জ্জনেব পবিমাণ হবে ৩০০০ পাউণ্ড। এর মধ্যে ১০০০ পাউণ্ড সঞ্চয় হবে, এবং সদ্যভোগ্য দ্রব্যাদির চাহিদা ২০০০ পাউণ্ড পরিমাণে স্থায়ীভাবে বাড়বে।

অন্যপক্ষে, নূতন মূলধনের নিযোগ যদি ১০০০ পাউণ্ড কম হয়, তা' হ'লে এই ঘাটতি ভজাবার জন্য ১০০০ পাউণ্ড কম সঞ্চয় হওয়া চাই। ব্যবসায়ের ক্ষতি ও বেকার সংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দেশের উপার্জ্জন ৩০০০ পাউণ্ড ক'মলে, তবে এই ঘাটতি ভজে। বাণিজ্য-চক্রের নিম্নগতির সময় এই ধরণের ব্যাপারই ঘটে।

তা হ'লে বোঝা গেল যে উপার্জ্জনের পরিমাণ, আর মূলধন নিয়োগের পরিমাণের মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ রয়েছে। এর থেকে, বাণিজ্য-চক্রের কুফলের কি প্রতিকার হ'তে পারে, তার একটা সন্ধান পাওয়া যায়।

যখন মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, তখন অনেক লোকের কাজ জোটে, নানা রকম কারবারের প্রসার হয়, এবং লোকের হাতে বেশী বেশী পয়সা আসে। ফলে, জিনিষ-পত্রের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু প্রথমটায় দর বাড়ে না; কারণ, সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণও বাড়ে। কিন্তু তার পর এমন একটা সময় আসে, যখন বেকার ব'ল্‌তে বড় কেউ আর অবশিষ্ট থাকে না; এবং দেশে বিত্ত-সৃষ্টির যা কিছু আয়োজন আছে তার সবটুকু কাজে লাগান হ'য়ে যায়। এ অবস্থায় যদি মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বেড়ে চলে, তা হ'লে মুদ্রা-স্ফীতির কুফলগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। তখন কাঁচা মাল, আর কাজ করবার লোক নিয়ে, কারবারে কারবারে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়; জিনিষপত্রের দর চড়তে থাকে; এবং পেছু পেছু মজুরীও চড়তে থাকে। টাকার অঙ্কে দেশের উপার্জ্জন বেড়ে চলে বটে; কিন্তু সম্পদের হিসাবে কিছুই বাড়ে না। বরঞ্চ গৌন-ভোগ্য দ্রব্যাদির কারবারে

বেশী বেশী কাঁচা মাল ও শ্রম-শক্তি টেনে নেওয়ার দরুণ সদ্য-ভোগ্য দ্রব্যাদির যোগানে ঘাট্‌তি পড়্‌তে থাকে। লোকের, আগে জীবন-যাত্রার মান যা ছিল, এখন বাধ্য হ'য়ে তার চেয়ে নীচু ক'রতে হয়। আমরা আগে দেখেছি যে বাড়তি মূলধন নিয়োগ ক'রলে, বাড়্‌তি সঞ্চয় দিয়ে তা ভ'রে যায়। এও এক রকমের সঞ্চয়, কারণ আগে লোকে যে পরিমাণ সদ্য ভোগ্য জিনিষপত্র কিন্‌ত এখন তার চেয়ে কম কিন্‌ছে। তবে এ সঞ্চয় ইচ্ছাকৃত নয় এর নাম দেওয়া হয়েছে 'Forced Saving' বা জবরদস্তি সঞ্চয়। মূলধন নিয়োগের পরিমাণ যত বেশী হ'তে থাকে, জিনিষপত্রের দর তত চড়তে থাকে, এবং সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা তত বাড়্‌তে থাকে। যদি ব্যাঙ্কগুলি সময় থাকতে সুদের হার চড়িয়ে মূলধন নিয়োগ নিয়ন্ত্রিত করে, তা হ'লে আর এ অবস্থা হ'তে পারে না।

বাণিজ্য চক্রের নিম্নগতি রোধ করতে হ'লে, লোকের উপার্জন বাড়ান দরকার। সুদের হার কমিয়ে দিলে ব্যাপারী ও শিল্পপতির বেশী মূলধন নিয়োগ ক'রতে পারে, এবং তা হ'লে লোকের উপার্জ্জন বাড়তে পারে। কিন্তু সব সময়ে এই উপায় দ্বারা প্রতিকার না হ'তে পারে কারণ, কম সুদে ধার পেলেও, লাভের আশা না থাক্‌লে ব্যবসায়ীরা বাড়তি মূলধন খাটাতে অগ্রসর হয় না। এ রকম অবস্থায় সরকারের উচিত, রাস্তা ঘাট তৈরী, রেলপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কাজ হাতে দেওয়া, যাতে লোকের হাতে বেশী পয়সা আসে। এই পয়সা যখন বাজারে ছড়িয়ে প'ড়তে থাক্‌বে, তখন বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতি থামা খেয়ে যাবে।

---

* It would be relevant to quote here the following passages from the "Economic Report of the President" to the American Congress in Jan, 1947, to show the degree of importance that he and his 'Council of Economic Advisers attach to the above policy of 'Public Works as an effective remedy for cyclical fluctuations 'There are valid reasons why public works cannot accomplish as much towards stabilisation as some have supposed. In the event of severe unemployment they cannot be generated in sufficient volume to avoid supplementation by other means. In a period of mild recession they cannot be generated on time to be fully effective If the tempo of public works program is geared to some business index, the reserves accumulated for emergency use may be used after they are needed and they then become inflationery rather than stabilising Even if advance preparations, are made through the completion of plans, the acquisition of sites, and the accumulation of funds, there will be an inevitable time-lag between calling the emergency program into operation and the employment of men in the job

"These comments are substantiated by experience. The chief lesson to be learned is that no one device constitutes an adequate safeguard against recession, or an adequate fighting apparatus against depression All useful devices need to be thought through in advance and blended into a consistent program

"Instead of regarding public works as the first and foremost device to restore our whole economy when it sags, we should attempt to stabilize Public works construction according to our long term needs. Increasing regularisation of public works expenditures at all levels of governmental activity over a long period will offer an assurance of a demand for capital, of a market for materials and equipment, and of a field of employment which will assist in stabilising that segment of the business world. This approach to public works will have the further advantage of appraising their size and character in terms of our total national needs

"This policy by no means forestalls the expansion of public works as a sustaining factor if recessions or depressions should unfortunately develop despite our best efforts to avoid them The very procedure necessary for long term regularised expenditure will pave the way for more effective emergency use than in the past."

Economic Planning by S. E. Harris PP 105-6.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রের আয় ব্যয়

(১)

রাষ্ট্র-পরিচালনা ব্যয়-সাপেক্ষ।

রাজ-কার্য্য পরিচালনায় খরচ আছে। এই খরচের পরিমাণ কত হবে, তা নির্ভর করে কত রকমের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, তার ওপর। আগে, গভর্ণমেণ্টের কাজ অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হ'ত। বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষা করা, দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এবং আইন আদালতের ব্যবস্থা করা, এ ছাড়া গভর্ণমেণ্টের আর বড় বিশেষ কিছু যে করবার আছে, লোকে তা মনে করত না। এখন কিন্তু, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, লোকের মত বদল হয়ে গেছে। এখন লোকে চায় "ওয়েলফেয়ার ষ্টেট" (Welfare state) বা মঙ্গল-বিধাতা রাষ্ট্র ; তার মানে দেশের সব রকমের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার করার দায় সরকারের. এবং দেশের আর্থিক, সামাজিক বা নৈতিক উন্নতির জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয়, তারও ব্যবস্থা করা উচিত সরকারের, এই বিশ্বাস এখন, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, সকল শ্রেণীর মধ্যে অতি ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা সোস্যালিষ্ট-পন্থী তারা দেশের বৈষয়িক জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গ গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনার পক্ষপাতী ; কারণ তা না হলে দেশের সর্ব্বাধিক উন্নতিও হ'তে পারে না, আর ধনীর দ্বারা দরিদ্রের শোষণও নিবারণ করা যায় না। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেশগুলিতে আজকাল, রাজ-কার্য্য পরিচালনায় অনেকাংশে সোস্যালিজমের আদর্শ অনুসরণ করা হয়। সেই জন্য দেখা যায়, ঐ সব দেশের বাৎসরিক 'বাজেটে' (Budget—আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব) বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বড় বড় দেশগুলির মধ্যে আজকাল এক আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রেই ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার আদর বিশেষ পরিমাণে বজায় আছে।

---

* The American policy seems to be changing, as is evidenced by the following passage in 'The Employment Act' of 1946—The Congress hereby declares that it is the continuing policy and responsibility of the federal government to use all practicable means consistent with its needs and obligations and other essential conditions of national policy...to coordinate and utilise all it plans functions and resources for the purpose of creating and maintaining...conditions under which there will be afforded useful employment oportunities, including self-employment, for those able, willing, and seeking to work, and to promote maximum employment, production, and purchasing power."

"Economic Planning" by S. E. Harris P. 112

কিন্তু সেখানেও, দেশের বৈষয়িক উন্নতির উদ্দেশ্যে, সরকারী তহবিল থেকে কম খরচ করা হয় না। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে শুধু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণার কাজের জন্য সেখানে গড়ে বৎসরে ৫০ কোটি ডলার খরচ হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের এক আইন অনুসারে (American Merchant Marine Act. 1936) সেখানে যত মালবাহী জাহাজ তৈরী হয়, তার খরচের অর্দ্ধেক সরকারী তহবিল থেকে দেওয়া হয়। ভারত শাসন-বিধির একটি আলাদা পরিচ্ছেদে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেকগুলি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলি পুরোপুরি পালন ক'রতে হ'লে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। একমাত্র নদী উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতেই প্রায় ১২১০ কোটি টাকা খরচ করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই টাকা ৫ বছরে খরচ করবার কথা আছে, তার মানে বছরে প্রায় ২৪০ কোটি টাকা করে খরচ হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আজকাল রাজ-কার্য্য পরিচালনায় অনেক টাকার দরকার হয়। এই টাকা প্রধানতঃ, দেশের ওপর টেক্স চাপিয়ে তোলা হয়। অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য, বাজার থেকে ঋণ তুলেও খরচ চালান' হয়। সে ক্ষেত্রে, বাৎসরিক বাজেটে সুদ দেবার জন্য টাকা বরাদ্দ করা থাকে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আসলটাও যাতে ধীরে ধীরে শোধ হয়ে যায়, তারও ব্যবস্থা থাকে। সাধারণ লোকের পক্ষে এভাবে জমা-খরচ মেলান' সম্ভব নয়। কোন গৃহস্থ কি কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছামত আয় বাড়াতে পারে না। অতএব তাদের আয়ের বশে ব্যয়ের সঙ্কল্প ক'রতে হয়। গভর্ণমেণ্টকেও, আয়ের দিক্‌টায় যে মোটে নজর দিতে হয় না, তা নয়। কারণ, টেক্স চাপিয়ে যা টাকা তোলা যায়, তারও একটা সীমা আছে। তা ছাড়া, কোন গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট টেক্সোর বোঝা এত বাড়াতে ভরসা পায় না, যাতে লোকে অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট হ'য়ে পড়ে। তৎ সত্ত্বেও একথা মোটের উপর ঠিক্ যে, সরকারী বাজেট তৈরীর সময় আগে খরচের পরিমাণ স্থির করা হয়, এবং পরে সেই অনুযায়ী টাকা তোলার ব্যবস্থা করা হয়।

(২)

সরকারী আয়

যে যে সূত্রে গভর্ণমেণ্টের হাতে টাকা আসে, সেগুলি মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় :—

১। সরকারী সম্পত্তির আয় ; যেমন, খাসমহল জমির খাজনা।

২। সরকারী কারবারের আদায় ; যেমন, রেলের ভাড়া ও মাশুল ; পোষ্ট-কার্ড বা খামের দাম, ইত্যাদি।

৩। সরকারী কাজের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত লোকেদের কাছ থেকে 'ফি' (Fee) আদায়; যেমন দলিল রেজিষ্ট্রীর ফি, মামলা রুজু করবার ফি, দরখাস্ত পেশ করবার ফি, ইত্যাদি।

৪। জরিমানা আদায়। এ টাকা মুখ্যতঃ রাজস্ব তোল্‌বার উদ্দেশ্যে আদায় করা হয় না; অন্য কাজের আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে আদায় হয়। যেমন অপরাধীকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে অর্থদণ্ড ক'রলে, সেই পরিমাণ টাকা আদায় হয়।

৫। টেক্স আদায়। সরকারী কাজের খরচ মেটাবার জন্য, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি নিজের সম্পত্তি বা আয় থেকে গভর্ণমেণ্টকে যে আদায় দিতে বাধ্য হয়, তাকে 'টেক্স' (Tax) বলে। রেলে না চড়্‌লে রেলের ভাড়া দিতে হয় না। চিঠি না লিখলে পোষ্ট-কার্ড বা খামের দাম দিতে হয় না। মামলা না ক'রলে মামলা রুজু করবার ফি দিতে হয় না। এ সব ক্ষেত্রে সরকারকে টাকা দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু টেক্স অবশ্য দেয়। যার ওপর কোন টেক্স চাপান' হয়, তাকে সে টেক্স দিতেই হয়। তার পক্ষে কিছু করা বা না করার ওপর এ দায় নির্ভর করে না। টেক্সের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কি উপকার পাওয়া গেল, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। রেলের মাশুল, কম মালের জন্য কম দিতে হয়, বেশী মালের জন্য বেশী দিতে হয়। এ হ'ল উপকারের মূল্য। অতএব যে পরিমাণে কাজ নেওয়া হয়, সেই পরিমাণে আদায় দিতে হয়। কিন্তু টেক্সের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। কোন লোককে টেক্স হিসাবে যে আদায় দিতে হয়, এবং গভর্ণমেণ্ট থাকার দরুণ সে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা ভোগ করে, এ দু'য়ের মধ্যে কোন পরিমাণগত সাম্য স্থাপন করবার চেষ্টা করা হয় না।

যার কাছ থেকে টেক্স আদায় করা হয়, টেক্সের প্রথম চাপ (Impact) তার ওপর পড়লেও অনেক ক্ষেত্রে সে এই চাপ অন্যত্র সরিয়ে দিতে পারে। যার ওপর শেষ চাপ (Incidence গিয়ে পড়ে, তাকেই আসলে টেক্সটা দিতে হয়। যেমন বিক্রয়-কর (Sales tax) প্রথমটায় দোকানদার দেয়। কিন্তু সে, জিনিষের দর বাড়িয়ে, সে খরচ পুষিয়ে নেয়। অতএব, আসলে এ টাকা খরিদ্দার দেয়।

আয় বা স্থাবর সম্পত্তির ওপর যে টেক্স চাপান' হয়, কিংবা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া ধন-সম্পদের ওপর যে টেক্স চাপান' হয়, তাকে প্রত্যক্ষ টেক্স (Direct tax) বলে। কারণ এ সব ক্ষেত্রে বিধান-সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, টেক্সের প্রথম চাপ যার ওপর প'ড়বে, শেষ চাপও তার ওপর প'ড়বে। আমদানী শুল্ক বা ব্যবহারের জিনিষের ওপর যে টেক্স চাপান' হয় তাকে পরোক্ষ টেক্স (Indirect tax) বলে, কারণ, এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে টেক্সের বোঝা সরিয়ে দেওয়া হবে, এবং শেষ খরিদ্দার এই ভার বহন ক'রবে।

(৩)

টেক্স কি রকম হওয়া উচিত।

সুনির্ব্বাচিত টেক্সের চারিটি লক্ষণ—

১। টেক্স ন্যায়-সঙ্গত হওয়া উচিত; অর্থাৎ, টেক্সের বোঝা সকলের উপর সমান ভাবে চারিয়ে দেওয়া উচিত। তার মানে এ নয় যে, প্রত্যেকের কাছ থেকে সমান পরিমাণ টাকা আদায় করা উচিত, কারণ, সকলের সঙ্গতি সমান নয়। প্রত্যেকের দেয় পরিমাণ এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট করা উচিত, যাতে টেক্স দেওয়ার দরুণ সকলকে সমান কষ্ট স্বীকার ক'রতে হয়।

২। টেক্সের পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। যে আইন অনুসারে টেক্স আদায় করা হচ্ছে সেটি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত, এবং টেক্সের পরিমাণ হিসাব করা সহজ হওয়া উচিত, যাতে, যে লোক নিজে হ'তে আদায় দিতে চায়, সে সহজে বুঝ্তে পারে, কত দিতে হবে, কখন দিতে হবে, এবং কি আইনের জন্য দিতে হবে। টেক্স-আদায়কারী যখন খুসী টেক্স আদায় ক'রতে পারবে, এবং টেক্সের পরিমাণ নিজের খুসীমত ঠিক্ ক'রতে পারবে, এ ব্যবস্থা ভাল নয়। সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকের দেয় পরিমাণ স্থির হওয়া উচিত।

৩। যতটা সম্ভব, টেক্স আদায় দিতে লোকের অনাবশ্যক অসুবিধা ভোগ ক'রতে না হয়, যে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। পরোক্ষ টেক্স আদায় দিতে লোকের কোন অসুবিধা হয় না, কারণ জিনিষপত্র কেন্‌বার সময় দামের সঙ্গেই টেক্স দেওয়া হ'য়ে যায়, আলাদা করে দিতে হয় না।

৪। আদায়ের অনুপাতে আদায় করার খরচ বিশেষ বেশী না হয়, সে দিকেও নজর রাখা দরকার। কম আয়ের ওপর যে আয়-কর বসান' হয় না, এ একটা তার কারণ। কারণ, কম আয়ের লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। প্রত্যেকের আয় কত তা হিসাব করবার জন্য, এবং কেউ টেক্স ফাঁকি দিচ্ছে কি না তার খোঁজ রাখ্বার জন্য, অনেক খরচ ক'রে বহু সংখ্যক লোক নিযুক্ত রাখ্তে হবে; অথচ প্রত্যেকের কাছ থেকে অত্যন্ত কম আদায় হবে। ঐটুকু আদায়ের জন্য অত খরচ করা উচিত নয়। এ সম্পর্কে আরও একটি কথা বিবেচনা করবার আছে। এমন টেক্স বসান' উচিত নয়, যার ফলে, যে পরিমাণ টেক্স আদায় হয়, দেশের তার চেয়ে অনেক বেশী আর্থিক ক্ষতি হয়। সেইজন্য, যে সব শিল্পে কারবারের আয়তন বাড়ান'র

সঙ্গে সঙ্গে তৈরী-খরচা খুব তাড়াতাড়ি কমে, সে সব ক্ষেত্রে যত কম টেক্স চাপান' যায় ততই ভাল। অন্যদিকে, খুব দামী মোটর-গাড়ী কিংবা হীরা জহরৎ প্রভৃতি ধনীর বিলাসের সামগ্রীর ওপর উঁচুহারে টেক্স বসান'র সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কারণ, এ সব জিনিষ, লোকে ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্য কেনে। খুব উঁচু হারে টেক্স বসালে, ঐ সব জিনিষের দাম খুব বাড়ে। তাতে একদিকে ক্রেতার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয়; এবং অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট টাকা আদায় হয়। মদের ওপর উঁচু হারে টেক্স বসান'র সপক্ষেও তেমনি যথেষ্ট সুযুক্তি আছে। মদ বেশী খেলে লোকের স্বাস্থ্যহানি হয়। অতএব বেশী টেক্স বসিয়ে, দর উঁচিয়ে দিলে, খাওয়াও কমে, অথচ যথেষ্ট টাকাও আদায় হয়। *

টেক্স নির্ব্বাচন করবার সময়, কর্ত্তৃপক্ষকে এই চারিটি বিষয় ছাড়া, আরও দুটি বিষয়ে নজর দিতে হয়। টেক্স বসান'র মুখ্য উদ্দেশ্য টাকা তোলা। কাজেকাজেই, যে টেক্সর সাহায্যে বেশী টাকা তুলতে পারা যায়, এবং সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়, এমন টেক্সই অর্থ-সচিবেরা পছন্দ করেন। সেইজন্য তাঁরা নিত্য-ব্যবহার্য্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির উপর টেক্স বসান'র বিশেষ পক্ষপাতী। কারণ, টেক্সের ফলে দাম কিছু বাড়লে, এগুলির বিক্রী বিশেষ কমে না। ইংরাজের আমলে এ দেশে গভর্ণমেণ্ট যে নূনের টেক্স তুলে দিতে এত নারাজ ছিল, এইটিই তার আসল কারণ। অর্থ-সচিবকে আর যে বিষয়টি বিবেচনা ক'রতে হয়, সেটি হচ্ছে এই যে, টেক্সটি এমন হ'লে ভাল হয় যাতে, প্রয়োজন হ'লে টেক্সর হার একটু বাড়িয়ে যথেষ্ট বাড়্তি টাকা আদায় করা যায়। আয়-করের এই গুণটি বিশেষ ভাবে আছে। বেশী টাকা তোল্বার দরকার হ'লে, কেবলমাত্র টেক্সের হার বাড়িয়ে এ কাজ করা যায়; তার জন্য বাড়্তি খরচ করে, নূতন ব্যবস্থাও ক'রতে হয় না, বাড়্তি লোকও রাখ্তে হয় না।

সাধারণভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার খরচ তোলা ছাড়া, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও, কোন কোন ক্ষেত্রে টেক্স বসান' হয়। আমাদের দেশে নানা রকমের বিদেশী শিল্প-জাত দ্রব্যের উপর আমদানী-শুল্ক বসিয়ে, ঐ সব শিল্প যাতে এ দেশে ভাল ভাবে গ'ড়ে ওঠে, তার চেষ্টা করা হয়। ইস্পাৎ, সূতিবস্ত্র, কাগজ, চিনি, নূণ, দিয়াশলাই প্রভৃতি শিল্পগুলির উন্নতি প্রধানতঃ এই সংরক্ষণ নীতির ফলেই হয়েছে। বিলাতে ক্রমবর্দ্ধমান হারে

* চারিটি ছোট ছোট কথার সাহায্যে এই লক্ষণ কয়টি মনে রাখা যেতে পারে—
ন্যায্যতা, স্থিরতা, সুবিধা ও কম খরচ

আয়-কর ও মৃত্যুকর আদায় করার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশে ধন-বৈষম্য কমিয়ে দেওয়া*।

আনুপাতিক হার ও ক্রমবর্দ্ধমান হার টেক্স দিতে বাধ্য হওয়া মানেই কিছু ক্ষতি স্বীকার ক'রতে বাধ্য হওয়া। কার কাছ থেকে কত টাকা আদায় ক'রলে সকলের প্রতি সমান সুবিচার করা হয়, এ বিষয়ে দুটি মত আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে আনুপাতিক হারে টেক্স আদায় ক'রলেই সুবিচার হয়। অর্থাৎ, যার ১০০৲ টাকা আয় তার কাছ থেকে যদি ৫৲ টাকা আদায় করা হয়, তা হ'লে যার ২০০৲ টাকা আয় তার কাছ থেকে ১০৲ টাকা আদায় করা উচিত, যার ১০০০৲ টাকা আয় তার কাছ থেকে ৫০৲ টাকা আদায় করা উচিত, এই রকম। আগেকার অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই মত সমর্থন ক'রতেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে আনুপাতিক হারে টেক্স আদায় ক'রলে, বড়মানুষদের ওপর টেক্সের ভার অযথা হাল্কা ক'রে দেওয়া হয়। কারণ, গরীবের আয়ের শতকরা ৫ ভাগ কেটে নিলে, তার কোন নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা আটকে যায়, কিন্তু বড়মানুষের আয়ের শতকরা ৫ ভাগ কেটে নিলে, তাকে বড় জোর কোন বিলাসের সামগ্রী কেনা বন্ধ ক'রতে হয়, কিংবা হয়ত কেবল সঞ্চয়ের পরিমাণ কিছু কমাতে হয়। অতএব তাঁরা মনে করেন যে, সকলের প্রতি সমান সুবিচার ক'রতে হ'লে, ক্রমবর্দ্ধমান হারে টেক্স আদায় করা উচিত। অর্থাৎ, ১০০৲ আয়ের ওপর যদি শতকরা ৫৲ টাকা টেক্স হয়, তা হ'লে ২০০৲ টাকা আয়ের শতকরা ৬৲ টাকা, ১০০০৲ টাকা আয়ের শতকরা ৮৲ টাকা, এই রকম। তার মানে, আয়ের পরিমাণ যত বাড়বে, টাকা প্রতি তত বেশী হারে টেক্স আদায় করা হবে। আজকাল সর্ব্বত্রই, আয় কর ক্রমবর্দ্ধমান হারে আদায় করা হয়।

ক্রমবর্দ্ধমান হারের সপক্ষে যুক্তি এই যে, "ক্ষীয়মান উপকারের সূত্র" অনুসারে, আয়ের পরিমাণ যত বাড়ে, টাকার প্রান্তিক কদর তত কমে। অতএব ১০০৲ টাকা আয়ের ২০ ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিতে হ'লে যে ক্ষতি হয়, ১০০০৲ টাকা আয়ের ২০ ভাগের এক

* "In 1945 46 only 840 persons possessed an income (after deduction of tax) within the range of £4 000 – £6,000 while a mere 45 had an income of £6 000 or more."

Death duties in U. K

Value of the estate		Death duty payable
£		£
5,000	-	100
15 000	—	1 200
30,000	—	5 400
50,000	—	15 500
100,000	—	45,000
300 000	—	180,000
1,000,000	—	750,000

ভাগ দিয়ে দিতে হ'লে তার চেয়ে কম ক্ষতি হয়। সেইজন্য দুজনের ক্ষতির পরিমাণ সমান ক'রতে হ'লে, ১০০০৲ টাকা আয় থেকে ২০ ভাগের ১ ভাগের চেয়ে বেশী নিয়ে নেওয়া উচিত। এই যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে যতটা অকাট্য ব'লে মনে হয়, আসলে কিন্তু ততটা নয়। কারণ, 'ক্ষীয়মাণ উপকারের সূত্র' অনুসারে মাত্র এইটুকু প্রমাণ হয় যে, ১০০৲ টাকার শেষের টাকাটার যে কদর, ১০০০৲ টাকার শেষের টাকাটার তার চেয়ে কম কদর। কিন্তু আনুপাতিক হারে যখন টেক্স নেওয়া হয়, তখন ১০০৲ টাকা আয় থেকে ১৲ টাকা নিলে, ১০০০৲ টাকা আয় থেকে ১৲ টাকা নেওয়া হয় না, ১০ টাকা নেওয়া হয়। অতএব ১০০৲ টাকার শেষের ১৲ টাকার যে কদর, ১০০০৲ টাকার শেষের ১৲ টাকার তার দশ ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম কদর হ'লেই তবে প্রমাণ হয় যে আনুপাতিক হারে অবিচার হয়। কিন্তু এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে হ'তেও পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে নাও হ'তে পারে। তা ছাড়া, আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ক্ষতিবোধটা মনের ব্যাপার। মানুষে মানুষে তফাৎ আছে। বিভিন্ন আয়ের লোক বিভিন্ন জীবন-ধারায় অভ্যস্ত। অতএব ১০০৲ টাকা আয়ের লোককে ৫৲ টাকা টেক্স দিলে যে ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হয়, ১০০০৲ টাকা আয়ের লোককে ৫০৲ টাকা টেক্স দিলে যে, তার চেয়ে কম ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হয়, এ কথা সব ক্ষেত্রে সত্য নাও হ'তে পারে। তবে আজকাল এ বিতর্কের কোন সার্থকতা নেই। কারণ, আজকাল ক্রম-বর্দ্ধমান হারের সমর্থনে প্রধান যুক্তি হ'ল এই যে, এর সাহায্যে দেশে ধন-বৈষম্য দূর করা সহজ হয়।

ক্রমবর্দ্ধমান হার সম্বন্ধে অন্য আপত্তিও আছে। প্রথমতঃ, যদি মেনেও নেওয়া যায় যে আনুপাতিক হারে সকলের ক্ষতির পরিমাণ সমান হয় না, তা হ'লেও বিভিন্ন আয়ের ওপর ঠিক কি কি হারে টেক্স বসালে, সকলের প্রতি সমান সুবিচার করা হয়, তা স্থির করবার কোন উপায় নেই। অতএব কর্ত্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার ওপর ব্যাপারটি ছেড়ে দিতে হয়। তাতে, যা হওয়া উচিত, তাই সব ক্ষেত্রে হয়, তা বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বেশী আয়ের ওপর অতিরিক্ত টেক্স বসালে, অনেকে টেক্স ফাঁকি দেবার লোভ সামলাতে পারে না, এবং ধূর্ত্ত লোকেরা নানারকম কৌশলের সাহায্যে টেক্স ফাঁকি দেয়। এতে টেক্স বসান'র আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হয়। আয়-কর অনুসন্ধান কমিশনের (Income-Tax Investigation Commission) হিসাবে আমাদের দেশে গত যুদ্ধের সময়ে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা আয়ের টেক্স ফাঁকি দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, অতিরিক্ত হারে টেক্স আদায় ক'রলে লোকের সঞ্চয়ের সামর্থ্য ক'মে যায়। তার ফলে দেশের শিল্পোন্নতি ব্যাহত হ'তে পারে। অনেক ছোট ছোট কারবার যে ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে ওঠে, তার কারণ প্রত্যেক বৎসর লাভের একটি মোটা অংশ কারবারের প্রসারের জন্য ব্যবহার করা হয়। বেশী টেক্স দিতে হ'লে, এই রকম সহজ উপায়ে কারবারের উন্নতি করা সম্ভব হয় না।

(৪)

প্রত্যক্ষ টেক্স ও পরোক্ষ টেক্সের গুণাগুণ

প্রত্যক্ষ খেক্সের প্রধান গুণ হ'ল এই যে, এ ভাবে টেক্স আদায় করাটাই সহজ এবং স্বাভাবিক। আয়ের ওপর বা সম্পত্তির ওপর সরাসরি টেক্স আদায় ক'রলে, লোকে সহজেই বুঝতে পারে যে টেক্স দিতে হচ্ছে; এবং কত দিতে হচ্ছে, কখন দিতে হচ্ছে ও কেন দিতে হচ্ছে, এ সব বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ থাকে না। তবে, আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এইটাই প্রত্যক্ষ টেক্সের দোষ। কেউই খুসী মনে টেক্স দেয় না। জেনে শুনে টেক্স দেবার সময় ক্ষতিবোধটা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। তার ওপর যদি তাগাদা দিয়ে টেক্স আদায় করা হয়, তা হ'লে টেক্স দেওয়াটা অত্যন্ত বিরক্তির কারণ হ'য়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ টেক্সের আর একটি গুণ এই যে, এ ধরণের টেক্স সহজে ও কম খরচে আদায় করা যায়। তবে এরও একটি অসুবিধার দিক আছে। আয় বা সম্পত্তির ওপর টেক্স আদায় ক'রতে হ'লে প্রত্যেক ব্যক্তির আয় বা সম্পত্তির হিসাব নেওয়া দরকার। এতে একদিকে টেক্স ফাঁকি দেবার সুযোগ হয়; এবং অন্যদিকে, কাকে কত টেক্স দিতে হবে তা নির্দ্দিষ্ট করবার ভার অনেকাংশে সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিতে হয়। প্রত্যক্ষ টেক্সের আরও একটি অসুবিধা এই যে, এর দ্বারা অপেক্ষাকৃত গরীব লোকেদের কাছ থেকে উচিতমত টেক্স আদায় করা যায় না।

পরোক্ষ টেক্সের ক্ষেত্রে উপরিলিখিত অসুবিধাগুলি ভোগ ক'রতে হয় না। প্রথমতঃ, পরোক্ষ টেক্স দেবার সময় তত বোঝা যায় না; অতএব তাতে বিশেষ বিরক্তিও হয় না। কাপড়, চিনি, তামাক, দিয়াশলাই, তেল মশলা প্রভৃতি জিনিষ কেনবার সময় প্রত্যেককেই টেক্স দিতে হয়; কিন্তু লোকের কাছে সেটা দামেরই অঙ্গ ব'লে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, পরোক্ষ টেক্স গরীব লোকদের কাছ থেকে আদায় ক'রতে কোন অসুবিধা হয় না। তৃতীয়তঃ, এর দ্বারা যথেষ্ট টাকা আদায় করা যায়, এবং যখন ব্যবসা বাণিজ্য ভাল চলে তখন টেক্সর হার কিছু বাড়ালেই অনেক বেশী টাকা আদায় করা যায়। তা ছাড়া, এ রকম টেক্স দিতে লোকের তত গায়ে লাগে না; কারণ, জিনিষপত্র কেন্‌বার সময় একটু একটু ক'রে এই টেক্স দিতে হয়।

পরোক্ষ টেক্সর দোষের দিকও আছে। প্রথমতঃ পরোক্ষ টেক্সর বোঝার বেশীর ভাগটা গরীবের ওপর পড়ে। কারণ, গরীবের আয়ের বেশীর ভাগটা সাধারণ ব্যবহারের জিনিষপত্র কিন্‌তে খরচ ক'রতে হয়। বড়মানুষদের যে অনুপাতে, অনেক কম অংশ খরচ ক'রতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যেমন ব্যবসা বাণিজ্য যখন ভাল চলে, তখন পরোক্ষ টেক্সর সাহায্যে অনেক টাকা তোলা যায়, তেমনি বাজার মন্দার সময় পরোক্ষ টেক্সর আদায় অত্যন্ত ক'মে

যায়। শুধু পরোক্ষ টেক্সর ওপর নির্ভর ক'রলে, কোন গভর্ণমেণ্টের নিয়মিত খরচ চলতে পারে না। তৃতীয়তঃ, পরোক্ষ টেক্স আদায় করবার জন্য যে সব ব্যবস্থা ক'রতে হয়, তাতে অনেক সময় দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের হানি ঘটে। যেমন, আমদানী শুল্ক আদায় করবার জন্য অনেক ছোট ছোট বন্দরের কাজ বন্ধ ক'রে দিতে হয়; কারণ, এই সব বন্দরে এত কম মাল আসে, যে শুল্ক আদায় করবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা পোষায় না। ফলে, আশে পাশের বাজারগুলি এই বন্দর দিয়ে মাল আনাবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এই কথা প্রতিপন্ন হয় যে, কোন এক রকমের টেক্সর সাহায্যে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা ক'রলে, সকলের প্রতি সমান সুবিচার করা যায় না, এবং অন্য দিক্ দিয়েও গভর্ণমেণ্টের অসুবিধা হয়। সেই কারণেই দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রে একাধিক টেক্সর ব্যবস্থা থাকে। তাতে এক টেক্সর দোষ অন্য এক টেক্সর গুণের দ্বারা চাপা পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ জিনিষের ওপর টেক্স বসালে গরীবের ওপর যে অবিচার করা হয়, ক্রমবর্দ্ধমান হারে আয়-করের দ্বারা তার প্রতিকার হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেশের বৈষয়িক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

(১)

ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ রাখার নীতি।

কৃষি শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার সুযোগ থাকার ফলাফল কি, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রথম খণ্ডে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। এই নীতি কার্য্যকরী থাকার দরুণ উনবিংশ শতাব্দিতে এবং বিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে, পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় কি অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল, সে কথারও উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু রাখ্তে হ'লে, গভর্ণমেণ্টকে দুটি বিশেষ কর্ত্তব্য পালন ক'রতে হয়; যথা—

১। বিভিন্ন প্রকার ধনসম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানী স্বত্ব স্বীকার করা, ও রক্ষা করা; এবং

২। প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে কাজ ক'রতে বাধ্য করা।

যাঁরা স্বাধীন চেষ্টার নীতির পক্ষপাতী তাঁরা বলেন যে গভর্ণমেণ্ট যদি এই দুটি কর্ত্তব্য

ঠিক্ মত পালন কবেন, এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে সবকাবী বা দেশাচাবগত কোন বিধি-নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তা হ'লেই দেশেব শ্রীবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী হয়, এবং সমাজেব সকল শ্রেণীব লোকেব নিজেদেব যোগ্যতা অনুসাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ ক'রতে সমর্থ হয়।

কাবণ, এই অবস্থায় ন্যায়-সঙ্গত প্রতিযোগিতাব ক্ষেত্র তৈবী হয়। তখন, প্রত্যেক পণ্যেব মূল্য খোলা বাজাবে 'চাহিদা ও যোগানেব সূত্র' অনুসাবে নির্দ্দিষ্ট হয়। যদি কোন পণ্যেব যোগান চাহিদাব অনুপাতে কম হয়, তা হ'লে দব চ'ড়তে থাকে। তখন সে ব্যবসায়ে লাভ বেশী হ'তে থাকে, এবং তাব ফলে শিল্পপতিবা সেই মাল যাতে বেশী ক'বে তৈরী হ'তে পাবে, সেই দিকে নজব দেয়। অন্যপক্ষে, যদি কোন পণ্যেব যোগান চাহিদাব অনুপাতে বেশী হয়, তা হ'লে দব ক'মতে থাকে। তখন সে ব্যবসায়ে লাভ ক'মতে থাকে এবং প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ লোকসান দিয়ে উঠে যায়, এবং নূতন মূলধন বা শ্রমশক্তি এ ব্যবসায়ে নিয়োগ কবা হয় না। এই ভাবে, স্বাধীন চেষ্টাব নীতি বজায় থাক্‌লে দেশেব প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ও শ্রমশক্তিব সবচেয়ে কার্য্যকব ব্যবহাব হয়। বেশী লাভেব আশায়, বুদ্ধিমান ও কর্ম্ম-তৎপব ব্যক্তিবা, কিসে আবও কম দামে আবও ভাল জিনিষ দেওয়া যায় সেই চেষ্টা ক'বতে থাকে। এবং তাব ফলে, নিত্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও নির্ম্মাণকৌশল আবিষ্কার হ'তে থাকে, এবং বিভিন্ন পণ্যেব তৈবীখবচা ক'মতে থাকে। তার ফলে, কালক্রমে সমস্ত পণ্যের দাম উত্তবোত্তব ক'মতে থাকে। তাতে জনসাধাবণ উপকৃত হয়। শ্রমিকদেব সাহায্য পাবাব জন্য বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিব মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। তাব ফলে শ্রমিকেবা তাদেব ন্যায্য মজুবী আদায় ক'বতে সমর্থ হয়। বস্তুতঃ দেশেব বৈষয়িক জীবনে ন্যায়সঙ্গত প্রতি-যোগিতা বজায় থাক্‌লে, কেহই তাব ন্যায্য পাওনাব চেয়ে বেশী আদায় ক'বতে পাবে না, এবং যে শ্রেণীব লোকে যে অনুপাতে সমাজেব উপকাবে আসে, সে শ্রেণীব লোক সেই অনুপাতে বোজগাব কববাব সুযোগ পায়।

(২)

ক্ষেত্র-বিশেষে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

স্বাধীন চেষ্টাব নীতি অবলম্বনেব ফলে, সকল দিক্ দিয়ে যে সুফলের প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, ততটা পাওয়া যায় না। এতে দেশের বৈষয়িক জীবনের সমস্ত প্রয়োজনও মেটে না; আর সকল শ্রেণীব লোক ঠিকমত নিজের নিজের স্বার্থ রক্ষাও ক'রতে পারে না। তাই, প্রায় সকল দেশেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অল্লাধিক সরকারী বিধি-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কল-কারখানায় শ্রমিকদের দুর্গতি নিবারণের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। তারা এতই অজ্ঞ ও নিঃসম্বল যে, তারা কেবল মাত্র নিজেদের জোরে, নিজেদের

স্বার্থের অনুকূল সর্ত্তাদি আদায় ক'রতে পারে না। ফলে, তারা নানা ভাবে মালিকদের দ্বারা বঞ্চিত ও উৎপীড়িত হ'তে থাকে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য এখন সকল দেশেই, আইনের সাহায্যে, কল-কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ সম্বন্ধে নানা রকম বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা হয়েছে। সপ্তাহে কত ঘণ্টা অবধি খাটান' চল্‌বে, কারখানায় হাওয়া চলাচলের কি ব্যবস্থা থাক্‌বে, কত বয়সের চেয়ে ছোট ছেলে মেয়েদের কাজে নেওয়া চ'লবে না, মজুরীর হার কত টাকার চেয়ে কম হ'তে পারবে না, কোন্ অবস্থায় লোক ছাড়ান' চ'লবে, কলকব্জা কি ভাবে ঘিরে রাখ্‌তে হবে, কাজ ক'রতে ক'রতে কেউ হতাহত হ'লে তাকে বা তার স্ত্রীপুত্রকে কি খেসারৎ দিতে হবে, এই সব এখন আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। শ্রমিকেরা দাবী করুক, চাই না করুক, সমস্ত কল কারখানার মালিকদের এই সব বিধি মেনে চ'ল্‌তে হয়।

শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেমন আইন কানুনের দরকার হয়েছে, তেম্‌নি কোন কোন ক্ষেত্রে খরিদ্দারদের স্বার্থ রক্ষার জন্যও সরকারী বিধি-নিয়ন্ত্রণের দরকার হয়েছে। সাধারণতঃ অবশ্য, জিনিষপত্র কে্‌নবার সময়ে, খরিদ্দারেরা জিনিষের গুণাগুণ বা দাম উচিতমত যাচাই করে নেয়। অতএব এ সব ক্ষেত্রে সরকারের কিছু করবার দরকার হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে, খরিদ্দারদের জ্ঞান বুদ্ধিতে কুলোয় না, কিংবা যাচাই করবার ঠিকমত সুযোগ ঘটে না। তখন সরকারের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না ক'রলে চলে না। সেই জন্য খাবার জিনিষে ভেজাল দেওয়া কিংবা কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ব'লে গণ্য করা হয়েছে। ঐ একই কারণে চিকিৎসা প্রভৃতি পেশাদারী কাজের জন্য, শিক্ষা ও দক্ষতার মাপকাঠি হিসাবে, বিভিন্ন উপাধি অর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে।

শিল্প-বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপের আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, শিল্প-সংরক্ষণ নীতিতে। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সস্তায় বিদেশী মাল কেন্‌বার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে, সংরক্ষণ-শুল্কের আওতায় নব-প্রতিষ্ঠিত দেশী কারবারগুলি পুষ্টি ও শক্তি সঞ্চয় করবার সময় পাবে, যাতে ভবিষ্যতে সেগুলি বিদেশী কারবারগুলির সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে পারে। এখানে, দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য সাময়িক ভাবে লোকের স্বাধীন চেষ্টার অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়। শিল্প সংরক্ষণ নীতির অন্য উদ্দেশ্যও থাকে। গভর্ণমেন্টের সবচেয়ে বড় কাজ, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা, এবং সেই উদ্দেশ্যে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা। আধুনিক যুদ্ধে লৌহশিল্প ও রসায়ণশিল্পের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। অতএব দেশে এই সব শিল্পের প্রয়োজনমত প্রসার ও পরিপুষ্টি যাতে হয়, সে দিকে গভর্ণমেন্টের বিশেষ নজর রাখা দরকার, এবং সেই উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ শুল্কের আওতায় সেগুলির উন্নতি করবার চেষ্টা

করা হয়। যেখানে তাতেও আশানুরূপ ফল হয় না, সেখানে গভর্ণমেণ্ট নিজেরাই এই সব শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ভার নেয়।

এ ছাড়া, রাস্তা ঘাট তৈরী, শিক্ষা-বিস্তার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কতকগুলি কাজ আছে, সেগুলি দেশের মঙ্গলের জন্য নিতান্তই দরকার, অথচ ব্যক্তিগত চেষ্টার ওপর ছেড়ে দেওয়া চলে না, কারণ, এ সব কাজে ব্যক্তিগত লাভ হবার সম্ভাবনা নেই। অতএব এগুলির দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টকেই নিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে একচেটিয়া কারবারগুলির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। অত্যন্ত ধনী ও কৌশলী লোকেরা অনেক ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, এবং সেই উদ্দেশ্যে নানা রকম অসাধু ও দেশের ক্ষতিকর উপায় অবলম্বন করে। এইসব লোকের হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনেক সময় ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর নানা রকম বিধি নিষেধ আরোপ ক'রতে হয়, এবং কোন কোন ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আয়ত্তাধীনে আনতে হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে, দেশের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাব অবলম্বন ক'রলে চলে না। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু, তাতে কি এ কথা প্রমাণ হয় যে, বৈষয়িক জীবনের প্রতিটি অঙ্গ সরকারের আয়ত্তে ও সরকারী পরিচালনাধীনে থাকলেই, তবে দেশের সবচেয়ে মঙ্গল হয়? সোস্যালিষ্টদের মত তাই।

(৩)

সোস্যালিজ্‌ম্ (Socialism)

সোস্যালিষ্টরা বলেন যে দেশের সমুদয় চাষের জমি, খনি, জলাশয়, কল কারখানা, ব্যাঙ্ক, রেলপথ প্রভৃতি যা কিছু ধনোৎপাদনের কাজে ব্যবহার হয়, সেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি না রেখে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা উচিত। এবং তখন রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষদের কর্ত্তব্য হবে, শাসন-কার্য্যের অঙ্গ হিসাবে, রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ও শ্রমশক্তির যথাযোগ্য নিয়োগ করা। তবেই, দেশের সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'তে পারে। তা না হলে, দেশের সঙ্গতির অপচয় নিবারণ করা যায় না, এবং ধনী ও কৌশলী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ রক্ষাও করা যায় না। সোস্যালিষ্ট নীতি অবলম্বন ক'রলে কাউকে বেকার ব'সে থাকতে হবে না; আবার, নিষ্কর্ম্মা লোক পূর্ব্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির জোরে ব'সে খাবে, তাও চ'লবে না। প্রত্যেককেই তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ দেওয়া হবে, এবং প্রত্যেকেই সেই কাজের জন্য যথাযোগ্য উপার্জ্জনের অধিকারী হবে।

সোস্যালিষ্টরা বলেন যে, ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার নীতির নিষ্ফলতা কতখানি, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, এখনকার কতকগুলি গুরুতর সমস্যার সমাধানে এই নীতির ব্যর্থতায়।

এর মধ্যে একটি হচ্ছে বেকার-সমস্যা। কেউ বেকার ব'সে আছে মানেই, দেশের খানিকটা শ্রমশক্তির অপচয় ঘট্‌ছে। তা ছাড়া একটু বেশী দিন বেকার অবস্থায় থাক্‌লে মানুষ নষ্ট হ'য়ে যায়। তার উৎসাহ যায়; তার আত্মসম্মানবোধ যায়; তার কর্ম্মকুশলতা নষ্ট হয়; এবং ক্রমশঃ সে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হ'য়ে সমাজের গলগ্রহে পরিণত হয়। যাঁরা ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার নীতির সমর্থক তাঁরা স্পষ্টই স্বীকার করেন যে বেকার-সমস্যার সম্পূর্ণ প্রতিকার অসম্ভব। কারণ, বেকার হওয়ার প্রধান কারণগুলি অনুধাবণ ক'রলেই বোঝা যায় যে, কেউ কখনও বেকার থাক্‌বে না, এ অবস্থার সৃষ্টি করা অসম্ভব।

তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, এমন অনেকগুলি ব্যবসায় আছে, যাতে কাজের চাপ, বৎসরের সব সময় সমান থাকে না; যেমন, ছাতার কারবার, পশমী বস্ত্রের কারবার ইত্যাদি। চাষের কাজে, বৎসরের খানিকটা সময় কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী থাকে, আবার খানিকটা সময়ে প্রায় কিছুই থাকে না। বাড়ী তৈরীর কাজেও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কাজের চাপের যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। অতএব এইসব ব্যবসায়ে যারা কাজ করে তাদের অনেককেই বৎসরের খানিকটা সময় বাধ্য হ'য়ে বেকার থাক্‌তে হয়। একই শিল্প-প্রতিষ্ঠানে দু তিন রকম সামগ্রী তৈরী করার ব্যবস্থা করা, কৃষাণদের জন্য কুটীর-শিল্পের সাহায্যে বাড়তি কাজের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি উপায়ে এ অবস্থার কিছু প্রতিকার সম্ভব; কিন্তু পূরো প্রতিকার সম্ভব নয়। বেকার হবার আর একটি প্রধান কারণ এই যে, শিল্পের ক্ষেত্রে সব সময়েই নূতন ধরণের বেশী বেশী কাজের যন্ত্রপাতি ও উন্নত নির্ম্মান-কৌশল আমদানী করা চ'লছে। তাতে আগে যে কাজের জন্য যত লোক ও যে যোগ্যতার লোক দরকার হ'ত, পরে তা হয় না। অতএব সব সময়েই এই কারণে কিছু কিছু লোক বেকার হচ্ছে। তার মধ্যে কারও কারও নূতন কাজ শেখ্‌বার বয়স থাকে না, এবং সেইজন্য তাদের আবার কাজ জোটা দুরূহ হ'য়ে ওঠে। দেশের এক জায়গায় পুরোণো ধরণের কারবারে মন্দা প'ড়ছে ও ক্রমশঃ সেগুলি উঠে যাচ্ছে; আবার অন্য জায়গায় নূতন নূতন কারবারের জন্ম হচ্ছে ও প্রসার হচ্ছে; এরকমও অনেক ক্ষেত্রে ঘট্‌ছে। যাদের কাজ যাচ্ছে তারা সব সময়ে নূতন জায়গার কাজের খোঁজ খবর পায় না; বা পেলেও, নানা অসুবিধার জন্য যেতে পারে না। ফলে, বেকারের দল ভারী হ'তে থাকে। খুব বেশী দিনের কথা নয়, এই বাংলা দেশেই প্রত্যেক গ্রামের কামার, কুমোর, তাঁতী, কলু প্রভৃতি কারু-শিল্পীরা পৈতৃক পেশা অবলম্বন ক'রে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌ত।

তারপর যন্ত্র-শিল্পের যুগ এল; এবং ধীরে ধীরে তাদের ব্যবসাগুলি নষ্ট হ'ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, বড় বড় পাটের কল, কাপড়ের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রভৃতি নানা ব্যবসায় গ'ড়ে উঠ্ল। কিন্তু সেখানে যে সব লোক নিযুক্ত হ'ল, তারা বাইরে থেকে এল। এখানে যাদের অন্ন গেল তারা এইসব নূতন কল-কারখানায় কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে না। বেকারের সংখ্যা-বৃদ্ধির আর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে বাণিজ্য-চক্র। বাণিজ্য-চক্রের নিম্নগতির সময় নানা কারবারে এত মন্দা পড়ে যে, হাজারে হাজারে লোক ছাঁটাই হ'তে থাকে। এ বিষয়ে আমরা আর একটি পরিচ্ছেদে সবিশেষ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে বাণিজ্য-চক্রের কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সকলে একমত নন। প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধেও তারা একমত নন। তবে কেউই তাঁদের মধ্যে এ আশ্বাস দেন না যে, বাণিজ্য-চক্র সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করা সম্ভব।

আরও একটি গুরুতর সমস্যার সমাধানে ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার নীতি ব্যর্থ হয়েছে। সে সমস্যাটি দারিদ্র্য ও ধন-বৈষম্যের সমস্যা। আজকাল বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে, ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে এত কম পরিশ্রমে এত বেশী জিনিষপত্র তৈরী করা সম্ভব হয়েছে যে অন্ততঃ শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান হবার কথা। কিন্তু তা হয় নি।

ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার নীতির এই ব্যর্থতার কারণ দেখাতে গিয়ে, সোস্যালিষ্টরা বলেন যে, এই নীতির মূলের অনুমানটিই ভুল, যে বৈষয়িক ক্ষেত্রে ন্যায়-সঙ্গত প্রতিযোগিতার অবস্থা বজায় রাখা যায়। অন্ততঃ আধুনিক কালে এমন কারবার খুব কমই আছে, যেখানে অবাধ প্রতিযোগিতা বজায় আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই অল্প-বিস্তর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার, গুটিকতক অতিবৃহৎ প্রতিষ্ঠান আর সকলকে হটিয়ে দিয়ে, একটি সমগ্র বাজার নিজেদের মধ্যে আপোষে ভাগ করে নেয়, এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের এলাকায় যথাসম্ভব খরিদ্দারদের শোষণ ক'রতে থাকে।

সোস্যালিষ্টরা আরও এই কথা বলেন যে, ব্যক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার নীতির সমর্থনে সাধারণতঃ যে সব যুক্তি দেখান' হয় সেগুলিও সব ক্ষেত্রে খাটে না। এগুলির মধ্যে প্রধান যুক্তি হ'ল এই যে লোকে স্বভাবতঃই নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকে, এবং জিনিষপত্র কেনবার সময় সাবধানে গুণাগুণ ও দর বিচার করে। অতএব যোগানদারদের মধ্যে রেষারেষি চলে, কে কত কম দরে কত ভাল জিনিষ দিতে পারে। ফলে জিনিষ ভাল করবার ও তৈরী-খরচ কমাবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চলে। যে, জনসাধারণের যত বেশী উপকার ক'রতে পারে, সে নিজে তত লাভবান্ হয়। যোগ্য ব্যক্তি টিঁকে যায়; অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি হ'টে যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায়, ঠিক্ এরকমটি হয় না। খরিদ্দার অনেক ক্ষেত্রে বাহিরের চটকে ভোলে। সে জিনিষের গুণাগুণ বিচার ক'রতে জানে না বা চায় না। ওপরের জৌলুস, ফ্যাসানের টান, নূতনত্বের মোহ, এইগুলির আকর্ষণই তার কাছে বেশী।

ফলে, খাঁটি মজবুত উপকারী জিনিষের উচিতমত আদর হয় না; আর মেকি ভেজাল ও ফঙ্গবেনে জিনিষে বাজার ভ'রে যায়। এবং এইজন্য অনেক ক্ষেত্রে ধূর্ত্ত অসাধু ব্যবসায়ীরা অল্পদিনের মধ্যে ধনবান্ হয়ে পড়ে; অথচ যারা সৎপথে থাকে, তাদের উন্নতি হয় না। সমাজের কোন উপকার না ক'রে, বা অতি সামান্য উপকাব ক'রে লোকে বড়মানুষ হয়েছে, এবং হচ্ছে, এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একচেটিয়া কারবারী যোগান কমিয়ে ও দর চড়িয়ে অন্যায় লাভ ক'রছে; ফাটকা কারবারী, কোন কোন ক্ষেত্রে, লোক ঠকিয়ে বড়মানুষ হচ্ছে; জমির মালিক তার জমির ওপর দিয়ে নূতন রাস্তা যাওয়ার দরুণ, বা সেখানে নূতন সহর পত্তন হওয়ার দরুণ অপ্রত্যাশিত লাভ ক'রছে, বড়মানুষের ছেলে, কেবল ভাগ্যের গুণে, ভোগ বিলাসের অধিকারী হচ্ছে; এই রকম ও অনুরূপ আরও অনেক রকম ঘটনা প্রত্যহ ঘটছে। স্বাধীন চেষ্টার সমর্থনে আর একটি যুক্তি এই যে প্রতিযোগিতার পথ থেকে যদি সকল রকম আইনগত ও দেশাচারগত বাধা সরিয়ে নেওয়া যায়, তা হ'লে প্রত্যে-কেই নিজের নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী উন্নতি ক'রতে পারবে। কিন্তু যার বাপের পয়সা আছে, যে ব্যয়সাধ্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রতে পেরেছে, যে ধনীসমাজে মানুষ হয়েছে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উৎসাহ, সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছে; আর যে গরীবের ঘরে জন্মেছে, অর্থ ও সময়ের অভাবে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রতে পারে নি, এবং আত্মীয় স্বজন সকলেই সামান্য অবস্থার লোক হওয়াতে কারও কাছ থেকে মূলধন বা অন্য কোন প্রকার সাহায্য পায় নি; স্বাধীন চেষ্টার অধিকার আছে বলেই এই দুই জন সমান সুযোগ পেয়েছে, একথা বলা যায় না। শেষের লোকটি মেধায় ও চরিত্রেব দৃঢ়তায় প্রথম লোকটির চেয়ে অনেক উচ্চস্তরেব হ'লেও বৈষয়িক উন্নতির দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে থাকতে বাধ্য।

সোস্যালিষ্টরা বক্তিগত স্বাধীন চেষ্টার নীতিব যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন, তার মোটা-মুটি পবিচয় এতক্ষণ দেওয়া হ'ল। এই নীতির যে সব ত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না; এবং এই নীতি যে সর্ব্বাংশে সার্থক হয় নি, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। তবে প্রশ্ন এই যে, এই নীতির পরিবর্ত্তে যদি পূরোপূরি সোস্যালিষ্ট নীতি অবলম্বন করা যায়, তা হ'লে কি দেশের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভাল হয়? অর্থাৎ, ধনসম্পদের পরিমাণ কি বাড়ে? দেশের সঙ্গতির অপচয় কি কমে? দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্, মূলধন ও শ্রমশক্তি, নিয়োগে কি আরও কর্ত্তব্যবোধ ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়? কোন সমাজ-ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হ'তে পারে না। যদি দেখা যায় যে সোস্যালিষ্ট নীতি অবলম্বন ক'রলে বেশী কাজ পাওয়া যেতে পারে, এবং জনসাধারণের বেশী উপকার হ'তে পারে, তবেই চালু ব্যবহা বদল করে নূতন ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়ার কথা উঠতে পারে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিলাতে এবং ফ্রান্সে অনেকগুলি ব্যবসায় রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে, এবং রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আছে। তার ফল যা হয়েছে, তা থেকে সোসালিষ্ট নীতির সার্থকতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হবার মত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিলাতে ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনটি সরকারী বিমানপথ কর্পোরেশনে মোট ১০,৩০০,০০০ পাউণ্ড লোকসান হয়েছে, এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে এই লোকসানের পরিমাণ আরও বেড়েছে। কয়লার ব্যবসায়ে ন্যাশানাল কোল বোর্ডের (National Coal Board) বিবরণীতে প্রকাশ যে বিলাতের কয়লার খনিগুলি রাষ্ট্রের হাতে আসবার পর প্রথম বৎসরে ২৩,২৫৫,৫৮৬ পাউণ্ড লোকসান হয়েছে, অর্থাৎ প্রতি টনে ১ শিলিং হারে লোকসান হয়েছে; অথচ রাষ্ট্রের হাতে নেবার ঠিক আগের বৎসরে এইগুলিতে টনপিছু ২ শিলিং হিসাবে লাভ হচ্ছিল। এখন উত্তরোত্তর কয়লার দাম বাড়িয়ে লোকসান বাঁচাবার চেষ্টা চ'লছে। বৃটিশ ট্রান্সপোর্ট কমিশনের (British Transport Commission) হাতে রেলপথ বাস চলাচল ইত্যাদি ব্যবসায়গুলি আছে। সেই বিভাগে ২০,০০০,০০০ পাউণ্ডের চেয়ে বেশী লোকসান হয়েছে। কৃষি দপ্তরের কাজ সম্বন্ধে 'হাউস্ অফ্ কমন্সের' এক কমিটির বিবরণীতে ঐ বিভাগের অপচয় ও ব্যয়বাহুল্যের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে; ১৯৪৮-৪৯ সালে ঐ বিভাগের খাদ্য উৎপাদনের কাজে প্রায় ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড লোকসান হয়েছে। ফ্রান্সেও, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়গুলিতে, সুপরিচালনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ১৯৪৭ সালে উত্তর ফ্রান্সের কয়লার খনিগুলিতে ৩,১১৯,০০০,০০০ ফ্রাঙ্ক, এবং 'লরেনের' (Lorraine) খনিগুলিতে ১,৩৮৪,০০০ ফ্রাঙ্ক লোকসান হয়েছে। গ্যাস বোর্ডের (Gas Board) লোকসান হয়েছে ৫, ৩৫০,০০০,০০০ ফ্রাঙ্ক; রেণোর (Renault) গাড়ী তৈরীর কারখানাগুলিতে ৪৫,০০০,০০০ ফ্রাঙ্ক; ও সরকারী বিমান চলাচল ব্যবসায়ে ৫২,০০০,০০০ ফ্রাঙ্ক। সরকারী ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ার মানেই এই যে, ঐ ক্ষতি জনসাধারণের ওপর বেশী টেক্স বসিয়ে পূরণ করা হয়।

উপরের এই দৃষ্টান্ত থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, ঠিক্ কি ধরণের ব্যবস্থা ক'রলে সরকারী পরিচালনা কার্য্যকরী হয়, তার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। এ সম্বন্ধে বিলাতের 'ফেবিয়ান সোসাইটি'র (Fabian Society) সভাপতি অধ্যাপক 'কোলে'র (Pro. Cole) মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন, "Nobody wil pretend that the problem of successful democratic control of industries under public ownerhip have yet been solved, or are even within sight of solution.' ভারত-গভর্ণমেণ্ট দ্বারা রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যবসায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্ত যে কমিটি (Committee on State Trading) নিযুক্ত হ'য়েছিল, ১৯৫০ সালে তাদের বিবরণীতে, ব্যবসা পরিচালনার কাজে রাষ্ট্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ

প্রকাশ করা হয়েছে। কিছুকাল আগে ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে, শ্রীকস্তুরভাই লালভাই, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কি ধরণের কাজ হচ্ছে সে বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ক'রতে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিবরণীতে সরকারী কর্ম্মপদ্ধতির যথেষ্ট নিন্দা করেছেন। সম্প্রতি, ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের (Ministry of Industry and Supply) বার্ষিক বিবরণীতে (১৯৫১) এই মন্তব্য করা হয়েছে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে সরকারী পদ্ধতি সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

সোস্যালিষ্ট নীতি সাফল্যমণ্ডিত করবার উপযোগী কোন ব্যবস্থার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। এরূপ কোন ব্যবস্থা যে সম্ভব তাও বলে মনে হয় না। কারণ, এ ব্যবস্থায় দুটি প্রয়োজন মেটা চাই। প্রথমতঃ, প্রত্যেক সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য এক বা একাধিক সুদক্ষ পরিচালক নিযুক্ত করা চাই, এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করা চাই যে, ঐ পরিচালকেরা কাজে উৎসাহ পায় এবং নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করবার সুবিধা পায়, অথচ, কাজে ফাঁকি দিতে বা ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ও শ্রমশক্তি নিয়োগ করবার সময়, ঐগুলিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া চাই যে, দেশের সব রকমের প্রয়োজন যথাসম্ভব মেটে, কোন একটি দিক্ উপেক্ষা ক'রে আর একটি দিকে বেশী নজর না দেওয়া হয়, এবং সমগ্রভাবে দেশের সর্ব্বাধিক কল্যাণ হয়। এ দুটি কাজের কোনটিই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে করা সহজ নয়।

সুদক্ষ পরিচালক, কোন দেশেই বিশেষ বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে ঐরূপ লোকের একান্ত অভাব। ঐ কাজের জন্য যে যোগ্যতার দরকার, সে যোগ্যতা স্কুল-কলেজে পড়িয়ে বা কোন বাঁধাধরা শিক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে দেওয়া যায় না। কারবারে থেকে এবং নিজের চেষ্টায় ও অনেক দিনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে এ যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায়। * স্বাধীন ব্যবসায়ের সুযোগ না থাকলে, যথেষ্ট সংখ্যায় সুদক্ষ পরিচালক তৈরী হ'তে পারে না। তা ছাড়া, সে অবস্থায় কে যোগ্য কে অযোগ্য, বিচার করবার কোন সহজ উপায় থাকবে না। এখন, লোকে স্বাধীন ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখিয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেয়; এবং তারপর বড় বড় কারবার পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব আপনা আপনিই তার হাতে এসে

* Sir Purushottomdas Thakurdas, in course of a speech condemning the policy of nationalisation and control by the Govt. of India, observed, "......Industrialisation requires not merely capital and capital goods but... . procurement and assimilation of technique,... ..and of managerial arts which cannot be imported like a packaged commodity ...It is a hard, painful and long procers (to acquire them)......(There must be) incentives which would attract large numbers of individuals to sustain the vast effort needed over long years of arduous painful toil......"

পড়ে। যদি দেশের সব কারবার রাষ্ট্রের হাতে যায়, তা হ'লে লোকের যোগ্যতার পরিচয় পাবার কোন সহজ ও নিশ্চিত উপায় থাক্‌বে না, এবং যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। আর, যদিও বা কোন ক্ষেত্রে যোগ্য লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং তার হাতে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভার দেওয়া যায় সে যে ঐ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। বেসরকারী ব্যবসায়ে, লাভ হ'লে মালিকের লাভ, লোকসান হ'লে মালিকের লোকসান। অতএব, শিল্পপতিরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে, এবং কিসে ব্যবসায়ের উন্নতি করা যায়, এবং কিসে অপচয় নিবারণ করা যায় এবং লোকসান বাঁচান' যায় সেদিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সরকারী কর্ম্মচারীর সে তাগিদ্ থাক্‌বে না। তার কাছে সবচেয়ে বড় কথা হবে, চাকুরীটি যেন বজায় থাকে, এবং বদনাম যেন না হয়। অতএব তার চেষ্টা হবে খাতায় কলমে কোন গলদ না থাকে সেই দিকে নজর রেখে, গতানুগতিক-ভাবে কাজ চালান'। বিশেষতঃ, শিল্পপতিরা যে ভাবে সাহস ক'রে নূতন নূতন কাজ হাতে নেয়, এবং নূতন যন্ত্র ও নূতন কৌশল অবলম্বন করে, সরকারী কর্ম্মচারীরা সে রকম ক'রতে স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ ক'রবে। কারণ, লোকসান হ'লে, উপরওলার কাছে এবং জনসাধারণের কাছে তাদের জবাবদিহি দিতে হবে, হয়ত বা শাস্তিও পেতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এ রকম মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, যখন অনেক বড় বড় বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান মাইনে-করা ম্যানেজারদের হাতে বেশ ভাল চ'লছে, তখন সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিও না চল্‌বার কোন কারণ নেই। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে কারণ যথেষ্ট আছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিচক্ষণ ব্যবসায়ীরা ম্যানেজার নিযুক্ত করে। অতএব যোগ্য ব্যক্তিই নিযুক্ত হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রনায়কদের এ কাজ ক'রতে হবে। তারা অন্য দিকে যতই কৃতী হউন, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনভিজ্ঞ। অতএব অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হ'তে পারে। তারপর, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতা দেখাতে পারলে যত বেশী ও যত তাড়াতাড়ি পুরস্কার পাওয়া যায়, সরকারী কাজে তা দেওয়া সম্ভব নয়। অংশীদারী কারবারে বেতনভুক কর্ম্মচারী কালক্রমে অংশীদার হ'তে পারে। জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীতে বিশেষ কৃতী ম্যানেজারকে লাভের অংশ দেওয়ার প্রথা আছে। এ ধরণের ব্যবস্থা সরকারী কাজে সম্ভব নয়। সেইজন্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজাররা যতখানি চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতি করবার চেষ্টা করে, সরকারী কাজে তা ক'রবে না। অধস্তন কর্ম্মচারীদেরও নিয়োগ, পদবৃদ্ধি ও পদচ্যুতি সম্বন্ধে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে যে সব ধারা চালু আছে, সরকারী কাজের পক্ষে সেগুলি উপযুক্ত নয়। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে দুটি একটি লোকের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা থাকে। তাদের কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চ'লতে হয় না। কারবারের সুবিধার জন্য তারা যখন যা ভাল বিবেচনা করে তখনই তা ক'রতে পারে। কিন্তু সরকারী কাজে এ ব্যবস্থা চল্‌তে পারে না। সরকারী

চক্রেরীতে নিয়োগ, বেতন, পদবৃদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ে বাঁধাধরা নিয়ম থাকা দরকার। তা না হ'লে, নানা রকম অনাচার, পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা।

মাঝামাঝি কোন ব্যবস্থা ক'রতে পারলে সুবিধা হয় কিনা, এ বিষয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হয়েছে। সম্প্রতি এ-ডি-গোরওয়ালা এই ধরণের একটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন। সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির কোনটিই ভাল চ'লছে না কেন, সেই বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করবার জন্য, তাঁকে ভারত গভর্ণমেণ্ট থেকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি অনুসন্ধান ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সরকারী কাজ চালাবার জন্য যে সব ব্যবস্থা ও বিধি চালু আছে, সেগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালাবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কি ব্যবস্থা ক'রলে কাজ ভাল চ'লতে পারে সে বিষয়ে তিনি কতকগুলি প্রস্তাব ক'রেছেন, এবং সেগুলি একটি স্মারক-লিপি আকারে 'প্ল্যানিং কমিশনের' (Planning Commission) হাতে দিয়েছেন (জুলাই, ১৯৫১)। তাঁর প্রধান প্রস্তাবগুলি এই—

১। প্রত্যেকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কাজ চালাবার সুযোগ ও অধিকার দিতে হবে।

২। পার্লামেণ্টের শাসন মাত্র এইটুকু থাকবে যে, বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ পেশ করবার সময় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ সম্বন্ধে আলোচনা হ'তে পারবে, এবং প্রশ্নোত্তরের সময় খবর নেওয়া যাবে।

৩। বিভাগীয় মন্ত্রীর ক্ষমতাও অনুরূপভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে। আসলে তাঁর কাজ হবে, "গভর্ণিং বোর্ড"এর সভাপতি ও সভ্য হবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচন করা। মন্ত্রী নিজে, বা গভর্ণমেণ্টের কোন সভ্য এই বোর্ডের সভ্য হ'তে পারবেন না।

৪। উপরোক্ত বোর্ডের কাজ হবে, সমগ্রভাবে দেশের সমস্ত সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলির জন্য নীতি নির্দ্ধারণ করা। দৈনন্দিন কাজের ওপর তাঁরা কোন খবরদারী ক'রবেন না। এই বোর্ডের সভ্যসংখ্যা হবে পাঁচ কি ছয়। সভাপতি ও আর একজন, গভর্ণমেণ্টের লোক হ'তে পারেন। বাকি কয়জনকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পপতিদের ভেতর থেকে বেছে নিতে হবে।

৫। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি চালাবার জন্য সুদক্ষ ম্যানেজার তৈরী ক'রতে হবে। ২০।২৫ বৎসরের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক আছে, এমন সব লোক বেছে নিয়ে, দেশের ও বিদেশের বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তাদের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়াতে হবে। সেখানে তারা মাল তৈরী ও মাল বিক্রী সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রলে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভার, এক একটির এক একজনের হাতে দিতে হবে। কাজে উৎসাহ দেবার জন্য উচিতমত পুরস্কারের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। এবং, একেবারে পাকা চাকুরী না দিয়ে, কয়েক বৎসরের চুক্তিতে তাদের নিয়োগ ক'রতে হবে।

এই সব প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা ক'রলে সুফল পাওয়া যাবে কিনা, সে বিষয়ে স্বভাবতঃই মতভেদ হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে যতদিন না প্রয়োগ করা হচ্ছে, ততদিন ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যাবে না।

তবে, এই প্রস্তাবগুলির একটি বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। বহুসংখ্যক বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান বজায় না থাকলে, এই প্রস্তাবগুলিকে কাজে লাগান' যায় না। কারণ, গভর্ণিং বোর্ডের বেশীর ভাগ সভ্য বে-সরকারী শিল্পপতিদের মধ্য থেকে নিতে হবে; এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ম্যানেজারদের, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পুরোপুরি সোস্যালিষ্ট নীতি চালু ক'রলে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করবার কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তার কোন উত্তর, শ্রীগোরওয়ালা দেন নি, বা দিতে পারেন নি। বরঞ্চ তাঁর প্রস্তাবগুলি থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, তাঁর মতে এ রকম কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

সমস্ত কারবার রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া হ'লে সুপরিচালনার সম্ভাবনা কত কম, তা দেখা গেল। অন্য সমস্যাটির সমাধান আরও শক্ত। দেশের সম্পত্তি থেকে সর্ব্বাধিক উপকার পেতে হ'লে, কোন একটি দিকে অত্যধিক নজর দিয়ে আর এক দিক্ উপেক্ষা ক'রলে চ'লবে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্, মূলধন ও শ্রমশক্তি এমন ভাবে ভাগ ক'রে দিতে হবে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐগুলি থেকে সমপরিমাণ প্রান্তিক উপকার পাওয়া যায়। এখন, খোলা বাজারে দর ওঠানামার ভেতর দিয়ে ঐ কাজ আপনা-আপনি হয়; এবং মোটের ওপর ভালই হয়। যদি অত্যধিক ধন-বৈষম্য না থাকত, এবং যদি একচেটিয়া কারবারীদের উচিতমত শাসনে রাখা যেত, তা হ'লে ঐ কাজ নিখুঁত ভাবেই হ'ত। সোস্যা-লিষ্ট রাষ্ট্রে, ঐ কাজের জন্য, জনকয়েক সরকারী কর্ম্মচারীর ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ও দুরদর্শিতার ওপর নির্ভর ক'রতে হবে। তাতে যে কত বড় বড় ভুল হ'তে পারে, তা একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৯৪৯ সালের নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় জলসেচ বিভাগ (Central Irrigation Department) থেকে যে সমস্ত কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছিল, সেইগুলি যদি ঠিকমত চালিয়ে যাওয়া হ'ত, তা হ'লে তার জন্য এত বেশী পরিমাণ লোহা ও সিমেণ্ট খরচ হ'ত যে, আর কোন কাজের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাক্‌ত না; অর্থাৎ, রেল বিভাগ, ডাক বিভাগ প্রভৃতি অন্যান্য সরকারী বিভাগের সমস্ত নূতন কাজ বন্ধ ক'রে দিতে হ'ত। সাধারণ লোকের বাড়ী ঘর করবার জন্য কি কল কারখানা গড়বার জন্য যে কিছুই অবশিষ্ট থাক্‌ত না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

গুটিকতক লোকের, সকল বিষয়ে এত অভিজ্ঞতা থাক্‌বে, এবং তারা এত বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ হবে, যে তারা লক্ষ লক্ষ লোকের অসংখ্য প্রয়োজনের দিকে নজর দিতে পারবে, এবং প্রত্যেকটির আপেক্ষিক গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রতে পারবে, এ রকম কখনও সম্ভবপর হ'তে

পারে না। তাদের কাজে পদে পদে অবিবেচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, এবং দেশের সম্পত্তির অতিমাত্রায় অপচয় ঘট্‌তে থাক্‌বে।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হচ্ছে যে, চালু ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে, তার বদলে পুরোপুরি সোস্যালিষ্ট ব্যবস্থা আমদানী করবার চেষ্টা ক'রলে অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কাজ করা হবে। দেশের বৈষয়িক জীবনের ভিত্তি হিসাবে স্বাধীন চেষ্টার নীতিই বজায় রাখা উচিত। যে সব ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, শুধু সেই সব ক্ষেত্রে যতটুকু দরকার ততটুকু বিধি-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা উচিত। আর সেই সঙ্গে, যে সব কারণে স্বাধীন চেষ্টার নীতি থেকে যথোচিত সুফল পাওয়ায় ব্যাঘাত ঘট্‌ছে, সেই সব কারণগুলি দূর করবার চেষ্টা করা উচিত। ঐগুলির মধ্যে প্রধান কারণ দুটি। একটি হচ্ছে অত্যধিক ধনবৈষম্য। এর দরুণ, বাজার দরের সাহায্যে বিভিন্ন সামগ্রীর আপেক্ষিক প্রয়োজন বোঝায় ব্যাঘাত ঘটে। এত বেশী ধন-বৈষম্য হওয়ার আসল কারণ এই যে, লোকে উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির অধিকার পায়। এ অধিকার দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। প্রত্যেক লোকের জীবিতকালে তার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার থাকা দরকার। তা না হ'লে তার কাজে উৎসাহ থাক্‌বে না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের ঐ সম্পত্তিতে অধিকার দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ তাতে অনেক ক্ষেত্রে দেশের অপকার হয়। কারণ, তাতে আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা প্রশ্রয় পায়। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীপুত্রাদি যাতে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন ক'রতে পারে, এইটুকু মাত্র বাদে বাকি সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া উচিত। সেইভাবে আইন বদল ক'রলে, আরও এক দিক্‌ দিয়ে সমাজের উপকার হবে। কৃতী লোকেরা তখন নিজেদের জীবদ্দশায় মান সম্ভ্রম পাবার জন্য নানা রকম জনহিতকর কাজে অর্থব্যয় ক'রবে; আর অসদুপায়ে অর্থো-পার্জ্জন করবার প্রবৃত্তি অনেকাংশে কম হবে।

অন্য প্রধান কারণটি, একচেটিয়া কারবারীদের অনাচার। এদের কঠোর হস্তে শাসন করবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

সমাপ্ত